আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর জননী গোলোকমণি দেবী

প্যারীচরণ সরকারের জননী ভবময়ী

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জননী জগত্তারিণী দেবী

প্রথম ভারতবর্ষীয় একাউণ্টেণ্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যের জননী মন্দাকিনী দেবী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জননী নিস্তারিণী দেবী

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অঞ্জলি—বিজয়দাতা দেবতা।

১। হে ভগবান! তোমার আদেশে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া জলদাতা মেঘসকল ছুটিয়া আসিতেছে। তুমি সেই রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছ। তোমার কণ্ঠহারের বিদ্যুজ্জ্যোতি থাকিয়া থাকিয়া নরনারীর নয়ন ঝলসাইয়া দিতেছে। তোমার মঙ্গলশংখের বজ্রনিনাদে জগতবাসী আশ্বস্ত হইতেছে। তাহারা নানাকর্ম্মের আয়োজন করিতেছে। তোমার করুণাবারিতে ধরণী ভাসাইয়া দাও।

২। আমরা রৌপ্যসদৃশ উজ্জ্বল ও কঠিন অয়স্কান্তনির্ম্মিত যন্ত্র দ্বারা ভূমি খনন করিয়া রাখিয়াছি। তুমি এখন তোমার করুণাবারি দ্বারা সেই ভূমিকে সিক্ত করিয়া প্রচুর অন্ন উৎপাদনের উপযুক্ত কর, যাহাতে আমরা সেই অন্ন দ্বারা যথাযুক্ত বল লাভ করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে বিজয়লাভ করিতে পারি।

৩। আমাদের ধনরত্ন অপহরণের জন্য শত্রুগণ কত না উপায় অবলম্বন করিতেছে। তুমি আমাদের কর্ম্মরথের সারথি আছ বলিয়া তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রবল সেনাদল প্রেরণ করিয়াও আমাদের সুদৃঢ় গৃহ ভেদ করিতে পারিতেছে না। আমাদের স্বপক্ষ সেনাদল যথানিয়মে কার্য্য করিয়া তোমারই বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

৪। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, আমাদের দুঃখ অবসানের সময় আগতপ্রায়। তোমার করুণাবারি আমাদের কর্ম্মযজ্ঞের সাফল্য প্রদান করিতেছে। তোমারই নামের বিজয় ঘোষণার জন্য এবং জগতবাসীর হিতের নিমিত্ত আমরা নানাস্থানে কূপতড়াগাদি খনন করিয়া দিতেছি।

৫। আমাদের গৃহসকল ধনরত্নে পূর্ণ হৌক। আমাদের পশুশালাসকল গো অশ্বে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকুক। আমাদের যানবাহনাদির যেন কখনই অভাব না হয়। যে প্রকার স্তবের সাহায্যে পূর্ব্বতন ঋষিরা তাঁহাদের দেহে মনে ও আত্মাতে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, আমরাও তোমার চরণে সেই প্রকার স্তবস্তুতির পুষ্পপত্র নিবেদন করিতেছি। তুমি প্রেমভরে আমাদের এই পূজা গ্রহণ কর।

৬। তোমার অনন্ত মহিমা। আমাদের স্তব স্তুতি তোমার সেই মহিমাসাগরের কূল স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু হে বন্ধু!

তুমি কৃপা করিয়া আমাদের ক্ষীণকণ্ঠের অর্দ্ধস্ফুট স্তবস্তুতির নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া আমাদের রিক্ত হৃদয়কে পূর্ণ করিবে জানি। তাই তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া এই নৈবেদ্য হস্তে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি তাহা গ্রহণ কর। তুমি আমাদের স্তবস্তুতি শ্রবণ কর। আমাদের দেহ সুন্দর হৌক, মন সুপ্রসন্ন হৌক, আত্মা সমুন্নত হৌক।

অঞ্জলি—কল্যাণকর দেবতা।

১। হে ভগবান! তুমি কল্যাণকর। তুমি আমাদের অন্তরে অবস্থিতি করিয়া নিয়ত শুভবুদ্ধি প্রদান কর। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না, আমাদিগকে বিনাশ করিও না। আমাদের শুভ কর্ম্মযজ্ঞে শত্রুগণ যে সকল বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে, তুমি সে সমস্ত বিঘ্ন তোমার মঙ্গল হস্তে অপসারিত কর এবং আমাদিগকে জ্ঞানে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সমুন্নত কর।

২। আমাদের হৃদয় হইতে অপরের প্রতি দ্বেষহিংসা চলিয়া যাউক। দেব-নর-যক্ষ-রক্ষ সকলেই আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে সহায় হৌক। আমাদের উপর সকলেরই শুভ ইচ্ছা ও মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। সর্ব্বোপরি, তুমি আমাদের চিরবন্ধু ও চিরনির্ভরস্থল হইয়া থাক। তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা যেন প্রতি মুহূর্ত্তে নিত্য নব জীবন লাভ করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হই।

৩। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিমুনিদিগের আহ্বানে তুমি সাড়া দিয়াছিলে। আমরাও তাই তাঁহাদের পদানুসরণে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি সাড়া দিয়া আমাদিগের ব্যাকুলতা দূর কর। আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে তোমাকে সমাসীন দেখিলে সকল দেবতা এখানে উপস্থিত হইয়া আমাদের কর্ম্মে সহায়তা করিবেন। বায়ুসকল মধু বহন করিবে, নদনদীর জল সুমিষ্ট হইবে এবং গাভীসকল মধু ক্ষরণ করিবে।

৪। সুমঙ্গল বায়ু রোগবীজসকল নষ্ট করিয়া আমাদের দেহে বলাধান করুক। সকলের আধার এই ধারত্রী বীর্য্যপূর্ণ শস্যসকল উৎপাদন করিয়া আমাদিগকে বীর্য্যবান করুক। চন্দ্রসূর্য্য আমাদিগের বল বিধান করুক। পূর্ব্বপশ্চিমবাহিনী নদীসকল ধরণীপৃষ্ঠকে বিধৌত করিয়া প্রচুর শস্যের আধার করিয়া তুলুক। তুমি আমাদের এই সকল প্রার্থনা সফল কর।

৫। তুমি সকল দেবতার পরম দেবতা, সকল প্রভুর পরম প্রভু। তুমিই বিশ্বজগতের একমাত্র অধিপতি। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে আহ্বান করি। তুমি আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে উপস্থিত হও এবং আমাদিগকে রক্ষা কর।

৬। তোমার আদেশে সূর্য্যের অর্করূপ জগতের রোগবীজ বিনষ্ট করিয়া তোমার রোগহর মূর্ত্তি প্রকাশ করুক। সূর্য্যের পূষারূপ জগতের পুষ্টিবিধান করিয়া আমাদের সম্মুখে তোমার পুষ্টিদাতা মূর্ত্তি প্রকাশ করুক। তুমিই আমাদের মঙ্গলবিধাতা। তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তুমি জ্ঞানদাতা। আমরা তোমাকে ভজনা করি, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৭। তোমার আদেশে পূর্ব্বদিক হইতে বিন্দুচিহ্নিত মৃগবাহিত রথে বায়ু আসিয়া তোমারই করুণা-করুণ আচ্ছাদনে গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করে। জগতবাসী যখন গ্রীষ্মকালে অগ্নিজিহ্ব সূর্য্যের খরতাপে দগ্ধ হইয়া বারিবিন্দুর জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে উন্মুখ হইয়া থাকে, তখন সেই পূর্ব্ববায়ুবাহিত মেঘ হইতে বারিধারা নামিয়া তোমারই করুণা সূব্যক্ত করে। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৮। তুমি আমাদের কল্যাণকর। তোমার কল্যাণবাণী আমাদের কর্ণে দিবানিশি ধ্বনিত হৌক। তোমার মঙ্গলমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হউক। আমাদিগকে শতবর্ষ পরমায়ু দাও এবং আমাদের শরীরকে সবল ও সতেজ কর, যাহাতে আমরা তোমার মঙ্গল নাম গৃহে গৃহে প্রচার করিতে সক্ষম হই।

৯। আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই আমরা যেন আমাদের পুত্রপৌত্রাদির অন্তরে তোমার মঙ্গলমূর্ত্তি খোদিত করিয়া দিতে পারি। তাহারাও যেন তাহাদের সকল কর্ম্মে সর্ব্বাগ্রে তোমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করে ও তোমাকেই অর্চ্চনা করে।

১০। এই অসীম আকাশে তোমারই মঙ্গলহস্ত প্রকাশ পাইতেছে। শতকোটী সূর্য্যচন্দ্র-গ্রহ

নক্ষত্রখচিত এই দ্যুলোকে তোমারই মঙ্গলহস্ত প্রকাশ পাইতেছে। মাতার ন্যায় তুমি এই ত্রিভুবন পালন করিতেছ। পিতার ন্যায় তুমিই সকলের অন্তরে জ্ঞান বিতরণ করিতেছ। আমরা তোমার সন্তান—তোমার স্নেহপ্রেম আমাদের উপর দিবানিশি অজস্রধারে ঝরিতেছে। তুমিই আমাদের একমাত্র বরণীয় পরম দেবতা। আমরা যেন তোমাকে ছাড়িয়া তোমার প্রতীকসমূহের চরণে মস্তক অবনত না করি। আমাদের মন ও আত্মাকে তোমার অভিমুখে সমুন্নত কর।

বর্ষশেষে উদ্বোধন।*

জীবনের একটী বৎসর কাটিয়া গেল। সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া একটী বৎসর কাটিয়া গেল। এই একটী বৎসরের ভিতর কত ভুলভ্রান্তি করিয়াছি, তাহার কোনই হিসাব রাখি নাই। দুঃখ-শোকের কত কঠিন আঘাত পাইয়াছি, তাহার কোনই হিসাব রাখি নাই। আশানিরাশার কত দ্বন্দ্ব জীবনকে নিষ্পিষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহারও কোন হিসাব রাখি নাই। অন্য দিকে, গত বৎসর সংসারযাত্রার পথে কত সুখশান্তি লাভ করিয়াছি, প্রাণের উপর দিয়া আনন্দের কত তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে, তাহারও কোন হিসাব রাখি নাই। কিন্তু অতীত সুখের বিষয় স্মরণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইবার জন্য প্রাণ আজ অগ্রসর হইতেছে না; অতীত আশা আনন্দের প্রতিধ্বনি আজ আমাদের হৃদয়-মনকে জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। বরঞ্চ যে সকল ভুলভ্রান্তি করিয়াছি, ঈশ্বরের সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে যে সকল কার্য্য করিয়াছি, সেই সমস্তের আঘাতে প্রাণ যেন বিকল হইয়া উঠিতেছে; জীবনটাকে যেন ব্যর্থতার ঘন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; প্রাণে যেন পূর্ব্বের ন্যায় আর সে উৎসাহ, উদ্যম, তেজ কিছুই আসিতে চাহে না। মনে হয়, জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম যুদ্ধে বিজয়লাভ করিবার শক্তিসামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছি। মনে হয়, আগামী বৎসরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জীবনব্যাপী অজ্ঞাতবাসের আশ্রয় গ্রহণ করি।

কিন্তু অজ্ঞাতবাসে তোমাকে যাইতে দেবে কে? তুমি মনে করিয়াছ যে, অন্নবস্ত্র প্রভৃতি তোমার যাহা কিছু আবশ্যক, সে সমস্ত সংগ্রহ করিবে সংসারের নিকটে; কিন্তু সংসারের কর্ম্মসংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া তাহার দুঃখকষ্টের ভাগ গ্রহণ করিবে না। ভগবানের বিধান তাহা নহে। তাঁহার কর্ম্মচক্র তোমাকে কর্ম্ম-সংগ্রামে অবতীর্ণ করাইবেই এবং জগতবাসীর সঙ্গে তোমাকেও জগতের দুঃখকষ্টের অংশগ্রহণে বাধ্য করিবে। সুখসম্পদের উত্তাপে এবং দুঃখশোকের শান্তিধারা লাভ করিয়া মঙ্গল-অমঙ্গলের ভিতর দিয়া জগতের চির-উন্নতি, চির-মঙ্গল ও চির-আনন্দের পথে অগ্রসর হওয়াই ভগবানের অভিপ্রেত। কেন তাহা জানি না, কিন্তু প্রত্যক্ষ করি যে, যন্ত্রী ভগবান মানুষকেই সেই উন্নতিসাধনের প্রধান যন্ত্র করিয়াছেন। তাঁহার হাতের যন্ত্র হইবার অধিকার লাভ করিয়াছি বলিয়াই তো মানবের এত গৌরব। আমরাও যেমন ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ে জননীমূর্ত্তিতে, সখাসুহৃৎরূপে বসিবার জন্য আহ্বান করি, তাঁহারও তেমনি মানুষে প্রয়োজন আছে—বিশ্বপতি ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের সহায়তা আবশ্যক, ইহাই তো আমাদের গৌরবপূর্ণ অধিকার। মানুষ ব্যতীত তাঁহার পবিত্র নামের বিজয়বার্ত্তা কে কত দিকে দিকে বহন করিয়াছে? মানুষ ব্যতীত তাঁহার মঙ্গল দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখিয়া অসাধুতার বিনাশসাধনে কে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? পাপতাপে দগ্ধপ্রাণ মানবের অন্তরে ভগবানের যন্ত্রস্বরূপে মানুষ ব্যতীত কে কত শান্তিবারি প্রদান করিতে দক্ষিণহস্ত বাড়াইয়া দিয়াছে?

জগতের উন্নতিসাধনে, মানবের মঙ্গলসাধনে যে মানুষ ভগবানের যন্ত্র হইতে পারে এবং তাঁহার সহায়তা করিবার গৌরব ধারণ করে, সে মানুষ আকারে সাড়ে তিন হাত পরিমিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র নহে। ভগবানের যন্ত্রস্বরূপে কার্য্য করিয়া চলিবার পথে, জগতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতিসাধনে অগ্রসর হইবার পথে আমাদের নানা বিষয়ে ভুলভ্রান্তি হইলেও আমাদের সে মহত্ব কেহই বিনষ্ট করিতে পারে না, আমাদের সে গৌরবপূর্ণ অধিকার বিলুপ্ত করিতে পারে না। আমরা অপূর্ণ সীমাবদ্ধ হইয়া যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ভুলভ্রান্তি তো হইবেই; মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধানেই দুঃখকষ্ট নিরাশানিরানন্দের ভিতর দিয়াই মুক্তির পথে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে—ছায়াবহুল বটবৃক্ষের মূল, প্রস্তর বিদীর্ণ করিতে গিয়াই দৃঢ়তা লাভ করে।

অতীতে ভুলভ্রান্তি করিয়াছ বলিয়া হাহুতাশ করিবার কোনই কারণ নাই; অতীতে তোমার কর্ম্মদোষে, সঙ্গদোষে, উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনার অভাবে নিরাশানিরানন্দ যাহা কিছু নিজের প্রাণে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলে, আজ বৎসরের এই শেষ দিনে সে সমস্তই ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে; ভুলভ্রান্তির জন্য হাহুতাশ করা দূর

---

* ৯৯তম ব্রাহ্মসম্বতের বর্ষশেষ ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষে ৩০ চৈত্র আদিব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

করিয়া দাও; জগতের এক কোণে বসিয়া নিরাশানিরানন্দের তপ্তনিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। জননীর স্নেহের আহ্বান কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। পবিত্রতার নববস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনের দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হও। নব উৎসাহে নব উদ্যমে পুণ্যের পথে অগ্রসর হও—জননী স্বয়ং নিজহস্তে তোমার সমস্ত ভুলভ্রান্তি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন, শান্তিধারা অজস্র বর্ষণ করিয়া তোমার প্রাণের সকল জ্বালা সকল যন্ত্রণা নির্ব্বাপিত করিয়া দিবেন। চক্ষু খুলিয়া দেখ, তাঁহার মঙ্গলদৃষ্টি নিত্য জাগ্রত থাকিয়া শত অমঙ্গলের ভিতরেও নিত্য মঙ্গলের উৎস খুলিয়া রাখিয়াছে।

তিনি আমাদের বন্ধু। তাঁহার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতম যোগ। তিনিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; আমরাও তাঁহাকে ইচ্ছা করিলেও পরিত্যাগ করিতে পারি না। আজ নববর্ষের মুখে পুরাতন বৎসরের অতীত কথা, ভুলভ্রান্তির কথা দূরে ফেলিয়া জীবনলাভের পথে অগ্রসর হও। ভবিষ্যতেরও আশা যতই আনন্দদায়ক হৌক, তাহার মোহে মুগ্ধ হইও না। একমাত্র ভগবানকে পিতামাতা জানিয়া তাঁহারই আদেশ শুনিয়া চল—সুখদুঃখ, বিপদসম্পদ, যাহা কিছু পাইবে, তাহারই মধ্যে তাঁহার মঙ্গলহস্ত খুঁজিয়া বাহির কর, নববলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে; হৃদয়ে নবতর আনন্দের আনন্দের উৎস খুলিয়া যাইবে, ভয়ভাবনা অন্তর্হিত হইবে। অতীতের ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের উপযুক্ত মহত্ব লাভ কর। যে সত্যের বলে বিশ্বজগত সুশাসিত হইয়া চলিতেছে, যে সত্যের বলে বিশ্বমানব ধর্ম্মের পথে, জ্ঞানের পথে ও কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, সেই সত্যের দিকে আত্মার দৃষ্টিকে স্থিরতর রাখিও। সংসারের ভয়ে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে পশ্চাৎপদ হইও না। তিনিই সকল ভয়ের ভয়, তিনিই তোমার নিত্য সঙ্গী। সকল প্রকার ভয়কে পদদলিত করিয়া নির্ভয় হও; সর্ব্ববিধ দীনতা, সর্ব্ববিধ সংশয়কে পদদলিত করিয়া সকল দেবতার পরম দেবতা, জীবনের প্রভু সেই সত্যস্বরূপ ভগবানকে উপলব্ধি কর এবং অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া নূতন জন্মলাভ কর; সকল স্বার্থ তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া তোমার যোগক্ষেমের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া সেই অমৃতপুরুষের কার্য্যে আপনাকে চিরনিযুক্ত করিয়া দাও এবং অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া নূতন জন্ম লাভ কর, এবং অমর হইয়া যাও।

—

ঈশ্বরকে অন্তরে প্রত্যক্ষ কর।*

বাহিরের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখিলে আমরা অন্তরের বিষয় ভালরূপ জানিতে পারি না, দেখিতে পাই না। আমাদের মন চারিদিকে এতই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এদিকে ওদিকে এতই ছুটাছুটি করে; বাহিরের কোলাহলকলরবের সঙ্গে এতই তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে যে, আমরা বুঝিতেই পারি না যে, আমাদের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে শান্তস্বরূপ চির-অধিষ্ঠিত আছেন, যাঁহার মধুময় ইঙ্গিতে শত দুঃখশোক বিপদআপদের মধ্যেও শান্তি আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করে।

কিন্তু ভগবানেরও আবার এমনই মঙ্গল বিধান যে, সেই বিধানের বলেই আমরা চিরকাল বাহিরের দিকে চাহিয়া আনন্দও লাভ করিতে পারি না, সুখশান্তিও খুঁজিয়া পাই না। সময়ে সময়ে এমন ঘটনা আসিয়া পড়ে, যাহা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাদিগকে হৃদয়ের অন্তঃপুরে টানিয়া লইয়া যায়। অন্তঃপুরে গিয়া আমরা শান্তস্বরূপের মধুর গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই এবং তাঁহার চরণে আমাদের মস্তক স্বতই অবনত হয়। তখন আমাদের জ্ঞান প্রসারিত হয়। তখন আমরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি যে "স সর্ব্বজ্ঞঃ" তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি প্রত্যেক জীবের কি শারীরিক ক্রিয়া, কি মনের চিন্তা, কি আত্মার গতি সকলই জানিতেছেন। তখন বুঝিতে পারি—"স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়"—তিনি বিনাশ হইতে রক্ষা সাধনের জন্য সেতুস্বরূপ হইয়া এই লোকসকলকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি বাহির হইতে অর্জ্জন করিতে হয় না। তাঁহার জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিক। তাঁহারই জ্ঞানের কণমাত্র লাভ করিয়া জগতবাসী জ্ঞানের শতবিধ পরিচয় দিতেছে। তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান হওয়াতেই সূর্য্যচন্দ্র হইতে মানব পর্য্যন্ত সকলেরই মধ্যে আমরা শক্তির কত শত আকারে প্রকারে বিকাশ এবং কত আশ্চর্য্য রকমের খেলাই না প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁহাকে ছাড়িয়া জগতের কার্য্যসকল আলোচনা কর, যুক্তি তোমাকে শূন্যের কোটায় লইয়া যাইবে; তাঁহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া সকল বিষয় আলোচনা কর, সকলই তোমাকে পূর্ণের অভিমুখে লইয়া যাইবে।

তাঁহার মঙ্গলদৃষ্টি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র প্রসারিত আছে। তিনি আমাদের স্নেহময়ী প্রেমময়ী জননী। তাঁহার নিকট কোনও নরনারীই ত্যাজ্য নহে। পক্ষী যেমন নিজ পক্ষপুটের তলে শাবকগণকে সর্ব্বদাই স্বীয় আশ্রয় দিয়া

* ৯৯ ব্রাহ্মসম্বৎ বর্ষশেষ সান্ধ্য উপাসনায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে বিবৃত

রক্ষা করে, তিনিও সেইরূপ পাপীতাপী সাধু অসাধু-নির্ব্বিশেষে সকলকেই স্বীয় মঙ্গলচ্ছায়ার তলে আশ্রয় দিয়া সকল অবস্থাতেই রক্ষা করেন। তিনি আমাদের হইতে দূরে এই বহিরাকাশেও আছেন; তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটে আত্মার অন্তরতম প্রদেশেও অবস্থিত আছেন। এই বিশ্বজগতের যতটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহা, এবং তাহার যে বিরাটবিশাল অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা দৃষ্টির অতীত তাহা, সমস্তই তাঁহার মঙ্গলরাজ্য। তুমি শুভ চিন্তা কর, তাহাও যেমন তাঁহার দৃষ্টির অতীত নয়, সেইরূপ তুমি পাপ চিন্তা কর, পাপ আচরণ কর, তাহাও তাঁহার দৃষ্টির অতীত নয়। পাপ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে লুকাইবার বৃথা চেষ্টা করিও না। বিশ্বজগতে এমন একবিন্দু স্থান নাই, যেখানে তুমি তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া লুকাইতে পারিবে। সমস্ত বিশ্বজগতে, বিশ্বজগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁহার অনিমেষ মঙ্গলদৃষ্টি প্রসারিত। পাপ যদি করিয়াই থাক, তবে তাঁহার নিকট হইতে ভয়ে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিও না। তিনি জননী। তাঁহার নিকটে নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের পাপতাপ সমস্ত নিবেদন করিয়া দাও এবং পাপ চিন্তা ও পাপ আচরণ অতিক্রম করিবার বল ভিক্ষা কর। অনুতাপের অনলে আপনাকে দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ কর। সেই শোধিত চিত্তকে তিনি এমন সবল করিবেন যে, তুমি নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে—তাঁহার সেই কৃপা স্মরণ করিয়া তুমি নিজেই অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইবে।

তিনিই আমাদের নেতা, তিনিই আমাদের পুরোহিত। ভয় নাই—ভয় নাই—তিনি আমাদিগকে নিমেষে নিমেষে অভয়দান করিতেছেন। তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি কদাপি ভয়প্রাপ্ত হন না। তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না। ভুলভ্রান্তি যাহা কিছু করিয়াছ, তাহার জন্য হাহুতাশ করিয়া সময় নষ্ট করিও না। ভুলভ্রান্তি তুমি যাহা কিছু করিবে, নিশ্চয়ই জানিও যে, সেই অভয়দাতা পরমপুরুষ তোমার সমস্ত ভুলভ্রান্তিও এক অপূর্ব্ব মঙ্গলসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিবেন। অন্তরের দ্বন্দ্ববিবাদ, সমস্তই বিদূরিত কর। তাঁহার চরণে সমস্ত নিবেদন করিয়া দাও। সমস্ত দ্বেষহিংসা দ্বন্দ্ববিবাদকে পদতলে নিক্ষেপ করিয়া সকল দ্বন্দ্ববিবাদের অতীত পরম পুরুষকে হৃদয়ে ধারণ কর এবং শান্তিসমুদ্রে অবগাহন কর।

ধ্রুব পর্ব্বতসকল যখন জন্মগ্রহণ করে নাই, তখনও যিনি ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহার ইচ্ছাতে পর্ব্বতসকল শক্তিলাভ করিয়া সমুন্নত মস্তকে গগন ভেদ করিতে সমুদ্যত; যাঁহার আদেশে পর্ব্বতসকল স্বীয় জীবনের বিনিময়েও শত শত নির্ঝরিণীর সাহায্যে স্তন্যদান করিয়া কত যুগযুগান্তর ধরিয়া কোটী কোটী প্রাণীর জীবন সংরক্ষণের বিধান করিতেছে; যিনি অনন্ত, তিনিই ঈশ্বর।

সকলের আধার এই পৃথিবী যখন জন্মগ্রহণ করে নাই তখনও যিনি ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহার ইচ্ছাতে কোটী কোটী ফুল্লকুসুমের বিচিত্র শোভাগন্ধে এই পৃথিবী নিত্য প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে এবং কোটী কোটী জীবজন্তুর আনন্দধ্বনিতে নিত্য মুখরিত হইয়া উঠিতেছে; এই পৃথিবীর শতবিধ ওষধিবনস্পতির ভিতর দিয়া যাঁহার অনুপম প্রেম নিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে; যিনি অনন্ত, তিনিই ঈশ্বর।

কোটী সূর্য্য, কোটী চন্দ্র, কোটী গ্রহতারকসমন্বিত এই ব্রহ্মচক্র যখন জন্মগ্রহণ করে নাই তখনও যিনি ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া এই অগণিত সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র এই সুবিশাল গগনমণ্ডলকে যাঁহার ইচ্ছাতে বিচিত্র বসনে বিভূষিত করিল; যাঁহার প্রাণশক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া এই ব্রহ্মচক্রে প্রাণের উৎস উৎসারিত হইয়া গিয়াছে; যাঁহার আদেশে এই ব্রহ্মচক্রে জ্ঞান ও প্রেমের অফুরন্ত উৎসসকল খুলিয়া গিয়া প্রাণীসমূহকে দিবানিশি দেবত্বের অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে; যিনি অনন্ত, তিনিই ঈশ্বর। এসো আমরা তাঁহার চরণে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি এবং শতকোটী প্রণিপাত করি। এখনও তাঁহার বিষয় যে না জানিয়াছে, না শুনিয়াছে, তাহার ন্যায় দুঃখী জগতে কেহ আছে কি না সন্দেহ।

তিনি অনাদি—তাঁহার আদি জানিবে কে? সমস্ত ব্রহ্মচক্রের জন্মগ্রহণের আদিতে দাঁড়াইলেও কেহ পরব্রহ্মের আদি বলিতে পারিবে না। যখন এই বিশ্বজগত গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, অন্ধকারও যখন ছিল না; মৃত্যুর উত্তপ্ত নিশ্বাসে যখন এই বিশ্বচক্র দগ্ধ হইতেছিল, মৃত্যুও যখন ছিল না, তখনও একমাত্র যিনি স্বীয় মহিমায় অবস্থিত ছিলেন, তাঁহার আদি বলিতে পারে কে?

তিনি অনন্ত। তাঁহার আদিও নাই, তাঁহার অন্তও নাই। তাঁহার আদিই বা কে জানে, তাঁহার অন্তই বা কে জানে? কাহার হৃদয়ে এই সত্যবাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কবি বলিতেছেন—অন্ত কোথা তাঁর অন্ত কোথা তাঁর এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে। বিশ্ববিধাতারই ইঙ্গিতে এই বিশ্বজগত প্রকাশিত হইয়া মহাশূন্যে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে এবং তাঁহারই মঙ্গল আদেশে আশ্চর্য্য সুনিশ্চল নিয়মে ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—কে জানে কোথায়—কোথায়? তিনিই আমাদের একমাত্র প্রভু। প্রতি-

নিমেষের প্রতি ঘটনা, আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপ, অন্তরের প্রতি ইচ্ছা, প্রতি ভাব তাঁহারই মঙ্গলবিধানে নিয়মিত হইতেছে। বিশ্বজগতের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকলেরই ভিতরে তাঁহারই শক্তি অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার ক্লান্তি নাই, তাঁহার শ্রান্তি নাই। দিবসে প্রাণীগণ জীবননির্ব্বাহের জন্য যখন শতবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে থাকে, তখনও তিনি তাহাদের মঙ্গলবিধানে নিরত থাকেন; আবার নিশীথে প্রাণীগণ যখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অসহায় ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তখনও তিনি অনিদ্র থাকিয়া তাহাদের মঙ্গলসাধনে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকেন। তাঁহাকে বুদ্ধি দ্বারা বা মেধা দ্বারা বা বিদ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না। যে তাঁহাকে অন্তরের সহিত প্রার্থনা করে, তাহারই অন্তরে তিনি প্রকাশিত হন, তাঁহারই নিকটে তিনি ধরা দেন।

আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে তাঁহাকে জানিবার স্পৃহামাত্র নিহিত করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে জানিবার শক্তি ও সামর্থ্যও তিনি প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মবাদী সাধক এই সত্যতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া ঘোষণা করিলেন যে "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে; দেশ কাল ও অবস্থানির্ব্বিশেষে ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার সকলেরই আছে"।

তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ জান যে, তোমরা প্রত্যেকে সেই মৃত্যুর অতীত অমৃত পুরুষের সন্তান। পিতামাতার মহিমা ও গৌরব ঘোষণা করা যেমন সন্তানের কর্ত্তব্য ও অধিকার, সেইরূপ সেই অনন্তস্বরূপ অমৃত পুরুষ পরম পিতামাতার জ্ঞান প্রেম ও শক্তি উপলব্ধি করিয়া নির্জ্জনে ও সজনে, নিজের অন্তরে ও জনসাধারণের সমক্ষে নির্ভয়ে অবিরাম ও অবিশ্রাম প্রচার করা আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য ও অধিকার। তিনিই সকল ভয়ের ভয়। আপনাকে তাঁহার সন্তান জানিয়া অভয়প্রাপ্ত হও। তাঁহার মাভৈ মন্ত্র দিনে নিশীথে, শয়নে জাগরণে অন্তরে ধারণ কর এবং দিকে দিকে তাঁহার পবিত্র নামের বিজয়পতাকা বহন করিয়া গৃহে গৃহে নবজাগরণ আনয়ন কর। তোমাদের জীবন নববলে বলীয়ান হউক; তোমাদের হৃদয় নবভাবে ও নবোৎসাহে সমুজ্জ্বল হউক; তোমাদের আত্মা সকলের সম্ভজনীয় সেই পরমাত্মার পবিত্র সংস্পর্শ লাভের অধিকারী হউক।

——

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ (১)

আমরা দেখিতেছি, গত ১লা বৈশাখে ব্রাহ্মসমাজ ১০০ তম বৎসরে প্রবেশ করিয়াছে। যে ভাবে ব্রাহ্মসম্বৎ চলিয়া আসিতেছে, তদনুসারে আমাদের কাগজে পত্রে ১০০ ব্রাহ্মসম্বৎ বলিয়াই লেখা হইতেছে। এবিষয় লইয়া আমরা কাহারও সহিত বিবাদ কলহে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ইতিহাস এবিষয়ে কি বলে, তাহা আলোচনা করা বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাই আমরা স্থির করিয়াছি, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই বলিতে গেলে যখন এ সম্বন্ধে আমাদের শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন, তখন তাহার প্রথম প্রকাশ অবধি আলোচনা করিয়া নিরপেক্ষভাবে দেখিব এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য কি। বর্ত্তমান বৈশাখ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে আমরা ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৮ শক পর্য্যন্ত প্রথম চারি বৎসরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যেটুকু উপকরণ পাইয়াছি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ঐ সকল হইতে আমরা পাই যে, অন্তত তত্ত্ববোধিনীর প্রথম অবধি সকলেরই ধারণা ছিল যে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন; উহা প্রথমে "ব্রহ্মসমাজ", পরে যথাক্রমে "ব্রাহ্ম্যসমাজ" এবং "ব্রাহ্মসমাজ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এবং এ সমস্তই পণ্ডিতবর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অনুমোদনে। কমললোচন বসুর বাটীতে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের কোনও উল্লেখই নাই।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার যে উদ্দেশ্য-ঘোষণাপত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার তৃতীয় অনুচ্ছেদে (paragraph) আছে "অনেক সভ্য * * * ব্রহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন"।

১৭৬৫ ভাদ্র সংখ্যা—আমরা দেখি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ৪ বৈশাখে "ব্রহ্মসমাজে" ব্যাখ্যান দেন। ১লা জ্যৈষ্ঠেও "ব্রহ্মসমাজে" ব্যাখ্যান দেন।

আশ্বিন ২য় সংখ্যা—"এই কলিকাতা নগরে "ব্রহ্মসমাজ" স্থাপিত হইয়াছে"। "এই প্রকার "ব্রহ্মসমাজ" যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়।" ১লা শ্রাবণে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ "ব্রহ্মসমাজে" ব্যাখ্যান দেন। ২রা আশ্বিনে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় "ব্রহ্মসমাজে" ব্যাখ্যান দেন।

১লা মাঘ—সংখ্যা—"রামচন্দ্র শর্ম্মা আচার্য্যঃ" এই স্বাক্ষরে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে—"ব্রাহ্ম্যসমাজ—আগামি ১১ মাঘ···সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম্যসমাজ হইবেক।" এই সংখ্যাতেই বাহির হইয়াছে—"ব্রাহ্মসমাজের প্রথম

এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যানের চূর্ণক।" এই সংখ্যাতেই আছে —"আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের গত ১১ মাঘে ব্রাহ্মসমাজে ব্যাখ্যাত হয়। ১লা চৈত্র সংখ্যায় আছে—"সাম্বৎসরিক "ব্রাহ্মসমাজ"—"গত ১১ মাঘ মঙ্গলবারে "সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে গায়ত্রীজপ এবং উপনিষৎ পাঠ হইলে" * * *। এই সংখ্যায় আছে—"উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীধর ন্যায়রত্ন মহাত্মা কর্ত্তৃক * * * ১০ ফাল্গুনে "ব্রাহ্মসমাজে" ব্যাখ্যাত হয়।"

১৭৬৬ শক—১ বৈশাখ সংখ্যায়—"সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ" এই হেডিং দিয়া একটী প্রবন্ধ আছে।

১১ মাঘে অক্ষয়কুমার দত্ত যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—"১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এতৎ 'ব্রাহ্মসমাজ' এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।" "এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা 'ব্রাহ্মদিগের' প্রতি অর্পণ কর"।

"ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম—প্রতি বুধবারে সূর্য্যাস্ত সময়ে সাপ্তাহিক 'ব্রাহ্মসমাজ' হইবেক। প্রতি মাসে প্রথম রবিবারে সূর্য্যাস্ত সময়ে মাসিক 'ব্রাহ্মসমাজ' হইবেক। প্রতি বৎসরে ১১ মাঘ দিবসে সূর্য্যাস্ত সময়ে সাম্বৎসরিক 'ব্রাহ্মসমাজ' হইবেক।

১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা—"১৭৬৪ শকে * * * ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার ঐক্য হয়, তাহাতে কিয়ৎমাস সকল কার্য্য 'ব্রাহ্মসমাজের' গৃহেতেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

"তিনি (রাজা রামমোহন রায়) পরলোকগত হইলে * * * ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাও ম্লান হইয়াছিল, * * * এইক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয়"।

১ ভাদ্র সংখ্যা—"যাঁহাদিগের এই ব্রাহ্মদলভুক্ত হইবার বাসনা থাকে"।

"Report of the Tuttuvoadhinee Subha 1843-44"এ—"The meetings of the Braumhu Sumauj are now attended &c."

১ আশ্বিন সংখ্যা—"ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্নগৃহে"

"ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা—১ শ্রাবণ ১৭৬৬"

"পাঠশালার নিয়ম—"ব্রাহ্মসমাজের দিবসে" &c

১ কার্ত্তিক সংখ্যা—"ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা—২১ ভাদ্র ১৭৬৬"; "৪ আশ্বিন ১৭৬৬"; ১৮ আশ্বিন ১৭৬৬; ৬ অগ্রহায়ণ ১৭৬৬; ৫ পৌষ ১৭৬৬; ১৯ পৌষ ১৭৬৬; ৭ মাঘ ১৭৬৬;

"প্রতি ব্রাহ্মসমাজে শত শত মনুষ্য" &c.

"ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের" &c.

১ মাঘ সংখ্যা—"ব্রাহ্মসমাজ—আগামী ১১ মাঘ * * * সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক ইতি শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা আচার্য্যঃ"

১ ফাল্গুন সংখ্যা—"সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"

মাঘোৎসবের বক্তৃতায় ভবানীচরণ সেন বলেন "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় * * * এই ব্রাহ্মসমাজ ১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এই স্থানে সংস্থাপন করিয়াছিলেন"। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বলেন—"এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বিধি * * * পূর্ব্বক গৃহীত" &c.

"অনেক ব্রাহ্মকে" * * * "সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম দ্বারা পরিপূর্ণ হয়"।

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"বিধিনিষেধিত প্রতিজ্ঞাশীল ব্রহ্মোপাসক অনেকে হইতেছেন যাঁহারা ব্রাহ্ম নামে বিখ্যাত হইয়াছেন"। "শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি তৎকালে ব্রাহ্মদল স্থাপনে অধিক উৎসাহী ছিলেন, তিনিই এইক্ষণকার ব্রাহ্মদিগের আচার্য্য হইয়াছেন"। * * * "তিনি ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে" &c. * * * "অনেক ব্রাহ্মই" &c. * * * "এদেশ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা পূর্ণ কর"।

"ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন"।

"ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ" &c।

১৭৬৭—১ বৈশাখ—"তদনন্তর শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ যত্ন দ্বারা মানিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনা জন্য ক্ষুদ্র আকারে আত্মীয় সভা নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যান করিতেন। পরে যখন ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে ব্রাহ্মসমাজ যোড়াসাঁকোস্থ বর্ত্তমান গৃহে স্থাপিত হইল, তখন তিনি তাহার একজন অধ্যক্ষ হইলেন"। * * * "ফলতঃ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় শাস্ত্রালোচনা জন্য এবং ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যাতৃত্ব কর্ম্ম সম্পাদন জন্য * * * সংস্কৃত কালেজের সম্পাদকীয় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন"।

গৌতম-বুদ্ধ।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ)

পূর্ব্বকথা।

'তাইতো, জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন আমি'!—ব্রাহ্মণ-তনয় সখেদে ভাবিতে লাগিলেন,—'এই রোগ-শোক-তাপ, জন্ম-জরা-মরণের পারে সুখময়, শান্তিময় কোনো অবস্থা আছে কি?' ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, বদ্ধ-মানবের মুক্তির কোন-না-কোন পন্থা নিশ্চয়ই

আছে। সেই নির্ব্বাণ মুক্তির পথ কোথায়? কি সে পথ? সুমেধ ভাবিতেই থাকিলেন, কিন্তু এ ভাবনার অন্ত কোথায়? অন্তরে তাঁহার দারুণ অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল। ধনৈশ্বর্য্য, পরিজন বিষবৎ বোধ হইল। যথা-সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া সুমেধ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। আজ সুমেধ তাপস, অরণ্যবাসী, ফলমূলা-হারী।

সেই যুগে এক নরোত্তম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম দীপঙ্কর বুদ্ধ। যে অরণ্যে তাপস সুমেধ বাস করিতেন, একদিন দীপঙ্কর তাহার নিকট দিয়া কোনো স্থানে গমন করিবেন। চতুর্দ্দিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বহু লোক আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া তাঁহার জন্য পথ প্রস্তুত করিতেছে। সুমেধও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি দেখিলেন, পথের এক অংশ কর্দ্দ-মাক্ত। তাহারই সন্নিকটে তিনি বুদ্ধদর্শন-মানসে সতৃষ্ণ-নয়নে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দীপঙ্কর যখন নিকট-বর্ত্তী হইলেন, সুমেধ সেই কর্দ্দমোপরি শয়ান হইলেন;—যেন শ্রীবুদ্ধের শ্রীচরণ কর্দ্দমকলুষিত না হয়। দীপঙ্কর এই অদ্ভুত ভক্তটিকে পঙ্কশয্যা হইতে তুলিলেন। সুমেধের হৃদয়মন্দিরের নিভৃত কন্দরে বুদ্ধত্ব লাভ করিবার জন্য নিরন্তর যে আকুল অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে, দীপঙ্কর তাঁহার দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে তখনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। ত্রিকালজ্ঞ দীপঙ্কর আত্মস্থ হইয়া মনকে ভবিষ্যতের রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন:—সেখান হইতে সে সংবাদ আনিল সুদূর ভবিষ্যতে সুমেধ গোতম-রূপে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

সুমেধের চিত্ত আজ আনন্দ-পুলকে ভরিয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই তিনি দীপঙ্করের শিষ্যত্ব লইয়া 'অর্হৎ' পদবী লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আত্মমুক্তি তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন, অর্হৎ হইয়া শুধু স্বীয় মুক্তি-সাধন তাঁহার মনঃপুত হইল না। দীপঙ্করের মতোই তিনি শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করিবেন—ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভি-লাষ। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, সমগ্র মানবসমাজে সেই জ্ঞান দান করিয়া, তাহাদের মুক্তির উপায় করিয়া দিয়া, তবেই তিনি স্বীয় নির্ব্বাণ চাহিবেন;—তাহার পূর্ব্বে নহে।

এইরূপে সুমেধ আপনার পরম এবং চরম শান্তি তুচ্ছ করিয়া তাপিত মানবের কল্যাণ কামনায় অশেষ দুঃখ-দুর্ব্বিপাক বরণ করিয়া লইলেন। দশপারমিতা সাধনের জন্য তাঁহাকে লক্ষ কল্প ধরিয়া অসংখ্য জন্ম * গ্রহণ করিতে হইল। কারণ দান, শীল (১), নৈষ্কর্ম্য (২), প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান (৩), মৈত্রী এবং উপেক্ষা (৪)—এই দশটী গুণ সম্যকরূপে আয়ত্ত না করিলে কেহ বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে না।

যথাসময়ে সুমেধের দেহান্ত ঘটিল। সংকল্পানুযায়ী বারাণসীনগরে অপন্নকরূপে তিনি পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করি-লেন। প্রাপ্তবয়সে বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তিনি বারাণসীর একজন প্রধান বণিকরূপে গণ্য হইলেন। পাঁচশত শকট তাঁহার বাণিজ্যদ্রব্য স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইত। একবার তিনি পশ্চিমে বহুদূরে যাইবেন স্থির করিলেন। যাত্রার প্রাক্‌কালে অপন্নক শুনিলেন নগরের অপর একজন প্রসিদ্ধ বণিক্‌ও ঠিক ঐ অঞ্চলে বাণিজ্যযাত্রা স্থির করিয়াছে। তিনি দেখিলেন একসহস্র শকট লইয়া একসঙ্গে চলা সহজ হইবে না। যত লোক যাইবে পথে তাহাদের জন্য আবশ্যকীয় জল, কাষ্ঠ ইত্যাদি পাওয়া যাইবে না এবং যানবাহী পশুদেরও যথেষ্ট খাদ্য মিলিবে না; ফলে পথকষ্টের সীমা থাকিবে না। সুতরাং তিনি সেই বণিকের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে অগ্রে কিংবা পশ্চাতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। অতিবুদ্ধি বণিক অগ্রে যাইলে অধিক বিক্রয় হইবে মনে করিয়া সেইরূপই স্থির করিল। অপন্নক ইহাতে খুসীই হইলেন; কারণ, প্রথম যে যাইবে তাহাকেই রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে, বিস্তৃত জলহীন স্থানে প্রয়োজনমত জলাশয় খনন করিতে হইবে। পশ্চাদ্‌গামী অনায়াসেই সেই পথে চলিতে পারিবে; পরন্তু, পূর্ব্বগামী বণিকের দ্রব্যসম্ভার বিক্রীত হইয়া গেলে, তদনুপাতে স্বীয় দ্রব্যের মূল্যনিরূপণও তাঁহার পক্ষে অতি সহজ হইবে। এই সব ভাবিয়া অপন্নক সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিলেন এবং উক্ত বণিকের যাত্রার প্রায় দেড়মাস পরে নিজের যাত্রার দিন স্থির করিলেন; কারণ তত দিনে স্বীয় লোকজনের এবং যানবাহী পশুদের জন্য প্রচুর নবীন শাক-সব্জী ও তৃণ জন্মাইবে।

পথে দিগন্তবিস্তৃত মরুকান্তার। অগ্রগামী বণিক তাহার অর্দ্ধপথ মাত্র অতিক্রম করিয়াছে এমন সময় সে দেখিতে পাইল বিপরীত দিক হইতে যানবাহন সহ অপর একদল লোক তাহাদের দিকেই আসিতেছে। তাহাদের বসন আর্দ্র, রথচক্র কর্দ্দমাক্ত, হস্তে নবস্ফুট পদ্মপুষ্প; মৃণাল ভক্ষণ করিতে করিতে মহোল্লাসে তাহারা অগ্রসর হইতেছে। উভয় দলের সাক্ষাৎ হইলে, বণিকের কষ্টবাহিত যানগুলি জলপূর্ণ জানিতে পারিয়া তাহারা হাস্য করিয়া উঠিল। তাহাদের দলনায়ক

* সিংহলী মতে ৫৫০ জন্ম।

(১) নীতি; (২) ত্যাগ; (৩) মানসিক দৃঢ়তা; (৪) লাভালাভে উদাসীনতা।

বণিককে বুঝাইল সম্মুখে বিশাল হ্রদ, সেখানে অবিরাম বারিবর্ষণ হইতেছে—কষ্ট করিয়া জলবহনের কোনো প্রয়োজন নাই। তাহারা চলিয়া গেলে, বণিক তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া শীঘ্র অগ্রসর হইবার জন্য জলভাণ্ডগুলি নিঃশেষে শূন্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। পথ অতিক্রম করিতে করিতে তাহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইল, কিন্তু জল কোথায়! জলাভাবে ক্রমে তাহাদের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিল। সেই সীমাহীন মরুদেশের উত্তপ্ত বালুরাশির মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও জল-রেখাও দৃষ্টিগোচর হইল না। ওদিকে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, ম্রিয়মান দিবসের উপর নিশাদেবী তাঁহার গাঢ় অন্ধকার-যবনিকা টানিয়া দিলেন। বণিক তাহার ক্লান্ত, অবসন্ন, সঙ্গীদলসহ হতাশচিত্তে বসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহাদের তৃষ্ণাকাতর অবসন্ন দেহ সুষুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িল।

ইহার প্রায় দেড়মাস পরে অপন্নক সদলে ঠিক এই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। পূর্ব্বগামী বণিককে যাহারা জলভাণ্ড শূন্য করিতে পরামর্শ দিয়াছিল, ঠিক পূর্ব্বের মতই আসিয়া তাহারা অপন্নককে জলভাণ্ড শূন্য করিয়া স্বচ্ছন্দে যাইতে অনুরোধ করিল। অপন্নক উত্তর করিলেন,—"আপনারা নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া যান, আমি কোন জলাশয় না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের জল-ভাণ্ড শূন্য করিব না।" উঁহারা চলিয়া যাইবার পর অপন্নকের সঙ্গীরা বলিল,—"প্রভু, ঐ ব্যক্তিরা বলিল অদূরে সবুজ বন আছে, সেখানে অবিরাম বারিবর্ষণ হইতেছে, উঁহাদের হাতে মৃণাল, পদ্ম ও অন্যান্য জলজ পুষ্প রহিয়াছে, বসনও তাহাদের সিক্ত; এমতাবস্থায় জলভাণ্ডগুলি শূন্য করিয়া ভার লাঘব করিলে ভাল হয় না কি? জলবাহী যানগুলির জন্যই আমাদের বিলম্ব হইতেছে;—জল ফেলিয়া দিলে আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব। ইহার উত্তরে অপন্নক তাঁহার সঙ্গী-গণকে একস্থলে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"মরুভূমিতে তোমরা কখন হ্রদ কিংবা পুষ্করিণীর কথা শুনিয়াছ?"

"না প্রভু, মরুভূমি জলহীন।"

"উঁহারা বলিল অদূরে সবুজ বন; সেখানে অবিশ্রাম বর্ষণ হইতেছে।"

"তোমরা জলীয় বায়ু অনুভব করিতেছ কি?"

"না।"

"তোমরা মেঘ দেখিতে পাইতেছ কি?"

"না।"

"বিদ্যুৎ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে কি?"

"না।"

"মেঘের ডাক শুনিয়াছ কি?"

"না প্রভু, শুনি নাই।"

তখন অপন্নক কহিলেন—"প্রিয় অনুচরগণ, উহারা মানুষ নহে, উহারা নরভুক্ যক্ষ। পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্যই উহারা এই ফন্দি আঁটিয়াছে।" তার পর ক্ষণকাল মৌনভাবে তাঁহা-দের পূর্ব্বগামী ক্ষীণবুদ্ধি বণিকের কথা চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"বন্ধুগণ, এক-বিন্দু জলও নষ্ট করিও না। চল অগ্রসর হও, আমার কথার সত্যতা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে।"

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তাঁহারা নানা সামগ্রীপূর্ণ পাঁচশত শকট দেখিতে পাইলেন। তাহার আশে পাশে বহু পশু এবং নর-কঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অপন্নক আপন লোকজনকে পূর্ব্বগামী বণিকের নির্ব্বুদ্ধি-তার ফল বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি মৃত বণিকের মূল্যবান্ দ্রব্যগুলি সঙ্গে লইলেন এবং দূরদেশে ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ হইয়া প্রচুর ধনরত্নসহ হৃষ্টচিত্তে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা গুণ অর্জ্জন করিলেন।

বোধি-সত্ত্ব * ইহার পর অন্যান্য গুণসাধনের জন্য আরও বহু-জন্ম গ্রহণ করিলেন। সামান্য ত্রুটির জন্য কোনো কোনো বার তাঁহাকে পশুযোনিতেও জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু প্রতি জন্মেই তিনি ক্রমে ক্রমে বুদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। একবার তাঁহাকে বৃষ-রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার সহোদর অনুযোগ করিল, তাহারা সারাদিন খাটিয়া সামান্য তৃণমাত্র আহার্য্য পায়, অথচ একটি শূকর বিনাশ্রমে ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী পায়। বোধিসত্ত্ব ভ্রাতাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শূকরটিকে নিজে আহার করিবার জন্যই গৃহস্বামী তাহার পুষ্টির নিমিত্ত তাহাকে ভাল ভাল খাদ্য দেয়। গৃহস্বামীর পুত্রীর বিবাহরাত্রেই বোধিসত্ত্বের বিজ্ঞতা প্রমাণিত হইয়া গেল। এইরূপে তিনি প্রজ্ঞা-পারমিতার সাধনব্রত উদ্‌যাপন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব ছদ্দন্ত † নামে এক হস্তিদলপতিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। চুল্ল সুভদ্দা ও মহাসুভদ্দা ‡ নামে তাঁহার দুই মহিষী। একদিন হস্তিরাজ সদলবলে এক কুসুমিত শালবনে আনন্দ-বিহারে গমন করিলেন। চলিতে চলিতে ছদ্দন্ত শুণ্ডদ্বারা একটি শালশাখা আকর্ষণ করিলেন। বায়ু অনুকূল থাকায় যত পুষ্প মহাসুভদ্দার উপর পতিত হইল, প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া থাকায় শুষ্ক

* Buddha in the making. বুদ্ধত্বলাভের সঙ্কল্পের পর হইতেই গৃহের বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ হইবার জন্য যিনি ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত হইতেছেন তাঁহাকেই বোধিসত্ত্ব কহে।

† ষট্+দন্ত।

‡ ছোট সুভদ্রা ও মহাসুভদ্রা।

পত্র-শাখা ও পিপীলিকাদি চুল্লসুভদ্রার অঙ্গে ঝরিয়া পড়িল। এই অবহেলা স্বেচ্ছাকৃত মনে করিয়া অল্পবুদ্ধি চুল্লসুভদ্রা ছদ্দন্তের উপর বিষম কুপিত হইলেন। তিনি প্রতিশোধের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অন্য একদিন ছদ্দন্ত মহাসুভদ্রাকে একটি পদ্মফুল উপহার দিলেন। উহাতে চুল্লসুভদ্রার ঈর্ষাগ্নিতে ঘৃতাহুতিই হইল। অসহ্য বেদনায় তিনি প্রতিশোধের সুযোগদানের নিমিত্ত প্রত্যেকবুদ্ধ * সমীপে প্রার্থনা জানাইলেন।

চুল্লসুভদ্রার দেহান্ত হইল। তিনি বারাণসীরাজের মহিষীরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে হঠাৎ তাঁহার একদিন পূর্ব্বজন্মের কথা মনে পড়িল। তিনি রোগের ভাণ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন এবং রাজাকে জানাইলেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত হিমালয়বাসী ছদ্দন্ত নামক হস্তিযূথপতির ছয়শাখাবিশিষ্ট দন্ত তাঁহাকে আনিয়া উপহার দেওয়া না হইবে ততক্ষণ তিনি আহার গ্রহণ করিবেন না। বহু রকমের পুরস্কার ঘোষিত হইল। রাজ্যের যত নিপুণ শিকারীকে সংবাদ দেওয়া হইল। একমাত্র সোণুত্তর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া উদ্দেশ্য সাধনে হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিল।

দিনের পর দিন অরণ্য ভেদ করিয়া বহু আয়াসে সোণুত্তর ছদ্দন্তের নিবাসস্থানে উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল পরেই ছদ্দন্ত ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বৃক্ষান্তরাল হইতে সোণুত্তর বিষাক্ত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। ক্রোধোন্মত্ত ছদ্দন্ত সোণুত্তরকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সংহার করিতে ছুটিলেন। তাহার সমীপস্থ হইয়া নিজেকে একটু সংযত করিয়া তাহাকে অনাচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সোণুত্তর কাতর অনুনয়ে সমস্ত যথাযথ বিবৃত করিলে, বোধিসত্ব ধ্যানস্থ হইয়া রাজমহিষীর পূর্ব্ব-জন্মকথা সমস্ত জানিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন রাণী কেবল তাঁহার দন্ত লইয়াই সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহার প্রাণনাশ না হইলে ঐ প্রবল ঈর্ষাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না। ছদ্দন্ত শয়ন করিয়া সোণুত্তরকে করাত দিয়া দন্ত ছেদন করিতে অনুমতি দিলেন। সোণুত্তরকে অসক্ত দেখিয়া তিনি নিজেই শুণ্ডদ্বারা করাত চালিত করিয়া তাহা ছেদন করিলেন। সোণুত্তর দন্ত লইয়া মহানন্দে প্রস্থান করিল। ছদ্দন্ত এই দানের ফলস্বরূপ বুদ্ধত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে বোধিসত্ব দান, ক্ষান্তি, অধিষ্ঠান ইত্যাদি পারমিতা আয়ত্ত করিলেন।

সত্যের শুভ্র কঠোরতাও তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। একদা তিনি ভিক্ষাজীবী ছিলেন। ভিক্ষার্থ এক গৃহস্থের বাড়ী গিয়া দেখেন যে গৃহিণী জনৈক পরপুরুষের সহিত বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত। তিনি একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎ পরে পুরুষটি আহারে বসিল এবং গৃহিণী তাহাকে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন পরিবেষণ করিতে লাগিল। লোকটি কিছু আহার করিয়াছে এমন সময় অদূরে গৃহকর্ত্তাকে আসিতে দেখা গেল। গৃহিণী ব্যস্তসমস্তভাবে তাহাকে গৃহকোণে লুকাইয়া রাখিল। গৃহস্বামী আহারে বসিলে গৃহিণী ভুক্তাবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জনের উপর আরো কিছু অন্নব্যঞ্জন চাপাইয়া তাঁহাকে আহার করিতে দিল। গৃহস্বামী উপরে গরম ভাত এবং নীচে ঠাণ্ডা ভাত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহিণী হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না। গৃহস্বামী উহা উচ্ছিষ্ট অন্ন বলিয়া সন্দেহ করিলেন। বোধিসত্ব তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং গৃহিণী ও লুক্কায়িত লোকটির বিশেষ বিড়ম্বনার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলেন। গৃহকর্ত্তা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহিণী ও তাহার উপপতিকে সমুচিত শিক্ষা দিলেন।

ইহার পর বারাণসীর রাজপুত্র অসদৃশ-রূপে, বোধিসত্বের বীর্য্যপারমিতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ অসদৃশ সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করিয়া অনুজ ব্রহ্মদত্তকে তাহা দান করেন এবং স্বয়ং তাহার অমাত্য-প্রধানরূপে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। কোন দুষ্ট অমাত্য একবার ব্রহ্মদত্তকে বুঝাইয়া দেয় যে মহাবীর অসদৃশ তাঁহার প্রাণনাশ পূর্ব্বক সিংহাসনলাভের অভিলাষী। অসদৃশকে সকলেই ভয় করিত, কাজেই ব্রহ্মদত্ত গোপনে তাঁহার হত্যার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অসদৃশ তাহা জানিতে পারিয়া ভ্রাতৃবিরোধ ঘটিতে না দিয়া সম্রাট্ সামান্যের রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অসদৃশ সেই রাজ্যে শ্রেষ্ঠ বীরের আসন পাইলেন। কিন্তু যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন তাঁহাকে অশেষবিধ পরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। নবাগতের এই সম্মানলাভে সে রাজ্যের যত ধনুর্ব্বিদ্ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল।

একদিন মহারাজ উদ্যানবাটিকায় একটি আম্রবৃক্ষতলে সুশীতল ছায়ায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সেই বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় একটি সুপক্ব ফল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি অধীনস্থ সকল ধনুর্দ্ধরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—তোমাদের মধ্যে কে ঐ ফলটি শরনিক্ষেপে ভূতলে আনিতে পার? তাহারা কেহই সাহস করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইল না। তবে অসদৃশকে মহারাজের সম্মুখে খর্ব্ব করিবার জন্য সকলে তাঁহার নাম করিল। অসদৃশের সঙ্গে ধনুর্ব্বাণ ছিল না দেখিয়া তাহারা ধনুর্ব্বাণ দিয়াও তাঁহাকে সাহায্য করিবে না স্থির করিল।

* যাঁহারা নিজে বুদ্ধত্বলাভ করেন কিন্তু বুদ্ধের মত অন্যকে মুক্তিপন্থা দেখাইতে পারেন না, তাঁহাদিগকে 'প্রত্যেকবুদ্ধ' বলে।

মহারাজ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অসদৃশ আপন বল্কলাবরণ পরিত্যাগ করিলেন এবং বস্ত্রমধ্যে লুকায়িত বহু বংশখণ্ড একত্র সংযোজিত করিয়া একখানি বিচিত্র ধনু নির্ম্মাণ করিলেন। এই আশ্চর্য্য ধনু দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। অসদৃশ জিজ্ঞাসা করিলেন, তীর ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় অথবা নীচে নামিবার সময় আম্রটি উৎপাটিত করিতে হইবে? তীর পতনকালে করিতে পারিলেই বিশেষ কৌতুকজনক হইবে মনে করিয়া রাজা তাহাই করিতে আদেশ করিলেন। অসদৃশ ধনুতে শরযোজনা করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বিষম বেগে বাণ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল—তাহার শন্ শন্ শব্দে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ধরামুখী তীরটি দেখিতে দেখিতে ফল বৃন্তচ্যুত ধরিয়া ধরণীতে ফিরিয়া আসিল। অসদৃশ অগ্রসর হইয়া একহস্তে ফল এবং অপর হস্তে শরটি ধারণ করিলেন। নির্ব্বাক বিস্ময়ে সকলে এই অদ্ভুতকর্ম্মার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাঁহার এই অব্যর্থ শরসন্ধানে প্রীত হইয়া মহারাজা তাঁহাকে প্রচুর বিত্ত দান করিলেন।

এদিকে অসদৃশের অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া সাতজন নৃপতি মিলিতশক্তিতে বারাণসী অবরোধ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে অসদৃশের নিকট ক্ষমা চাহিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। রাজ্য সিংহাসন দেওয়া দূরেও তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া যে ভ্রাতা তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, বিপদের সময় তাহার আকুল আহ্বান তাঁহাকে বিচলিত করিল। ভ্রাতার উদ্ধারের জন্য অসদৃশ অবিলম্বে বারাণসী যাত্রা করিলেন। বারাণসী নগরতোরণ হইতে তিনি নৃপতিগণের উদ্দেশে শরমুখে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখিলেন—'এই অসদৃশের প্রথম বাণ। তাহার দ্বিতীয় বাণ আপনাদের পক্ষে খুব শুভকর হইবে না।' এমন অদ্ভুতভাবে অসদৃশের আগমনবার্ত্তা পাইয়া কেহই উহাতে সন্দেহ করিতে পারিল না; কারণ তাহারা সকলেই জানিত যে অসদৃশ ছাড়া এমন অসদৃশ শরসন্ধান আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে। নৃপতিগণ ভয়ে বারাণসী পরিত্যাগ করিলেন। অসদৃশ এইরূপে বীর্য্যপারমিতা সাধন করিয়া তপস্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

বাল্যকালে বাড়ীতেই আমাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ভাল পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায় যে বাড়ীর লোকদের মন কিসে ভাল হইবে, কি করিলে কাহারও সামান্য একটু সুবিধা বা সাহায্য হইবে, তাহার প্রতি অতি অল্প বয়সেই তাহাদের দৃষ্টি পড়ে। তাহারা এইরূপ চেষ্টায় একটা আনন্দ পায়। কোন কোন পরিবারের নিয়ম এই যে পিতামাতা ছেলেমেয়েদের হইতে দূরে দূরে থাকেন, তাহাদের সঙ্গে তেমন ভাল করিয়া মেশেন না, তাহাদের হাসি-গল্প আমোদ-প্রমোদে যোগ দেন না। যে সকল পরিবারে দূরে দূরে থাকার নিয়ম নাই, সেখানে প্রতিদিনের জীবনের সকল ঘটনাতেই পরস্পরের সঙ্গে যোগ ও সহানুভূতি আরও দৃঢ় হয়। ইহাতে আমাদেরও উপকার, ছেলেমেয়েদেরও উপকার। তাহারা যদি দেখিতে পায় যে কি করিলে বাড়ীর সকলের মন ভাল হইবে আমরা সর্ব্বদা সেই কথা ভাবি ও সেই চেষ্টা করি, পাছে কোন শক্ত কথা বলিলে কাহারও মনে ব্যথা লাগে এই জন্য তেমন কথা মনে আসিলেও আমরা মুখে বলি না, আমরা রাগ ও বিরক্তি দমন করিবার সর্ব্বদা চেষ্টা করি, কেহ মন্দ ব্যবহার করিলেও আমরা তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বিরত থাকি—যে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পিতামাতার ব্যবহারে এইরূপ ভালবাসা সংযম ও সহানুভূতির দৃষ্টান্ত দেখে সে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা অতি অল্পবয়সেই প্রেমের দীক্ষা লাভ করে। তাহাদের জীবনে দিন দিন আনন্দ শান্তি ও কোমলতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

কিন্তু বিস্তৃতিই প্রেমের স্বভাব। স্নেহ প্রেমও পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। এই প্রকার সঙ্কীর্ণ যে ভালবাসা তাহা ত স্বার্থ। সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতাই অধর্ম্মের মূল। আমাদের প্রেম পরিবারের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া সমাজকে ও সমগ্র মানবমণ্ডলীকে আলিঙ্গন করিবে। সংসারে এরূপ লোক বিরল নহে যাহারা দুঃখ-বিপদে অতি নিকট প্রতিবেশীর মুখের দিকেও চাহিয়া দেখে না। তাহাদের স্নেহপ্রীতি পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ।

আমাদের সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া প্রেমের সীমা ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হওয়া উচিত। গৃহে ও পরিবারে যে প্রেমের শিক্ষা আরম্ভ হয় সমাজক্ষেত্রে সেই প্রেমই আমাদিগকে বন্ধু-বান্ধব আনিয়া দেয়। প্রকৃত ভদ্রতার মূলেও প্রেম। যাহার অন্তরে ভালবাসা আছে তাহারই ব্যবহার মিষ্ট। আপনাকে ভুলিয়া যে অপরের সুখ অসুখ, সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে তাহারই ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হয়। সকলেই তাহাকে আপনার লোক বলিয়া মনে করে। স্বার্থপরতার মত বন্ধুত্বের শত্রু আর নাই। যাহার অন্তরে প্রীতি ও সদ্ভাব নাই তাহার ভদ্রতা কেবল ছদ্মবেশ—এ কথা লোকের বুঝিতে বড় অধিক সময় লাগে না।

পরিবার হইতে প্রেম সমাজ মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে বটে, কিন্তু এখানে একটী বিপদ আছে। সমাজের লোকজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে তাহারা আমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, তাহাদের উপকার করিলে তাহারা আমাদের প্রত্যুপকার করিবে—এইরূপে প্রেমের পশ্চাতে গূঢ়ভাবে স্বার্থ লুকায়িত থাকিতে পারে। যেখানে কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদানের আশা থাকে সেখানে প্রেমের পূর্ণতা নাই। সে প্রেম সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য নহে।

প্রেম যে কত উচ্চ ও কত সুন্দর হইতে পারে দাম্পত্য প্রেমে আমরা তাহার পরিচয় পাই। স্বামী স্ত্রীর জন্য ও স্ত্রী স্বামীর জন্য একেবারে আপনাকে ভুলিয়া যান। আদর্শ বিবাহে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একহৃদয় হইয়া যান। একজনের জীবনের ছোট-বড় সকল ব্যাপার আর একজন আপনার করিয়া লন। এক জনের অন্তরের ক্ষুদ্রতম সুখদুঃখ অপরের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়। একজনের জীবনের কোন কথাই অপরের নিকটে উপেক্ষার বিষয় থাকে না। কিন্তু এখানেও বিপদ আছে। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে পাইয়া আর সকলকে ভুলিয়া যাইতে পারেন। যে প্রেমের বিস্তৃতি নাই তাহার সঙ্কোচ অনিবার্য্য। ক্রমে তাঁহাদের প্রেম ক্ষীণ ও শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে; তাঁহারা আর পরস্পরকে সুখী করিতে পারেন না। কত বিবাহের যে এইরূপ শোচনীয় পরিণতি হয় তাহা বলিবার নহে।

শুধু স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসিলেই হইবে না, শুধু পরিবারের আর সকলকে ভালবাসিলেই হইবে না, বন্ধুবান্ধবকে ও আপন আপন সমাজের লোকদেরও ভালবাসিলে হইবে না; কিন্তু যাহাদের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, যাহাদের সঙ্গে পরিচয় পর্য্যন্ত নাই, যাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ প্রতিদানের আশা বা সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই, তাহাদিগকেও ভালবাসিতে হইবে। সকল শ্রেণীর ও সকল প্রকৃতির লোকদের প্রবল অনুরাগের সহিত ভালবাসিতে হইবে; এমন কি, যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখে, তাহাদেরও সর্ব্বান্তঃকরণে মঙ্গল কামনা করিতে হইবে এবং প্রদীপ্ত উৎসাহের সহিত তাহাদের সেবা করিতে হইবে। আত্মবিস্মৃত প্রেম বড় মধুর, আত্মবিস্মৃত সেবা বড় পবিত্র। ইহাই শ্রেষ্ঠ জীবন, ইহাই পরম ধর্ম্ম।

এই প্রেমের অনেকগুলি শত্রু আছে, তাহাদের মধ্যে দুইটী প্রধান। এই দুটীর একটী আলস্য অপরটী ভোগবিলাস ও আমোদপ্রমোদের উত্তেজনা। আমরা এত অলস যে আমাদের কথায় ও কাজে অন্যের মনে কষ্ট হইবে কি না তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। আমরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিই, কিন্তু একবার চাহিয়া দেখি না যে কূলে দাঁড়াইয়া কত লোক ক্রন্দন করিতেছে। অথবা আমরা আমোদ প্রমোদে এমন উন্মত্ত হই যে অন্যের কথা ভাবিবার আর অবসর থাকে না। এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হইবে এবং তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতে হইবে।

নরনারীর সুখ-দুঃখে যিনি আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিতে শিখিয়াছেন, বাহ্যপ্রকৃতি তাঁহার অতি নিকট আত্মীয়ের মত প্রিয় হইবে। প্রকৃতির কান্তি প্রত্যেক স্থানেই বিভিন্ন প্রকার; এবং একই স্থানে দণ্ডের পর দণ্ড, দিবসে ও নিশীথে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দিনের পর দিন শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় প্রকৃতির মুখশ্রীর অবিরাম পরিবর্ত্তন হইতেছে। যিনি নিখিল মানবের প্রতি প্রেমে অভ্যস্ত হইয়াছেন তিনি সহজেই প্রকৃতির সহিত একাত্মা হইয়া যাইবেন। একটী ক্ষুদ্র বনফুল, নদীর বক্ষে তরঙ্গলীলা, মেঘমালার নিত্য নব নব রূপ—সকলই তাঁহার চক্ষে সুন্দর লাগিবে, সকলই দেখিয়া তিনি তন্ময় হইয়া যাইবেন। প্রকৃতির রহস্যমন্দিরের দ্বার তখন তাঁহার মুগ্ধনেত্রে উন্মুক্ত হইবে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাওয়ার আনন্দ-কথায় প্রকাশ করা যায় না।

পরিশেষে আমরা ধর্ম্মজীবনের মধুরতা অনুভব করিব। ভগবানের সহিত আমাদের অন্তরের নিভৃত প্রদেশে যে সম্বন্ধ আমরা অনুভব করি, তাহা প্রেমের সম্বন্ধে পরিণত হয়। আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ করুণা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিয়া দিব, কোন পাপচিন্তা মনে আসিলে আমরা লজ্জাবোধ করিব। পতিব্রতা সাধ্বী রমণী স্বামীকে যেরূপ ভালবাসেন আমরা ভগবানকে সেইরূপ ভালবাসিব, কেবল এই প্রেমের সঙ্গে ভক্তির সম্ভ্রম, অনন্তের গভীরতা ও পরিপূর্ণ শুদ্ধতা বিজড়িত থাকিবে। ইহাই সত্য পুণ্য, ইহাই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ, ইহাই প্রেমের উচ্চতম অবস্থা, ইহাই ব্রহ্মসহবাস।

মহাভারতের প্রক্ষিপ্তবাদ।

(শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল)

বর্ত্তমান মহাভারতের কোন অংশ পরিত্যাগ দুঃসাহসের কথা।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমানাকারে প্রাপ্ত মহাভারতের কোন্ অংশ তাঁহার নিজের রচনা এবং কোন্ অংশ অপর কর্ত্তৃক রচিত হইয়া উক্ত মূল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—এ বিষয়ে সুধীবৃন্দ মধ্যে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ

কেহ নিজ কল্পনানুযায়ী মহাভারত হইতে কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বাদ দিয়া বাকী অংশই বেদব্যাসপ্রণীত খাঁটি মহাভারত বলিয়া প্রচারে ব্যস্ত।

কিন্তু চিন্তনীয় যে মূল মহাভারত প্রায় পঞ্চসহস্রাধিক-বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তদবধি তাৎকালীন স্বাধীন আর্য্যজাতির রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম ও অন্যান্য নানাবিধ বিপ্লবাদিতে আর্য্যজাতি ও তাঁহাদের গৌরবের সকল "কিছুরই" মধ্যে সেই বিপ্লবের আঘাত প্রবিষ্ট হইয়াছে। আজ আর সেই বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বের সেই আর্য্যজাতিও নাই, তাঁহাদের পুরাকীর্ত্তিসমূহও বিপর্য্যস্ত; তাঁহাদের শাস্ত্রাদি, ইতিহাস, পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থাদিনিচয়ও সে বিপর্য্যয়ের হস্ত হইতে একেবারে ত্রাণ যে পায় নাই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ উক্ত গ্রন্থাদির মধ্যে অনেকগুলিতে যথেষ্টই পাওয়া যায়। উক্ত নানা বিপ্লবের মধ্যে আর্য্যজাতিরই ন্যায় তাঁহাদের গৌরবের অন্যতম হেতু—বেদব্যাসরচিত মূল মহাভারতখানিও কালবশে লুপ্ত এবং এতকাল পরে সেই মূল গ্রন্থ (Original Edition) পাইবার কল্পনা বাতুল ব্যতীত অন্য কেহ করিতে অক্ষম। তবে অধুনা বেদব্যাস-রচিত বলিয়া খ্যাত যে মহাভারত তাহার সমগ্র অংশই তাঁহার রচিত নহে বলিয়া কাহারও নিজ সন্দেহানুযায়ী বর্ত্তমান মহাভারত হইতে কোন অংশ বাদ দিলে হঠকারিতা হইবে বলিয়া মনে হয়। এবিষয়ে ধীরভাবে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং স্বাভিমত বিদ্বৎসমাজে তথা সাধারণের নিকট উপস্থিত করতঃ তাঁহাদের সকলের দ্বারা বিবেচিত ও বিচারিত হইলে পর সকলের মত জানিয়া তদনন্তর বর্ত্তমানের মহাভারত হইতে বাদ দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যবস্থা করাই সমীচীন মনে হয়। বর্ত্তমানে ব্যক্তিবিশেষের মতানুযায়ী প্রক্ষিপ্তাংশরূপ পরাধীনতার নিগড় হইতে বাদরায়ণির মূল "মহাভারত" উদ্ধার বা তাঁকে পরিণত হইয়া যাহাও বা আছে তাহারও নাশ যাহাতে না হয় এবং ধীরচিত্তে সকলে বিচার ও মীমাংসা করেন তাহাই কামনা করিয়া সেই বিচারের যৎসামান্য সহায়তাকল্পে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণ।

মহাভারতের বিভিন্ন সংস্করণ।

মহাভারত আদিপর্ব্বান্তর্গত অনুক্রমণিকাধ্যায়ে উল্লিখিত কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য :—

(১) "ভারতসংহিতা প্রথমতঃ চতুর্ব্বিংশতিসহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যানভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

(২) "পরিশেষে মহর্ষি সার্দ্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সংকলন করিলেন।

(৩) "বেদব্যাস এই মহাভারত প্রস্তুত করিয়াই সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান।

(৪) "পরে অনুরূপ শিষ্যমণ্ডলীতে তাহা বিতরণ করেন।

(৫) "অনন্তর ষষ্টিলক্ষ শ্লোকাত্মক অন্য ভারতসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন।

(৬) "ঐ ষষ্টিলক্ষের মধ্যে.........নরলোকে একশতসহস্র শ্লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

(৭) "নারদ দেবলোকে মহাভারত সুপ্রচার করেন। অসিত দেবল পিতৃলোকে ও শুকদেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান এবং

(৮) "ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মনুষ্যলোকে ভারত কীর্ত্তন করেন।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে ব্যাসদেবের জীবিতকালেই তৎকর্ত্তৃক মহাভারতের তিনটী বিভিন্ন সংস্করণ বা Editions রচিত হইয়াছিল।

মহাভারত।

(অ)

প্রথম সংস্করণ—২৪ হাজার শ্লোকযুক্ত। ইহাতে উপাখ্যানভাগ একেবারে ছিল না।

দ্বিতীয় সংস্করণ—উক্ত ২৪ হাজার শ্লোকের সহিত মহর্ষি ব্যাস একশত পঞ্চাশটি শ্লোক যোগ করেন। সুতরাং এই দ্বিতীয় সংস্করণের শ্লোকসংখ্যা ২৪১৫০ মাত্র।

এই দ্বিতীয় সংস্করণে শেষোক্ত ১৫০ শ্লোকে মহর্ষি "ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার-সংকলন" (Index ?) করিলেন।

(আ)

তৃতীয় সংস্করণ—(ক) ৬০ লক্ষ 'শ্লোকাত্মক' [অর্থাৎ ঠিক ঐ সংখ্যক না হইয়া কমবেশি হইতে পারে, যথা—"শতখানেক" শব্দে সঠিক একশতই বুঝায় না, এক শতের কিছু কম বা বেশীও হইতে পারে]।

(খ) "অন্য এক ভারতসংহিতা" মহর্ষি রচনা করিয়াছিলেন। "অন্য এক" শব্দ প্রতি লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে যে এই নব সংস্করণভুক্ত মহাভারত প্রথম দুই সংস্করণ হইতে পৃথক ছিল।

(গ) এই তৃতীয় সংস্করণের মাত্র "এক লক্ষ শ্লোক নরলোকে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে"।

এমতাবস্থায় "মহাভারত" উদ্ধারপ্রয়াসী জনের বলা উচিত যে কোন্ সংস্করণের মহাভারতকে তিনি মূল মহাভারত আখ্যা দিবেন এবং কোন্ সংস্করণের মহাভারত তিনি উদ্ধারেচ্ছু।

আদি মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণদ্বয় যে অল্পসংখ্যক শ্লোকযুক্ত ছিল তাহাও যেমন কেবলমাত্র বর্ত্তমান মহাভারত হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায় তেমনই বর্ত্তমান মহাভারত হইতেই ইহাও জানা যায় যে উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণদ্বয় ব্যাসের আমলেই মুখে অথবা তৃতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং শ্লোকাধিক্যদৃষ্টে তৃতীয় সংস্করণ মহাভারত ব্যাস রচিত নহে বলিয়া উড়ান যায় না এবং বর্ত্তমান লক্ষসংখ্যক শ্লোক তাঁহার নহে বলিয়া হঠাৎ পরিত্যাগ করা উচিত মনে হয় না। এগুলি যে ব্যাসের রচিত নহে—সে বিষয়ের প্রমাণ কি? তদ্বিষয়ের প্রমাণ দিতে না পারিলে প্রমাণাভাবাৎ তদ্বিষয়ই ত্যাজ্য হইবে না কি?

এমতাবস্থায় আদি দুই সংস্করণ মাত্রই মহাভারত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে ও বর্ত্তমান বা তৃতীয় সংস্করণ তদ্রূপ গ্রাহ্য নহে বা হইতে পারে না একথা সাধু মনে হয় না। যদি কখন কেহ আদি দুই সংস্করণ উদ্ধার করিতে পারেন তিনি ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই ও তাহা পুরাতত্ত্ববিদের সাফল্য সূচিত করিতে পারে। তাই বলিয়া তৃতীয় বা বর্ত্তমান সংস্করণ পরিত্যাজ্য কেন হইবে? ইহাও তো ব্যাসদেবেরই রচনা বলিয়া উক্ত আছে। উভয়ের প্রমাণস্থানও একই, অর্থাৎ বর্ত্তমান মহাভারতই।

মহাভারত—প্রহেলিসমাচ্ছন্ন, মহাভারত—বোঝা চাই।

মহাভারত-পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে মহাভারত নানা প্রহেলি-সমাচ্ছন্ন। মহাভারতের আদি অনুক্রমণিকাধ্যায়েই উক্ত আছে, কি কারণে "ব্যাস স্থানে স্থানে গ্রন্থ-গ্রন্থিস্বরূপ কূটশ্লোক রচনা করিয়াছেন"; ঐ সকল ব্যাসকূটের "অদ্যাপি কেহ অর্থ করিতে পারেন না"। এমন কি "সর্ব্বজ্ঞ গণেশকেও" ঐ সকলের অর্থ চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইত।

যাহোক, এমতাবস্থায় মহাভারত হইতে কিছু হঠাৎ বাদ দিবার পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থ বিশ্লেষণ করতঃ সম্যক বা ভালরূপে বোঝা প্রথমেই আবশ্যক। বর্ত্তমান মহাভারতের প্রতি খড়্গহস্তজনগণ উহা সম্যক বোধের পরিচয় সাধারণ্যে প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত তাঁহাদের পাশ্চাত্য উপাধিরাশি দর্শাইয়া বা তৎমাহাত্ম্যবলে সাধারণের ধাঁধা লাগাইয়া যদি একেবারেই মহাভারত হইতে স্বেচ্ছামত অংশসমূহ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট রহিবে তাহাই মহাভারত বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করেন তবে তাহা নিতান্তই "গা জোরের" কার্য্য হইবে কি না ও তাহাই মহাভারত বলিয়া মান্য হইবে বা হইতে পারে কি না তাহা সুধীজন ও সর্ব্বসাধারণের বিবেচ্য।

মহাভারত বুঝিবার ক্রম।

এক্ষণে মহাভারত বুঝিবার জন্য মহাভারতের কুহেলি বা প্রহেলির মধ্য হইতে নানা স্থানে ছড়ান ও লুকান কথাগুলি খুঁজিয়া বাহির করতঃ একত্রিত বা Index করা আবশ্যক। এবিষয়ে এদেশে সবিশেষ চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ পর্য্যন্ত মাত্র একটি এরূপ পুস্তক বাংলা ভাষায় দেখিয়াছি। তাহাও রচয়িতার শ্রেণীবাৎসল্যের পরিচায়ক—তদ্বিপরীত ভাবযুক্ত মহাভারতোক্ত অনেক বিষয়ই উক্ত পুস্তক হইতে রচয়িতা বাদ দিয়া অন্যায় করিয়াছেন। আমি এই জন্য মহাভারতের একটী সম্পূর্ণ Index করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে অবসর ও সুযোগ অভাবে কর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। এ বিষয়ে যিনি বা যাঁহারা অবহিত ও যাঁহাদের সবিশেষ সময় ও সুযোগ আছে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিলে আর্য্যজাতির মহোপকার করিবেন।

মহাভারতে একই বিষয় বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা হেতু মহাভারতোক্ত বিভিন্ন বিষয় একত্র সংগ্রহ করতঃ একে একে আলোচ্য।

মহাভারতের যে তিনটি সংস্করণের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে তাহাতে রচয়িতা কবির অন্তরের তিনটি স্তরের বা পর্য্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণ রচনাকালে যা স্তরে সংক্ষেপে বা বীজাকারে সর্ব্ববৃত্তান্ত কবির মনে উদয় হয়, তাহা তিনি মাত্র ১৫০ শ্লোক মধ্যে গ্রথিত করিয়াছিলেন। ইহা ব্রহ্মসূত্রাদি রচয়িতা মহর্ষির চিন্তার গভীরতার অপূর্ব্ব নিদর্শন। সম্ভবতঃ এই বীজই ভাবীকালে পূর্ণ বিকাশ লাভে ৬০ লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাগ্রন্থে পরিণত ও "অন্য এক ভারত সংহিতার" রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।

ঐ যে আখ্যায়িকাভাগ বা নিখিল বৃত্তান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা লক্ষ্যীভূত বা focussed হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া কুরুপাণ্ডবের ইতিহাসে অথবা বলা যায় মহাভারতের আখ্যায়িকাভাগের মূল—শ্রীকৃষ্ণে কেন্দ্রীকৃত কুরুপাণ্ডবের ইতিহাস।

—

অর্চ্চনা।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি সহ।

কল্যাণ—তেওরা।

ওঁ পিতা তুমি। জ্ঞানদাতা হে। নমি তোমা—
ছেড়োনাকো মোরে।
যতেক দেব হে পিতা দুরিত মোর করি' দূর
আশীষ তব বরিষ।
নমি দেব শঙ্কর শুভদাতা হে
নমি দেব শঙ্কর শুভাকর হে
নমি দেব শিব শিবতর তোমায় হে॥

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

॥
৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
সাঃ রঃ I { পা -া ক্ষপা। গা -া। রা -া I গা ধা পা। পরা গা। রা সা I
ওঁ পি তা • • • তু • মি • জ্ঞা • ন দা • • তা হে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I -া সা ধ্া। সা -া। সা সা I রা গা পা। পা ধা। র্সা -া I
• ন মি তো • মা ছে ড়ো না কো মো • রে •

১´ ২ ৩
I ধর্রা র্সর্সা ধপা। গপা গরা। সা রা } I
• • • • • • • • • • • "পি"

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
গা I গা -া গা। পাঃ ক্ষাঃ। ধা -া I পা ধপা র্সা। -া র্সা। র্সা র্সা I
য তে • ক দে • ব • হে পি• তা • দু রি ত

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা -া র্সা। র্সা র্সা। র্সা -না I র্রা র্সর্সা গা। -া গা। -া গা I
মো • র ক রি' দূ • • • র আ • শী • ষ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I রা রা ন্া। রা সা। সা সা I সা -া রা। রা -া। রা রা I
ত ব ব রি ষ ন মি দে • ব শ • ঙ্ক র

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I রা রা রা। সরা গা। গা গা I -া রা গা। ক্ষা -া। ক্ষা ক্ষা I
শু ভ দা • • • তা হে • ন মি দে • ব শ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I -া ক্ষা ক্ষা। ক্ষা ক্ষা। গা ক্ষা I পা পা পা। পা -া। ক্ষা পা I
• ঙ্ক র শু ভা • • • ক র হে • ন মি

১´			২		৩		১´			২		৩	
I ধা	-া	ধা |	ধা	ধা |	পা	ধা I	না	না	না |	না	-া |	ধা	না I
দে	০	ব	শি	ব	শি	ব	ভ	য়	তো	মা	০	০	০

১´			২		৩	
I র্রা	র্সর্সা	র্সা |	র্সা	-া |	সা	-া I
০	০০	য্	হে	০	ওঁ	০

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ইমন পূরবী—দাদ্‌রা।

শান্ত সন্ধ্যা এল আকাশ জুড়ে
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে।
প্রাণ ভরে গো ডাক তাঁরে সেই অকূলের কূলে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে॥
প্রাণের কথা যত কিছু বল তাঁরে বল খুলে
বেড়ায়ো না হেথা-সেথা মরি' বৃথা ঘুরে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে॥
ভক্তিসিক্ত হয়ে তাঁরি দাঁড়াও চরণমূলে
গন্ধে বর্ণে ফুটুক চিত্ত প্রেমের হাওয়ায় দুলে
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে।
প্রিয়তম সখা তোমার নাইকো জেনো তিলেক দূরে
দেখবে তিনি আছেন হৃদে অশ্রুজলে ধুলে
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে॥
এমন মধুর সন্ধ্যাবেলা—প্রেমভক্তি নানা ফুলে
চিত্ত-সাজি সাজাইয়া দাও গো তাঁরি পায়ে তুলে।
ডাকবার মত ডাক তাঁরে ব্যাকুল-করুণ সুরে—
দেখা দেবেন প্রাণের মাঝে আপনারেও ভুলে।
মন যাওরে এবার অন্তঃপুরে।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বীণা তব শুনি মোর পরাণ চাহে
যেতে ধেয়ে তব চরণে হে।
রাখে কেবা বাঁধি মোরে
আজি মধু রাতে কঠিন শত বাঁধনে হে॥

মিশ্র রামকেলী—তাল ফেরতা।

জাগো সবে জাগো আজি পুণ্য দিনে
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে॥
পুষ্প ফোটে পাখী জাগে
ছুটে চলি' সবার আগে—
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে॥
সুমঙ্গল শঙ্খ বাজে,
দিকে দিকে ঘণ্টা বাজে;—
যেথা যে যা, সবে চলি'
তাঁরি জয়ধ্বনি করি'
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে॥
রাঙ্গাইয়া গগন-থালে
উঠছে ভানু তালে তালে—
মন আর যে রইতে নারে
ঘরের কোণের আঁধারে॥
এমন মধুর সকাল-বেলা
কোরোনাকো অবহেলা;—
গীতে গন্ধে সবার মাঝে
প্রাণের দেবতা দেখবে রাজে
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে॥

আশাবরী—তেতালা।

তব চরণকমলে মম মনভ্রমর
আজি প্রাতে ধায় হর্ষে বিভোর॥
দিব তোমারে কিছু নাহি গো;
নিয়েছ সব হরি' মোর॥
হাসে চারি দিশি ফুল পাতা
গগনে উথলে আনন্দ-জোর॥
ভিক্ষা পদে তব—রাখ বাঁধিয়া দেবা
দিয়া প্রেমের ডোর।

মনুষ্যত্বের বিকাশে প্রকৃত শিক্ষা।*

(শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত, বি-এল)

শিক্ষার স্বরূপ কি ইহা স্থির করিতে হইলে স্বতঃই মনে হয় যে মানুষ হইবার চেষ্টাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলিলেই ইহার সদুত্তর হইল। একথাটা যে খুব সরল স্বাভাবিক এবং মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দিহান হইবার কারণ দেখা যায় না। যদি মানুষ হওয়াটা কি এবং মনুষ্যত্ব কি এ বিষয়ে আমরা একমত হইতাম বা হইতে পারি, তাহা হইলে শিক্ষার স্বরূপ কি তাহা লইয়া আর বেশী মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না।

অতএব আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে হইলে মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে সেই বিষয়ের আলোচনাই প্রথমে উঠিয়া পড়ে। আবার এবিষয়ের মীমাংসা করিতে যাইলেই সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা অবশ্যম্ভাবী। এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানুষের স্থান কোথায় এবং তাহার সৃষ্টিতে কোন উদ্দেশ্য আছে কি না ইত্যাদি গুরুতর সমস্যা স্বতঃই মনে উদিত হয়। সৃষ্টির এবং স্রষ্টার সম্বন্ধ, অদৃষ্টবাদ (predestination) এবং ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা (freedom of will), একত্ব (individualism) এবং সমাজতত্ত্ব (collectivism) প্রভৃতি গভীর ও গুরুতর তত্ত্বের আলোচনা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

এসব তত্ত্বের সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা হয় নাই বা আশু হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি আমরা হতাশ হইয়া আমাদের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিব? আমরা অন্যান্য বিষয়ে যতই ভিন্ন মতাবলম্বী হই না কেন, সকল ব্যাপারে উদ্যম ও চেষ্টা যে মনুষ্যত্বের একটা প্রধান লক্ষণ তদ্বিষয়ে বোধ হয় আমরা সকলেই একমত।

সেই উদ্যম ও চেষ্টার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমাদের নিজ নিজ জ্ঞান বিশ্বাস মতে এই সকল গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করতঃ শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার প্রচলনে বিধিমত চেষ্টা করা নিতান্তপ্রয়োজন বলিয়াই আমি এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি। এই দুঃসাহসের ফলে যে বহুতর ত্রুটী ও ভুল হইবে তাহা নিজে বেশ বুঝি বলিয়াই পূর্ব্বাহ্নে "ক্ষন্তব্যো মে অপরাধঃ"—প্রার্থনা জানাইতেছি।

সকল তত্ত্বের সুমীমাংসা সম্ভব না হইলেও বোধ হয় গোটাকতক মূলতত্ত্বে আমরা একমত হইতে পারি, এই ধারণায় সেই কয়টী তত্ত্বের উল্লেখ করিলে হয় ত আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত সহজ-হইবে এই বিবেচনা করিয়া সেইগুলির উল্লেখ করিতেছি।

গোঁড়া ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যতীত ক্রমবিকাশতত্ত্ব (Evolution Theory) সম্বন্ধে আর কেহ সন্দিহান আছেন বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্য সৃষ্টিতত্ত্বের উহা যে একটী মূল স্তম্ভ ইহা স্বীকার করিয়াই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহা সত্য হইলে ক্রমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত মানবের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার বিধান হওয়া আবশ্যক। ইহাকেই আমাদের শাস্ত্রকারেরা অধিকারভেদ বলিয়া স্বীকার করতঃ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার মনে হয় যে ইহা স্বীকার না করিয়া সকল লোককে একছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করাতেই আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি এত ব্যর্থ হইতেছে।

অতএব প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে এই তথ্যটীর উপর সদা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এখন কথা উঠিতে পারে যে যদি তাহাই হয় তবে হয় ত প্রত্যেক মানবের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক হইবে। ইহা কতকপরিমাণে সত্য হইলেও এবং মানবের নিজত্বকে ফুটান শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও একটা সাধারণ ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করি। কারণ মানুষ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও মনুষ্যত্ব এক।

অতএব সেই জন্যই আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা করিতে যাইয়া সকলের পক্ষে একটা সাধারণ শিক্ষার স্থান রাখিয়া প্রত্যেকের বিশেষত্ব ফুটাইবার চেষ্টাকেই প্রকৃত শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

এক্ষণে শিক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা করিতে যাইলেই মনুষ্যত্ব কি ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা উঠিয়া পড়িবে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয় যদি স্থিরভাবে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে মূলতঃ দুইটী শক্তির লীলাতেই এই সৃষ্টির বিকাশ। একটী আকর্ষণ, একটী বিকর্ষণ; একটী উৎকেন্দ্রিক (centrifugal). অন্যটী কেন্দ্রাভিমুখী (centripetal); একটী স্থিত (static), অন্যটী বেগবতী (dynamic)।

যুগে যুগে মানবসন্তান এই শক্তিদ্বয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে, এবং কখনও দেবাসুররূপে, কখনও God ও Satan রূপে, কখনও spirit ও matter রূপে, কখনও এক ও বহুরূপে, কখনও সুমতি ও কুমতি-

* লেখক শিক্ষাসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ অনেক তত্ত্ব এই প্রবন্ধে দেখিতে পাইব বলিয়া আমরা ইহা সাদরে প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য অনেক বিষয়ে বিশেষত তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মতের সহিত আমাদের সর্ব্বাংশে ঐক্য হইবে না। সুতরাং আমরা এই প্রবন্ধোক্ত মতামতের জন্য দায়ী নহি—লেখকই দায়ী। ভং সং

রূপে, কখনও সংযম ও চাঞ্চল্যরূপে, কখনও বা আদর্শ (ideal) ও বাস্তব (real) রূপে এই শক্তিদ্বয়কে অভিহিত করিয়াছে। শ্রীভগবান গীতায় "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥" বলিয়া এই দুইটী শক্তির প্রকৃতি নিরূপণ করিয়াছেন।

এই দুইটী শক্তির তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ এই দুইটী শক্তির সামঞ্জস্যেই (equilibrium) সৃষ্টির বিকাশ। সেই জন্যই "রাধাকৃষ্ণ-বিকৃতি-প্রণয়-হ্লাদিনী-শক্তিরস্মাদেকাত্মনাবাপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ" রূপে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের বিকাশ। সেই জন্যই আমাদের বিশ্বপ্রসবিনী জগন্মাতা একাধারে অসিখড়্গধারিণী এবং বরাভয়দায়িনী। সেই জন্যই বুদ্ধদেবের মধ্যপন্থা আবিষ্কার। কারণ এই মিলনেই, এই সামঞ্জস্যেই সচ্চিদানন্দের বিলাস। ইহা যদি গ্রহণীয় হয় তাহা হইলে যখন বা যেস্থানে একটী শক্তির অত্যধিক প্রাবল্য হয়, সেই কালে ও সেই স্থানে অপর শক্তিটীর আশ্রয় ভিন্ন সচ্চিদানন্দের বিলাস প্রকট হয় না। এমতাবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ কি ইহা নিরূপণ না করিয়া প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় না।

সেই জন্যই প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থায় সময় শিক্ষার্থীর অধিকার ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণের এত প্রবল চেষ্টা এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে আত্মনিরূপণের এত প্রবল উদ্যমের ব্যবস্থা উপলক্ষিত হয়। সেই জন্যই প্রাচীন ভারতের সাধনায় আত্মতত্ত্ব নিরূপণের এত উচ্চস্থান। গ্রীসের সাধনাতেও "To know thyself is the highest wisdom" বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

এই আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করতঃ বিদ্যাতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া শিবতত্ত্বে উপনীত হইবার জন্যই দৈনিক সন্ধ্যা-আহ্নিক হিন্দুর পক্ষে এক সুন্দর ব্যবস্থা দেখা যায়।

এস্থলেও আবার সেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি সকলের এইরূপ পৃথক পৃথক শিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয় হয় তাহা হইলে সাধারণ ব্যবস্থার স্থান কোথায়? পূর্ব্বে ইহার যে উত্তর দিয়াছি তদ্ব্যতীত ইহার আর একটী সদুত্তর আছে বলিয়া মনে হয়। যদি আমরা সত্য সত্যই আত্মতত্ত্বনিরূপণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই এবং কেবল 'আত্মতত্ত্বায় নমঃ' বলিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে না করি, তাহা হইলে এই স্থূল দেহাত্মবোধ হইতে ক্রমে ক্রমে বিরাট পুরুষের আত্মবোধ স্ফুরিত হইবে এবং সেই স্ফুরণের চেষ্টাই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইবে। এই সাধনায় ব্যাপৃত হইলে মানব ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর, ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর, সামান্য হইতে মহত্তর সত্তায় উপনীত হইয়া ভগবদুদ্দেশ্য সাধন করিবে। আমার সামান্য বুদ্ধিতে ইহাকেই প্রকৃত আত্মস্ফুরণ এবং এই আত্মস্ফুরণের চেষ্টাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে হয়। ইহার ভিতর একত্বের বহুবিকাশ এবং অবশেষে একত্বে প্রত্যাবর্ত্তন দেখিয়া ভক্তিগদ্গদচিত্তে সেই একের শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি এবং সেই "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" যিনি—"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" বলিয়া নিজেকে স্বীকার করিয়াছেন এবং যাঁহাতেই এই দুটী শক্তির সমন্বয় তাঁহার পাদপদ্মে "নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর" বলিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হই।

আমাদের শাস্ত্রে "একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" এই সূত্রেই সৃষ্টিতত্ত্বের সুন্দর মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়াই এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্রতার মধ্যে একত্বকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। এই একই, পূর্ব্বকথিত দুইটী শক্তিতে বিভক্ত হইয়া অসংখ্যরূপ ধারণ করিয়া সচ্চিদানন্দের লীলা প্রকট করিতেছেন। অতএব আমরা প্রত্যেকে সেই লীলায় নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুভব করিয়াও তাঁহার বিরাট অস্তিত্বের অন্তীভূত ইহা উপলব্ধি করতঃ তাঁহারই আনন্দবর্দ্ধন করিতেছি, এই অনুভূতিতে যে পরমানন্দ তাহা পাইবার প্রয়াসকেই আমি প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে করি।

এই আত্মচেষ্টা ও আত্মনিবেদন শ্রীমদ্ভাগবতে কি সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়াছে তাহা এই শ্লোকটীর দ্বারা বুঝিতে পারিবেন বলিয়াই উহা এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

নাতঃপরং পরম ! যদ্ভবতঃ স্বরূপ
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥

আমার মনে হয় যে বহুত্বের এই বিচিত্র সার্থকতা নষ্ট না করিয়া ভূমানন্দ ভোগ করাই মানবের পূর্ণ চরিতার্থতা। জীবাত্মায় পরমাত্মার এই আভাস পাওয়াই মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ।

এই বিশেষত্ব ও সামান্যতা সম্যকভাবে রক্ষা করিয়া মানবের যাবতীয় চিত্তবৃত্তির সম্যক্ পরিস্ফুরণে এবং সামঞ্জস্যে শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলে মানবসভ্যতা রক্ষা পাইবে, নচেৎ নহে। সকল বৃত্তিই ঈশ্বরমুখী করা ব্যতীত এই পরিস্ফুরণ ও সামঞ্জস্য সম্ভব হয় না, ইহাই কেবলমাত্র জগতের সকল ধর্ম্মবেত্তা ও ভক্তি-

মানবের নির্দ্দেশ। ইহা বুঝিয়া সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে—ইহাই আমার সুচিন্তিত অভিমত।

এই বিশেষত্ব ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন সত্য, মানবসঙ্ঘ বা জাতিবিশেষের পক্ষেও তেমনি সত্য। যথা:—ইংরাজজাতির বিশেষত্ব তাহাদের "Rule Britannia, Rule the waves" পদ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এমন ইংরেজ নাই যাহার ধমনীতে এই পদ্য শুনিয়া প্রবলতরবেগে রক্ত প্রবাহিত না হয়। কিন্তু ইংরাজ জাতির এই বিশেষত্বকে তাহারা সামান্যের অঙ্গীভূত করিতে পারে নাই বলিয়াই তাহারা জগতে সুখশান্তি আনিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের বিশেষত্ব যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে তিতিক্ষা, সংযম, সংরক্ষণই ইহার মজ্জাগত। ইহা শুনিয়াই হয় ত আমার নব্যসম্প্রদায়ভুক্ত বন্ধুগণ আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সন্তোষবিধানার্থ আমায় বলিতে হইবে যে ভারতের ইহা বিশিষ্টত্ব বলিয়াই যে প্রবৃত্তির উদ্দাম নৃত্যের এখানে স্থান থাকিবে না এমত নহে। স্তর হিসাবে প্রকৃতির উদ্দাম নৃত্যকে অবসর দিতে হইবে বই কি! কাহার সাধ্য ইহার গতিপ্রতিরোধ করে? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন—'প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি,' কিন্তু তাহা যে নিম্নস্তরের ইহা সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। আর একটী ইহার সুমীমাংসা ভারতবর্ষ যেভাবে করিয়াছে সেভাবে অন্যত্র কোথাও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

যদি প্রবৃত্তির উদ্দাম নৃত্য ভগবদুদ্দেশ্যেই করিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহার স্থান অতীব উচ্চে। যখন নিজের ক্ষুদ্র সত্তার আনন্দই প্রকৃত আনন্দ নহে, উহা অপেক্ষা বৃহত্তর ও মহত্তর আনন্দের আমরা অধিকারী, ইহা বুঝিয়া সেই আনন্দ পাইবার জন্যই উদ্দাম নৃত্য করিতে শিখি, যদি বুঝি আত্মপ্রীতি কাম ও ভগবৎপ্রীতি প্রেম, তাহা হইলে দুই শক্তির সামঞ্জস্য দ্বন্দ্ববিমুক্ত হইয়া ভারতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক স্থলেই "Greatest hapiness of the largest number for longest time"এর অধিক উঠিতে পারে নাই। সম্যক্ জ্ঞান ও সর্ব্বের মঙ্গল মানুষের সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জনীয় ও করণীয় ইহা ভারতের সভ্যতাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে সাধনার ক্ষীণ স্পন্দন প্রায় প্রাণহীনদেহে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। তাহাকে শক্তিশালী করিয়া আবশ্যক হইলে আধারের সংস্কার সাধন করতঃ জগতে সুখশান্তি আনিবার জন্য ভগবান এই বিধ্বস্ত জাতিকে এখনও সমূলে বিনাশ করেন নাই। যদি আমরা পাশ্চাত্য সাধনাকে ঈশ্বরমুখী করাইতে পারি তাহা হইলে তাহাদের এই বিস্ময়কর জ্ঞানার্জ্জন ও কর্ম্মপ্রবণতা সার্থক ও শুভ হইবে এবং আমরা যদি "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" বুঝিয়া সকল জ্ঞান অর্জ্জন করাই তাঁহার পূজা এবং সকল কর্ম্মই তদুদ্দেশ্যে সাধিত হইলে তাঁহারই সেবা ইহা বুঝিয়া সর্ব্বজ্ঞানার্জ্জন ও সকল কর্ম্ম করিতে থাকি, তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং ভারতের সাধনার বিস্তার করিতে পারিব।

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা। *

[সমালোচনা]

(রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল)

ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম (Aryan Culture) বহুকাল হইতে নানা কারণে সবিশেষ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। এই সব কারণের মধ্যে পরধর্ম্ম-সংমিশ্রণই সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট। অনেক সময়ে পরধর্ম্ম হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত আর্য্যধর্ম্মকে কমঠবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যুগের পর যুগ কাটাইতে হইয়াছে। এখনও রক্ষণশীলেরা সেই কমঠবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই থাকিতে চাহেন এবং তদুদ্দেশ্যে উপদেশ করেন। একদিকে পরধর্ম্ম-সংমিশ্রণ এবং অপর দিকে বহুকাল ধরিয়া গতিহীন, উন্নতিহীন অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ক্রমে জীবনীশক্তির হ্রাস—এই উভয়ের ফলে আর্য্যধর্ম্মে বিষম ও বিজাতীয় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। আমি এস্থলে "ধর্ম্ম" শব্দ ইংরেজী "religion" শব্দের অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। ইংরেজী Culture শব্দে যাহা বুঝায়, সেই ব্যাপক অর্থেই "ধর্ম্ম" শব্দ ব্যবহার করিতেছি। বস্তুতঃ হিন্দুর ধর্ম্মও তাই—শুধু পূজা, উপাসনাদি নহে; উহার সহিত রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গি, শিক্ষা-দীক্ষা, আহার-বিহার ইত্যাদি জীবন-যাত্রার যাবতীয় ক্রিয়াসমষ্টির আদর্শই হিন্দুর "ধর্ম্ম" নামে অভিহিত।

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে ও প্রভাবে হিন্দুর ধর্ম্ম বিষম ভাবে বিপর্য্যস্ত হইতেছে। এই যুগের আরম্ভ হইতেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণের কুফল ফলিতে থাকে। এই কুফল দেখিয়া যাঁহারা আর্য্যধর্ম্ম সংরক্ষণের প্রয়াসী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যে স্রোত নিবারণের জন্য তাঁহার এই প্রশংসনীয় প্রয়াস, সে স্রোত কিন্তু ক্রমেই প্রবলতর রূপে প্রবহমান। তাই সুদীর্ঘকাল

---

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। ৩১৫পৃষ্ঠা। কাগজ ছাপা ও বাঁধাই উত্তম। মূল্য এক টাকা বারো আনা মাত্র।

পরে তিনি ঐ গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি আগাগোড়া পড়িয়া দেখিলে সহৃদয় পাঠক বুঝিবেন যে, গ্রন্থকার হিন্দু স্ত্রীলোকের পক্ষে পাশ্চাত্য অনুকরণকে সর্ব্বাংশে মাতৃত্বের প্রতিকূল জ্ঞান করেন। পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষা ও স্বাধীনতা কোন মতেই হিন্দু আদর্শানুযায়ী গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুকূল নহে।

হিন্দুর গার্হস্থ্যধর্ম্ম শ্রেষ্ঠধর্ম্ম এবং গার্হস্থ্যাশ্রম শ্রেষ্ঠ আশ্রম। "Complete living" এই গার্হস্থ্য আশ্রমের আদর্শ এবং ঐ আশ্রমে থাকিয়া জীবনকে ঐ আদর্শানুযায়ী করাই পূর্ণ মানবতা প্রাপ্তির উপায়। এই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়াই গার্হস্থ্যধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন কর্ত্তব্য এবং একটা সূত্র (principle) ধরিয়া তাহা করিতে হইবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাতৃত্বই গার্হস্থ্যধর্ম্মের সূত্র। যে কার্য্য মাতৃত্বের অনুকূল, গৃহিণীর পক্ষে তাহাই সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয় এবং যে কার্য্য মাতৃত্বের প্রতিকূল, তাহাই সাবধানে বর্জ্জনীয়। এই সূত্র ধরিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, প্রচলিত "পাশ"-কারিণী স্ত্রীশিক্ষা (অবশ্য উচ্চশিক্ষা) মাতৃত্বের অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্মসাধনের অনুকূল নহে;—বস্তুতঃ অনেকাংশে প্রতিকূল। হিন্দু স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রসম্মতই হওয়া চাই। নতুবা কেবলমাত্র পাশ্চাত্য মতে উচ্চশিক্ষিতা হিন্দু গৃহিণীর পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও হয়।

স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অপেক্ষা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকেই বড় করিয়া দেখিতেছে। সুতরাং পাশ্চাত্য স্ত্রীলোক ব্যক্তিগত ভাবেই শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যস্ত। তাঁহাদের লক্ষ্য, শিক্ষা ও স্বাধীনতা দ্বারা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটনের দিকে। এই ব্যক্তিত্ব বস্তুটাকে হিন্দু অন্যভাবে দেখিয়াছে এবং আমার মনে হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক। সামাজিক জীবের সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সমাজকে বাদ দিয়া "ব্যক্তি" দাঁড়াইতে পারে না। কেবলমাত্র পুরুষ বা কেবলমাত্র স্ত্রী যতই কেন ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ লাভ করুন না, পূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভের অধিকারী বা অধিকারিণী নহেন; কারণ, জীবপ্রবাহ, তথা সমাজ, রক্ষা করিতে তাঁহাদের উভয়ের সম্মিলন ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই। এই সম্মিলন উদ্দেশ্যেই সভ্য জাতিদের মধ্যে 'বিবাহ'-অনুষ্ঠান। স্বামী-স্ত্রীর এই সম্মিলন যত গাঢ় ও যত দৃঢ় হইবে, ততই গৃহের মঙ্গল এবং গৃহের মঙ্গলেই প্রত্যক্ষভাবে সন্তানের এবং পরোক্ষভাবে সমাজের মঙ্গল। হিন্দুর পক্ষে এই সম্মিলিত স্ত্রীপুরুষই সমাজের unit অর্থাৎ একক। বিবাহমন্ত্রে

"যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

এই যে স্ত্রীর স্বীকৃতিবাক্য, ইহা শুধু বিবাহকার্য্যটা কোন প্রকারে সমাধা করিবার জন্য একটা কৌশলাত্মক স্তুতিবাক্য নহে; ইহা আজীবন উভয় হৃদয়ের একীকরণ-কারবার উপদেশ। গার্হস্থ্যধর্ম্মের মূল কথাও ঐ, অর্থাৎ দুই হৃদয় এক করিয়া গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতে হইবে।

গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সতীত্ব-ধর্ম্ম বা দাম্পত্য-প্রেমই সকল প্রকার প্রেমের মূল। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি প্রথমে গৃহে অঙ্কুরিত হয়; এবং ক্রমে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ব-সমাজ ও স্ব-দেশ আলিঙ্গন করিয়া অবশেষে জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। এই দাম্পত্য প্রেমের উৎকর্ষেই সন্তানের উৎকর্ষ ও গৃহের উৎকর্ষ। সুতরাং সমাজের উৎকর্ষের মূলও উহাই। এই প্রেম নষ্ট কর, দেখিবে গৃহ থাকিবে না—সব ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। গৃহ না থাকিলে, সমাজ কোথায় থাকে? কোন্ ইতিহাসাতীত যুগে যে দিন মানুষ গৃহ বাঁধিয়া তাহাতে গৃহিণী স্থাপনা করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া মানবহৃদয়ের এই প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হয়। তারপর, যুগযুগান্তরের লালনপালনে বদ্ধমূল ও বর্দ্ধিত হইয়া এবং শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া নানাভাবে ও নানা আকারে উহা এখন সমাজব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহ বলো, ভক্তি বলো, প্রীতি বলো, মৈত্রী বলো—সকল সামাজিক ধর্ম্মের মূলই ঐ। গৃহে ইহার জন্ম, সমাজে ইহার ব্যাপ্তি এবং পরিশেষে পরম প্রেমময়ের পাদমূলে ইহার চরম পরিসমাপ্তি। যে বিশ্বপ্রেম পূর্ণ মানবতার আদর্শ, গার্হস্থ্যধর্ম্মেই তাহার দীক্ষা, সমাজধর্ম্মেই তাহার সাধনা এবং দেবত্বলাভেই তাহার সিদ্ধি। তাই বলিয়াছি —complete living বা পূর্ণ মানবতাসাধনের অনুকূল ক্ষেত্র আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত গার্হস্থ্যাশ্রম।

হিন্দু নারীর শিক্ষা, সাধনা ও স্বাধীনতা—সবই এই গার্হস্থ্যাশ্রমের অনুকূল হওয়া চাই। এবং তাহা তখনই সম্ভব, যখন স্ত্রীর কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্র হইবে মাতৃত্ব। মাতৃত্বকে গার্হস্থ্যধর্ম্মসাধনার কেন্দ্র করিলে স্বতঃসিদ্ধভাবে পত্নীকে পত্যনুসারিণী হইতে হইবে—বাধ্য হইয়া নহে, স্বেচ্ছায়। এই পত্যনুসারিণী মনোবৃত্তিই গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুকূল। ইহার অন্যথায় অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারে গার্হস্থ্যধর্ম্ম বিধ্বস্ত হয়। যাঁহারা পাশ্চাত্যদেশের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের কাছে এ কথা অবিদিত নহে। তবু কিন্তু স্ত্রীশিক্ষায় ও স্ত্রীস্বাধীনতায় পাশ্চাত্যের অনুকরণই এদেশে উদ্যম সহকারে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফল যাহা হইবে, তাহা অনুমেয়। ফলের কিছু কিছু নিদর্শন

যাঁহারা চক্ষুষ্মান, তাঁহারা এখনই না দেখিতেছেন এমন নয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন—Beware—সাবধান—ও পথে যাইও না। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতাকে মাতৃত্ব-মুখিনী কর। স্ত্রীশিক্ষাকে পূর্ণমাত্রায় গার্হস্থ্যধর্ম্মানুসারিণী কর, আর স্ত্রীস্বাধীনতাকে পত্যনুসারিণী কর। ঐরূপ স্বাধীনতায় অবরোধক্লেশ বিদূরিত হইবে, অথচ মাতৃত্ব-বোধ ক্ষুণ্ণ হইবে না।

গার্হস্থ্যধর্ম্মে কি স্ত্রী, কি পুরুষ কাহারই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থান নাই। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া উভয়ের যতখানি স্বাধীনতা গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুকূল, তাহাই মঙ্গল-কর। বলা বাহুল্য, গার্হস্থ্যধর্ম্মে পুরুষের স্বাধীনতাও অবাধ নহে—তাহাও পিতৃত্বের (তথা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের) অনুকূল হওয়া চাই। গৃহস্বামী ও গৃহিণী, উভয়েরই এই একই লক্ষ্য থাকিলে, দাম্পত্য প্রেমের প্রভাবে পরস্পর পরস্পরের অধীন, এ মনোভাব বিদূরিত হইয়া উভয়ের কার্য্য উভয়ের প্রীতি অর্জ্জনই করিয়া থাকে। তখন আর "স্বাতন্ত্র্য" নাই বলিয়া মনঃক্ষোভ থাকে না। বরং গার্হস্থ্য মঙ্গলের দিকে উভয়ের লক্ষ্য থাকিলে স্বামীতন্ত্রতাকেই স্ত্রী সৌভাগ্য জ্ঞান করেন। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" মনুর এই আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বচনটী পাশ্চাত্য মতে আপত্তিজনক;—কারণ, পাশ্চাত্য মতে স্ত্রীও যেমন এক "ব্যক্তি", স্বামীও তেমনই এক "ব্যক্তি"। সুতরাং এ অবস্থায় কেহ কাহারও অধীন হওয়া মনুষ্যত্বের বিরোধী বলিয়া ভাবাই স্বাভাবিক। হিন্দুর গার্হস্থ্য ধর্ম্মে স্বামী ও স্ত্রী মিলিতভাবে সমাজের এক ব্যক্তি; সুতরাং তাহা অবিভাজ্য—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য-মর্হতি"। উভয়ের স্বীয় স্বীয় "স্বাতন্ত্র্য" ধর্ম্মের প্রতিকূল। যে সমাজেই গার্হস্থ্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর "স্বাতন্ত্র্য", সেই খানেই তাঁহারা নামে মাত্র গৃহী ও গৃহিণী,—কার্য্যে নহে। পাশ্চাত্য দেশে এখন স্বামী-স্ত্রীর এই ব্যক্তিগত ভাবের প্রভাব এবং পাশ্চাত্যদেশের নব্য সাহিত্যও এই ভাবের পোষকতা করিতেছে। গৃহস্থধর্ম্মের দিক্ দিয়া স্বামী ও স্ত্রীকে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি ভাবিলেই তাহার ফল গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নাশ। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ও আধুনিক ধর্ম্মবিবর্জ্জিত শিক্ষার প্রভাবে স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত এই স্বাতন্ত্র্যের ভাব এদেশেও দেখা যাইতেছে এবং তাহার ফল সুমধুর বলিয়াও বোধ হইতেছে না। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—হিন্দুনারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতাকে মাতৃত্বমুখিনী কর। ক্ষিতীন্দ্রনাথ যে হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে সবিশেষ ভক্তিমান্, এ গ্রন্থের পত্রে পত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রে যেখানে দ্বিবিধ পন্থা উল্লিখিত, সেখানে তিনি যে পন্থা উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুকূল, তাহা গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছেন। কালধর্ম্মে এখন কন্যার বিবাহ পরিণত বয়সে হইতেছে এবং হইবে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, মন্বাদি শাস্ত্রও তাহার বিরোধী নয়। যুগধর্ম্মের প্রতিকূলে "অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী" এই বিধান এখন আর কেহই মানিবে না। এখন শিক্ষিতেরা বুঝিয়াছেন যে, পরিণত বয়সে বিবাহে বিধবার সংখ্যা হ্রাস, জননী ও সন্তান উভয়ের মঙ্গল ইত্যাদি নানা বিষয়ে শুভকর। এবং যদি পরিণত বয়সে বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধও না হয়, তাহা হইলে এ যুগে তাহাই বিধেয়।

গ্রন্থকার উপসংহার করিয়াছেন, "বেদ অবধি তন্ত্র-পুরাণ পর্য্যন্ত কোন প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থেই স্ত্রীলোকের বেদাদি পঠন-পাঠন বিষয়ক নিষেধ-বিধি নাই। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী এবং পাশ্চাত্য স্বাধীনতা মাতৃত্বের আদর্শরক্ষার পক্ষে, সুতরাং ভারতের হিন্দুরমণীর পক্ষে, সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তৃতীয়তঃ, মাতৃত্বকেন্দ্রক স্ত্রীশিক্ষা ও বৈদিক কালের স্ত্রীস্বাধীনতা অথবা প্রকৃত অবরোধপ্রথাবিষয়ক শাস্ত্রানুশাসন ও শাস্ত্রসমর্থিত সামাজিক আচার-ব্যবহার নিষ্কলঙ্ক সতীত্বরক্ষার পক্ষে সুতরাং হিন্দুরমণীর সম্পূর্ণ উপযোগী।"

গ্রন্থকার হিন্দুর এই মহাসঙ্কটকাল সমুপস্থিত বুঝিয়া আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রের উপদেশ বিবৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক হিন্দুর পক্ষে মহা সমস্যা উপস্থিত। সকল দিক্ দিয়া হিন্দুর সমাজ, আচার, ব্যবহার—এক কথায় হিন্দুর ধর্ম্ম (culture) ধ্বংসমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এ সমস্যা এখন মরণ-বাঁচনের সমস্যা। হিন্দু culture হারাইয়া বাঁচা অপেক্ষা হিন্দুর পক্ষে মরণই শ্রেয়ঃ। শাস্ত্রের উপদেশ—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" আর যদি বাঁচিতেই হয়, তাহা হইলে হিন্দুভাবে উপস্থিত অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নতুবা পরিবর্ত্তনের বিরোধী দুই-চারিটা শ্লোক উচ্চারণে এ ভীষণ স্রোত নিবারিত হইবে না। রক্ষণশীলেরাও জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এ স্রোতে ঠিক আত্ম-রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। ভগবদ্বাণী আছে সত্য—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে কমঠবৃত্তি অবলম্বনে যুগের পর যুগ কাটাইয়া দেওয়া সজীবতার লক্ষণ নহে। আর্য্যধর্ম্ম সনাতন হইলেও, তাহা পালন না করিয়াও হিন্দুজাতি সনাতন, মরণের অতীত, এই ভাবিয়া বসিয়া থাকা শাস্ত্রসঙ্গত কি না বলিতে পারি না; কিন্তু যুক্তি-সঙ্গত নয় বলিয়াই বোধ হয়। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু-জাতির হিতকামী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে যতই আলোচনা করেন, ততই মঙ্গল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অনেক

ভাবিয়াছেন ও গবেষণা করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদার্হ। আরও দশ জন এ বিষয়ে চিন্তা করুন, গন্তব্য পথের নির্দ্দেশ করুন, ইহাই আমার কামনা।

নানা কথা।

মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমকথা—সংবাদপত্রে দেখি, মহাত্মা গান্ধী বলেন যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রম "উদ্যোগ মন্দিরে" ঠিক তাঁহার মনের মত কাজকর্ম্ম চলিতেছে না এবং তাহার অন্যতর দৃষ্টান্তস্বরূপে তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীর কয়েক মুদ্রা আশ্রমনিয়মের বিরুদ্ধে নিজের নিকট সঞ্চিত রাখিবার কথা তাঁহার নিজের সংবাদপত্রের সাহায্যে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়া পত্নীর নামে চৌর্য্যাপবাদ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অপর সাধারণ কোন ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করিলে আমরা তাহাকে শত ধিক্কার দিতাম। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী, যাঁহাকে ইউরোপ আমেরিকা বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তিনি যখন নিজের স্ত্রীর নামে ঐরূপ নিন্দা ঘোষণা করিতেছেন, তখন সে বিষয়ে আমাদের মত ক্ষীণবুদ্ধি সাধারণ ব্যক্তির কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু তথাপি আমাদের মনে যে দুই চারি কথা উদিত হইয়েছে তাহাও তো না বলিয়া পারি না। প্রথম কথা আমাদের মনে হয় এই যে, বিচারালয়ের নিয়ম এই যে, কাহাকেও বিচারার্থ উপস্থিত করিলে আসামীকে নিজের দোষক্ষালনের জন্য অবসর ও সুযোগ দেওয়া হয়। যেস্থলে সেরূপ সুযোগ না দিয়া দণ্ড দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে বিচার বিচার নহে, বিচারের প্রহসন মাত্র। মহাত্মা গান্ধীর কর্ত্তব্য ছিল, তাঁহার পত্নীকে আত্মদোষ ক্ষালনের অবসর দেওয়া। তিনি যখন পত্নীর নামে চোর অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, এবং সেকথা সাধারণ্যে ঘোষণা করিতেও বিরত হন নাই, তখন তাঁহার পত্নীকে এবিষয়ের কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাও প্রকাশ করা উচিত ছিল। তবেই আমরা ধর্ম্ম রক্ষিত হইল বলিতে পারিতাম। কিন্তু তিনি যখন এবিষয়ে তাঁহার পত্নীর কৈফিয়ৎ লয়েন নাই মনে হইতেছে, লইয়া থাকিলেও সাধারণ্যে প্রকাশ করেন নাই, অথবা তাঁহার কোপের নিকট পত্নী কুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছেন বা স্বামীর উপর কোনও কথা না কহিবার হিন্দুমহিলার অধিকারের কারণে হয় তো কৈফিয়ৎ দেন নাই, তখন আমরা শতবার বলিব, মহাত্মা গান্ধীর উচিত ছিল, তাঁহার পত্নীর ভ্রম হইয়া থাকিলে ভ্রম বুঝাইয়া দেওয়া এবং আশ্রমের প্রাপ্য কোন টাকা নিজের কাছে রাখিয়া থাকিলে তাহা ফেরত দেওয়ানো। কিন্তু পত্নীর একটী কার্য্যকে চৌর্য্য নাম দিয়া তাঁহাকে অতি হেয় করিয়া দেখা এবং জগতকে হেয়রূপে দেখিতে শিক্ষা দেওয়া আমরা অত্যন্ত অন্যায় মনে করি—ইহাকে আমরা কিছুতেই ধর্ম্মানুগত বলিতে পারি না।

রামমোহন স্মৃতিস্তম্ভ—বিলাতের ব্রিষ্টল সহরে রামমোহন রায়ের যে স্মৃতিস্তম্ভ আছে, তাহা ধ্বংসের মুখে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই পাঠকদিগকে জানাইয়াছি। বিলাতপ্রবাসী যে সকল ভারতবাসী ইহার মেরামতের জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্যের নিকট এই বিষয়ের আলোচনার জন্য প্রস্তাবটী উপস্থিত করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের কেহই রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজকে এই আলোচনায় অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। গ্রহণ করুন বা নাই করুন, আমাদের প্রিয় রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিস্তম্ভ মেরামত হইলে এবং তজ্জন্য একটা স্থায়ী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমরা বড়ই সুখী হই। সংবাদপত্রে দেখি, মেরামত করিতে প্রায় ৫০০০৲ টাকা এবং স্থায়ী ভাণ্ডারের জন্য প্রায় ১০০০০৲ টাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দিয়াছেন—

স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫০৲; মিঃ অশোক মোহন বসু ৫০৲; ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ২৫৲; মিঃ নির্ম্মলেন্দু রায় ও মিঃ রাজেন্দ্রনাথ রায়; (শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের মারফতে) ২৫৲; মিসেস্ এস এম বসু ২০৲; মিসেস্ ডি এন রায় ২০৲; মিঃ অশোক চাটার্জ্জির সংগৃহীত ২০৲; শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৲; মিঃ এস্ এন্ মল্লিক (প্রথম কিস্তীতে) ১০৲; মিঃ নিশীথচন্দ্র সেন ১০৲; মিসেস্ কিরণ বসু ১০৲; মিস্ হেমপ্রভা বসু ১০৲; শ্রীযুক্তা মাধুরী মহলানবীশের সংগৃহীত ১০৲; লেডী জি, এম, সিংহ ১০৲; মিঃ এস্ এন্ রায় আই সি এস্ (দিল্লী) ৫০৲; মিঃ সুরেন্দ্রমোহন বসু (প্রথম কিস্তীতে) ৫০৲; মিঃ এ সি সেন ৫০৲; রায় প্রমথনাথ বাহাদুর ৪০৲; মিঃ এস এম বসু ২৫৲; মিঃ শিশিরকুমার দত্ত ২৫৲; মিঃ শিশিরকুমার মল্লিক ২৫৲; শ্রীযুক্তা আশালতা মজুমদার ১০৲; মিসেস্ এ পি ঘোষ (প্রথম কিস্তীতে) ১০৲; মিসেস্ বিজয়চন্দ্র বসু ১০৲; মিঃ মনরোহিত ঘোষ ১০৲; মিঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস ১০৲; মিসেস্ বি এন চৌধুরী ৪৲; মিঃ এম এল সরকার ১৲; জনৈক অজ্ঞাতনামা ১৲; মোট ৩২০৬৲ টাকা।

যিনি এই কার্য্যের জন্য যাহা কিছু দান করিবেন তাহা শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে এবং যথাস্থানে প্রেরিত হইবে। পত্রিকায় তাঁহাদের দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে।

"অধঃপাতের পথে"—আমরা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, বলিতে গেলে মহিলানৃত্য প্রভৃতির দুর্নীতিমূলক কার্য্যের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ই তাঁহার সঞ্জীবনীতে নির্ভীকহৃদয়ে আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করিয়াও ক্রমাগত প্রতিবাদ করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাইতেছি। আমরা দুই একজন নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মমহিলাকে প্রতিবন্দিতাসত্ত্বেও মহিলানৃত্য সমর্থন করিতে শুনিয়াছি। হায় রে ব্রাহ্মমনোভাব! সম্প্রতি সঞ্জীবনী Greer Parkএ মহিলাদিগের জন্য মহিলা কর্ত্তৃক মূক অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন; আমরাও এই প্রতিবাদ সমর্থন করি, কারণ ইহা thin end of the wedge। এক পা সরিলেই বহিনৃত্যে পড়িতে হয়। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কি ভাবিয়া দেখিতেছেন যে এই সকল কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে কিরূপ পর্ব্বতসমান বিঘ্ন আনয়ন করিতেছে এবং ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠানসমস্যা কিরূপ অন্যায় প্রণালীতে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে? মহিলানৃত্য প্রভৃতি ভাল কি মন্দ, তাহার acid test আমরা মনে করি যে সেই সকলের অনুষ্ঠাতা তাঁহাদের মাতাদিগকে ষ্টেজে নামাইয়া নাচাইতে সম্মত আছেন কি না? মহিলানৃত্যের অনুষ্ঠাতাগণ অনেক সময়ে বলেন যে, যেমন ব্রহ্মসঙ্গীতের দ্বারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্গীতের প্রতি অশ্রদ্ধা বিদূরিত হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহারা ভদ্রমহিলাদের নৃত্যের সাহায্যে নৃত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা দূর করিবেন। বলিতে ইচ্ছা হয়—হায় রে হায়—কিসের সঙ্গে কি! নৃত্যের মূল নীতিই হইল দেহ সম্বন্ধ লইয়া—যতই চেষ্টা কর, নৃত্য হইতে এই সম্বন্ধ অপসারিত কিছুতেই দূর করা যাইতে পারে না, সুতরাং ইহা হইতে দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতিসাধক দুর্নীতির সম্ভাবনা অতিক্রম করাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে।

হিন্দুসমাজ সম্মিলন—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে হিন্দুসমাজ সম্মিলন সম্পর্কিত প্রদর্শনী খোলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে যতই মেলামেশা হইবে ততই সুখের বিষয়।

গ্রন্থ-পরিচয়।

বিলাত ভ্রমণ—শ্রীঅজয়কুমার নন্দী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅতুলচন্দ্র নন্দী, মাতৃমন্দির-কার্য্যালয়, ২০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র। সবুজ কাপড় ও সোনালি অক্ষরে সুন্দর বাঁধা, ডবলক্রাউন ৩০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

এই গ্রন্থটী হাতে পাইয়া মনে করিয়াছিলাম যে বিলাতের কথা তো জানাই আছে, এই গ্রন্থে নূতন এমন কি কথা লিখিত থাকিবে, যাহা আমরা পড়ি নাই বা শুনি নাই? যাই হোক গ্রন্থকার যখন সমালোচনার জন্য দিয়াছেন, তখন ভাবিলাম, একবার অন্ততঃ চক্ষু বুলাইয়া গ্রন্থখানি দেখা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া রাত্রিশেষে ভোর ৪টায় আরম্ভ করিয়া ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে পাঠ সমাপ্ত করিয়া উঠিলাম। গ্রন্থটী বড়ই ভাল লাগিয়াছে—বাহিরের আকার প্রকারও যেমন ভাল, ভিতরের লিখিবার বিষয় ও প্রণালীও তেমনি সুন্দর। গ্রন্থের সুন্দর ভূমিকা লিখিয়াছেন আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ভূমিকাতে তিনি গ্রন্থকারের এই বিলাতভ্রমণকে "বাঙ্গালীর ছেলের বিশেষ-রকম জয়যাত্রা" বলিয়াছেন। কারণ, গ্রন্থকার বিলাত হইতে প্রথম যাত্রাতেই প্রায় কুড়ি হাজার টাকা আদায় করিয়া দেশে আনিয়াছেন। পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ, ইউরোপে বঙ্গমহিলা প্রভৃতি অনেকেরই বিলাতভ্রমণ পড়িয়াছি, কিন্তু সেগুলির কোনটাই একজন প্রকৃত কর্ম্মীর লিখিত নহে; সেগুলি সাহিত্যিক কর্ত্তৃক sentimental দৃষ্টিতে লিখিত। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রত্যেক ঘটনা কর্ম্মীর practical দৃষ্টিতে দেখিয়া লিখিত। কাজেই ইহাতে বক্তৃতা কম, কিন্তু কাজের কথা অনেক আছে। আচার্য্য রায় ভূমিকাতে বলিয়াছেন "দেশের হাওয়া ফিরেছে এরকম বইয়ের আদর হবে"। আমাদের সন্দেহ আছে, কিন্তু আমরাও তাঁহার সঙ্গে একপ্রাণে আশা করি যে "দেশের হাওয়া ফিরুক, এরকম বইয়ের আদর হউক"।

পত্রিকাপরিচয়।

প্রকৃতি—শীতসংখ্যা—১৩৩৫—মুখপত্রেই অধ্যাপক ডাক্তার হান্‌স্ মলীশএর সুন্দর প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইনি বর্ত্তমানে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। উপযুক্ত সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয়ের হস্তে বাংলা ভাষায় ইহা বিজ্ঞানবিষয়ক standard পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের খুবই সুলক্ষণ যে, ডাঃ শ্রীসহায়রাম বসুর ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ বৃক্ষের উপর হীরাকষ প্রভৃতি দ্রব্যের ইন্‌জেকশন করিয়া ফল পরীক্ষা করিতেছেন এবং তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ইনজেকশন শব্দের বানান

সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ইংরাজীতে যেখানে "tion" থাকে, তাহার বাংলায় প্রতিলিপি করিতে গেলে "শন" —শ কারযুক্ত করিলে বোধ হয় ভাল হয়। "sh"এর স্থলে "ষ" করাই সঙ্গত বোধ হয়। "ইনজেকশন" শব্দের প্রতিশব্দ লেখক "অন্তর্নিক্ষেপ" করিয়াছেন। "অন্তর্বেশ" করিলে কিরূপ হয়?—"অন্তর্বিষ্ট" শব্দের বিশেষ্য ব্যবহার করিলে ভাল মনে হয়।

"তারাপরিচয়" প্রবন্ধ—দুঃখের বিষয় এটী বিশেষজ্ঞের পক্ষে উপযোগী হইলেও আমার মত জ্যোতিবিদ্যায় অজ্ঞের পক্ষে বিশেষ দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। কি ভাবে এই সকল প্রবন্ধ লিখিত হইলে সুবোধ্য হইবে, তাহারও ইঙ্গিত করা বড়ই কঠিন। কিন্তু সুবোধ্য করিয়া লিখিলে ভাল হয় এইটুকু বলিতে পারি। প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত "তারাপুঞ্জের বিবরণ" এবং "বৈদিক প্রসঙ্গ" অপেক্ষাকৃত interesting হইয়াছে, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও interesting করিয়া লিখিলে তবে সাধারণ লোকে তাহা পাঠ করিয়া আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানলাভ করিবে।

"কালিদাসের বৃক্ষলতা"র ২য় পর্য্যায় চলিতেছে। নামেতেই বক্তব্য সুস্পষ্ট। "ক"এর ঘর চলিতেছে। শেষ হইলে এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে একটী বহুমূল্য গ্রন্থ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বৃক্ষের ফুল পাতা বা শিকড় ইত্যাদির কবিরাজী এবং পাশ্চাত্য অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি মতে গুণাগুণ দিলে প্রবন্ধের উপকারিতা বৃদ্ধি পাইবে।

"রক্তের কথা" প্রবন্ধটি লেখক যথাসাধ্য সুস্পষ্ট করিয়া লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন—তবু অনেক বিষয় বাংলায় ভালরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হন নাই। ইহা লেখকের দোষে নহে, কিন্তু বাংলা ভাষা বিজ্ঞানে, বিশেষত আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া। বাঙ্গালী যদি বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে চান, তবে কতকগুলি অশ্লীল নাটকনবেল পড়িয়া সময়ের অপব্যবহার করিয়া, দেহের বল, মনের বীর্য্য ও আত্মার তেজের বৃথা ক্ষয়সাধন করিলে চলিবে না। শিক্ষিত সমাজের সমবেত চেষ্টায় বিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষা স্থির করিতে হইবে এবং সেই পরিভাষার সাহায্যে ভাল ভাল গ্রন্থ সকলের মর্ম্ম বা অনুবাদ প্রকাশ করিতে হইবে। নচেৎ কথায় কথায় বলা সহজ হইবে যে, বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া বিদ্যালয়ে সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু উপায় অভাবে যে তাহা অসম্ভব হইবে। এ বিষয়ে আমাদের জাপান প্রভৃতি দেশের অনুকরণ ও অনুসরণ করা উচিত।

"মাছের কথা" প্রবন্ধ—সুন্দর ও সহজবোধ্য।

"আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা"—উপযুক্ত ব্যক্তি এই পরিভাষা সংগ্রহে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু একটা suggestion করিতে চাই—সংস্কৃত শব্দগুলি কোন্ গ্রন্থে আছে, তাহার উল্লেখ করিলে—(যথা, ভাবপ্রকাশ হইতে হইলে ভা॰ প্র॰) শব্দগুলি অধিকতর প্রামাণিক হয়—কোনও দ্বন্দ্ব থাকে না।

"সজীব আলোক" প্রবন্ধটী অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানশ মণীশের ইংরাজী হইতে অনুবাদ। সুলিখিত। বৃক্ষপত্র ও প্রাণীগণের শরীর প্রভৃতি হইতে আলোক দেখা যায়, তাহারই বিষয়ে এই প্রবন্ধ। সম্পাদক মহাশয় যদি আধুনিকতম বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন, তবে উহা দ্বারা দেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইবে।

উপসংহারে আমরা "প্রকৃতি"র দীর্ঘজীবন কামনা করি। ইহার প্রত্যেক প্রবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ—কোন্‌টীকে ছাড়িয়া কোন্‌টীকে প্রশংসা করিব বলা বড় কঠিন।

সঞ্জীবনী—৪৭ বৎসরে পড়িয়াছে। নিজের শুভবুদ্ধি ও জ্ঞানমতে সর্ব্ববিধ পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে অদ্বিতীয়। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, ভগবানের বিজয়পতাকাবহনে সঞ্জীবনী চিরকাল এইরূপ নির্ভীকহৃদয়ে অগ্রসর হউক।

ব্রহ্মবিদ্যা—ফাল্গুন ১৩৩৫—প্রথমেই শ্রীদ্বারকানাথ দেবের "সাধন সোপান" বিষয়ক পয়ার ছন্দে ১২ পৃষ্ঠা ব্যাপী কবিতা। কবিতাকারে কঠিন বিষয়সকল বোধগম্য করাইবার চেষ্টার সময় বহুকাল হইল অতীত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—গুরু ও শিষ্য (শ্রীশ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিপরিচয়)—লেখক লিখিতেছেন—"ব্রহ্মা তাঁহার চারি পুত্র সনৎকুমার, সনক, সনাতন ও সনন্দকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন"—এবিষয়ে আমরা না হয় তথাস্তু বলিয়া মানিয়া লইলাম। কিন্তু তাহার পরে বলিতেছেন—"ইহারা এক্ষণে জনলোকে অবস্থান করত আমাদের এই জগতে আধ্যাত্মবিদ্যা পরিচালনা করিতেছেন।" মন সহজেই জিজ্ঞাসা করে—প্রমাণ? যদি বল, শাস্ত্রে আছে, মন জিজ্ঞাসা করে তাহার প্রমাণ? যদি কেহ আমাকে শাস্ত্রের বা গুরুবাক্যের দোহাই দিয়া "সোনার পাথরবাটীতে" বিশ্বাস করিতে বলেন, তবে আমাকে তাহা কি বিশ্বাস করিতে হইবে? ধরিয়া লইলাম, সনৎকুমার প্রভৃতি আধ্যাত্মবিদ্যা পরিচালনা করিতেছেন—তাহাতে এল গেল কি, বুঝিতে পারি না। তাহার পর আমাদের মত স্বল্পধারণার লোক Fourth Round, Root Race, venus chain প্রভৃতি high sounding phrasesএর ধারেও যাইতে পারি না—এ অক্ষমতা স্বীকার করিতেছি। লেখক যে কেতাব reference দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াও আমি যে তিমিরে ছিলাম,

সেই তিমিরেই আছি। লেখক বলিতেছেন—বিশুখৃষ্ট শ্রীমৎ কৃষ্ণমূর্ত্তির দেহ অবলম্বন করিয়া লোকশিক্ষা দিতেছেন এবং পরে স্বশরীরে আবির্ভূত হইবেন। এই বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানে সমুজ্জ্বল বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এসকল কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কি সত্যই মনে করেন যে সকলে এই সকল কথা বিনা বাক্যব্যয়ে গলাধঃকরণ করিবে আর সহজে পরিপাক করিবে? আমরা তো তাহা করিতে পারি না—প্রমাণাভাবাৎ—কোনও প্রকার প্রমাণ বা লক্ষণ উহার স্বপক্ষে দেখি না। একটা বিষয় কি লেখক ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, এই সকল কথা প্রচারের ফলে মানবের বিশেষত এদেশবাসীর অন্তরে মানসিক পরাধীনতার কত বড় পাষাণভার চাপাইবার চেষ্টা হইতেছে? মানসিক পরাধীনতার ভারে অবনত হইয়া পড়িলে মানুষের পক্ষে কোনও প্রকার স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব হইবে। লেখক কি তাহাই চান?

তৃতীয় প্রবন্ধ শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্টের জীবনীর অষ্টম অধ্যায়। তাহাতে বলা হইয়াছে "কৃষ্ণমূর্ত্তি মেসায়া বা ত্রাণকর্ত্তা নহেন:—কৃষ্ণমূর্ত্তি সর্ব্বস্বত্যাগী পুরুষ"। তিনি সিনেমা কোম্পানীর সপ্তাহে দুই হাজার টাকার offer প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার temperamentএর সঙ্গে মিল হয় নাই বলিয়া তিনি সিনেমা কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করেন নাই। কৃষ্ণমূর্ত্তি স্বয়ং বলিতেছেন—"আমার স্নেহময়ী জননীর আদর্শে নিজ জীবন গঠন করিয়া জীবন ধারণ করিতে আমি মনস্থ করিয়াছিলাম, এবং আমি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইতে চাহিয়াছিলাম। পরবর্ত্তীকালে ডাক্তার বেসাণ্ট এবং অন্যান্যেরা আমার সামনে জগদ্‌গুরুর অপর এক আদর্শ প্রদর্শন করাইলেন। আমি এই আদর্শ উপলব্ধি করিতে যত্নপরায়ণ হইয়াছি। ইহা ত খুব স্বাভাবিক কথা। যিনি উক্ত আদর্শ উপলব্ধি করিতেই যত্নবান, জোর করিয়া তাঁহার দেহকে "ত্রাণকর্ত্তারূপে জগদ্‌গুরুর আবির্ভাবের অবলম্বন" বলা বুদ্ধিজীবী স্বাধীনতাকামী ও স্বাধীনতাপ্রাণ মানবের উপযুক্ত নহে নিঃসন্দেহ। সময়ে সময়ে "আরাধ্যদেবের সহিত একত্ববোধ" করিলেই যে তাঁহাকে অভ্রান্ত জগৎগুরু ভগবানের আসনে বসাইতে হইবে, একথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। এই প্রকার অন্ধ বিশ্বাস করিবার উপদেশ দিয়া ভারতকে পরাধীনতার পথে কি প্রকার লইয়া যাওয়া হইতেছে, বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই তাহা উপলব্ধি করিবেন। এখন আমাদের প্রশ্ন এই যে প্রকৃত জগৎগুরু কে? জগৎগুরু যিনি হবেন, তিনি স্থান কাল ও অবস্থানিরপেক্ষ জগৎগুরু হবেন। যখন Bishop Leadbeater বলিতেছেন (এবং সেই কথাই যদি আমাদের বিশ্বাস করিতে হয়) যে তিনি (Bishop) শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়াছেন, তবে তিনিই বা অভ্রান্ত জগৎগুরু না হবেন কেন? তার পর লেখক একস্থলে বলিতেছেন যে, 'ডাক্তার অ্যানি বেসান্ত যোগসাধনায় বিশপ অপেক্ষা কখনই ন্যূন নন, বরং কোন কোন অংশে তিনি অধিকতর উন্নত; তবে কি অ্যানি বেসাণ্টই অভ্রান্ত জগৎগুরু? সংশয়ে দোদুল্যমান আমাকে কে নির্ভুল উপদেশ দিবেন? অন্তরের ভগবান অকিঞ্চনগুরু ব্যতীত ন কোঽপি ন কোঽপি। আমাদের বিবেচনায় যে মানুষকে অভ্রান্ত জগদ্‌গুরুর আসন দেওয়া হয়, সেই মানুষকে অশ্রদ্ধা ও অপমান করা হয়—তাঁহার বুদ্ধির উপর আমাদের যে প্রকৃত আস্থা নাই, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

"বারাণসীধামে তত্ত্ববিদ্যা সমিতির ৫৩ তম বাৎসরিক মহাধিবেশনের বিবরণ পড়িলাম। ইংারও কেন্দ্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তিকে জগদ্‌গুরুরূপে extol করা। উহাতে তাঁহার সহিত অনেক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নোত্তর যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জগদ্‌গুরুর উপযুক্ত উত্তর দেখিলাম না। আমাদের মনে হয়, ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি প্রাচীন ধর্ম্মসমূহের মর্ম্মকথা বাহির করিবার যে ভাবে চেষ্টা করিতেন, সেই ভাবে তত্ত্ববিদ্যাসমিতির কার্য্য পরিচালিত হইলে ধর্ম্মজগতের অনেক নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

Navavidhan—May 7 & 14, 1929—ডাঃ এন্ ম্যাকনিকল ডি-লিট লিখিত একটি প্রবন্ধ Are All Religions Equally True" (সমস্ত ধর্ম্ম সমানভাবে সত্য কি না)? বাহির হইয়াছে। Equally (সমান ভাবে) শব্দের নীচে আমরা কসি দিয়েছি। দেখা যাক, প্রবন্ধটি কতদূর যুক্তিসহ। তিনি বলিতেছেন "ধর্ম্মমতে গভীর পার্থক্য সহ্য করিতে না পারিলে ভারতের উদ্ধারের আশা নাই।" "ধর্ম্মবিশ্বাসকে দুর্ব্বল করিলে (তাহা) সহ্য করা যায়, যাহা প্রার্থনীয় নহে" অথবা "যে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা আধ্যাত্ম রাজ্যে উন্নত স্থানে লইয়া যায়, সেই স্বাধীনতা স্বীকার করিলেও (তাহা) হইতে পারে"। এই মন্তব্যের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ নাই।

তিনি এই বিরোধ তাড়াইবার যে প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহারই সহিত আমাদের বিরোধ। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি হইলেও তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অবলম্বনে উহার প্রতিবাদে সাহসী হইতেছি। তিনি বলেন—"পার্থক্য সহ্য করা ঠিক এবং একান্ত কর্ত্তব্য, এইটি মনে বসাইতে গেলে এক পথ হইতেছে যে, সকল ধর্ম্ম সত্য, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা।" গোড়ায় এই যে

premises দাঁড় করাইলেন, ইহাই তো ভুল। আমাদের দেশে, সকল দেশেই এমন অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, যাহারা পরস্পরের মতগত গভীর পার্থক্য সহ্য করে, অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি সমদৃষ্টি হয়। ইহা অনুমান নহে, ইহা প্রত্যক্ষ। আমাদের দেশে গীতা এই ভাবেই সমদৃষ্টি হইবার উপদেশ দেন। সকল ধর্ম্ম সত্য হইলে গীতায় বিভিন্ন ধর্ম্মের সমালোচনা নিরর্থক হইত। ব্রাহ্মধর্ম্মও উদারতম বীজের উপর দাঁড়াইয়া সকল ধর্ম্মকেই সমদৃষ্টিতে ও উদারভাবে দেখিতে বলেন, কোনও ধর্ম্মকেই নিন্দা করা সমর্থন করেন না। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লেখক নিজের বক্তব্য সমর্থন করিতে চান। পরমহংসদেব বলেন—"সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরের অভিমুখে লইয়া যায়"। ইহা তো তাঁহার বহু পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ভারতবাসীর প্রাণের কথা—'নৃণামেকো গম্য স্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব'—সমুদ্রে যেমন সকল নদী পড়ে, সেইরূপ সকল মানুষেরই একমাত্র ভগবান গন্তব্যস্থল। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, পাপী তাপী সাধু অসাধু সকলেরই হৃদয়ে ভগবান মঙ্গলমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন এবং যথাযথ উপায়ে প্রত্যেককে নিজের অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন; একটি মানুষ, একটি জীব, একটি অণুপরমাণুও তাঁহার ত্যাজ্য নহে, পরিত্যক্ত নহে।

মহাত্মা গান্ধীর মত, যাহা লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা লেখকের বিরুদ্ধে আমাদিগকেই সম্পূর্ণ সমর্থন করে। তাঁহার সিদ্ধান্ত—"সকল ধর্ম্মই সত্য ছিল এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেই কিছু না কিছু ভুল ছিল • • • আমার ধর্ম্মে আমি থাকিলেও অন্য ধর্ম্মও আমার প্রিয়"। "আমি মন্দকে সহ্য করিব না"। লেখক নিজেই এই সকল উক্তির উপর মন্তব্য করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বাস এই যে "প্রত্যেক ধর্ম্মই ভাল ও মন্দে মিশ্রিত"। "তিনি বাস্তবিক বিশ্বাস করেন না যে, সকল ধর্ম্মই সমানভাবে সত্য"। ইহার উপর আমাদের টিপ্পনী অনাবশ্যক। অথচ লেখক গোড়াতে নিজের মূলকথা অর্থাৎ সকল ধর্ম্ম সমানভাবে সত্য এই মতের সমর্থকরূপে পরমহংসদেব, মহাত্মা গান্ধী এবং অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ, এই তিন জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। লেখক শেষোক্ত অধ্যাপকের মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন "হিন্দুধর্ম্ম ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল ভাবকেই সংঘটিত সত্য বা facts বলিয়া গ্রহণ করেন এবং সেগুলির ন্যূনাধিক অন্তর্নিহিত significance অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করেন"। এই উক্তিও লেখককে সমর্থন করে না। এই প্রবন্ধ এখনও চলিবে। যে অংশটুকু বাহির হইয়াছে, তাহার উপরেই আমাদের বক্তব্য বলিলাম। আসল কথা এই যে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ন্যায়ের ফাঁকির সাহায্যে যিনি যতই বলুন, "সকল ধর্ম্মই সমান সত্য". একথা কিছুতেই টিঁকিতে পারে না। তাহা যদি হইত, তবে আমরা এই সোজা কথা ভুলিয়া যাই কেন যে, অতি পুরাকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত এত ধর্ম্মসংস্কারের সম্ভাবনা কিছুতেই আসিতে পারিত না।

আর একটী প্রবন্ধ বিবেচনার যোগ্য—"ব্রাহ্ম স্ত্রীলোক এবং অভিনয়"। Statesman পত্রে H D.B. স্বাক্ষরিত এক পত্রে ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদিগের পেশাদার অভিনেত্রীদিগের ন্যায় টাকা লইয়া প্রকাশ্যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সমর্থিত হইয়াছে। সেই পত্র টিপ্পনীসহ প্রকাশিত হইয়াছে। টিপ্পনী হইতে বুঝিতে পারিলাম না যে নববিধান সমাজ প্রকাশ্যে অর্থের বিনিময়ে রঙ্গমঞ্চে সাধারণ অভিনেত্রীদিগের ন্যায় অভিনয় করা উচিত বলিয়া স্বীকার করেন কি না। এরূপ অভিনয় যে দুর্নীতির সহায়—দুর্নীতির পথে ইহা যে thin end of the wedge, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করেন ও করিবেন। জাগিয়া ঘুমাইলে যেমন ঘুম ভাঙ্গানো অসম্ভব, সেইরূপ কুফল জানিয়াও ঐ পথে কেহ চলিলে তাহাকে ফিরানো দুঃসাধ্য। ব্রাহ্মসমাজ যদি সন্তানগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করেন, তবে সবল ও দৃঢ়ভাবে এই রঙ্গমঞ্চে মহিলানৃত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। নারীনৃত্যের সাহায্যে সংগৃহীত অর্থও দৃঢ়চিত্তে পদাঘাতে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব—১৬ চৈত্র ১৩৩৫—"নববিধানে বিশ্বাস" প্রবন্ধে লেখক একদিকে বলিতেছেন—"প্রত্যেক ধর্ম্মই আংশিক ধর্ম্ম", পরক্ষণেই অপরদিকে বলিতেছেন—"কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মই • • • মানবমাত্রেরই গ্রহণীয়"। দুঃখের বিষয় গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন যুক্তি দেন নাই।

"উপার্জ্জন ও শিক্ষা"তে উক্ত হইয়াছে—ধর্ম্মবিধানে ভিক্ষাই শ্রেয়, উপার্জ্জন হেয়।" লেখক ভগবানের কৃপাভিক্ষার সঙ্গে অর্থাদি ভিক্ষাকেও যেন একটু জড়াইয়া ফেলিয়াছেন মনে হয়। ইহার সঙ্গে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" উপনিষদের এই সকল উক্তির যেন বিরোধ দৃষ্ট হয়। সংসারের দিক দিয়া ধরিলে এই প্রশ্ন আসে—সকলেই যদি ভিক্ষা করে, তবে ভিক্ষা দিবে কে? এইজন্য সকলের পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি আদর্শ ধরা যাইতে পারে না। শাস্ত্রেও এই কারণে সকল আশ্রমের আশ্রয় বলিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদত্ত হইয়াছে।

"চয়ন"এ কেশবচন্দ্রের একটী বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—বড় সুন্দর।

"প্রশ্নোত্তর ও প্রার্থনা"—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের Theistic Annual হইতে উদ্ধৃত। সময়ান্তরে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

"বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালার ধর্ম্ম"—শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। যে অংশটুকু বাহির হইয়াছে

সুন্দর লাগিল, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এরূপ প্রবন্ধ না পাইলে আলোচনার সুবিধা হয় না।

"নূতন বিধান বলি কেন?" প্রবন্ধটী লাগিল ভাল—ব্রাহ্মধর্ম্ম ভগবানের বিধান বলিয়াই লেখক ইহাকে নূতন বিধান বলিতে চান। আপত্তি কি? কিন্তু গোড়াতেই বলিয়াছেন যে, "প্রবন্ধটী ভক্তিভাজন প্রেরিতপ্রবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতার মর্ম্ম লইয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত"। এইখানে আপত্তি আছে। প্রতাপবাবুর বক্তৃতাটী পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত না করিয়া তদবলম্বনে নূতনভাবে নূতন প্রবন্ধ লিখিলেই ভাল হইত। আবশ্যক হইলে তাঁহার প্রবন্ধটী যেমনটী তেমনটী প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য।

—

শোক-সংবাদ।

৺বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়—আমাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখিকা ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দৌহিত্রী মাননীয়া শ্রীরত্নমালা দেবীর অন্যতর পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় গত ২৭শে চৈত্র তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও আত্মীয়স্বজনকে কাঁদাইয়া মিহিজামে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। বহুকাল যাবৎ তিনি পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এবং সহধর্ম্মিণী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে আমাদের অন্তরের গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি। মঙ্গলময় ভগবান পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে শোক-ভার বহন করিবার সামর্থ্য প্রদান করুন।

রুক্মিণী দেবী—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর তদানীন্তন শুভ স্বনামধন্য ৺গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের পত্নী উপযুক্ত পুত্রপৌত্রাদি রাখিয়া গত ১৯শে মার্চ্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় শতবর্ষ হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান পরলোকগত আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান করুন।

৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—বিষ্ণুপুরের অধিবাসী সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার রাত্রি দুই ঘটিকার সময় আপন বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। স্বনামধন্য সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনি জ্যেষ্ঠ সহোদর। শৈশব হইতেই পিতার নিকট শিক্ষা করিয়া সঙ্গীতবিদ্যায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া রামপ্রসন্ন নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রনাথ খাঁন বাহাদুরের সঙ্গীতাচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সঙ্গীতের আদি উৎসভূমি বিষ্ণুপুরে প্রাচ্য সঙ্গীতবিদ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া তিনি নাড়াজোল হইতে অবসর লইয়া স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের অনুরোধে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সঙ্গীতবিদ্যালয়টীর পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া উহার অশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। ইহাঁকে হারাইয়া দেশ কেবল যে একজন সুগায়ককে হারাইল, তাহা নহে—একজন সুবাদকের সেবা হইতেও বঞ্চিত হইল। আমরা ইহাঁর সুবৃহৎ পরিবার ও পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাঁর লোকান্তরিত আত্মার সুগতি বিধান করুন।

—

সংবাদ।

চিত্রকথা—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ মহাশয়ের সংগৃহীত বাঙ্গালার খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের জননীদের ফটো-চিত্র এবার আমরা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বার-এট-ল মহাশয়ের সৌজন্যে লাভ করিয়া আংশিক প্রকাশ করিলাম। বাকী অংশ এবং এবিষয়ে মন্মথবাবুর সুলিখিত প্রবন্ধটী আমরা আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করি।

অনাথ ব্রাহ্ম পরিবার ধনভাণ্ডার—ব্রাহ্মসমাজের বহুতর সমস্যারমধ্যে 'অনাথ ব্রাহ্ম পরিবার' একটী গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্য কিছুকাল হইল ঢাকায় একটী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত ধনভাণ্ডারে আশানুরূপ অর্থাগম হইতেছে না। সহৃদয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হইলে সুখী হইব। এই ধনভাণ্ডারে যিনি যাহা দিবেন তাহা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে সঙ্গে সঙ্গে যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

দীক্ষাগ্রহণ।—গত ১লা বৈশাখ রবিবার প্রাতঃকালে ৺হেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ যোগানন্দ সিংহ আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট সপত্নীক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মানুরাগী দম্পতিকে ভগবান জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির পথে নিত্য অগ্রসর করুন।

—

ভ্রমসংশোধন।

গত ফাল্গুন-সংখ্যা পত্রিকায় আত্মারী প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি গ্রাহক ও পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৮২	১	৩০	("আত্মারী"	("স্বামী
২৮২	২	৩৯	প্রধান	প্রথম
২৮৩	১	৬	বিন্যাসেনান্যতম	বিন্যাসেষন্যতম
২৮৩	১	৬	প্রযুক্তো হংসাদি	প্রযুক্তোহংশাদি

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ও ব্যয়।

১৮৫০ শক। ১৩৩৫ সাল।

আয়	৭১৬৯৫৩
পূর্ব্ব স্থিত	১০১।০
সমষ্টি	৭২৭০।৯
ব্যয়	৭২৪৩।/৯
স্থিত	২৬৸/০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিকদান	২২০০৲
আনুষ্ঠানিক	২২৲
উৎসব	১৩৲
হাওলাত	১১৫৸/০
হাওলাত আদায়	৪৯৲
গচ্ছিত আদায়	১৮৩০।৬
বণ্ডেড্ অয়ার হাউস	১১৫৲
সসপেন্স	৫৩০৲
বিবিধ	৶০
সমষ্টি	৪৮৭৫।/৬

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	২০২৲
হাল	১১০/০
বিজ্ঞাপন	১৯৫৲
মাশুল	২০॥/০
সাহায্য	১০৲
অগ্রিম	৮৲
নগদ	।০
সমষ্টি	৫৪৫৸/০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৬৬৬।০
তত্ত্ববোধিনী মুদ্রণ	৫৭০৲
সমাজের বক্তৃতা ইত্যাদি	৪৮৲
কাগজের মূল্য	১৬১।/৬
দপ্তরী	৮৯।০
বিবিধ	২৸০
ব্লকের মূল্য	২৫৸/৯
সমষ্টি	১৫৬৩৸৩

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	১২৬৶০
গচ্ছিত	৪৩।/০
কমিশন	৭৶০
মাশুল	৬৸/০
সমষ্টি	২৮৪৲
সর্ব্বসমষ্টি	৭১৬৯৫৩

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের পাথেয়	১২০৲
গায়ক	৩৪০৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৬০৲
হিসাবরক্ষক	১২০৲
বেহারা	১৪৪৲
মেথর	২৬।০
সাময়ী	১৪/৬
মাশুল	১১৶০
পাখাকুলি	৪৲
ইলেক্‌ট্রিক	৫০॥/০
পাখা মেরামত	১৫৲
কেরোসিন	৯৴৩
ট্যাক্স	২৭০॥/০
আলো মেরামত	২৸/০
হাওলাত শোধ	১১৫৸/০
হাওলাত প্রদান	৬২৲
ড্রেণ পরিষ্কার	৯৸০
মাঘোৎসব	৯৪॥৶৩
পূর্ত্তকার্য্য	৬৫॥/৬
সসপেনশোধ	১১৸০
সস্‌পেন্স	২১/০
গচ্ছিত	১৮৬৫৶০
বারবরদারী	২৪।৶৯
বিবিধ	৯৩॥৶৩
পার্ব্বণী	২।০
কাগজক্রয়	৭৩৴৩
মুদ্রাঙ্কণ	৩৯॥৶০
চৈত্রসংক্রান্তি	১০॥০
সমষ্টি	৩৭৫৬।/৬

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজের মূল্য	২৩৭/০
দপ্তরী	৫৫।/৬
মাশুল	৭৫।/০
মূল্য আদায়ের কমিশন	২৮৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৬০৲
হিসাবরক্ষক	১২০৲
বিজ্ঞাপনের কমিশন	১৩।০
প্রবন্ধ	২০৲
মুদ্রাঙ্কণ	৫৭০৲
বিবিধ	৩।/৯
সমষ্টি	১১৮২৸/৩

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	৩৩৩৶০
কম্পোজিটর	৫১৮৷৶৩
প্রেসম্যান	২৩৮৷৶০
ইঙ্কম্যান	১৪২৷৵৬
কাগজতোলা	৬৯৷৵০
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৬০৲
হিসাবরক্ষক	১২০৲
প্রুফকাগজ	৯/০
ছাপার কাগজ	১ ৯০৶০
জলপানী	২৸৶৬
কালি	১৪৶০
প্রেসের তৈল	৬৷৶
তামাক	৪৷৴৬
সাজিমাটী	২ ৸৬
রুলঢালা	৩৷৶৩
মাশুল	১৷৵০
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১২৩৸/৯
লেই জন্য ময়দা	১৸৶৩
দপ্তরী	৭৪৶০
বিবিধ	২৫ ৵৬
ব্লক তৈয়ারী	৫২৷৶০
শিরীষ	৪/০
ব্রাস	১৷৶৬
দড়ি	৸৬
লাইসেন্স	১৷২৲
বাতি	৷৶৬
অক্ষর	৭/৯
সমষ্টি	২০২০৸৶৯

পুস্তকালয়।

গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য	২৭৸০
কমিশন	২০৷৵৩
মাশুল	৯৸৶৬
বিবিধ	২৻৩
গীতার মূল্য	২২৷৻৩
দপ্তরী	২৲
পুস্তকক্রয়	৬৷৸০
সমষ্টি	৩০৩৶৩
সর্ব্বসমষ্টি	৭২৪৩/৯

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, তত্ত্বনিধি বিরচিত, বহু চিত্র শোভিত, স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই ; কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট, ৪১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸০ আনা। সুন্দর সবুজ কাপড়ের। প্রাপ্তিস্থান—আদিব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ৫৫, আপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

আর্য্য নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা কিরূপভাবে প্রদান করিলে তাঁহারা আদর্শ মাতৃত্বের অধিকারিণী হইয়া গৃহ শান্তি ও সুখের আদর্শনিকেতনে পরিণত করিতে পারেন, এই পুস্তকে তিনি তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তক পাঠে মনে হয়, বর্ত্তমানে শিক্ষা ও স্বাধীনতার নামে যে কঠোর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হইয়া নারীর স্বভাব-কোমল হৃদয়কে কঠোর করিয়া তুলিতেছে এবং পরিণামে তাহাকে সুজননী হইবার পক্ষে অনুপযোগী করিয়া তুলিতেছে, তিনি সেই শিক্ষা ও স্বাধীনতার একান্ত বিরোধী। তিনি সে বিষয়ে মহর্ষি মনুর সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া বলেন—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥'

বিশেষত বর্ত্তমানে আর্টের নামে যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ 'নারীনৃত্যে'র ব্যপদেশে সংক্রামক ব্যাধির মত সমাজের অঙ্গে অঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, তিনি সে বিষয়েও আমাদিগকে সতর্ক হইতে উপদেশ দিয়াছেন—সম্বন্ধে শিক্ষা অধ্যায়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনিও ইহুদি দার্শনিক স্পিনোজার মত নারীদের জন্য "Freedom in bondage" শ্রেণীর স্বাধীনতার পক্ষপাতী।

এই পুস্তকের দ্বারা সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইবে আশা করা যায়। ভাষা সহজ ও সরল।

সুবর্ণবণিক সমাচার ফাল্গুন ১৩৩৫।

গ্রন্থকার প্রাচীন শাস্ত্রের যুক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। :ইহাতে পাশ্চাত্যের বহুপ্রকার দুর্নীতির অনুসরণ হইতে নারীগণকে বিরত থাকিতে যুক্তিযুক্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীনতা অর্থে নারীর বাহিরের স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে গৃহের স্বাধীনতাকেই বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ডিগ্রী লওয়া বা প্রতিযোগিতার বিদ্যাকে আবশ্যক শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। গ্রন্থকার ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য হইয়াও হিন্দুর প্রাচীন রীতি নীতি গুলি সমর্থন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। এই গ্রন্থখানি ১৩০৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালার কিছুদিন পূর্ব্বেকার রীতিনীতি, বিশেষতঃ নারীগণের আচার পদ্ধতি, চলন-চরিত্র সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে স্থান পাওয়ায় গ্রন্থখানি বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছে।

মাতৃমন্দির মাঘ ১৩৩৫।

ভগবান মাতৃত্বে নারীপ্রকৃতির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং এই মাতৃত্বের সুপ্রকাশেই নারীত্ব। এই নারীত্বের সম্পূর্ণতার জন্য নারীদিগের শিক্ষার প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের নারীশিক্ষার উৎকর্ষ গ্রন্থকার বহু

উদাহরণ এবং শাস্ত্রীয় শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার নারীশিক্ষার পাশ্চাত্য আদর্শ আদৌ সমর্থন করেন না। অন্ধভাবে পরানুকরণে পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য প্রণালীমাত্রই যে পরিত্যাজ্য একথা মানিয়া লওয়া যায় কি? এ যুগে অবরোধ প্রথা ও প্রচলিত সংস্কারের সমর্থন কেহ সমর্থন করিবে কি? যাহা হউক, সামান্য দুই একটি বিষয়ে মতান্তর থাকিলেও গ্রন্থকারের শাস্ত্রজ্ঞান, পবিত্র চিন্তাধারা, জাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম প্রভৃতির জন্য পূজনীয় গ্রন্থকারকে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠক সমাজে ইহার সমাদর সূচিত করিতেছে। আমরা প্রত্যেক শিক্ষিতা মহিলাকে ইহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বঙ্গলক্ষ্মী বৈশাখ ১৩৩৬।

প্রকৃতির উপর রাগরাগিণীর প্রভাব—

শ্রীমতী বাণী দেবী।

লেখিকা সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞা। তিনি এই পুস্তকে তাঁহার কতকগুলি অভিজ্ঞতার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রকৃতির উপর যে সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব, ইহা ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ ঋষিগণ বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই বৈদিক মন্ত্র গানের ব্যবস্থা—সেই জন্য সামবেদ সামগান নামে অভিহিত। শব্দ ব্রহ্ম এ কথা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে সঙ্গীতের দ্বারা প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারা যাইবে না, এ কথা বলা চলে না। তার পর রাগরাগিণী গানের সঙ্গে সঙ্গে যে তিনি ব্যক্তিত্ব ও ধ্যানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। যে ধ্যান মানবাত্মাকে বিশ্বাত্মা 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান' পরব্রহ্মের সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারে, সে ধ্যান সামান্য প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বঙ্গ সাহিত্যে এ বিষয়ের রচনা বিরল না হইলেও বহুল নহে। আশা করি লেখিকা এ বিষয়ে আরও কিছু লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত করিবেন যে, ভারতীয় সঙ্গীত শুধু দু'দণ্ডের খেয়াল-পরিতৃপ্তির জিনিষ নহে,—ইহা শাশ্বত শান্তির আধার, জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী, কল্প-কল্পান্তরব্যাপী ধ্যানগম্য সাধনার ধন।

সুবর্ণবণিক সমাচার ফাল্গুন ১৩৩৫।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মহিলা কবি তরুদত্তের জননী—ক্ষেত্রমণি

সুকবি বরদাচরণ মিত্রের জননী (নাম অজ্ঞাত)

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জননী—সোণামণি দেবী

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জননী আনন্দময়ী দেবী

প্যারীচাঁদ মিত্রের জননী আনন্দময়ী

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

অঞ্জলি।
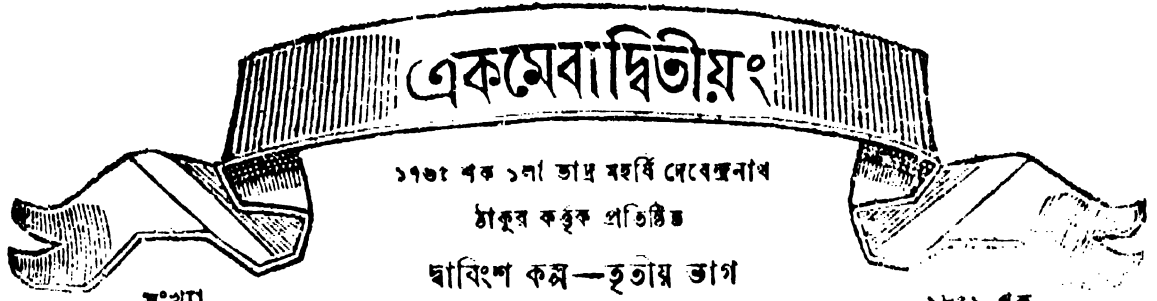
(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১১১ অঞ্জলি—বন্ধু দেবতা।

১। হে বন্ধু! তুমি আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত কর। সংসারে আমরা যেন কুটিল পথ অবলম্বন না করি। কণ্টকময় পথ ধরিয়া যেন আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত না হই। প্রতি পদে আমরা যেন তোমার অনিমেষ মঙ্গল দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রাখিয়া শ্রেয়ের পথে চলি। আমাদের সম্মুখ হইতে সকল অমঙ্গল সকল অনিষ্ট বিদূরিত কর।

২। তুমি আমাদিগকে প্রচুর ধন প্রদান কর যাহাতে আমরা অকুতোভয়ে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা ও প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি।

৩। আমরা তোমার দুর্ব্বল সন্তান। শত্রুগণ তাই পদে পদে আমাদের উপর অত্যাচার করিতে সমুদ্যত। তুমি তাহাদিগকে পরাজয় প্রদান কর এবং তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনে আমাদিগকে বিজয়-যুক্ত কর।

৪। আমরা তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমাদের সহায় হইয়া আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদান কর এবং আমাদিগের সুখশান্তি বিধান কর। পূর্ব্বতন পিতৃপিতামহদিগকে আমরা প্রণাম করি, তাঁহারা আমাদিগকে সুপথ প্রদর্শন করুন। মুনি ঋষি ও সাধুপুরুষদিগকে আমরা প্রণাম করি, তাঁহাদের উপদেশে আমাদের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যাক।

৫। তুমিই আমাদিগের পুষ্টিবিধান করিতেছ। তোমারই আদেশে মেঘসকল সুবৃষ্টি বর্ষণ করিতেছে। তুমি আমাদিগকে হিংসা করিও না। তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিও না। তুমি আমাদের নিত্যসঙ্গী থাকিয়া আমাদের সকল অভাব মোচন কর, যাহাতে আমাদের শুভকর্ম্মের যজ্ঞসকল সাফল্যমণ্ডিত হয়।

৬। তোমার আদেশে আমাদের জন্য বায়ু মধু বর্ষণ করুক। জলাশয়সকলের জল সুমিষ্ট হৌক। ওষধি সকল মধুময় হউক।

৭। নিশীথের শিশির মধু বর্ষণ করুক। উষার অরুণ তপন মধু বর্ষণ করুক। তোমার সন্তানগণের মধ্য হইতে দ্বেষহিংসা অন্তর্হিত হউক। সকল গৃহে, সকল সমাজে, সকল দেশে মঙ্গলবায়ু প্রবাহিত হউক, সুখশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হউক। তুমিই সকলের পালক। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৮। বনস্পতিসকল ছায়াপ্রদান করিয়া আমাদের শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করুক। তেজসমুজ্জ্বল ভানু স্বীয় তেজে রোগবীজ বিনষ্ট করিয়া আমাদের স্বাস্থ্যবিধান করুক। গাভীসকল প্রচুর সুমিষ্ট দুগ্ধ প্রদান করিয়া আমাদের স্বাস্থ্য ও বল বিধানে সহায় হউক।

৯। তুমি যে সুখকর ও কল্যাণকর, সুখ ও কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

নববর্ষে উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের চরণে সম্মুখের বৎসরের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভক্তিভরে প্রণিপাত কর। দুঃখ শোক নিরাশা নিরানন্দ অন্তর্ব্বিবাদ বহির্ব্বিবাদ—সংসারের ছোটখাটো খুঁটিনাটি আজ মন হইতে বিদূরিত কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতে সেই মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা পরমপুরুষের হস্ত উপলব্ধি করিতে বলেন। মানবের ইহাই শ্রেষ্ঠতম অধিকার।

ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর কর এবং ধর্ম্মের পথে ও কর্ত্তব্যের পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। সেই অপ্রতিহতশক্তি পরমাত্মার আশ্রয় লইয়া নির্ভীক হৃদয়ে তাঁহার কর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করিলে কোনও বাধাই তোমাকে বাধা দিতে পারিবে না; পদে পদে কথায় কথায় বিভীবিকার অন্ধকার তোমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। তিনি তোমার অন্তরে যে তেজ, বল ও সাহস প্রদান করিবেন, তাহার তুলনা নাই।

সম্মুখের নূতন বৎসরের জন্য মনকে দৃঢ় কর। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, ভাল হউক বা মন্দ হউক, কথায় কথায় জনসংঘের মতে সায় দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, যাহা ভাল বলিয়া বুঝিবে, তাহাই নির্ভীকহৃদয়ে অন্তরে ধারণ করিবে এবং তাহাই নির্ভীকতার সহিত প্রকাশ করিবে। সত্য এবং ভাল যাহা কিছু, তাহারই ভিতর ভগবানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখা যায়। সত্য পথে চলিলে এবং কল্যাণপ্রদ শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত থাকিলে ভগবানই তোমার আচারে ব্যবহারে, তোমার মনে ও বাক্যে সহজেই প্রকাশ পাইবেন।

বিগত কয়েক বৎসর যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, সেই সকল ঘটনা হইতে আমরা এই সত্য লাভ করিয়াছি যে, একমাত্র অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ববিবাদ বিদূরিত করিয়া মিলনের ভিত্তিভূমি রচনা করিবার প্রকৃত অধিকারী। ইহা যদি সত্য বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি করিয়া থাক, তবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণে অগ্রসর হও। পদে পদে ভয়ত্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ভগবানকে লাভ করা সম্ভব নহে।

সম্মুখের নূতন বৎসরে শ্রেয়ের পথে মঙ্গলের পথে সাহসের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাঁহার এই প্রেমপূর্ণ আহ্বান শুনিয়া কে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে? আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে তাঁহার সেই আহ্বানের সাড়া পাইয়াছি, তাই তো আমরা এখানে পবিত্রহৃদয়ে সম্মিলিত হইয়াছি। আমাদের এই উপাসকমণ্ডলী সংখ্যায় অল্প—তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। আমাদের প্রত্যেকের এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বপিতা অখিলমাতা অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসক; আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রত্যেকেই সেই মহাশক্তি হইতে নিঃসৃত এক একটী শক্তিময় অগ্নিকণা; আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা তাঁহারই শক্তি প্রীতি ও জ্ঞানের কণামাত্র পাইয়াও কেবল পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নহে, কিন্তু ইহলোক ও পরলোক পর্য্যন্ত এক অখণ্ড প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার অধিকারী। তখন সংখ্যায় অল্প বলিয়া মুহ্যমান হইবার কোনই অবসর নাই। সমগ্র জগৎকে জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে যে প্রকার দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে দেখিতেছি, তাহাতে নিরাশার পরিবর্ত্তে আশা ও আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠে। আমাদের মধ্যে একজনও যদি ভগবানে হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি সমর্পণ করে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে অক্লান্তভাবে আপনাকে নিযুক্ত রাখে; আমাদের মধ্যে যদি একজনও প্রকৃতই তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠে, তখন সেই একজনই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। সংখ্যায় অল্পতা বা অন্য কোনও কারণেই তাঁহার সুমঙ্গল আহ্বানে সাড়া দিতে পশ্চাৎপদ হইও না।

তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে বলসঞ্চয় করিয়া উত্থান কর, জাগ্রত হও। যে উপধর্ম্মের ফলে পদে পদে পরাধীনতার চরণে মস্তক অবনত হয়, দাসখতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হই, সেই উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে সাহসের সহিত দণ্ডায়মান হও। আঘাত লাগিবার ভয়ে, ব্যথা পাইবার ভয়ে উপধর্ম্ম কুসংস্কার প্রভৃতির নিকটে মস্তক অবনত করিলে চলিবে না। সুখভোগের লালসায়, সোয়াস্তির প্রত্যাশায় নিরবয়ব নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে এক-

মাত্র উপাস্য বলিয়া কেবল নিজের অন্তরে নহে কিন্তু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। যে প্রেরণা ভগবান আজ আমাদের অন্তরে প্রেরণ করিয়াছেন; সেই প্রেরণার নিকট আমাদিগকে আচারে ব্যবহারে, মনে ও বাক্যে সম্পূর্ণ খাঁটি হইতে হইবে। তবেই আমাদের বাণী সকলেই স্তব্ধ হইয়া শুনিতে থাকিবে।

মহাপুরুষ যাঁহারা, তাঁহাদের কথায় ও কাজে মিল থাকে বলিয়াই তাঁহাদের জীবন, তাঁহাদের বাণী, তাঁহাদের স্পর্শ তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে উৎসাহের ও সাহসের আগুন বিকীর্ণ করিতে পারে। বিশ্বস্রষ্টা ভগবান আমাদের সত্যই পিতামাতা, সকল ঐশ্বর্য্যের আকর পরমেশ্বর আমাদের সত্যই সখা ও সুহৃৎ, সকল জ্ঞান ও শক্তির মূল উৎস পরমাত্মা সত্যই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা—এই সরল সত্যের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার চরণে উপস্থিত হও, তোমাদের কথা ও কাজ এক হোক; তোমাদেরও স্পর্শ, তোমাদেরও বাণী উৎসাহ ও সাহসের অগ্নি বিকীর্ণ করিতে পারিবে। ভগবানের বিধান এমনই আশ্চর্য্য যে, আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হইলেও সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাইব—তাঁহার অজেয় শক্তির অধিকারী হইব; নিজের নিকট খাঁটি থাকিলে আত্মা সজীব হইয়া উঠিবে; শত বিপদের তরঙ্গ, শত দুঃখের আঘাত তোমাকে মঙ্গলের পথ হইতে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

যদি শ্রেয়ের পথে চলিতে চাও, তবে আজ এই বৎসরের প্রারম্ভে প্রাণের প্রভু যিনি, তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি সমর্পণ কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে আত্মনিয়োগ করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর; তাহা হইলে জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব সহজেই উপলব্ধি করিবে। জাগ্রত ভগবানের তুমি অনুচর হইয়া থাক; তাঁহাকে করুণাময় পিতা, স্নেহময়ী জননী বলিয়া প্রাণের ভিতর উপলব্ধি কর; দুঃখকষ্টের কঠিন আঘাত পাইলে তাঁহাকেই বন্ধু বলিয়া ডাক—তোমার সমস্ত দুঃখকষ্ট, সকল বিপদ আপদ কি এক অমোঘ শক্তিতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যই বীরের ধর্ম্ম, সাহসী একনিষ্ঠ ভক্তের ধর্ম্ম। আজ বৎসরের প্রারম্ভে সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অন্তরে সবলে ধারণ করিয়া সম্মুখের বৎসরকে সাফল্যমণ্ডিত কর।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মকথা।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান তাঁহার অনুপম স্নেহের দানস্বরূপে যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে এই জগতসংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার, সরল ও সবল বাণী আজ এই শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করিতেছি। তোমরা তাহা হৃদয়ে গ্রহণ কর এবং জীবনে পালন করিয়া পাপ হইতে মুক্তিলাভ কর। তোমাদের শরীর সবল হোক, মন সতেজ হউক এবং আত্মার উন্নতি হউক। তোমরা ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে সদ্গতি লাভ কর।

ধর্ম্মের গ্লানি ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব

প্রত্যেক মানবের জীবনে এবং জগতের ইতিহাসে ইহা একটী পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ সত্য যে, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই ভগবান যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া ধর্ম্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব এই সত্যের পক্ষে জ্বলন্ত সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান।

অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতম বাণী

ভগবান যেমন প্রতি মানবের নিজস্ব, সুতরাং সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িকতার অতীত, সেইরূপ তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। ব্রাহ্মধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম এই উদারতম বাণী ঘোষণা করেন যে, "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে। সকলেরই আত্মাতে ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন পাই। * * * ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি কালবিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা

এই উদার বাণী ঘোষণার ফলে সমগ্র জগতের নরনারীর অন্তর হইতে মানসিক পরাধীনতারও শৃঙ্খল খসিয়া গেল। জীবনের আচার-ব্যবহার ও আহার-বিহার সম্বন্ধেও ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্গে ঈশ্বর ও মানবের প্রত্যক্ষ যোগসাধনের সহায়তা হয়, সেইভাবে সকল বিষয় নিয়মিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। স্বাধীনতার উৎস ভগবান আমাদের অন্তরে দুঃখদারিদ্র্য পাপতাপ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের এক প্রবল আকাংক্ষা মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।

---

* গত ১লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষ্যে আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিবৃত।

ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষযোগ স্বাধীনতার মূল

ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার মূল। শত নিগ্রহের মুখেও ঐ প্রত্যক্ষ যোগের কথা, ঐ স্বাধীনতার আশ্বাসবাণী, ঐ মুক্তির অমৃতবার্ত্তা অন্তরে গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে প্রচার করিতে হইবে। প্রাচীন বা নবীন কোনও পন্থারই শুষ্ক মতামত ও শুষ্ক অনুষ্ঠানের কঠিন বাঁধন মানুষকে চিরকাল বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। সকল পন্থার ভিতর যাহা সত্য ও ভাল, তাহাই সুরক্ষিত করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। মানুষের প্রাণে ঐ সকল অন্যায় বন্ধন কাটাইয়া একটা সরল ও সবল ধর্ম্মের অভাব অনেক সময়েই জাগিয়া উঠে। যে ধর্ম্ম স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যক্ষ যোগের উপদেশ দেন এবং তাহার পথে অর্গলস্বরূপে দণ্ডায়মান মত বা শাস্ত্রকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় অনুশাসন দিতে পারেন, তাহাই সেই সরল ও সবল ধর্ম্ম। তাহারই অন্য নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল অবলম্বন—পরমাত্মা ও জীবাত্মা

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল অবলম্বন দুইটী—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। পরমাত্মা সমুদ্র, জীবাত্মা স্রোতস্বতী; পরমাত্মা সূর্য্য, জীবাত্মা চন্দ্র; পরমাত্মা আতপ, জীবাত্মা ছায়া; পরমাত্মা পিতা, জীবাত্মা পুত্র। এই উভয়ের বাহিরে গিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুকে ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া পূজা করিলেই সাম্প্রদায়িকতা আসিবে, এবং সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম কলুষিত হইবে। ধর্ম্মের বহিরাবরণেরই সহিত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বা উপধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য থাকে পাঁচজনের মতে বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদি যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে সম্পাদনের উপর। কিন্তু সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট ইহা অবান্তর কথা; তাহার প্রধান লক্ষ্য ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ যোগসাধন। ধর্ম্মের বহিরাবরণ মানুষের প্রস্তুত, প্রকৃত সত্যধর্ম্ম ভগবৎপ্রেরিত। সত্যধর্ম্মে ঈশ্বর ও মানবের মধ্যবর্ত্তী অভ্রান্ত গুরু প্রভৃতির কোনও স্থান নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আত্মপ্রত্যয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যাত্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা কিছু, সকলই আত্মাকে লইয়া এবং আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে লইয়া। ইহার মূল ভিত্তি ও প্রমাণ আত্মপ্রত্যয়। আত্মপ্রত্যয়ের মূল কথা হইতেছে—প্রত্যেকের নিজ নিজ আত্মাতে প্রত্যয়, অর্থাৎ প্রত্যেক মানবের আত্মাতে পরমাত্মা যে সকল সহজ সত্য নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই সকল সহজ সত্যের উপর অটল আস্থা। সেই সকল সত্যকেও সাধারণত সংক্ষেপে আত্মপ্রত্যয় বলা হয়। এই সকল সহজ সত্য ভগবান অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়া উহা আমরা বাহির হইতে পাই না, সেগুলি আমরা ভিতর হইতে স্বত-উত্থিতরূপে প্রাপ্ত হই। সেই সমস্ত সত্যকে মূলে ভিত্তি না করিলে বিজ্ঞানও দাঁড়াইতে পারে না, তর্কও চলিতে পারে না; এমন কি, আমাদের জীবনযাত্রাই নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

"এই আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করিতে গেলে একেবারে যুক্তির মূলচ্ছেদন করা হয়। তাহা হইলে আপনার অস্তিত্বে, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বে এবং কার্য্যকারণের অস্তিত্বে সংশয় জন্মিয়া বুদ্ধি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আত্মপ্রত্যয়ের উপর যিনি নির্ভর না করেন, তিনি কখনও জ্ঞানগোচর নিত্য সত্য মঙ্গলস্বরূপ পূর্ণ পুরুষের প্রতি নিঃসংশয় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, প্রতি তর্কের তরঙ্গে তিনি অস্থির হয়েন এবং ঈশ্বরসহবাসজনিত সুনির্ম্মল শান্তি কদাপি লাভ করিতে পারেন না"।

শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি নহে

আত্মপ্রত্যয়ের উপর স্থিরপদে দাঁড়াইলেই আমরা বুঝিব যে, আত্মা যখন নরনারীমাত্রেরই আছে এবং পরমাত্মা যখন প্রতিজনের আত্মাতে অবস্থিত, তখন জাতিবিশেষ ব্যক্তিবিশেষ প্রভৃতির কোনও শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না। শাস্ত্রের যে অংশে আত্মপ্রত্যয় সায় দিবে, সেই অংশই আমরা গ্রহণীয় বলিয়া মানিতে পারি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র

ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র হইতেছে—বিশ্বস্রষ্টা, নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, স্বতন্ত্র, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, নির্ব্বিকার, পরিপূর্ণ ও অপ্রতিম পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ একমাত্র তাঁহারই উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। ইহারই উপরে অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম দণ্ডায়মান।

পূর্ণপুরুষ বিশ্বস্রষ্টা

পূর্ণপুরুষ পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাতে জগত সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি স্বয়ম্ভু ও স্বপ্রকাশ। তিনি অকৃত কারণ। সৃষ্টিকার্য্য একটী প্রণালী মাত্র। সৃষ্টির কারণ সৃষ্টির অতীত ইচ্ছাময় পরব্রহ্ম। তাঁহার আদি নাই, কারণ নাই। তিনি অনাদি। যে দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, মনন করে, বোধ করে ও কর্ম্ম করে বা ইচ্ছা করে এবং যে জানে যে, সে-ই সকল কার্য্য করে, তাহাকেই পুরুষ বলা হয়। আমরা তাহাকেই পুরুষ বলি, যাহার ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্ব আছে, যে কর্ত্তা ও নিয়ন্তা হইবার অধিকার রাখে, যাহার জ্ঞান আছে, প্রীতি আছে। ইচ্ছা প্রভৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না।

পূর্ণপুরুষ পরিমিত পুরুষের কারণ ও আশ্রয়

আমরা সকলেই পুরুষ বটে, কিন্তু সীমাবদ্ধ। এই অগণিত পরিমিত পুরুষ আসে কোথা হইতে? আমরা এই পরিমিত ইচ্ছা, ভাব ও শক্তি প্রভৃতি পাই কোথায়? জন্মের পূর্ব্বে বা পরে কেহই এসকল আমাদের ভিতরে বসাইয়া দিতে আসে না। আর আমরা দাঁড়াই বা কাহার আশ্রয়ে? পরিমিত কোন কিছুই আপনাপনি আসিতেও পারে না, আর বিনা আশ্রয়ে দাঁড়াইতেও পারে না। কাজেই বলিতে হয় এবং আত্মপ্রত্যয়ও সমর্থন করে যে, আমরা যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা পুরুষেরই ইচ্ছাতে ক্ষুদ্র ও পরিমিতশক্তি আমরাও সমুদ্ভূত হই, এবং তাঁহারই মঙ্গলবিধানে জ্ঞানে ধর্ম্মে ও প্রীতিতে সমুন্নত হই। যে ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্বের বলে এই অসীম আকাশে অসংখ্য রবিচন্দ্রগ্রহতারকা বিধৃত হইয়া অভ্রান্ত নিয়মে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে; যে জ্ঞানের এবং যে প্রীতির কণামাত্র পাইয়া কোটী কোটী যুগযুগান্ত ধরিয়া মানবসমাজ দেবত্বের অভিমুখে উন্নীত হইয়া চলিয়াছে, সে ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্বের, সে জ্ঞান ও প্রীতির উৎস, এই বিশ্বজগতের এবং পরিমিত পুরুষ আমাদেরও স্রষ্টা, নিয়ন্তা, মূল কারণ ও আশ্রয়, পরব্রহ্ম ব্যতীত কোন পরিমিত পুরুষ হইতে পারে না।

বিশ্বস্রষ্টা অন্ধ শক্তি নহে

এই বিশ্বচরাচর আপনাপনি সমুদ্ভূতও হয় নাই এবং ইহা কোন অন্ধ শক্তিরও কার্য্য নহে। আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, শক্তি কোন অবলম্বন ব্যতীত আপনাপনি দাঁড়াইতে পারে না—শক্তির পশ্চাতে কোন শক্তিমান পুরুষ থাকিবেই।

শক্তি ও শক্তিমান পুরুষ

শক্তি শক্তিমান আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে অধিশ্রিত থাকিলেও উভয়ে এক ও অভিন্ন হইতে পারে না। একই আত্মাতে আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্ম্মী শক্তি—আঘাত করিবার শক্তি এবং প্রীতি করিবার শক্তি—অধিশ্রিত দেখিতে পাই। সজ্ঞান ইচ্ছাবিশিষ্ট পুরুষের আত্মা ঐ সকল বিভিন্ন শক্তির আশ্রয় হইলেও এবং উভয়ের মধ্যে ব্যবধানাবহীন ওতপ্রোতভাব থাকিলেও উভয়ে পৃথক। সূর্য্য হইতে সূর্য্যরশ্মি নিঃসৃত হইলেও এবং সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যেতে অভিন্নভাবে অধিশ্রিত থাকিলেও সূর্য্য ও তাহার রশ্মি পরস্পর যেমন পৃথক্, সেইরূপ এই বিশ্বকার্য্যে যে সমস্ত শক্তি কার্য্য করে, সেই সকল শক্তি ইচ্ছাময় জ্ঞানময় পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত হইলেও এবং তাঁহাতে অভিন্নভাবে আশ্রিত থাকিলেও তাঁহা হইতে ভিন্ন ও পৃথক—তিনি স্বতন্ত্র। কার্য্যকারণসমন্বিত এই বিশ্বজগত এবং বিশ্বজগতের শক্তিসমূহ, সমস্তই যখন তাঁহারই ইচ্ছা হইতেই সমুদ্ভূত, তখন ইহা সুস্পষ্ট যে, ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টির অতীত, স্বয়ম্ভূ ও অকৃত কারণ। সেই অকৃতকারণকে সমস্ত প্রকৃতির মূল কারণরূপে বুঝিলেই আত্মার জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি হয়।

মহান পুরুষ বিশ্বনিয়ন্তা

সেই মহান পুরুষ এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনি বিশ্বনিয়ন্তা বলিয়াই কি সূর্য্যে, কি ক্ষুদ্র পৃথিবীতে, ভূলোক ও দ্যুলোকের সর্ব্বত্র একই অভ্রান্ত নিয়ম ও একই শক্তিকে বিভিন্ন আকারে প্রকারে কার্য্য করিতে দেখা যায়—অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যে মহান ঐক্য দৃষ্ট হয়। তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মারও নিয়ন্তা অন্তর্যামী পুরুষ। তিনি বাহিরের বস্তু হইলে আমাদের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা প্রভৃতির ভিতর দিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিতাম না।

তিনি অনন্ত

যাহার আদি আছে, তাহারই অন্ত আছে। তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি দেশকালের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন নহেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদর্শী। তিনি নিত্য। এই অনন্ত স্থান ও এই অনন্ত কাল তাঁহারই অনন্ত ভাবের ছায়া মাত্র।

তিনি জ্ঞানস্বরূপ

তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহারই অভ্রান্ত নিয়মসকল বিশ্বজগতে কার্য্য করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃতিতে তিনি যে জ্ঞানের কণা দিয়া রাখিয়াছেন, তাহারই উপরে আমাদের জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগ অবলম্বিত হইয়া আছে।

তিনি মঙ্গলস্বরূপ

তিনি মঙ্গলস্বরূপ। কি সুখসম্পদ কি দুঃখবিপদ সকলেরই মধ্যে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে। যতক্ষণ আমাদের অভাবসকল সহজে পূর্ণ হয়, ততক্ষণ ভাবি না যে, এক মঙ্গলময় পরম পুরুষ আমাদের "প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন।" অজ্ঞানবশত আমরা অনেক সময়ে মনে করি যে, এই বিশ্বজগত অমঙ্গল ও দুঃখেরই রাজ্য। তাহার জন্য আমাদের স্বেচ্ছাকৃত কার্য্য যে অনেক সময়ে দায়ী তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। মঙ্গলময়ের রাজ্যে কোন্ মূল কারণে অমঙ্গল আসিল, দুঃখের স্বরূপ কি, ঈশ্বর দুঃখে পরিণত হইয়াছেন কি না, এই প্রকার কূটতর্ক সকল আমাদিগকে সরল পথ হইতে দূরে লইয়া গিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা উপলব্ধির পথে বাধা প্রদান করে। ঐ সকল প্রশ্নের বিষয় প্রকৃতির অতীত। প্রকৃতির ভিতরে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ সকল প্রশ্নের সমাধান করা অসম্ভব। জগত অপূর্ণ বলিয়াই জগতে

সুখের সঙ্গে দুঃখ, মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গল আছে। দুঃখ বা অমঙ্গলের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার চেষ্টা নিরর্থক। ব্রাহ্মধর্ম প্রত্যক্ষ সত্যের উপর দাঁড়াইয়া বলেন যে, সুখ দুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল সকলের ভিতর দিয়া জগতের চির-উন্নতি, চির-মঙ্গল ও আনন্দের পথে অগ্রসর হওয়াই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। জগতে যে সকল অভ্রান্ত মঙ্গল নিয়ম কার্য্য করিতেছে, সে সকলের উৎস অন্ধ শক্তি হইতে পারে না—সে সকলের প্রতিষ্ঠাতা মঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতা পরম পুরুষ। তিনি প্রতি অণুপরমাণুতে, প্রতি আত্মাতে ওতপ্রোত থাকিয়া প্রতি ঘটনাকেই মঙ্গল উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

তিনি নিরবয়ব

তিনি নিরবয়ব ও নির্ব্বিকার। তাঁহার শরীর থাকিলে অবশ্য দেশে ও কালে সীমাবদ্ধ হইতেন। তাঁহার যখন অবয়ব নাই, তখন তাঁহার কোন প্রকার বিকারও সম্ভব নহে। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়। তিনিই একমাত্র বিশ্বজগতের অণুপরমাণুতে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনিই একমাত্র অনাদি ও অনন্ত কাল ব্যাপ্ত করিয়া থাকিতে পারেন—অন্য কাহারও সে ভাবে থাকিবার অবকাশ নাই। এই প্রকৃতি তাঁহার স্রষ্টার জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি আনন্দে অদ্বিতীয়, তিনি শান্ত-ভাবে অদ্বিতীয়। তিনি অদ্বিতীয় বলিয়াই একই শক্তি, একই মঙ্গল উদ্দেশ্য ভূলোক-দ্যুলোক সম্বলিত এই ব্রহ্মচক্রের সর্ব্বত্র অভ্রান্ত নিয়মে কার্য্য করিতেছে। তিনিই সকলের আশ্রয়। কি বহির্জগত, কি মানবাত্মা সকলই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে।

তিনি সর্ব্বজ্ঞ

তিনি সর্ব্বজ্ঞ! প্রতি অণুপরমাণুতে এবং প্রতি আত্মাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত থাকিয়া তিনি সকলই জানিতেছেন।

তিনি অপ্রতিম

তিনি অপ্রতিম। তিনি অনাদ্যনন্ত ও অদ্বিতীয় বলিয়াই অপ্রতিম। তাঁহার তুলনা নাই। কোনও সৃষ্ট পদার্থকেও তাঁহার প্রতিমা ধরা যাইতে পারে না। কোনও মনুষ্যকেও তাঁহার পূর্ণাবতার বলা যায় না।

তিনি স্বপ্রকাশ

তিনি স্বপ্রকাশ। আকাশে বাতাসে, সূর্য্যে চন্দ্রে, পুষ্প পত্রে, ভূধরে সাগরে, গ্রহতারার নীরব গতিতে এবং পাপতাপের সহিত সংগ্রামে জয়লাভজনিত অপার শান্তিতে, সকলের মধ্যেই তিনি নিত্য স্বপ্রকাশ।

ব্রহ্মপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন

সেই অনন্তস্বরূপের প্রতি আমাদের প্রকৃষ্ট প্রীতি ভক্তি স্বতই ধাবিত হয়। তিনি যে প্রীতি আকর্ষণ করেন, কোনও পরিমিত বস্তু সে প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না। ভগবানকে বিশ্বপিতা অখিলমাতা বলিয়া প্রাণে উপলব্ধি করিলেই তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনেও প্রবৃত্তি স্বতই আসিবে। তাঁহাকে প্রীতি করিব, অথচ তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করিব না—ইহা মিথ্যা কথা। তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই হইল তাঁহার পূজার উপকরণ। তাঁহার পূজার জন্য বাহির হইতে ধূপ ধুনা পুষ্পাদি সংগ্রহের প্রয়োজন নাই, জীবজন্তু বলি দিবারও প্রয়োজন নাই অথবা প্রতিমাগঠনও আবশ্যক নহে। আমাদের অন্তরে যে প্রীতি নিহিত আছে, সেই প্রীতি দ্বারা আত্মার অন্তরাত্মাকেও প্রীতি করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন, উপাসনার এই দুইটী অঙ্গ ভগবৎপ্রীতিরই দুই আকার। উভয়ে এত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ যে, একটীকে ত্যাগ করিলে অপরটী ম্লান ও পরিশুষ্ক হইয়া যায়।

তাঁহার উপাসনাতে মঙ্গল ও উন্নতি

তাঁহার উপাসনাতেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি সন্নিবদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্মকে শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে অন্তরে ধারণ করিয়া বিশ্বপতি পরমাত্মাকে হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি সমর্পণ করিলে এবং তাঁহার আদেশ ও প্রিয়কার্য্য জানিয়া নিজের মঙ্গল এবং দেশের ও জগতের কল্যাণসাধনে নিরত থাকিলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

হে পরমাত্মন্! তোমাকে জানিবার ও প্রীতি করিবার অধিকার আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ। তোমাকে প্রীতি করিবার এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার উপযুক্ত ইচ্ছা ও শক্তি দাও, যাহাতে আমরা সেই অধিকার লাভের উপযুক্ত হই এবং জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত হইয়া তোমার চরণস্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

দীক্ষার্থীকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণে আহ্বান।

(আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

হে প্রিয়দর্শন! হে আয়ুষ্মতি! তোমাদের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মকথা এবং বীজমন্ত্র প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ কর।

সর্ব্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা হইতেছে—"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতিদ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার

উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।" ঈশ্বরের উপাসনাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতেছে—"পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোনও বস্তুর আরাধনা করিব না।" ব্রহ্মোপাসকের এই প্রতিজ্ঞাটী দৃঢ়রূপে অন্তরে ধারণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিবার অবসর নাই। ভূমা পরমেশ্বর সৃষ্টির অতীত—স্থান, কাল ও সর্ব্ববিধ সীমার অতীত; সৃষ্টবস্তুমাত্রই অন্তত স্থানে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবেই। সুতরাং আমাদের ক্রমোন্নতিশীল আত্মার শ্রদ্ধাভক্তি পরিমিত বস্তুতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

ঈশ্বর কোন এক ব্যক্তিতে বা জাতিতে বা দেশে বা কালে আবদ্ধ নহেন। প্রাণের ইচ্ছা লইয়া সরল পথে তাঁহার নিকট যাও, সকল বাধাই অতিক্রম করিবে। তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা। এই সত্য কথা ভুলিয়া মানুষকে যতই শ্রদ্ধা কর না কেন, অতিপ্রাকৃত অবতাররূপে ভগবানের আসনে বসাইও না। একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অতিপ্রাকৃত বা প্রকৃতির অতীত আর কেহই হইতে পারে না।

অগ্নিহোত্রী যেমন তাঁহার পূজার অগ্নিকে অবিচ্ছেদে প্রজ্বলিত রাখেন, আমাদেরও অন্তরে বিশ্বপিতা অখিলমাতা ঈশ্বরের উপাসনাকে সেইরূপ একনিষ্ঠভাবে জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে।

তিনি নিরাকার বলিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা দিতে ক্ষান্ত হইও না। সেই অন্তর্যামী পরম পুরুষ শূন্য নিরাকার নহেন। আমাদের আত্মা যেমন নিরাকার—ইচ্ছা, শক্তি, জ্ঞান ও প্রীতিবিশিষ্ট নিরাকার পুরুষ, অনন্তমঙ্গল ভগবানও সেইরূপ অনন্ত ইচ্ছা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রীতিবিশিষ্ট নিরাকার পরম পুরুষ। নিরাকার বলিয়াই যেমন আমাদের আত্মা আমাদের দেহ ও মনের সকল অংশ একই সময়ে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়, তেমনি সেই পূর্ণ পুরুষ নিরাকার বলিয়াই কি বহির্জ্জগতের, কি অন্তর্জ্জগতের প্রত্যেক অংশ নিজের পূর্ণস্বরূপে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি এইরূপে নিজের অরূপ রূপে তাঁহার ব্রহ্মচক্রের প্রত্যেক অংশ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়াই সর্ব্বত্র ও সকল অবস্থাতেই তাঁহার পূজা করা সম্ভব। এই কারণেই উপাসকের সহিত উপাস্য ভগবানের প্রত্যক্ষ যোগ।

ব্রহ্মোপাসকের একদিকে উপধর্ম্ম, অপরদিকে নাস্তিকতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। উপধর্ম্ম মন্দ বলিয়া নাস্তিকতার প্রতি ঝুঁকিলে চলিবে না। বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এবং নিজের আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইবে যে, নাস্তিকতার কোনও ভিত্তি নাই। অপরদিকে, মূর্ত্তিপূজা বল, অবতারবাদ বল, সর্ব্বপ্রকার উপধর্ম্মই পরিণামে মানবের অমঙ্গলজনক। উপধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে প্রকৃতিকে যথাযথ বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার শক্তি অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হয় বলিয়া পশুবলি নরবলি প্রভৃতি ভীষণ অনিষ্টকর প্রথা সকল সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমাজকে ধ্বংসপথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে দেখা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই কারণে কুটতর্ক ছাড়িয়া প্রত্যেক মানবকে সরল পথে নিজ নিজ আত্মার ভিতর দিয়া আত্মার আত্মা পরম পিতামাতা পরমাত্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিবার উপদেশ দেন।

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা—"রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।" আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আত্মাকে জানিবার অধিকার রাখি, কিন্তু জড়পদার্থেরও যেমন স্বরূপ জানি না, আত্মারও সেইরূপ স্বরূপ জানি না। দর্শন, মনের নিয়মন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা আত্মার পরিচয় পাই। সেই আত্মা মহান আত্মা পরমাত্মাতে অধিশ্রিত। সুখসম্পদের মোহে আচ্ছন্ন থাকিলে অনেক সময়ে এই সত্য স্পষ্ট দেখিতে পাই না। কিন্তু দুঃখবিপদের কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া একটা আশ্রয় পাইবার জন্য যখন ব্যাকুল হই, তখনই বুঝিতে পারি একটি আত্মাও নিরাশ্রয় নহে, প্রত্যেক আত্মাই সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করি যে, বিশ্বজগতেরও আত্মা সেই পরমাত্মা; তাঁহাতেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

পরমাত্মা কেবল আত্মার প্রতিষ্ঠাভূমি নহে। আত্মা যেমন আমাদের শরীর ও মনের আশ্রয়, পরমাত্মাও সেইরূপ আত্মার একমাত্র আশ্রয়, আত্মার প্রাণ। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, আত্মার দ্বারাই পরমাত্মাকে জানিবে। আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিলে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায়। আত্মাকে না জানিলে সকলই শূন্য। আত্মাকে ছাড়িয়া পরমাত্মাকে পাইবে না। আত্মা সুস্থ থাকিলেই আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে জানা সহজ হয়। শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য যেমন প্রতিদিন নিয়মিত অন্ন আহার করা আবশ্যক, সেইরূপ আত্মারও স্বাস্থ্য রাখিবার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করা আবশ্যক। যেমন মাটির নীচে যথেষ্ট জল থাকিলেও গাছে নিয়মিত জলসিঞ্চন করিয়া তাহাকে সজীব রাখিতে হয়, সেইরূপ ভগবান আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া থাকিলেও নিয়মিতরূপে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধন করিয়া আত্মাকে সতেজ করিয়া তুলিতে হয়।

এইরূপ যোগসাধনই হইল আত্মার অন্ন। মৃত্যুর পরে শরীর পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু যোগযুক্ত আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্তকাল বিচরণ করিতে থাকিবে। পরমাত্মার সহিত আত্মার অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের আদি এবং তাহাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্ত।

পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধনের ফলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি তো অবশ্যম্ভাবী; সঙ্গে সঙ্গে আত্মা মধুময় হয়। বিশ্বজগত সেই আত্মার নিকটে মধুময় হয়। যোগযুক্ত আত্মা শান্তিসমুদ্রে অটল থাকে। জগতের অনেক বিষয়ের কারণ ও তত্ত্ব বুঝিতে না পারিলেও, জীবনের অনেক রহস্য ভেদ করিতে না পারিলেও মঙ্গলস্বরূপের উপর তাহার বিশ্বাস কিছুমাত্র টলে না। ঈশ্বরকে যিনি আত্মস্থ দেখেন, তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়; মৃত্যু তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইতে পারে না; বিপদ তাঁহার নিকটে সম্পদ হয়, মৃত্যু অমৃতের সোপান হয়। তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী এবং প্রকৃতই অমর; এবং ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় পিতামাতা, অন্তরতম সখা ও সুহৃৎ। এইভাবে ঈশ্বরের উপাসনাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

এই আত্মসমাধানের জন্য যেমন ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন ব্যতীত অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ স্থান বা কালের বিষয়েও নির্দ্দিষ্ট কোন বিধিনিষেধ নাই। যে স্থানে এবং যে সময়ে যে অবস্থায় চিত্তের একাগ্রতা আসিবে, সেই স্থানে, সেই সময়ে এবং সেই অবস্থাতেই পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিবে।

আত্মসমাধানের জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনেরও একান্ত প্রয়োজন নাই। ওঁকার বা অন্য কোন মন্ত্রের অর্থধ্যান বা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী বা অন্য কোন হৃদয়গ্রাহী রচনা, যাহাতে আত্মার তৃপ্তি হইবে এবং পরমাত্মাতে আত্মসমাধান সহজসাধ্য হইবে তাহাই অবলম্বন করিবে। পরমাত্মাতে আত্মসমাধান অভ্যস্ত হইলে আমরা তাঁহাকে পিতামাতা বলিয়া জানিতে পারি; বিপদের সময় তাঁহাকে বিপদের কাণ্ডারী এবং সুখে দুঃখে তাঁহাকে সখা ও সুহৃৎ বলিয়া বুঝিতে পারি। পাপে পতিত হইলে তিনি পতিতপাবন; মুক্তির জন্য শরণাপন্ন হইলে তিনি মুক্তিদাতা।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা হইতেছে—"সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব"; পঞ্চম প্রতিজ্ঞা—"পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।" আত্মসমাধানের ফলে ঈশ্বরকে প্রীতি করিবার সঙ্গে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনও সহজ হয়। তখন অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধার বলেই আমরা বুঝিতে পারি যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাঁহার প্রিয় এবং পাপকর্ম্ম তাঁহার অপ্রিয়। আমরা প্রত্যক্ষও করি যে, সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফল সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি এবং পাপকর্ম্মের ফল সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি। ভগবানে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মুখে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন এবং কার্য্যে তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যসাধন—ইহাতে গুরুতর অধর্ম্ম হয়।

পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইলেও সীমাবদ্ধ মানুষ সময়ে সময়ে পাপাচরণ করিয়া ফেলে। কিন্তু অনন্তমঙ্গলের রাজ্যে অনন্ত নরক থাকিতে পারে না। ইহা জানা কথা যে, সংসারে নানা বিষয়ে আমরা নানা ভুলভ্রান্তি করিয়া অনেক অমূল্য সময়ও নষ্ট করি এবং অনর্থও আনি। কিন্তু তজ্জন্য বৃথা হাহুতাশ করিবার পরিবর্ত্তে মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাবে অটল আস্থা রাখিয়া, তাঁহার হস্তে ফলাফলের ভার নির্ভয়ে সমর্পণ করিয়া নিষ্কামহৃদয়ে শুভ কর্ম্ম করিতে থাক, ভগবৎবিধানেই সমস্ত ভুলভ্রান্তি পদ্মপত্র হইতে জলের মত ঝরিয়া পড়িয়া কোথায় অদৃশ্য হইবে। মোহবশত কখন কোন পাপাচরণ করিয়া ফেলিলেও তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইলে, পাপের জ্বালায় জর্জ্জরিত হৃদয়ে অনুতাপের রক্তে পরমেশ্বরের চরণ ধৌত করিলে তিনি সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া আদর পূর্ব্বক তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন। তাই ষষ্ঠ প্রতিজ্ঞায় পাপ করিলে তাহা হইতে অনুশোচনা পূর্ব্বক বিরত হইবার কথা আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সর্ব্বশেষ প্রতিজ্ঞা এই যে, "ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিসাধনার্থ বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে যথাশক্তি দান করিব"। যে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগবিষয়ক নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে। সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা, মঙ্গল ও উন্নতির পথপ্রদর্শক মোক্ষপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশের সম্মুখে যে উচ্চতম আদর্শ ধারণ করিয়াছেন, সেই আদর্শকে গৃহে গৃহে উপস্থিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করা চাই-ই। ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ব্রাহ্মসমাজে যথাশক্তি দান করা। তাই প্রতিজ্ঞায় প্রত্যেকের পক্ষে এই দান যতদূর সম্ভব সহজ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে যে ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, বর্ষে বর্ষে যথাশক্তি দান করিলেও সে ঋণদায় হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি না। আমাদের কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ঈশ্বর ও সংসারের বিরোধ উপস্থিত হইলে সহস্র বাধা সত্ত্বেও সংসারকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে

হইবে। এই সকল উপায়ে যে বিদ্বান ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হয়।

এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবনের প্রতি নিশ্বাসে ঈশ্বরকে জীবনের সাক্ষী জানিয়া নির্ভয় হও—রোগশোক ভয়ভাবনা হইতে মুক্তিলাভ কর। তাঁহাকে মহান প্রভু বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ববিধাতা পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি কর—তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি কেহই প্রতিহত করিতে পারে না। তাঁহাকে অন্তর্যামী পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি কর, তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত সখাসুহৃৎরূপে থাকিয়া, পিতামাতার মূর্ত্তিতে জাগ্রত থাকিয়া, অনুক্ষণ তোমার মঙ্গলবিধান করিতেছেন, বিপদে আপদে তোমাকে নিজ স্নেহের ধর্ম্মদুর্গে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের ঘনিষ্টতম যোগ—তিলমাত্র ব্যবধান নাই। তিনি আমাদের প্রত্যেক কার্য্য দেখিতেছেন, প্রত্যেক কথা শুনিতেছেন। তাঁহাকে নিকটতম অন্তরতম প্রাণের প্রাণরূপে প্রত্যক্ষ কর এবং জীবনকে সার্থক কর।

সত্য না কল্পনা?

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা চলিয়াছে। নানা প্রকার মত ও বিশ্বাসের কিরূপে উৎপত্তি হইল, বিবিধ অনুষ্ঠানাদির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য কি, ভিন্ন ভিন্ন পৌরাণিক ধর্ম্মে যে সকল ঘটনার কথা আছে, তাহার কতটা ঐতিহাসিক সত্য আর কতটাই বা রূপক ও কল্পনা, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের কোন্ কোন্ অংশ মৌলিক আর কোন্ কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত—ইত্যাদি বিষয় লইয়া যে পরিমাণে তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছে, লোকে ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য সে পরিমাণে উৎসুক নহে। ধর্ম্মের বহিরের কথা লইয়াই আলোচনা হইতেছে; কিন্তু ধর্ম্মের যাহা সার কথা, তাহা হইতে লোকে যেন ক্রমশই দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছে। ধর্ম্ম সাধনার সামগ্রী না হইয়া, শুধু আলোচনার ব্যাপারে পরিণত হইতেছে। একান্তে সঙ্গোপনে ভগবচ্চরণে না বসিয়া লোকে কেবল পরস্পরের মত ও বিশ্বাস লইয়া তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হইতেছে। পূর্ব্বকালের সরল নিষ্ঠা ভক্তি ক্রমশই অন্তর্হিত হইতেছে। সংশয় ও অবিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা বিনয়ের বেশ ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু এই উদারতার মূলে উদাসীনতা। লোকে ধর্ম্মকে ঈশ্বরের সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, মানবীয় সৃষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। যখন সকল ধর্ম্মই মিথ্যা, তখন যে যাহা বিশ্বাস করে করুক না, তাহাতে আর বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি কি? লোকের এই ভাব দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানের উদারতার মূলে এইরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। সমস্ত পৃথিবীময় যেন একটা সংশয়ের বায়ু বহিতেছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে সার কথা কি? সার কথা এই যে, ভগবান মানুষের প্রার্থনা শ্রবণ করেন কি না এবং ঋষিমহর্ষিগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য কি না? এই মূল কথার মীমাংসা না করিয়া লোকে কেবল অবান্তর কথার আলোচনায় ব্যস্ত। কেহ বলিতেছেন যে সমাজরক্ষার জন্য ধর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কেহ বা স্বীকার করিতেছেন যে ধর্ম্মভাব মানুষের প্রকৃতি-নিহিত, ইহার বিনাশ নাই। যদি কেহ বলেন যে, ধর্ম্ম বিনা মানবের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছোট থাকিয়া যায়, এবং মানবের হৃদয় যে কত উচ্চ ও কত গভীর হইতে পারে ধর্ম্মই তাহার সাক্ষী, তাহাতেও অনেকের আপত্তি নাই। ধর্ম্ম যে পাপীকে অনুতাপের আগুনে পোড়াইয়া নির্ম্মল করে, দুর্নীতি ও অনাচার হইতে উদ্ধার করে, কঠিন কর্কশ হৃদয়কে প্রেমে আর্দ্র করে এবং মানবের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে একটা উন্নত জীবনের আদর্শ স্থাপন করে—তাহাও অনেকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু মানবের ধর্ম্মজীবন কি তাহার জাগ্রৎ অবস্থা? না, তাহার নিদ্রিত অবস্থা? মহাজনগণ যে সাক্ষাৎ অনুভূতির কথা বলেন, যে ধ্যানলব্ধ দর্শন-শ্রবণের কথা বলেন, তাহা সত্য না স্বপ্ন—সন্দেহ এই স্থলে। যাঁহারা ভূতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা যেমন অনেক সময় আপনাদেরই মনঃকল্পিত ভূত দেখিয়া ভীত হন; শোকে যাঁহারা আকুল তাঁহারা যেমন অনেক সময় মৃত প্রিয়জনের মুখ মনশ্চক্ষে দেখিয়া থাকেন; অনেকে মনে করেন যে ভক্তের হৃদয়ে ভগবান ও স্বর্গের অনুভূতিও সেইরূপ কল্পনা। এই সন্দেহ দূর করিতে না পারিলে মানব-অন্তরে ধর্ম্মের শক্তি জাগিবে না।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাসী তাহাকে যদি কেহ বলে, "হাঁ, তোমার মত ও বিশ্বাসগুলি বড় চমৎকার! তবে তোমার কাছে ওগুলি সত্য বলিয়া লাগে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ওগুলি কিছু নয়, সমস্তই কল্পনা।" এ কথা শুনিয়া সে লোকটি সকাতরে চীৎকার করিয়া বলিবে না কি—"যাহা আমি মানি তাহা আমি সত্য বলিয়াই জানি; আমি যাহার সাক্ষ্য দিতেছি তাহা আমার জীবনের পরীক্ষিত কথা; যদি আমার সাক্ষ্য তুমি সত্য বলিয়া গ্রহণ না কর, তবে আমার মত ও বিশ্বাসগুলি বড় চমৎকার, এরূপ ভদ্রতার কথা আমার কাছে অসহ্য। পরমেশ্বর ও তাঁহার স্বর্গরাজ্য আমার কল্পনা নহে, কিন্তু স্বপ্রকাশ সত্য বস্তু। আমি ভগবানের আলোকেই ভগবানকে দর্শন করিয়াছি এবং স্বর্গের আলোকেই সেই দিব্যধাম দেখিয়াছি।" বাস্তবিক, আমরা জড় ও চৈতন্যের অন্তরালে

যে জ্যোতির্ম্ময় দেবতাকে অন্তশ্চক্ষে দেখিতেছি, অন্যে যদি তাঁহাকে না দেখে; যদি জীবনের দুর্দ্দশার দিনে আমরা নিজেরাই সেই দেবতার মুখ আবার হারাইয়া ফেলি, এবং সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া মনে করি যে, হয়ত একদিন যাহা দেখিয়াছিলাম বুঝি বা তাহা স্বপ্নই ছিল,—সেই জন্য কি আমাদের দেখা মিথ্যা হইবে? দিবালোকে যাহা দেখিয়াছি, রজনীর অন্ধকারে তাহা দেখিতে না পাইলে, দিবসের দেখা কি কল্পনা হইবে? দেখার অবস্থাকে চক্ষুর বিকার, আর না দেখার অবস্থাকে চক্ষুর স্বাভাবিক অবস্থা মনে করিবার যুক্তি কি? হৃদয়ের নির্ম্মল অবস্থায় মানুষ ঈশ্বরকে কল্পনা করে, এই কথাই সম্ভব? না, হৃদয়ের মলিন অবস্থায় পাপের কুজ্ঝটিকা ভগবানকে ঢাকিয়া ফেলে, এই কথাই সম্ভব? দুশ্চিন্তার প্রহারে যখন আমরা অধীর হই, কর্ত্তব্যের ভার যখন বড় গুরু বোঝা বলিয়া লাগে, বিবেকের যখন দুর্গতি উপস্থিত হয়, ভোগলালসা যখন প্রবল হইয়া উঠে, এবং হৃদয় যখন অবসাদে ম্রিয়মাণ হয়—তখনই ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অবিশ্বাস আমাদিগকে আক্রমণ করে। যাহারা বলে যে ধর্ম্ম স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, ভগবান মানুষের সুললিত কল্পনা মাত্র,—তাহাদের কথায় আমরা এই উত্তর দিব যে, আমাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসই আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্গতির ছায়া, আমাদের পাপই মেঘের আকার ধারণ করিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আচ্ছন্ন করে।

বিশ্বাসের দ্বারা আমরা প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হই বা সন্দেহের দৃষ্টি আমাদিগকে সত্যদর্শনে সমর্থ করে, এ প্রশ্ন যে শুধু ধর্ম্মের বেলাতেই উঠে, তাহা নহে। জীবনের যে বিভাগেই প্রীতি ভক্তি সৌন্দর্য্য ও আনন্দের কথা আছে, সেইখানেই আমাদের বিশ্বাস ও সন্দেহ, আমাদের দর্শন ও অন্ধতা—আমাদের হৃদয়ের অবস্থার উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মরাজ্যের বাহিরেও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এমন লোক আছেন, যাঁহার কাছে একটি উচ্চ ভাবের কবিতা পাঠ কর, তিনি ঐ কবিতাটির ভাবের সৌন্দর্য্যে বিহ্বল ও আত্মহারা হইবেন, কবিতাটি শুনিবামাত্র তাঁহার অন্তরের নিভৃতে যেন কত স্বর্গীয় সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিবে; কিন্তু আবার এমন লোকও আছেন যিনি ঐ কবিতাটীর মধ্যে মুগ্ধ হইবার মত কোন-কিছুই খুঁজিয়া পাইবেন না। একটী রমণীর মুখে তুমি দেখিলে কত লাবণ্য, কত স্নেহ-করুণা, কত স্বর্গের পবিত্রতা; আর আমি দেখিলাম ললাট ও গণ্ড, নাসিকা ও চিবুকের গঠন ও বর্ণ। আমার দৃষ্টিশক্তি উত্তম হইতে পারে, কিন্তু ঐ মুখখানিতে যাহা দেখিবার আছে তাহা দেখিল কে? আমাদের দুইজনের দেখার মধ্যে যে প্রভেদ তাহার মূলে বহিশ্চক্ষুর ভিন্নতা নয় কিন্তু হৃদয়ের ভিন্নতা। একজন সাধারণ লোকের মৃত্যু হইলে যাহারা তাহাকে অল্প অল্প চিনিত তাহারা শুষ্কভাবে তাহার দোষ ও গুণের আলোচনা করে; কিন্তু তাহার আত্মীয়স্বজন তাহার সদ্‌গুণের কথাই স্মরণ করেন; তাঁহারা যে ঐ ব্যক্তির দোষদুর্ব্বলতার কথা জানিতেন না তাহা নহে, বরং বাহিরের লোক অপেক্ষা অনেক অধিক জানিতেন; কিন্তু সে কিরূপ প্রলোভন ও ঘটনাচক্রে পড়িয়া সুপথ হইতে স্খলিত হইয়াছিল, নিজের অপরাধের জন্য সে কত লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিল, সে ভাল হইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিল—এসব কথা বাহিরের লোকে জানিত না কিন্তু তাঁহারা জানিতেন। তাই আজ তাঁহারা প্রেমের সহিত তাহার সদ্‌গুণের কথাই স্মরণ করিতেছেন এবং দিব্যধামবাসী সাধুদের মধ্যে আজ তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। অরণ্য ও পর্ব্বতের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, সমুদ্রের নীলকান্তি ও উত্তাল নৃত্য ভাবুকের প্রাণকে অপার আনন্দে প্লাবিত করে কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য অপর একজনকে স্পর্শমাত্রও করে না। প্রেমভক্তির চক্ষে প্রকৃতির মুখে যে শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখা যায়, তাহা কি সত্য, না তাহা কল্পনা? যাহা নাই তাহাও আমরা কখন কখন কল্পনা করি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যাহা আছে তাহাও আমাদের হৃদয়ের অন্ধতাবশতঃ আমরা দেখি না। সময়ে সময়ে হঠাৎ যেন আমাদের চমক ভাঙ্গে, আমরা নিজ নিজ হৃদয়ের অন্ধকার কূপ হইতে উঠিয়া যেন একটী উদার উন্মুক্ত রাজ্যে উপনীত হই ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করি। একবার যখন আমরা প্রকৃতির সেই মাধুর্য্য ও লাবণ্য দর্শন করি তখন আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে ইহা মিথ্যা নয়, কল্পনা নয়, হৃদয়ের প্রতারণা নয়, কিন্তু ইহাই সত্য। শুধু হৃদয়ের অন্ধতা ও অসাড়তা বশতঃই এতদিন ইহা দেখি নাই।

বিশেষ ধর্ম্মের যাহা সার কথা, হৃদয়কে ছাড়িয়া শুধু চক্ষুকর্ণে ও বুদ্ধির সাহায্যে, তাহা বোধ হয় আমরা ধরিতে পারি না। এই ব্রহ্মাণ্ড যদি সত্যই একটি প্রাণহীন যন্ত্র হইত; প্রকৃতি যদি পরমাণুপুঞ্জের রঙ্গভূমি হইত; যদি জীবন-মৃত্যুর অন্তরালে কেবল অন্ধ জড়শক্তি থাকিত; যদি সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য না থাকিত; যদি ঘূর্ণ্যমান গ্রহ-উপগ্রহগণ কেবলমাত্র নিয়তির তালে তালে নৃত্য করিত; যদি সুস্নিগ্ধ উষালোকে স্নেহ-করুণার বার্ত্তা না থাকিত; যদি বায়ুর হিল্লোল ও নির্ঝরিণীর কলতান ভাবহীন ও অর্থহীন হইত; যদি মানবের আশা, শোক ও বিবেক কেবল স্নায়ুর স্পন্দন মাত্র হইত —তাহা হইলে জগৎ সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইত, জগতে বুদ্ধির অগম্য ও চক্ষু-কর্ণের অগোচর

বিছুই থাকিত না। কিন্তু বিশ্বের অন্তরালে বিধাতা আছেন, এই কথা যদি সত্য হয়; প্রকৃতি যদি মানবাত্মা ও পরমাত্মার যোগের সেতু হয়; যদি বিশাল জলধিবক্ষে ও নক্ষত্রখচিত নীরব নৈশাকাশে তাঁহার পরিচয় থাকে; যদি এই দৃশ্যমান বহির্জ্জগৎ ও এই অতীন্দ্রিয় সুগভীর মানবের অন্তর্জ্জগৎ তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানের নিদর্শন হয়; বিবেক তাঁহারই বাণী—একথা যদি সত্য হয়; জীবনের শোক দুঃখ পরীক্ষার মধ্যে যদি দৃঢ়তর নির্ভর ও বিশ্বাসের জন্য তাঁহার আহ্বান থাকে; যদি পবিত্রতার আগামনী আকাঙ্ক্ষা তাঁহারই পুণ্যস্পর্শ হয়—তবে তাঁহার সহিত আমাদের ইচ্ছার যোগ ব্যতীত, কি বহির্জ্জগৎ কি অন্তর্জ্জগৎ, কিছুরই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের অসাধ্য।

আমাদের মনের অবস্থা কখন ভাল কখন বা মন্দ হয়। হৃদয় কখন প্রেমে সরস, উৎসাহে জীবন্ত, আনন্দে পূর্ণ থাকে; আবার কখন হৃদয়ের এমনি দুর্গতি হয় যে, কোন কিছুরই ভাল দিক আমরা দেখিতে পাই না, কিছুতেই আনন্দ পাই না, কোন কাজেই উৎসাহ থাকে না, মনটা যেন পাষাণবৎ কঠিন হইয়া যায়। এই দুইটি অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থাই কি আত্মার প্রকৃত অবস্থা, আর প্রথমটিই কি বিকৃতি? যখন এইরূপ দুর্দ্দশা চলিয়া যায়, তখন কি মনে হয় না যে, হৃদয়ের মধ্যে যে অন্ধকার দেখিতেছিলাম, তাহা আমাদেরই হৃদয়-নিঃসৃত মেঘের ছায়া?

শুধু চক্ষু থাকিলেই হইবে না, শুধু বাহির দেখিলেই চলিবে না; জগতের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে হইলে হৃদয়ের প্রয়োজন—বিধাতার গভীর মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং দর্শন-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অপেক্ষাও নিঃস্বার্থ সরল হৃদয়ের প্রয়োজন।

দেখিবার ও শুনিবার শক্তি অনেক ইতর প্রাণীরও আছে। মানুষ কি শুধু পশু-পক্ষীর মত চক্ষু-কর্ণের বার্ত্তা গ্রহণ করিবে এবং বিবেক ও হৃদয়ের বাণী তুচ্ছ করিবে? গরু ভেড়াও ত পাহাড়-পর্ব্বত, বৃক্ষলতা দেখিতে পায়; অরণ্যের মর্ম্মরধ্বনি ও সমুদ্রের গম্ভীর নির্ঘোষ তাহাদেরও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রকৃতির চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া তাহার পশ্চাতে অনন্ত স্বরূপকে তাহারা দেখে না। তবে যে গৌরব ও মহিমা দেখিয়া তোমার কণ্ঠ হইতে বন্দনার গীত উত্থিত হইতেছে, তাহা কি মিথ্যা? যে স্বর্গীয় শোভায় মুগ্ধ হইয়া তুমি নিস্তব্ধ ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেছ, যেন অরণ্য পর্ব্বত ও আকাশের মর্ম্মস্থল হইতে কি এক অদৃশ্য প্রবাহ আসিয়া তোমার হৃদয়কে আলিঙ্গন করিতেছে—ইহা কি মিথ্যা? এরূপভাবে মুগ্ধ হওয়া মানবেরই ত বিশেষ অধিকার। কিন্তু ইহা যদি মিথ্যা হয়, তবে ত মানুষ অপেক্ষা গরু-ভেড়াকেই শ্রেষ্ঠ মানিতে হয়; কারণ এ সব মিথ্যা বিড়ম্বনা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

দেখা তবে দুই প্রকার। একদিকে বুদ্ধি ও চক্ষুর সাহায্যে বাহ্যদর্শন, অপর দিকে প্রেম ও ভক্তির আলোকে অন্তর্দৃষ্টি। পুণ্য, শান্তি, কোমলতা, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি ভাবের বিষয় বহিশ্চক্ষুর অগোচর। হৃদয়কে বিদায় করিয়া দেও, মানবজীবন ও প্রকৃতির রহস্য তোমার নিকট নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য হইবে। এক একজন সাধুর উপদেশে বা ভক্তের গানে কত পাপীর জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। আবার সেই গান ও সেই উপদেশ কত লোককে স্পর্শমাত্রও করে না। এই বিভিন্নতার মূলে একজনের শ্রদ্ধা ও দ্বিতীয় ব্যক্তির শ্রদ্ধার অভাব। যদি মানুষের কথা বুঝিবার জন্য এত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ভক্তির প্রয়োজন, তবে কি বলিব যে আমাদের আত্মার আত্মা যিনি, অসীম প্রকৃতির কাব্যের কবি যিনি, যাঁহার বিধানে এক দিকে উষার সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে, অপর দিকে আমাদের হৃদয়-বীণায় সেই সঙ্গীতের ঝঙ্কার বাজিতেছে—সেই ভগবানের সুগম্ভীর বাণী শুনিবার ও বুঝিবার জন্য কি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের প্রয়োজন নাই?

যখনই নিভৃত চিন্তা বা কর্ত্তব্যের প্রেরণা বা শোকের কশাঘাত আমাদিগকে জীবনের উচ্চভূমিতে লইয়া যাইবে, এবং অন্তরের অন্তরে একটী অস্ফুট স্বর্গীয় ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকিবে, তখন কে আমাদের নিকটে আসিয়াছেন, তাহাতে যেন আমরা সন্দেহ না করি। সেই ধ্বনি আমাদের নিজের নয়। সে ধ্বনি আমাদের কল্পনা নয়। তখন যেন আমরা ভক্তিভরে ভগবচ্চরণে প্রণাম করি। জীবনের হীন অবস্থায় যে অবিশ্বাস ও অন্ধকার আমাদিগকে আক্রমণ করে তাহাকেই যেন আমরা মিথ্যা বলিয়া মনে করি, এবং শুভমুহূর্ত্তে এই অবিশ্বাস ও অন্ধকার ভেদ করিয়া যে স্বর্গের আলোক আসিবে তাহাকে সারাৎসার সত্য জানিয়া তাহাকে মানবাত্মার পরমাত্মার পুণ্য স্পর্শ জানিয়া, তাহাকে স্বপ্রকাশের আবির্ভাব জানিয়া আমরা যেন সেই আলোকের নিকট হৃদয় উন্মুক্ত করিতে পারি।

Lord Buddha's Message OF WORLD-PEACE

ACHARJYA Sj. KSHITINDRA NATH TAGORE

[The following was delivered by Acharya Sj. Kshitindra Nath Tagore from the chair,

when presiding over the "Buddhastami" meeting of the Bubdhist Indian Society at the Mahabodhi Society Hall on the 16th instant]

When virtue is on the wane and vice reigns rampant, it is then that the benign Providence sends to this earth a great man endowed with His power to re-establish spirituality and to secure bliss to the people. In this way, age after age, great men have come, each with his own great message, which finds a ready response in the heart of men of his era.

Since the last great European War, it is the message of peace which is ready there to receive response from the whole world. When this message of peace is being proclaimed by practically all the nations of the world; when the whole world is busy in explaining the good effect of the World-peace, when and if established, the mind's eye of the Indians goes back to those far-off times, when perhaps out of the disgust and repugnance arising from the then internecine quarrels, the hearts of the people of India yearned for peace, there arose the Lord Buddha with his grand message of peace.

It was his bright torch of peace, which drove away the impenetrable darkness of ignorance and brought the bliss of peace in place of bloody feuds and quarrels; the sweetscented rose of brotherly feeling blossomed forth from the ashes of deadly hostilities.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE

So far as we understand it, the fundamental principle of Buddism is—Peace first, peace second, and peace last. The religion that has the establishment of peace as its goal, very naturally took to antiviolence as its means of propagation. The result of its this form of propagation was the establishment of hundreds of "Bihars" and wonder-inspiring rock-cut temples. It is this idea of peace and its inevitable corollary of doing good to others, that led the great King Asoka to adopt Buddhism and arrange for its propagation far and wide through good works. It is the peaceful penetration, not in the sense of its modern political propagandists, but in its true sense, of Buddhism, that has made it a standard religion for ages, not only in India, its fountain head, but also in the far-off continents like America and the far-off countries like Tibet, China and Japan.

About half a century ago or more, the Savants of the West took a sudden predilection to this religion, perhaps having noticed all over the world the grand things it has been able to bring about, and began to study it assiduously. The results of their study and research were disseminated throughout the world, more particularly among the nations of the West. The educated communities of the West, I may say, were saturated with the sober and peacemaking ideas of Buddhism. Who can say that it is not this Buddhistic culture that helped a good deal in the speedy termination of the last great war?

IS IT ATHEISM?

This religion, which brings solace and peace to hundreds of milions of people, is often and anon spoken of as God-denying religion. I could not believe it and from whatever little I have studied of Buddhism, I have come to this conclusion that it is not at all a God-denying religion. The only thing that can be said in this matter is, to my mind, that the Buddha would not argue or bandy words either for or against the existence of God, as that was likely to bring about unnecessary and useless disputes and quarrels, which were perhaps in evidence in his time to superfluity. From his conversation with the Brahmin Vasistha, it appears that the Lord Buddha drew out from him the true conception of the Godhead. Had he been an atheist in his heart, he would never have done so.

The real aim of Buddhism is to lead people to do good works and as a great help towards this, to adopt renunciation and asceticism. To my mind, this seems to be the central point of the teachings of Buddha. Not that this idea could not be found in the more ancient Shastras of the Hindus, but that it cannot be gainsaid that it was the Lord Buddha who laid special emphasis on this point. In fact, we find, it is those truths from Hinduism that have been given special emphasis and more particularly

dilated upon by Lord Buddha, that have come to stay as the fundamental truths underlying Buddhism.

AN APPEAL

In conclusion, what I have to urge is to ask both the Hindus and the Buddhists not to look askance at each other, but to extend to each other hands of fellowship, when the sweet morning breeze of unity has commenced to blow not only in Bengal, not only in India, not only in the East, and not only in the West, but in the whole world; and by trying to do good to ourselves and to our neighbours, bring about the fulfilment of the purpose of the Lord Buddha's advent to this world. Let the Hindus remember that it is *their* Lord Buddha, it is one of the incarnations of the God *they* worship, whose teachings have been accepted by the hundreds of millions of people living beyond the Himalayas. At the same time, let Buddhists all over the world ponder well that it is *India* that produced the Lord Buddha, and it is the great teachers of Buddhism like Dipankar, who were born in *Bengal* and went to preach this great religion without the least fear not only to the inhabitants of the Near-East, e. g. Tibet, China and Japan, but even to those of the far-West, America and other places.

Let us forget our differences and embrace each other and re-conquer our lost throne by our united effort and place once more the crown of ancient glory on the head of the East, the mother of all religions.*

কুরুসিংহাসনের উত্তরাধিকার।

(শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল)

মহাভারতের আখ্যায়িকাভাগের মূল সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা ভুল।

মহাভারতের আখ্যায়িকাভাগের মূল সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা এই যে, কুরুপাণ্ডবের মধ্যে যে কুরুক্ষেত্র মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা হস্তিনায় কুরুসিংহাসন লইয়া; এবং দুর্য্যোধনের দুর্নীতি ও উক্ত সিংহাসনে তাঁহার অন্যায় দাবীর জন্যই—তাঁহার দোষেই—ভারতের ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী উক্ত ভয়াবহ যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছিল এবং যুধিষ্ঠিরই উক্ত সিংহাসনের প্রকৃত ও ন্যায্য অধিকারী ছিলেন।

ধীরভাবে মহাভারত-পাঠে দেখা যাইবে যে সমগ্র মহাভারতের লক্ষ্য বা কেন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে এক ধর্ম্মরাজ্য বা মহাভারত সংগঠন বা স্থাপন। তদুদ্দেশ্য সাধনার্থ শ্রীকৃষ্ণ তদানীন্তন রাজনীতিক্ষেত্রে যে দাবা-খেলার "চাল" পাতিয়াছিলেন, তাহাতে কুরুসিংহাসন তথা কুরুপাণ্ডবের এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইতিহাস একটা উপলক্ষ্য বা পণ মাত্র। খেলোয়াড় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

মহাভারতের এই লক্ষ্যস্থল নানা ঘটনার ও বিষয়ের অন্তরালে যেন রক্ষিত। এই অন্তরাল ভেদ করতঃ লক্ষ্য-স্থলে পৌছিলে মহাভারত-রচয়িতার অপূর্ব্ব কৌশল, সৌন্দর্য্যজ্ঞান ইত্যাদির পরিচয়লাভে ধন্য হইতে পারা যাইবে এবং মহাভারত বোঝা সহজ হইবে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও তৎস্থাপিত ধর্ম্মরাজ্য বা মহাভারতের বিষয় যথাস্থানে আলোচনার জন্য রাখিয়া এক্ষণে অগ্রে উক্ত অন্তরালগুলি ভেদ করা দরকার। তদুদ্দেশ্যে প্রথমেই কুরুপাণ্ডবের কথা আলোচনা করিব।

সবিশেষ প্রণিধান-পূর্ব্বক মহাভারত-পাঠে আরও জানা যাইবে যে, দুর্য্যোধনের দোষ ও দুর্নীতি এবং তাঁহার ও যুধিষ্ঠিরের দাবী প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণের অনেক ভুল ধারণা আছে; কারণ যৎকালে কুরুসিংহাসন লইয়া উক্ত বিবাদের সূত্রপাত হয়, তৎকালে কুরু-সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী ছিলেন দুর্য্যোধন এবং তাঁহার দাবীই যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত ছিল,—যুধিষ্ঠিরের দাবী একেবারেই অন্যায় ছিল।

হস্তিনার কুরুসিংহাসনে কাহার দাবী ন্যায্য—ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের অথবা পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের?

সাবধানে মহাভারত-পাঠে জানা যায় যে মহারাজ পাণ্ডু বনগমনকালে সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে উহা দান করতঃ তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। পরে বনবাসকালে—পাণ্ডব-গণের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বেই পাণ্ডু প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং আইনের দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, যে জিনিস একবার দান করা যায় তাহাতে দাতার আর কোন স্বত্ব-স্বামিত্বাদি থাকে না। অতএব দান করার ফলে দাতার তাহাতে কোনও অধিকার না থাকায় দাতার জাত সন্তানদেরও তাহাতে আর কোনও দাবী-দাওয়া থাকা সম্ভব নয়।

পুনশ্চ—কেহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে বা সন্ন্যাসী হইলে তাঁহাকে বিষয়সম্পত্তি আদি ত্যাগ করিতে হয় এবং তাহাতে একজন না একজন উহার অধিকারী

* Liberty 19. 5. 29.

দাঁড়ান; তখন এই শেষোক্ত ব্যক্তিতে কোনওরূপে ঐ ত্যক্ত সম্পত্তি অর্শাইলে, পরে উক্ত সন্ন্যাসী বা তাঁহার সম্পত্তি আদি ত্যাগের পর উদ্ভূত সন্তানগণ আর উক্ত সম্পত্তি ফেরৎ পাইতে পারেন না।

অতএব আইনতঃ দেখা যাইতেছে যে, পাণ্ডু কর্তৃক দানকৃত কুরুসিংহাসনে পাণ্ডুপুত্রগণের কোনই অধিকার ছিল না; সুতরাং তাঁহারা তাহা ফেরৎ পাইবারও দাবী করিতে পারেন না।

এক্ষণে মহাভারতের ঘটনাবলী হইতে উক্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন কি না তাহা দেখা ও বোঝা দরকার; এবং তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রশ্নটি সংক্ষেপে পুনরায় বলিয়া রাখি, উহা এই—হস্তিনার কুরুসিংহাসনে ন্যায্য দাবী কাহার—পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অথবা ধার্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের?

১।

শান্তনুর বংশাবলী—পাণ্ডুর রাজ্যলাভ।

মহাভারত (আদি, সম্ভব—৯৯ হইতে ১০৯ অধ্যায়) হইতে জানা যায় যে মহাত্মা শান্তনুর তিনপুত্র—গঙ্গাদেবী-গর্ভে গাঙ্গেয় দেবব্রত, ইনি পরে ভীষ্ম নামে খ্যাত হন; এবং সত্যবতীগর্ভে—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। ভীষ্ম সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করায় শান্তনুর দেহান্তে চিত্রাঙ্গদ রাজা হন। গন্ধর্ব্বসহ যুদ্ধে তিনি নিহত হইলে অপুত্রকবিধায় তাঁহার কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে তাঁহার ক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্য্যের জননী সত্যবতীর কানীন-পুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে তিন পুত্র জন্মলাভ করিয়াছিলেন—জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, মধ্যম পাণ্ডু ও দাসীগর্ভসম্ভূত বিদুর সর্ব্বকনিষ্ঠ। "ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, বিদুর পারসব সুতরাং পাণ্ডুই সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।" (ঐ ঐ ১০৯ অধ্যায়)

এই স্থলে "সুতরাং" শব্দের ব্যবহার দৃষ্টে বোধ হইবে যে, পাণ্ডুর পূর্ব্বে কুরুসিংহাসনে তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার দাবী বিচারপূর্ব্বক তাঁহারা অনধিকারী বিবেচিত হওয়ায় এবং বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদ্বয়ও বেদব্যাসের সহবাসে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনে অনিচ্ছুক থাকায় কুরুগণ যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই "অগত্যা" পাণ্ডুকেই সিংহাসন দিয়াছিলেন।

২।

পাণ্ডুর বনগমন—দানসূত্রে ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যলাভ।

মহারাজ পাণ্ডু কিয়ৎকাল রাজ্যবৃদ্ধি ও ভোগ করণান্তর তাঁহার দুই মহিষী কুন্তী ও মাদ্রী সহ বনগমন করিয়াছিলেন।

মহাভারতে (উদ্যোগ, ভগবদ্‌যান, ১৩৪ অধ্যায়) দৃষ্ট হইবে যে কুরুসভাপ্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণ বিরাটালয়ের সভামধ্যে, কুরুসভায় দ্রোণের উক্তি যুধিষ্ঠিরকে শুনাইতেছেন। উক্ত শ্রীকৃষ্ণ-কথিত দ্রোণ-বচনে দেখা যায় যে, পাণ্ডু জ্যেষ্ঠভ্রাতা "ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। ... বিদুর বিনীতভাবে কিঙ্করের ন্যায় চামর ব্যজন দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। সমুদয় প্রজাগণ নরাধিপতি পাণ্ডুর ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ... মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনস্থ হইয়া মহামতি বিদুরের পরামর্শানুসারে অন্যান্য রাজকার্য্যসকল পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।"

উপরি উদ্ধৃত দ্রোণবাক্যমধ্যে যে কথাগুলির নিম্নে দাগ দেওয়া (underlined) হইল, ঐ কথাগুলির উপর মনোযোগ দিয়া উক্ত উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে:—(১) বনগমনকালে পাণ্ডু তদীয় অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে "সংস্থাপন" অর্থাৎ চলিত ভাষায় বসাইয়া দিয়া বা দান করিয়া গিয়াছিলেন। (২) [তৎকালে প্রজাগণের অনভিমতে কেহই রাজা হইতে পারিতেন না; সুতরাং প্রজাগণের রাজা মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা ছিল (প্রবন্ধান্তরে দ্রষ্টব্য) ইহা স্মরণ রাখিয়া বুঝিতে হইবে যে,] বিদুর ও প্রজাগণ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। (৩) সিংহাসনস্থ হওয়ার পর ঐস্থলে ধৃতরাষ্ট্রকে "নরপতি" বলিয়া উল্লেখ আছে; এবং (৪) তিনি "সিংহাসনস্থ" হইয়া রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

ক্ষুদ্র হইলেও একটা কথা এইস্থানে মনে রাখা উচিত যে, পাণ্ডুর রাজত্বকালে সিংহাসনাধিষ্ঠিত পাণ্ডুকে "মহারাজ" এবং ধৃতরাষ্ট্রকে "রাজা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা,—উক্ত "রাজা" (ধৃতরাষ্ট্র) মহারাজ "পাণ্ডুর প্রভাবে বহুদক্ষিণ শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিলেন" (মহাভারত আদি, সম্ভব ১১৪ অধ্যায় ও অন্যত্র)। কিন্তু পাণ্ডুর সিংহাসনাদি ত্যাগের পরে ধৃতরাষ্ট্র "মহারাজ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কেন? উত্তর মনে হয় এই যে, যৎকালে পাণ্ডু রাজত্ব করিতেন তৎকালে তিনিই "মহারাজ" বলিয়া অভিহিত হইতেন; এবং তিনি রাজ্য ত্যাগ করিবার পর হইতে অথবা যখন হইতে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর প্রদত্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তদবধি তিনিই "মহারাজ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনা ও উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রতীতি হইবে যে, ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধত্বপ্রযুক্ত সিংহাসন প্রথমে না

পাইলেও তাঁহার কনিষ্ঠ ও রাজ্যপ্রাপ্ত মহারাজ পাণ্ডুর নিকট দানসূত্রে পরে উহা প্রাপ্ত হন।

সম্ভবতঃ এই জন্যই মহাভারত আদি পর্ব্বের ১১৪ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, পাণ্ডুর বনবাসকালে "তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত।" পাণ্ডু যদি রাজ্যত্যাগ না করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই লিখিত হইত যে, পাণ্ডুর ভৃত্যগণই তাঁহার প্রয়োজন সাধন করিত। কিন্তু পাণ্ডু রাজ্য ত্যাগ করা হেতুই "ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত ভৃত্যগণের" কথা সম্ভবত উল্লিখিত হইয়াছে।

৩।

পাণ্ডুর প্রব্রজ্যাগ্রহণ।

আরও একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে দ্রষ্টব্য। বনে কিয়ৎকাল সপত্নীক বাসান্তর পাণ্ডু সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ হস্তিনাপুরে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন যে তিনি "আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না"।

প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিলে হিন্দুশাস্ত্র বা আইন ও প্রথানুসারে সম্পত্তি আদি ত্যাগ করিতে হয়। তর্কস্থলে যদিই বা ধরিয়া লওয়া হয় যে, প্রব্রজ্যাগ্রহণকালে সম্পত্তি বা রাজ্যাদিতে পাণ্ডুর কোনও স্বত্বাদি অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইলে ইহাও সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করায় রাজ্যাদিতে পাণ্ডুর যাহা কিছু স্বত্ব-স্বামিত্বাদি অবশিষ্ট ছিল তৎসকলই তৎকর্ত্তৃক তৎকালে নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

প্রব্রজ্যা-গ্রহণকালের বহু পরে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পঞ্চপুত্রের জন্ম হইয়াছিল; সুতরাং সন্ন্যাসগ্রহণকালে পাণ্ডুর নিজাধিকারাদি উক্ত পুত্রগণের অনুকূলে পরিত্যাগ বা দান করা সম্ভবপর ছিল না এবং তিনি তাহা করেনও নাই।

সুতরাং পাণ্ডু যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, আর ফিরিলেন না তখন সিংহাসনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? সিংহাসনাধিষ্ঠিত রাজা না থাকায় রাজ্য অরাজক হইয়াছিল অথবা অপর কেহ রাজা হইয়াছিলেন? পাণ্ডুই বা তাঁহার ভবিষ্যৎ অধিকারী 'কে' হইবেন, প্রব্রজ্যাগ্রহণকালে তাহা নির্ণয় করিয়া দেন নাই কেন? এই সকল প্রশ্ন স্বতই এস্থলে মনে উদয় হয়।

এক্ষণে এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা যথাসম্ভব মহাভারত হইতেই দেখা যাক। উত্তরার্থ শেষ প্রশ্নটী প্রথমেই গ্রহণ করা যাইতেছে।

প্রব্রজ্যার সংবাদ হস্তিনায় প্রেরণকালে পাণ্ডু যে তৎসিংহাসনের অধিকারী কে হইবেন ইহা নির্ণয় করিয়া দেন নাই, তাহার কারণ আমার মনে হয় একমাত্র ইহাই যে, তিনি বনপ্রস্থানকালের পূর্ব্বেই স্বীয় অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসন দান করিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং প্রব্রজ্যাগ্রহণকালে তাহা পুনরায় নির্ণয় করিবার আর কোন আবশ্যক হয় নাই এবং পাণ্ডুও তাহা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

প্রথম দুইটী প্রশ্নের উত্তর এই যে, তৎকালে ও তৎকালের পূর্ব্বে ও পরে ধৃতরাষ্ট্রই সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন; সুতরাং রাজ্য অরাজক হয় নাই। মহাভারতে (আদি, সম্ভব—১০২ অধ্যায়) দৃষ্ট হইবে যে মহাত্মা শান্তনুর দেহান্ত হইলে পর "ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে পর ভীষ্মই বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ও পরম যত্নে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে ত্রুটী করিতেন না। বিচিত্রবীর্য্যও ভীষ্মের আদেশানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন"। বিচিত্রবীর্য্যের যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর পর সত্যবতী তৎকালে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত ব্যাসদেবকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্যাসদেবের সহিত কথোপকথন সময়ে সত্যবতী বলিয়াছিলেন যে "অকালিক পুত্র জন্মিলেও ভীষ্ম তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন"। (মহাভারত, আদি, সম্ভব—১০৫ অধ্যায়) উক্ত আদি-পর্ব্বের ১০৯ অধ্যায়ে পুনশ্চ দৃষ্ট হইবে যে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্রগণকে ভীষ্মই প্রতিপালন ও রাজ্য পরিরক্ষণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং পাণ্ডু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে পর রাজ্য যদি অরাজক হইত, তাহা হইলে রাজ্যের বিশেষ ব্যবস্থা অবশ্য ভীষ্মকেই করিতে হইত, এবং মহাভারতেও তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হইত। কিন্তু এবম্প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয় নাই বা করিবার প্রয়োজনও হয় নাই। কেন? উপরে শেষ প্রশ্নের উত্তর যাহা, এই প্রশ্নেরও উত্তর তাহাই অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর নিকট দানসূত্রে রাজ্য ও সিংহাসন প্রাপ্ত হওয়ায় এরূপ কোন ব্যবস্থার আদৌ আবশ্যক হয় নাই।

পাণ্ডু কর্ত্তৃক সন্ন্যাসগ্রহণের বহুকাল পরে অরণ্যে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পঞ্চপুত্র জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং পুত্রগণের জন্মের বহু পূর্ব্বেই যে সম্পত্তি পাণ্ডু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে অন্য মালিক তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে পাণ্ডুপুত্রগণের আর কোনও ন্যায্য দাবী রহিতে পারে কি?

রাজকুমার বেস্‌সন্তর।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

বুদ্ধজন্ম বাদ দিয়া বোধিসত্ত্বের মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বশেষ জন্ম বেস্‌সন্তর * রূপে। বেস্‌সন্তর জন্মাবধি ধ্যানপরায়ণ।

* বেস্‌সন্তর—বিশ্বন্তর।

পিতা শিবিরাজ্যাধিপতি মহারাজ সঞ্জ এবং মাতা মহারাজ্ঞী ফুসতী এজন্য মহা উদ্বিগ্ন। কুমার সম্বন্ধে আরো আশ্চর্য্য এই যে, সে জন্মাবধিই পরিষ্কার কথা বলিতে পারে এবং দানে তাহার মহা আগ্রহ। কুমারকে সন্তুষ্ট অথচ গৃহাবদ্ধ রাখিবার জন্য মহারাজ তাহার জন্য কারুকার্যময় ধ্যান-গৃহ এবং দানশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। রাজকুমার এক শ্বেতহস্তী আরোহণ করিয়া প্রত্যহ এই দানশালায় স্বহস্তে গরীবদুঃখীকে অর্থ ও আহার্য্যাদি দান করিতে যাইতেন। এই শ্বেতহস্তীর বিশেষত্ব ছিল—সে যেখানে যাইত সেখানেই আশানুরূপ বৃষ্টিপাত হইত।

একবার কলিঙ্গরাজ্যে জলাভাবে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। কলিঙ্গরাজ কুমার বেস্সন্তরের হস্তীর সংবাদ পাইয়া এবং কুমারের দানে অদ্ভুত আগ্রহ জানিতে পারিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে কুমার সমীপে হস্তীটী যাজ্ঞা করিতে পাঠাইলেন। দানশালায় যাইবার পথে কুমার সমীপে তাহারা তাহাদের আবেদন জানাইল। —'ও হস্তীটি! আমার চক্ষুদুটি অথবা শরীরের রক্ত-মাংস চাহিলে তাহাও দিতে প্রস্তুত।' এই বলিয়া কুমার তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং দানের ফলস্বরূপে বুদ্ধত্ব আকাঙ্ক্ষা করিয়া হস্তীটি তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন।

এদিকে শিবিরাজ্যাধিবাসিগণ তাহাদের পরম হিতকারী হস্তীটির এইরূপে ভিন্নদেশে দানের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া রাজসকাশে কুমারের নির্ব্বাসন দাবী করিল। কুমার নিজের যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া বনগমনের উদ্যোগ করিলেন। তাঁহার পত্নী মাদ্রী দেবী তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য জেদ ধরিলেন। অবশেষে তিনি ইহাতে সম্মতি দিয়া পুত্র জলীয় ও কন্যা কৃষ্ণজিনাকে তাহাদের মাতামহীর নিকট রাখিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পুত্রকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া দেহধারণ সম্ভব, মাদ্রী দেবী ইহা কল্পনাও করিতে পারিলেন না। শেষ মুহূর্ত্তে কৃষ্ণজিনা ও জলীয়কে সঙ্গে লওয়াই স্থির হইল।

দানবীর বেস্সন্তর বনগমন করিতেছেন এই সন্ধান পাইয়া, পথে এক লোভী ব্রাহ্মণ তাঁহাদের রথ ও অশ্ব চাহিয়া লইল। রথ ও অশ্ব সেই ব্রাহ্মণকে দান করিয়া রাজকুমার তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যাকে লইয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথশ্রমে অনভ্যস্ত পদ প্রতি-পদেই বাধা পাইতে লাগিল। কিন্তু সে ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তিনি ক্ষতবিক্ষতচরণে চলিতে লাগিলেন। প্রাসাদ-বাসীর দুর্দ্দশা দেখিয়া দেবতারও নয়নে অশ্রু ঝরিল।

মাদ্রী দেবীর পিতা সংবাদ পাইয়া, পুত্রী ও জামাতাকে স্বীয় রাজ্যে লইয়া যাইতে বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াসই বিফল হইল—বেস্সন্তর সত্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। পত্নী ও পুত্রকন্যা সহ তিনি বঙ্ক-গিরিতে প্রস্থান করিলেন। শক্র বোধিসত্ত্বের বঙ্কগিরি অভিমুখে গমনবার্ত্তা পাইয়া পূর্ব্বেই বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে উক্ত গিরিতে দুইটি বাসোপযোগী গুহা প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। বেস্সন্তর পত্নী ও পুত্রকন্যাকে এক গুহায় বাস করিতে দিয়া নিজে অন্য গুহায় আশ্রয় লইলেন। দিনের বেলায় পুত্রকন্যাকে বেস্সন্তরের নিকট রাখিয়া মাদ্রী দেবী অরণ্যে ফলমূলান্বেষণে যাইতেন। বেস্সন্তর অধিকাংশ সময়ই ধ্যানধারণায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই ভাবে দিন বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু অধিকদিন এভাবে কাটিল না—একদিন মাদ্রী দেবীর অনুপস্থিতিতে এক বিকটাকৃতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ভৃত্য করিবার মানসে তাঁহার পুত্রকন্যা দুইটি প্রার্থনা করিল। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনিয়া বেস্সন্তর প্রথমে মনে করিলেন যে, ইহারা মাদ্রী দেবীর প্রাণের প্রাণ; পুত্রকন্যা বিহনে তিনি কি করিয়া প্রাণধারণ করিবেন! কিন্তু অপর দিকে বুদ্ধত্ব—আপনার বলিতে যাহা কিছু, আপনার যথাসর্ব্বস্ব সেই নির্ম্মম যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি না দিলে তো সেই পরমপদ মিলিবে না! বেস্সন্তরের অন্তর ছিন্নবিছিন্ন হইতে লাগিল। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া তীব্র ভৎর্সনার সুরে বলিল—'এই কি তুমি দানবীর! কাপুরুষ তুমি।' ব্রাহ্মণের ভৎর্সনাবাক্যে কুমার আত্মস্থ হইলেন। নিষ্ঠুর দৃঢ় সত্যের জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভের সঙ্কল্প করিয়া দানের নিয়মানুযায়ী ব্রাহ্মণের হস্তে জল ঢালিয়া দিলেন।

নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ আর্ত্ত, ক্রন্দনরত ও যাইতে অনিচ্ছুক সেই শিশুদ্বয়কে বেত্রাঘাত করিতে করিতে টানিয়া লইয়া চলিল। বেস্সন্তর অবিচলিতচিত্তে অপলকনয়নে তাহা দেখিতে লাগিলেন। একবার মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে হইল—মাদ্রী দেবীর প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য; বেস্সন্তর তখনি নিজ চিত্ত সংযত করিয়া স্থির হইলেন। শিশুদিগকে এইভাবে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে যাইতে একস্থানে ব্রাহ্মণের পদস্খলিত হওয়ার সুযোগ পাইয়া তাহারা ছুটিয়া আসিয়া বেস্সন্তরকে জড়াইয়া ধরিল। পুত্রকন্যারা তাহাদের রক্তাক্ত শরীরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পিতার মুখপানে কাতরভাবে চাহিয়া রহিল। জলীয় কোমল অঙ্গে এতাদৃশ নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য হইবে না বলিয়া জলীয় কৃষ্ণজিনার মুক্তি প্রার্থনা করিল। বেস্সন্তর বিমূঢ়ের মত নির্ব্বাক ও নিশ্চল

হইয়া বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার দুই চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল। ক্রোধপ্রজ্বলিত ব্রাহ্মণ ইতিমধ্যে আসিয়া ভ্রাতাভগ্নীকে লতিকা দ্বারা একত্র বন্ধন করিয়া পশ্চাৎ হইতে বেত্রাঘাত করিতে করিতে লইয়া চলিল। বেস্‌সন্তর চক্ষু চাহিলেন, আর তাহা নিমীলিত হইল না। শিশুদ্বয়ের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি তাঁহার সেই দীপশিখার ন্যায় নিবাত নিষ্পন্দ মূর্ত্তিকে নরাকৃতি পাষাণমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া বেস্‌সন্তর ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। গুহায় গমন করিয়া তিনি ধ্যানে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন।

ক্রমে সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িল। সন্ধ্যায় ঘন ঘোর ঘনাইয়া আসিল। বলাকাশ্রেণী তাহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আকাশপথে দিগন্তের পানে ফিরিতে লাগিল। নিস্তব্ধ কাননভূমি ক্রমেই ঝিল্লিরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রী দেবীও ফলমূল সহ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মাতৃহৃদয় আজ অজানা আশঙ্কায় উতলা, গতরাত্রির অশুভ স্বপ্ন মাঝে মাঝে মনে জাগিয়া তাঁহার উদ্বেগ দ্বিগুণিত করিয়া দিতেছিল। বাহির হইতে কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া তিনি নিরতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত গুহায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু একি, গুহা যে শূন্য!—শিশুদ্বয় নাই! ছুটিয়া তিনি স্বামীর প্রকোষ্ঠে গেলেন, সেখানেও তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। ব্যগ্রআবেগে তিনি স্বামীকে প্রশ্ন করিলেন—আমার পুত্রকন্যা! কোথায় তাহারা? বেস্‌সন্তর সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। একটু সংযত হইয়া মাতার প্রাণনাশ আশঙ্কায় বলিলেন—'তোমার বিলম্ব দেখিয়া বোধ করি তাহারা তোমায় খুঁজিতে গিয়াছে'। মাদ্রী দেবী এই কথা শুনিয়া উন্মত্তপ্রায় গুহা হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া চলিলেন,—অন্ধকার কাননপথে পুত্রকন্যাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিলেন। কিন্তু কোথায় তাহারা! নিষ্ঠুর প্রতিধ্বনি বার বার ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহার আকুল আহ্বানের উত্তর দিয়া যেন বলিতে লাগিল--নাই নাই তাহারা নাই। সেই কাননে পুত্রকন্যারা যেখানে যেখানে যাইত, যে যে স্থান তাহাদের প্রিয় ছিল, মাদ্রী দেবী সকল স্থানেই তাহাদের সন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। ক্ষোভে হতাশায় সন্তানশোকে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। পত্নীর বিলম্ব দেখিয়া বেস্‌সন্তর তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। বহুযত্নে সংজ্ঞাহীনার চেতনাসঞ্চার করিলেন। জ্ঞানসঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন,—'আমার সন্তান, তারা কোথায়?' সন্তানশোকে বিহ্বলা মাতার এই আকুল প্রশ্নে বেস্‌সন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইল। কষ্টসংযত-কণ্ঠে তিনি উত্তর করিলেন,—'ভদ্রে, বুদ্ধত্বের আশায় আমি সন্তানদ্বয়কে জনৈক প্রার্থী ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি'। স্বামীপ্রাণা মাদ্রী দেবী আর প্রশ্ন করিলেন না। প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি এই দুঃসহ বেদনা হৃদয় পাতিয়া বরিয়া লইলেন—স্বামীর বুদ্ধত্বলাভেচ্ছার অমর্য্যাদা তিনি করিলেন না।

স্বর্গ হইতে শক্র সমস্ত দেখিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, মাদ্রী দেবীর সেবা ব্যতীত ধ্যানপরায়ণ বোধিসত্বের জীবনধারণ অসম্ভব। যদি কেহ মাদ্রীকে চাহিয়া লয়, তবে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া শক্র বেস্‌সন্তর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পরিচারিকা করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া মাদ্রীকে প্রার্থনা করিলেন। কাতরনয়নে বেস্‌সন্তর জায়ার তাপক্লিষ্ট মুখপানে চাহিলেন। মাদ্রী তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইঙ্গিতে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করিলেন এবং গমনোদ্যত হইয়া বেস্‌সন্তরকে বলিলেন—'মনে রাখিও, ইনি এখন হইতে আমার। এঁর উপর তোমার আর কোন অধিকার নাই। আমি আপাততঃ অন্যত্র যাইতেছি। আমি যত দিন ফিরিয়া না আসি ততদিন ইনি তোমার কাছেই থাকিবেন'। অতঃপর তিনি স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বেস্‌সন্তরের দানে সমস্ত দেবগণের বিস্ময় ও আনন্দসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং আর সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁহার পিতামাতা লোকজন সহ তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া লইতে আসিবেন জানাইয়া গেলেন।

এদিকে সেই নৃশংস ব্রাহ্মণ শিশুদুইটিকে তাড়না করিতে করিতে বহু যোজনান্তরে স্বগৃহে লইয়া গেল। হৃদয়বান দেবতা দুইজন পিতামাতার রূপধারণ করিয়া সুযোগ পাইলেই গোপনে শিশুদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। একদিন এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রাহ্মণ একান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভীত ব্রাহ্মণ পরদিনই শিশুদ্বয়কে তাহাদের পিতামহসমীপে ফিরাইয়া দিতে গেল। প্রতিদানে ধনরত্ন লাভ করিল সে প্রচুর, কিন্তু উপাদেয় আহার্য্যের লোভে অত্যধিক ভোজন করিয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

পৌত্রপৌত্রীকে পাইয়া পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য রাজারাণীর শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে কলিঙ্গরাজের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় তিনি যথাসময়ে কুমারের শ্বেতহস্তী প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কুমারকে ফিরাইয়া আনিতে শিবিরাজের আর কাহারো আপত্তির

কারণ ছিল না। সদলবলে মহারাজ পুত্র ও পুত্রবধূকে বঙ্কগিরি হইতে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন। স্বজন-বর্গের মধ্যে ফিরিয়া যাইবেন ভাবিয়া বেস্‌সন্তর ও মাদ্রী দেবীর আনন আনন্দোদ্ভাসিত হইল। কিন্তু কলিঙ্গ-রাজের নিকট হইতে শ্বেতহস্তী ফিরাইয়া আনা হইয়াছে শুনিয়া লজ্জায়, ক্ষোভে, বিতৃষ্ণায় বেস্‌সন্তরের অন্তর ভরিয়া উঠিল; তাঁহার দীপ্ত বদন হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। যখন শুনিলেন অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় কলিঙ্গরাজ স্বেচ্ছায় হস্তী প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয় হইতে এক গুরুভার নামিয়া গেল; তাঁহার প্রশান্ত মুখে আবার হাসির রেখা দেখিয়া সকলে পরম আহ্লাদিত হইল। মাদ্রী দেবী ব্যগ্র-আগ্রহে শিশুদ্বয়কে কোলে তুলিয়া লইলেন। সকলে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে বেস্‌সন্তর সিংহাসনাধিরূঢ় হইলেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দান-পারমিতার চরম সাধনব্রত উদ্‌যাপিত করিয়া দেহান্তে বোধিসত্ত্ব তুষিত-স্বর্গে গমন করিলেন; এবং তথায় পুনঃ মর্ত্ত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত আত্মস্থ হইয়া রহিলেন।

জাগতিক নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে জগতে বুদ্ধাবি-র্ভাবের প্রয়োজন হইল। অতৃপ্ত-মানবের শান্তিবিধান ও সত্যধর্ম্মের সংরক্ষণকল্পে সেই যুগের আদর্শ সদ্গুণাবলীর একটি ঘনীভূত জীবন্তবিগ্রহের মূর্ত্তবিকাশ আবশ্যক হইল। দশসহস্র সৌরজগতের সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া তুষিত-স্বর্গে অবস্থিত বোধিসত্ত্বকে মর্ত্ত্যলোকে জন্মপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন, কারণ তাঁহারই কেবল অদূর-ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভের কথা। স্থান-কাল বিবেচনা করিয়া তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ক্ষত্রিয়সমাজকেই তখন সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত দেখিতে পাইয়া তিনি শ্রেষ্ঠ শাক্যবংশে পূতচরিত্র রাজা শুদ্ধোদন ও সাধ্বী রাজ্ঞী মহামায়ার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ স্থির করিলেন।

নারী-নৃত্য।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি-এ)

বর্ত্তমানে আর্টের নামে, সুকুমার শিল্পকলার দোহাই দিয়া নারীনৃত্যের সাদর আহ্বানে বাঙ্গালার তরুণসম্প্র-দায়ের কতকগুলি নরনারী মাতিয়া উঠিয়াছেন; তাই আজ সময়ে অসময়ে, অবসরে অনবসরে প্রকাশ্য রঙ্গ-মঞ্চের উজ্জ্বল প্রদীপের দীপ্ত আলোকে শত শত কাম-কামনাবিজড়িত কলুষিত দৃষ্টির সম্মুখে কতকগুলি ভদ্র-রমণী নৃত্যের চপলচরণ বিক্ষেপে শত শত যুবকের মানসরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীরূপে বৃত হইয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছেন। দর্শকের সঘন করতালির মধ্যে উৎক্ষিপ্ত যবনিকার পুরোভাগে চপল হাস্যে, চটুল লাস্যে, সুমোহন নয়নভঙ্গীর অপরাজেয় ক্ষমতায় সমাগত জনমণ্ডলীর চিত্তবিনোদনই আজ সেই সকল নারীর জীবনের কাম্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে। নৃত্য-গীতপটীয়সী হইয়া জনসমাজে সুখ্যাতি অর্জ্জনের স্রোত গোমুখীর গঙ্গাপ্রবাহের মত বিপুলবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে—বাঙ্গালার তথাকথিত শিক্ষিতা রমণীকুলের মধ্য দিয়া; কে তাহার গতি রোধ করে?

এখন দেখা যাউক, এ উন্মাদনা এ উত্তেজনা এ আকুল দৃপ্ত বাসনা নারীজীবনের পক্ষে অনুকূল কি প্রতি-কূল, উন্নতিপথের সহায় কি ক্ষতিকারক, বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বিধানের অনুসরণকারী কি বিরুদ্ধাচারী।

নৃত্যগীত যে সুকুমার শিল্পকলা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মানবের মনোবৃত্তিকে পরিতুষ্ট করিতে এই দুইটির ক্ষমতা অপরিসীম। সুতরাং মানুষ সহজেই দুঃখাতিশয্যে অভিভূত হইয়া মানসিক শান্তিলাভের জন্য নৃত্যগীতের আশ্রয় গ্রহণ করে; সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই রাজা মহারাজা বাদসা প্রভৃতির মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্যগীত-কুশলা রমণী নিযুক্ত থাকিত এবং এখনো অনেক স্থানে আছে; বিশেষতঃ নৃত্য পুরুষের চেয়ে নারী সহজে আয়ত্ত করিতে সক্ষম। কিন্তু ইহাও সঙ্গে সঙ্গে পরিদৃষ্ট হয় যে, ভদ্রসমাজে নারীনৃত্য বিশেষ উৎকর্ষলাভ কোন যুগেই করে নাই, যদিও বেহুলা বা উত্তরার মত দু'একটি নারীর দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে; কিন্তু বাস্তবিকই যদি নৃত্য ভদ্রসমাজের উপযোগী হইত, তবে তাহা জনসাধারণের মধ্যে বিকাশলাভ না করিবার হেতু কি? এমন কি গুপ্ত কারণ বর্ত্তমান, যাহার জন্য নারীনৃত্য ভদ্রসমাজে স্থান লাভ না করিয়া 'নটী' নামে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল?

কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নারীনৃত্য ভদ্রসমাজের উপযোগী নহে; বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যসভ্যতাগঠিত ভদ্রসমাজে নারীনৃত্য কোন কালে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই, যদিও বর্ত্তমানে বিদেশী আবহাওয়ায় নারীনৃত্যের বিপুল স্পন্দন সমাজের অঙ্গে অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে; কিন্তু উহা যে সুফলপ্রসূ হইবে না, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কেন না—

(১) নৃত্য সুকুমার শিল্প হইলেও এমন শিল্প নহে, যাহার চর্চ্চা না করিলে মানবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না বা অন্ন-বস্ত্র পাওয়া যায় না;—উহা বিলাসিতার উপকরণ মাত্র, সুতরাং সংযতচিত্তা বিলাস-ব্যসন-বিরহিতা আর্য্যরমণী বিলাসের স্রোতে পা ঢালিয়া দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। আরও এক কথা, আজ যাহা

বিলাসিতা বলিয়া অনুভূত হয়, কাল তাহাই অভ্যাসবশে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় এবং তখন সেই বিলাসিতার দ্রব্য না পাইলে মানসিক অশান্তিতে হৃদয় ভরিয়া উঠে; নৃত্য সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য।

(২) রমণীজাতির স্বাভাবিক ভূষণ লজ্জা—যা তাহাকে দিন দিন মাধুরীমণ্ডিত করে, তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করে, সংসারের চোখে তাহার কমনীয়তার উৎকর্ষসম্পাদন করে; কিন্তু নৃত্য এই লজ্জাশীলতার হানিজনক। শ্যামপত্রপুঞ্জের অন্তরালে ফুটনোন্মুখী যূথিকার মত নারী স্বভাবসুলভ লজ্জার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া মহীয়সী শোভা বিস্তার করে। আজ যদি হঠাৎ সেই লজ্জাশীলতা ভাঙ্গিয়া দিয়া নারীকে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে হাবভাব প্রদর্শন করিয়া লোকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে হয়, তবে তাহার সে শোভা ও কমনীয়তা দূরে পলায়ন করে; সামান্য রূপজ মোহে মানবহৃদয় একটু আকৃষ্ট হইলেও পরে আর সে নারীর কোন আকর্ষণ থাকে না। তখন তাহার জীবন একটা ব্যর্থতার পূর্ণ আধিব্যাধিরূপে প্রকটিত হয়।

(৩) নৃত্য প্রেমের পথেও একনিষ্ঠতার হানিজনক। মনে করা যাউক, একটি যুবক ও যুবতী (বিবাহিত বা অবিবাহিত) একসঙ্গে বরাবর নৃত্য করে; উভয়ের অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শ হওয়া স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য; এখন কে এমন মহাপুরুষ আছে, যাহার ভিন্ন প্রকৃতির অঙ্গস্পর্শে চিত্ত বিকৃত হয় না, বা মনে কুভাবের সঞ্চার হয় না? অনেকে বলেন—"Too much familiarity inhibits sex-consiousness." অর্থাৎ অত্যধিক মেলামেশায় যৌনবোধ রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু একথার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। কারণ, সূর্য্যের উত্তাপ ও মাখনের মধ্যে যতই ঘনিষ্ঠতা হউক না কেন, একে অন্যকে বিচলিত করিবেই; অগ্নির উত্তাপে লৌহ উত্তপ্ত হইবেই, বরফের শৈত্য অগ্নিতে আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র; সেইরূপ পুরুষ ও নারীর দৈহিক এমন কতকগুলি বিশেষত্ব বর্ত্তমান, যাহা চুম্বক ও লৌহের মত পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। যদি কেহ বলেন যে, রমণীর সাহচর্য্যে তাঁহাদের চিত্ত স্থির থাকে, শত নৃত্যের মাঝখানেও তিনি অবিচলিত থাকেন, অঙ্গে অঙ্গে সংস্পর্শ তাঁহাকে টলাইতে পারে না, তবে আমি তাঁহাকে মিথ্যাবাদী না বলিলেও সত্যের অপলাপকারী বলিতে দ্বিধা বোধ করিব না; কারণ যাহা স্বাভাবিক, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া মানবের সাধ্যাতীত।

কাজেই যে রমণী অপর পুরুষের সঙ্গে নৃত্যে মশগুল হইল, সে তাহার স্বামীকে ঠিক একনিষ্ঠভাবে ভালবাসিতে সমর্থ কি? তাহার মন অন্য পুরুষে আসক্ত হইলে স্বামীর প্রতি উপেক্ষা আসা স্বাভাবিক; ফলে গৃহের নিরবচ্ছিন্ন শান্তিকল্পনা আকাশকুসুমে পর্য্যবসিত।

আর যদি কোন কুমারী পরপুরুষের সঙ্গে নৃত্য করে, তবে সঙ্গীর প্রতি যে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইবে না, কে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? বস্তুতঃ আকৃষ্ট হইবেই; কাজেই যদি সঙ্গীর সঙ্গে তাহার বিবাহ না হয়, তবে তাহার জীবন কোন্ পথে গমন করিবে, তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নয়? আর যদি সঙ্গীর সঙ্গেই বিবাহ হয়, তবেই যে তাহার জীবন শান্তিময় হইবে তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? কারণ স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সঙ্গে যদি কখনো নৃত্য করিতে হয়, তবে সেই নবাগতের প্রতি যে তাহার আকর্ষণ জন্মিবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

এইরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, নৃত্য গৃহসুখের ও একনিষ্ঠ প্রেমের প্রধান অন্তরায়; এবং সম্ভবতঃ সেইজন্যই নৃত্য ঘৃণিত ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া নিম্নশ্রেণীর নর্ত্তকীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসিতার কেন্দ্রস্থল ফ্রান্সে কোন সম্ভ্রান্ত লোক কোন নর্ত্তকীকে বিবাহ করেন না। যদিও ইংলণ্ডে ইহা চলে, তথাপি ইংলণ্ডের ঘরের খবর অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সেখানে গৃহসুখ বহু পরিবারেই বিরল।

অনেকে বলেন, আমাদের মা-বোনকে যেমন দেখি, যার সঙ্গে নৃত্য করিব তাহাকেও কি সে ভাবে দেখিতে পারি না? উত্তরে বলিতে চাই—প্রকৃতি বলিয়া দেয় তাহা সম্ভব নহে। মনু প্রকৃতির এই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া বলিতে দ্বিধা করেন নাই যে, মা-বোনের সঙ্গেও একান্ত নির্জ্জনে বাস করিবে না "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ"। ভক্তবীর চৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

"দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।"

সুতরাং নারীনৃত্য কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে।

আর এক কথা, যাঁহারা অপরকে মা-বোনের মত দেখার কথা বলেন, তাঁহারা নিজের মাকে আনিয়া প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করাইতে পারেন কি?

অনেকে বলেন, নৃত্য ব্যায়ামবিশেষ; কাজেই স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু নৃত্যকালে যে ভাবে দেহচালনা করিতে হয়, তাহার সঙ্গে স্বাস্থ্যের বিশেষ যোগ থাকা সম্ভব নহে। স্বাস্থ্যের অনুকূলে অনুষ্ঠিত ব্যায়ামের জন্য অঙ্গচালনা নৃত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিশেষতঃ ভগবান স্ত্রীলোককে গর্ভ প্রভৃতি যে সকল অবস্থার মধ্যে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার পক্ষে নৃত্য বড়ই

প্রতিকূল—অনিষ্টকর। স্ত্রীলোকের পক্ষে সাংসারিক কর্ম্মসাধন অনেকটা ব্যায়ামের মত কার্য্যকর হয়।

সেদিন আমার জনৈক বন্ধু বলিতেছিলেন যে, নৃত্য জীবনশক্তির পরিচায়ক, প্রাণের লক্ষণ। যে জাতির ভিতর নৃত্য আছে, বুঝিতে হইবে সে জাতির মধ্যে প্রাণ আছে, সে জাতির মধ্যে বাঁচিয়া থাকার লক্ষণ বর্ত্তমান। শুধু নৃত্যই যদি প্রাণের লক্ষণ হয়, তবে সে প্রাণ প্রাণ নহে, তাহা জীবন্মৃত্যু। কারণ যে নৃত্য গৃহসুখকে চিরতরে বিদায় দিয়া একটা অশান্তির দাবানল সৃষ্টি করে, যাহা বিলাসিতার কুহকদণ্ডস্পর্শে মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করিয়া একটা পাশবপ্রবৃত্তির ঠুলি চোখে পরাইয়া দেয়, যাহা একনিষ্ঠ ভাবগরিমাময়ী ছায়া বিদূরিত করিয়া কামের মূণ্যমূর্ত্তি জাগাইয়া তুলিবার সমধিক সম্ভাবনা রাখে, তাহাকে যদি জীবন বলিতে হয়, কান্ত কবি রজনীকান্তের ভাষায় বলি, তবে সে জীবন—

"মরণের লাগি' যেন কুম্ভকর্ণের হঠাৎ জাগা।"

চারু শিল্পকলার ভিত্তিতে উদারদৃষ্টি লইয়া বিচারপূর্ব্বক নারীনৃত্য যে গার্হস্থ্যাশ্রমের ও একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের হানিজনক, তাহা আমরা দেখিলাম; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে বিচার-আলোচনার এই সূক্ষ্ম পদ্ধতি ছাড়িয়া স্থূলতঃ কি ঘটিতেছে যদি তাহার অনুসন্ধান করি, তবে বঙ্গীয় পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একান্ত হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। ধর্ম্ম ও নীতির দিক হইতে কিছু বলিতে গেলে এইসব চারু-কলাবাদীরা 'গোঁড়া' ও 'পবিত্রতাবাদী' বলিয়া উপহাস করিয়া সব উড়াইয়া দিতে চান; কিন্তু ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ যে নারীকেই কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বত্র পরিবার গড়িয়া উঠে। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উদাসীন পুরুষকে স্নেহে ও প্রেমে সাহচর্য্যে ও সেবায় বাঁধিয়া পরিবার গড়িয়া তুলিবার মূল শক্তি ভগবান নারীর মাঝেই নিহিত রাখিয়াছেন। নারী তাই স্বভাবতই একনিষ্ঠা একমুখী, এককে লইয়া একের সেবায় একের প্রেমে তন্ময় থাকিতে ভালবাসে। সব সমাজেই নারী তাই চিরদিন গৃহপরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী;—ঐ আসনই তাহার প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট গৌরবের আসন। সে কোনও দিন তাই আপন অধিকার ছাড়িয়া বহির্মুখীন জীবনের জন্য লোভ করে নাই। আজ পাশ্চাত্য জগৎ অংশতঃ সাম্য ও স্বাধীনতার ভ্রান্ত আদর্শে কুপথ অবলম্বন করিয়াছে; গৃহ-পরিবারের শান্ত ছায়ার আশ্রয় হইতে নারীকে সংসারের রৌদ্রতপ্ত বালুকাময় মরুকান্তারে টানিয়া আনিতেছে। ইতিমধ্যেই সেখানে তাহার কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে—পরিবার-বন্ধন নষ্ট হওয়ায় স্বাভাবিক আনন্দের উৎস রুদ্ধ হইয়া কৃত্রিম ও কুৎসিত আনন্দের পিপাসায় নর-নারী ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে। আমরা চোখের সম্মুখে এই পরিণাম লক্ষ্য করিয়াও কি মরণোন্মুখ পতঙ্গের মত ঐ আগুনেই ঝাঁপাইয়া পড়িব? সমাজ, নীতি ও ধর্ম্মের শাসনহীন আমাদের মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমরা আর কতদিন স্বাধীনতা ও শিল্পকলার মুখোস পরাইয়া আত্মপ্রতারক হইব? মানুষের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত! সে কোন কুকার্য্যের অনুষ্ঠানেও তাহার অনুকূল যুক্তি-তর্কের সৃষ্টি না করিয়া পারে না—তাহার মন তৃপ্তি পায় না। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এই নারীনৃত্যের সমর্থনে তাই কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ইহা ধর্ম্মার্থে চাঁদা সংগ্রহ। এই যুক্তি যে কতদূর ভঙ্গুর, তাহা যাঁহারা বাঙ্গলার "গরু মেরে জুতা দান" প্রবাদের সহিত পরিচিত, তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন।

মোটের উপর, এই নারীনৃত্যের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই—বলিবার কিছুই নাই। পশ্চিম দেশের ভ্রান্ত স্ত্রীস্বাধীনতার বীজ আসিয়া বহুদিন হইতে বাঙ্গলার মাটিতে প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অনুকূলতা—প্রথমতঃ একদল আভিজাত্যগর্ব্বী অর্থশালী লোকের অপরিণামদর্শী বালকের আগুন লইয়া খেলা করার মত ক্ষণিকের খেয়াল; দ্বিতীয়তঃ এই আর্থিক দুর্দ্দিনে, একশ্রেণী শ্রমভীরু বিলাসী লোকের অর্থার্জ্জনের এই সহজ পন্থার আবিষ্কার; তৃতীয়তঃ নরনারীর সেই বয়োধর্ম্ম, যাহা পরস্পরকে পরস্পরের অভিমুখে প্রতিনিয়তই আকর্ষণ করিতেছে। এই ত্রয়ীর সম্মিলনে পারিবারিক অধঃপাতের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে, যাহা দিকে দিকে নারীর নৃত্য অভিনয় ও আবৃত্তির মধুর মূর্ত্তি ধরিয়া বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্বত্র ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহার এই অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বত্র—সাময়িকে ও সভায় সুদৃঢ় প্রতিবাদ আবশ্যক।

ইহা যে কিরূপ সুফলপ্রসূ, তাহার সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। অবশ্য যখন কোন একটী মত প্রবল হইয়া উঠে, তখন হঠাৎ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে কেমন শঙ্কা ও সঙ্কোচ আসে; প্রতি পদে নিজেকে একান্ত একাকী ও অসহায় মনে হয়; কিন্তু সাহস করিয়া একবার পা বাড়াইতে পারিলে মুহূর্ত্তে ভগবানের সহায়-হস্ত নামিয়া আসিতে বিলম্ব হয় না। একটু পূর্ব্বে যাহাদিগকে প্রতিপক্ষ ভাবিয়া হতাশ হইয়াছিলাম, তাহারাই শেষে স্বপক্ষ হইয়া পশ্চাদনুসরণ করিতে থাকে। আজ বঙ্গসাহিত্যের দুর্নীতি-আলোচনায় সবাই মুখর হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু বেশীদিনের কথা নহে,—সবাই দেখিয়াছে, কাহার ঘাড়ে সাতটা

মাথা যে উহার বিরুদ্ধে একটা কথা বলে ! তার পরে যতীন্দ্রমোহনের "সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা" ও ক্ষিতীন্দ্রনাথের "আর্ট ও সাহিত্যের" অব্যবহিত অভ্যুদয়ে কেমন করিয়া যে স্রোত ফিরিতে আরম্ভ করিল, সে কথা ভাবিতেও আজ বিস্ময় লাগে।

তাই বলিতেছিলাম, পিছনের দিকে দলের দিকে না তাকাইয়া আমরা ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ং সত্য ও সুনীতির প্রতি শ্রদ্ধালু হইলে অনুসরণকারীর অভাব হইবে না। জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ কৃষ্ণকুমার সাহসের সহিত তাঁহার 'সঞ্জীবনী'তে প্রথম হইতেই যে প্রতিবাদের সুর তুলিয়াছেন, ইতিমধ্যে নানাস্থানে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। আমাদের দৃঢ় ধারণা এই দুরাচার আর কদাপি নির্ব্বিবাদে বাঙ্গালার পারিবারিক জীবনের ধ্বংসসাধন করিতে পারিবে না।

উপসংহারে বলি, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, দেবত্ব কেহ কামনা করেন ; যদি গৃহসুখ কেহ চান, তবে নৃত্যের পরিবর্ত্তে মা লক্ষ্মীগণকে উষার প্রথম বিকাশে পূর্ব্বগগনের রক্তরাগের সঙ্গে সঙ্গে, সায়াহ্নের গোধূলিমালায় প্রতীচ্য গগনে অস্তগামী রবিকিরণের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উদাত্তকণ্ঠে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত করিয়া সমস্বরে গাহিতে শিক্ষা দিন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

দেখিবেন, সংসার শান্তিকুঞ্জরূপে ফুটিয়া উঠিবে ; কুটীরে কুটীরে অমৃতরসের-নির্ঝর-ধারা প্রবাহিত হইবে, হৃদয়ে হৃদয়ে মন্দাকিনীর পূত-প্রেম-প্রবাহ মালিন্য-কালিমা ধৌত করিয়া বহিতে থাকিবে।

—

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ (২)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৯ শক বৈশাখ—মুখবন্ধে আছে "বিধিপূর্ব্বক "ব্রাহ্মধর্ম্ম"কে অবলম্বন"। রাজা রামমোহন রায়ের সংক্ষেপ-জীবনবৃত্তান্তে আছে—"পরে যখন ধর্ম্মবিচারে তাঁহার প্রতিবাদিরা পরাস্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের উপায় হইল, ১৭৫১ শকে (বর্ত্তমানে ১৮৫১ শক চলিতেছে) কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার দ্বারা স্থাপিত হইল।" তৃতীয় প্রবন্ধ—"ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" ১৯ চৈত্র ১৭৬৮ শক"। তত্ত্ববোধিনী সভাবিষয়ক বিজ্ঞাপনে আছে "ব্রাহ্মসমাজের নিম্নগৃহে"।

জ্যৈষ্ঠমাস—বিজ্ঞাপন— * * * "ব্রাহ্মসমাজের নিম্নগৃহে"। উক্ত বিজ্ঞাপনে এই প্রস্তাব—"বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" এই বাক্য আছে তাহার পরিবর্ত্তে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই শব্দ হয়। আর একটী বিজ্ঞাপন—"ব্রাহ্মসমাজ" "ব্রাহ্মসমাজে" "ব্রাহ্মসমাজের" "ব্রাহ্মদিগের" "ব্রাহ্মেরা" এই সকল শব্দ আছে। আর একটী বিজ্ঞাপনে "মাসিক ব্রাহ্মসমাজ" মাসের প্রথম রবিবার প্রাতে সাত ঘণ্টায় হইবার কথা আছে।

আষাঢ় মাস—মাসিক সমাজের বিজ্ঞাপনে "ব্রাহ্মসমাজ" শব্দ আছে।

ভাদ্র মাস—"ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৯ শক।

আশ্বিন মাস—"বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা" লিখিত হইয়াছে। "পরন্তু ১৭৩৫ শকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের ১৬ বৎসর পূর্ব্বে) রঙ্গপুর হইতে তিনি কলিকাতা নগরে আগমন পূর্ব্বক বিচার দ্বারা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনারূপ সত্যধর্ম্ম স্থাপনে অত্যন্ত উদ্যোগী হইলেন।" ১৭৩৭ শকে রাজা মাণিকতলার উদ্যানগৃহে আত্মীয়সভা স্থাপন করিলেন, কিয়ৎকাল পরে সেস্থান পরিবর্ত্ত হইয়া তাঁহার ঝামাপুকুর বাটীতে সভা হইত, তদনন্তর কতক দিবস তাহার সিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভা হইয়া পুনর্ব্বার মাণিকতলার উদ্যানে আরম্ভ হইয়াছিল।

"সায়াহ্নকালে আত্মীয়সভাতে (তখনও সভা "আত্মীয় সভা"ই ছিল, ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মসভা নাম হয় নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়) বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত, কিন্তু বেদব্যাখ্যার নিয়ম তৎকালে ছিল না।" * * * "ইতিমধ্যে ১৭৩৯ শকে রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্ট বিচারালয়ে অভিযোগ করেন, ইহাতে তিনি প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত (এইখানে ১৭৪২ শক হইয়া গেল) বিব্রত থাকাতে * * * আত্মীয়সভা পর্য্যন্ত আর হইত না। পরন্তু তিনি সেই অন্যায় অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সভা (আত্মীয়-সভা) আরম্ভ করিলেন। রাজার কলিকাতাস্থ ভবনে সভারম্ভ হইলে পর প্রথমত শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্রের গৃহে এবং তদনন্তর ভূকৈলাসে শ্রীযুক্ত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে এক একবার ব্রাহ্মসমাজ হয়। ১৭৫১ শকের পৌষমাসে শ্রীযুক্ত বেহারীলাল চৌবে আপনার তুলাবাজারের ব্রাহ্মসমাজ আহ্বান করেন তাহাতে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত

দেব, রাজা রামমোহন রায়, রঘুরাম শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ এবং সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেক ধনবান ও জ্ঞানবান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।"

[এই অংশ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অন্তত ১৭৪২ শক পর্য্যন্ত রাজা রামমোহন রায়ের সভা আত্মীয়সভা নামেই চলিয়াছিল; কিন্তু সেই সময়েই বাহিরে যে সকল ব্রহ্মোপাসনা-সংক্রান্ত সভা-সমাজ হইত, সেগুলি ব্রাহ্মসমাজ নামেই চলিতে সুরু হইয়াছিল।]

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন যে খৃষ্টপন্থী মিশনরি উইলিয়ম অ্যাডাম সাহেব রাজা কর্তৃক ব্রহ্মপন্থী হইয়া ঐ বিষয়ে "হরকরা" আফিসের উপরে উপদেশ দিতেন। সেখানে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি উপস্থিত থাকিতেন। একদিন গৃহে ফিরিবার সময় প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তি রাজাকে ধর্ম্মসাধনের জন্য নিজেদের একটী গৃহস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার কয়েকজন বন্ধু সেবিষয়ে সম্মতি দেওয়ায় "রাজা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের প্রতি অত্যন্ত সত্বর ছিলেন" * * * "পরন্তু ঐ স্থান (শিমুলিয়া স্থিত একখণ্ড জমি) নির্দ্দিষ্ট না হওয়াতে ১৭৫০ শকে ভাদ্র মাসে যোড়াসাঁকোস্থিত শ্রীযুক্ত কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎকালে প্রতি শনিবার সায়ংকালে সমাজ হইত, তাহাতে প্রথমত দুইজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ করিতেন, তদনন্তর শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিতেন, অনন্তর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান করিতেন, পরিশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজের কার্য্য সম্পন্ন হইত; কলিকাতায় অনেকেই তথায় আগমন করিতেন। তৎকালে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সমাজের নির্ব্বাহক ছিলেন। পরন্তু সমাজের আয়বৃদ্ধি হইলে কলিকাতায় বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের গৃহপ্রস্তুত হইয়া ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে তথায় উপাসনা আ[illegible] হইল।" "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার * * * কারণে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি * * * দ্বেষানল জ্বলিত হইল," * * * "এই কালে কৌমুদী নামে ব্রাহ্মসমাজের অধীন এক প্রকাশ্য পত্র প্রচার হইত।" "১৭৫২ শকে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ড দেশে যাত্রা করিতে মানস করিলেন।" * * * "১৭৫১ শকের পৌষমাসে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর, বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরি এবং রাধাপ্রসাদ রায় সমাজগৃহের বিশ্বস্ত হইলেন। ইহাতে সমাজের কোন কার্য্যের অন্যথা হয় নাই, কেবল শনিবারের পরিবর্ত্তে বুধবারে সমাজ হইবার নিয়ম তাঁহারা স্থির করিলেন।"

১৭৫৫ শকের আশ্বিন মাসে ইংলণ্ডে রাজা পরলোক গমন করেন। মাঘ মাসে তাহার সংবাদ আসে। "সমাজের জন্মদিবসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি ধন বিতরণ একাল পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে হইয়া আসিতেছিল, ১৭৫৫ শকে তাহা নিরস্ত হইল।" "ব্রাহ্মসমাজের এই ম্লান অবস্থা প্রায় দশ বৎসর ক্রমাগত রহিল। পরন্তু ১৭৬১ শকের আশ্বিন মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের আন্দোলন পুনর্ব্বার আরম্ভ হওয়াতে ১৭৬৫ শকের মধ্যেই পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রতি অনেকেই যত্নবান হইলেন।" মাসিক সমাজের বিজ্ঞাপনে—"ব্রাহ্ম সমাজ"।

কার্ত্তিক সংখ্যা—"বেঙ্গল হরকরা" হইতে উদ্ধৃত—"Historical Sketch of Vedantism" প্রবন্ধে আছে—"The Brahmma Samaj of Calcutta was established in the year 1830, a year before the Rajeh's departure for Europe, and two years before his death". * এই স্থলে foot note আছে—"Here the writer has made a mistake; The Brahmma Samaj was established in the year 1828, two years before the Rajah's departure for Europe and five years before his death: Ed. T. P."

"The Tattwabodhini Sabha * * * was founded in the year 1839"

অগ্রহায়ণ-সংখ্যা—"তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন"।

পৌষসংখ্যা—(রাজা রামমোহন রায়) "এই কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকো পল্লীতে এক ব্রাহ্মসমাজ তিনি স্থাপন করিলেন।" "কালক্রমে ঐ ব্রাহ্মসমাজের এপ্রকার অবসন্নতা হইল।" "১৭৬১ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদীপ্ত করিবার মানসে তত্ত্ববোধিনী নাম্নী এই সভা স্থাপন করিলেন।" বিজ্ঞাপনে "ব্রাহ্মসমাজ" শব্দ আছে।

মাঘসংখ্যা—"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" ১ পৌষ ১৭৬৯ শক।

১৭৭০ শক জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা—তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৬৯ শকের সাম্বৎসরিক বিবরণ, যাহা ২৬ বৈশাখে সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে বিবৃত হয়—"শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় * * * নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরব্রহ্মের উপাসনার অনুষ্ঠান জন্য বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ ১৭৫১ শকে স্থাপন করিলেন।"

১৭৭২ শক মাঘসংখ্যা—"ব্রাহ্ম সমাজের ট্রস্টডীড" হেডিং দিয়া রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত আদিসমাজের ট্রষ্টডীড প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে আছে—"১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের অষ্টম দিবসে * * * ব্রাহ্ম-

সমাজগৃহের ট্রষ্ট করিয়া তত্ত্বাবধারক করেন। ঐ • • • ট্রস্টডীড ইংরাজী ভাষাতে লিখিত • • • অবিকল প্রকাশ করা যাইতেছে।" • • • "Rammohan Ray of Manicktollah"

[মন্তব্য :—আমরা গত সংখ্যাতেই বলিয়াছি যে, আমরা পুরাতন পত্রিকার প্রবন্ধসকল নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিব যে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ কি? বর্তমান সংখ্যায় ১৭৬৯—১৭৭২ এই চার বৎসরের পত্রিকায় যাহা পাওয়া গেল, তাহাই উদ্ধৃত হইল। উদ্ধৃত উপকরণ হইতে বুঝিতেছি যে, ১৭৬৯ শক অবধি ব্রাহ্ম-সমাজ "ব্রাহ্মসমাজ" বলিয়াই উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। ১৭৬৯ শকে উক্ত হইয়াছে যে ১৭৫১ শকে অর্থাৎ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি ব্রাহ্মসমাজ রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক স্থাপিত হয়। ১৭৬৯ শকে "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" স্থলে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নাম গৃহীত হয়। ১৭৬৯ শকের আশ্বিন-সংখ্যায় দেখি যে, ১৭৩৫ শকে রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া সত্যধর্ম্ম স্থাপনে অত্যন্ত উদ্যোগী হইলেন। তখন অবধি বিলাত যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রামমোহন রায় মাণিকতলায় ছিলেন। ঐ শক অবধি তিনি মধ্যে কয়েক বৎসর বাদ দিয়া ১৭৪২ শক পর্য্যন্ত আত্মীয়সভা চালান। কিন্তু এই সভার সম্ভবত বাহিরের ব্রহ্মোপাসনার অধিবেশনকে "ব্রাহ্ম-সমাজ" বলা হইত। ১৭৫০ শকে ভাদ্র মাসে কমল-বসুর বাটিতে ব্রাহ্মসমাজ অথবা ব্রাহ্মদিগের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষত কার্ত্তিক-সংখ্যায় বেঙ্গল হরকরা হইতে উদ্ধৃত অংশের সম্বন্ধে ফুটনোট যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তখন সাধারণ ধারণা ছিল বটে যে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দেই উহার মূল বীজ সর্ব্বপ্রথম উপ্ত হয়। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন অবধি ১৭৫৫ শকে রামমোহন রায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত উহার জন্মদিবসে ব্রাহ্মণ-বিদায় দেওয়া হইত]।—এই জন্মদিবস কবে—১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসে অথবা ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘে?

—

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি।

আড়ানা—একতালা।

সুন্দর প্রকাশ হে প্রিয় তব
সুন্দর তোমার হাতের লিখন
দেখি' দেখি' মোর প্রাণ
আর ফিরিতে চাহে না।
জাগিল আমার প্রাণের মাঝার
শত নব গান, শত নব তান—
দিনু অর্ঘ্য তোমার চরণেতে;—
ফিরায়ো না।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর | স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী

৩ ১´ ২ ৩ ।
II পা ধণা। পা মজ্ঞা মা পা I ণা মা পা র্সা। -া -া ণা ণা। পা মজ্ঞা মা -া I
সু • ন্দ র • • প্র কা • শ হে • • প্রি য় ত ব • • •

১´ ২ ৩ ১´
I সা সা সা মা। মা মা মা পা। মা পা মজ্ঞা মা I ণা দা ণা পা।
সু ন্দ র তো মা র হা তে র লি খ ন দে খি দে খি

২ ৩ ১´ ২
। ণা মা পা পা। ণা পা না র্সা I ণপা ণপা মা নর্সা। র্রা র্সা II !
মো র প্রা ণ আ র ফি রি তে• •• চা হে• • না

১´ ২ ৩ ১´ ১
I মা পা পা ণপা । না না না র্সা । র্সা না র্সা র্সা I না র্রা র্সা র্রা । র্রা র্সা না র্সা ।
জা গি ল আ মা র প্রা ণে র মা ঝা র শ ত ন ব গা ন শ ত

৩ ১´ ২ ৩
। ণপা না র্সা র্সা I না র্সা র্মর্জ্ঞা র্মা । র্রা র্রা র্সা র্সা । মা পা না র্সা I
ন ব তা ন দি হু অ • • যাঁ তো মা র চ র ণে তে

১´ ২
I নর্সা র্রা র্সা নর্সা । র্রা র্সা IIII
ফি• ০ রা খো০ • না

ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

[ভারতীয় সাধনার উপর জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে ভারতের মুক্তি ও জগতের শান্তি সম্ভবপর নহে বলিয়া উহার প্রচারকল্পে ১২। ১০ গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে, একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ৮ই বৈশাখ রবিবার ৩০২, আপার সার্কুলার রোডে কাশীমবাজার রাজভবনে উক্ত সমিতির যে প্রারম্ভিক সভার অধিবেশন হয়, তাহার একখণ্ড বিবরণপত্র উক্ত সমিতির যুগল সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সত্যানন্দ গিরি ও শ্রীবিধুভূষণ দত্ত মহাশয় আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ অবধারণ বিষয়ে ঐ সভায় এসম্বন্ধে যাঁহারা উৎসাহশীল ও অভিজ্ঞ, তাঁহাদের মতামত নির্দ্ধারণের জন্য কয়েকটী সাধারণ বিবেচ্য বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয়ের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; এবং আদিব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ উপাচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহার যে সুচিন্তিত উত্তর দিয়াছেন, নিম্নে তাহাও আমরা প্রকাশ করিলাম। এসম্বন্ধে পাঠকগণ যদি তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত আমাদিগকে লিখিয়া জানান, আমরা সাদরে তাহা পত্রস্থ করিব।

বিবেচ্য বিষয়:—

(১) ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতির (culture) স্বরূপ কি?

(২) বর্ত্তমান ভারতে নানারূপ প্রতিকূল ভাব ও অবস্থার মধ্যে ঐ সাধনা-নির্দ্দেশক কি ঐক্যসূত্র পাওয়া যাইতে পারে?

(৩) ঐ সাধনাকে মূল করিয়া এদেশে এক্ষণে কিরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে?

(৪) ঐ পদ্ধতির শিক্ষা-প্রণালী, শিক্ষালয়ের গঠন-বিধি, পাঠ-বিধি, শিক্ষণীয় বিষয় (অর্থকরী ও কার্য্যকী ইত্যাদি সহ) কিরূপ হওয়া উচিত?

(৫) বর্ত্তমান সময়ে এদেশে যে বিভিন্ন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ সংগঠিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাদের সকলকে লইয়া একত্রে একটী শিক্ষা-সঙ্ঘ সংগঠন করিয়া, অথবা তাহাদিগের পরস্পর পরস্পরের সহযোগে ও সাহচর্য্যে, দেশ মধ্যে একটী বিরাট জাতীয় শিক্ষায়তন কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে?

(৬) অন্যান্য যাহা কিছু বলিবার থাকে।]

ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষাপ্রচার-কার্য্য-সমিতির প্রারম্ভিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সমিতি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী। ইঁহারা আমাদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে অভিমত চান, আমাদের অভিমত সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। তাঁহাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় "ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতির (culture) স্বরূপ কি?" আমাদের উত্তর এই যে, এদেশের সাধনার স্বরূপ হইতেছে ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে জলন্ত বিশ্বাস; নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা; ধর্ম্মসাধনের জন্য অকাতরে ব্যয়; সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, আত্মীয়-স্বজনের সেবা এবং পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি অবিচলিত ভক্তি; সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অবস্থান, ঐহিক সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা, এবং বৈরাগ্যের ভাবকে জাগাইবার জন্য ব্যাকুলতা। এই সকল ও অন্যান্য অনুরূপ আদর্শ হইতে

আমরা দিন দিন বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছি। যাহা প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক আমাদের দেশের সেই চিরন্তন ভাবধারা হইতে আমরা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে সরিয়া দাঁড়াইতেছি। এই সকল ভাবকে অন্তরের ভিতরে জাগাইয়া তুলিবার প্রকৃত শিক্ষার অভাব ঘটিতেছে। আমাদিগকে বিলাসী ও বৃথাভাষী করিয়া তুলিতেছে। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে ক্রিয়াকলাপে সাদর আহ্বানে ও নিমন্ত্রণে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে প্রাণ খুলিয়া মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের ভাব ভুলিয়া যাইবার যে যথেষ্ট অবসর আসিত, তাহা দিন দিন বিরল হইয়া পড়িতেছে। তৎপরিবর্ত্তে বহুদিন হইতে অভূতপূর্ব্ব পার্থক্যের ভাব জাগিয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক সমিতি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী; কিন্তু তাহা একেবারে অসম্ভব। বর্ত্তমান শিক্ষার যে ত্রুটি আছে তাহার সংশোধন ও পরিপূরণের দায়ীত্ব, প্রতি পিতামাতার আত্মীয়স্বজনের ও ছাত্রগণের অভিভাবক-দিগের উপরে ন্যস্ত। শিক্ষকমণ্ডলী যদি ছাত্রবর্গের চরিত্রগঠনে ভারতীয় বিশেষত্ব নিজে উপলব্ধি করিয়া পরে উহা ছাত্রবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিবার প্রয়াস পান, আরও সুফল ফলিতে পারে। দুঃখের সহিত বলিতে হইবে বিদ্যালয়ের ও কলেজের শিক্ষকগণ বা অধ্যাপকগণ অনেক সময়ে এই ভারতীয় বিশেষত্ব স্বয়ং বুঝিবার চেষ্টা করেন না, অপরকে শিক্ষা দিবেন—সে ত দূরের কথা।

২। "বর্ত্তমান ভারতে নানারূপ প্রতিকূল ভাব ও অবস্থার মধ্যে ঐ সাধনানির্দ্দেশক কি ঐক্যসূত্র পাওয়া যাইতে পারে?" উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি প্রকৃত ধর্ম্মভাব সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগিয়া উঠে, নিরবচ্ছিন্ন গুরু-পুরোহিত মোল্লা-ধর্ম্মযাজকের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরের পরিবর্ত্তে যদি আমরা ব্যক্তিগত ভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করিতে পারি এবং নিরবচ্ছিন্ন শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে শিক্ষা করি, এবং উদার দৃষ্টিতে অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, ধর্ম্মের বহিরাবরণের ও কোন কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও, প্রতি ধর্ম্মের মূল কথার মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ঐ ঐক্যের উপরে যদি প্রতি সম্প্রদায় অধিক মাত্রায় জোর দেন এবং পার্থক্য লইয়া বৃথা তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে প্রতিকূল ভাব ও অবস্থার মধ্যে ঐ সাধনা-নির্দ্দেশক যথেষ্ট ঐক্যসূত্র পাওয়া যাইতে পারে।

৩। "ঐ সাধনাকে মূল করিয়া এদেশে একালে কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে?" এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। চাই আমাদের হৃদয়ের উদারতা; সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের অর্থের বা ঐশ্বর্য্যের তারতম্য থাকিতে পারে; কিন্তু সবাই ভ্রাতা বলিয়া কেহই আমাদের ত্যাজ্য ও ঘৃণ্য নহেন। এ সাধনা যদি আমরা আমাদের মধ্যে আনিতে পারি, ব্যাপক শিক্ষার বিস্তার করিতে পারি, পরস্পরের ধর্ম্মপুস্তক পাঠের অভ্যাস ও অনুরাগ যদি সকলের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারি, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের দিকে তাকাইবার অভ্যাস যদি দেশের মধ্যে বদ্ধমূল করিয়া তুলিতে পারি, ধর্ম্মের সহিত যাহা অবিচ্ছিন্ন সেই পর-লোকে বিশ্বাস যদি গাঢ় করিয়া তুলিতে পারি, তবেই প্রকৃত শিক্ষার সূচনা আরম্ভ হইবে। ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া আদৌ গণ্য হইতে পারে না।

৪। "এই পদ্ধতির শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষালয়ের গঠন বিধি, পাঠবিধি, শিক্ষণীয় বিষয় (অর্থকরী ও কার্য্যকরী ইত্যাদি সহ) কিরূপ হওয়া উচিত?" আমাদের উত্তর এই যে শিক্ষাপ্রণালীর মূল আদর্শচরিত্র শিক্ষকসংগ্রহ, যাঁহারা ভাবে কার্য্যে ছাত্রবর্গের সর্ব্ববিধ নৈতিক উন্নতিসাধনের সহায় হইতে পারেন। এইবিষয়ে বরিশালের জন-নেতা ও ছাত্রনেতা এবং দরিদ্রবন্ধু শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার দত্ত যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়-কর। পাঠ্যপুস্তকের ভিতরে ঈদৃশপ্রকৃতি বিরাটহৃদয় মহাজনগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্যের সবিশেষ পরিচয় থাকা চাই। কোমলমতি বালকবৃন্দ তরুণ বয়সে ইঁহাদের আদর্শে নিজ নিজ জীবনগঠনে প্রচুর সাহায্য পাইতে পারে। শিক্ষালয়ের গঠনবিধি হরিদ্বারের গুরুকুল, রাঁচির ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রভৃতির যেখানে যেটুকু ভাল পাওয়া যায়, সমস্ত মিলাইয়া গঠিত হইলে ভাল হয়। নীতিশিক্ষা ও আদর্শ জীবনগঠনের সঙ্গে অর্থকরী ও কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। সকল বিদ্যালয়ে একই রূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর না হইলেও যতদূর পারা যায় কার্য্যকরী, অন্য কথায় লোকহিতকর ব্রতে ও পরসেবায় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতে হইবে।

৫। সমিতি একটি বিরাট জাতীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সংকল্প করিতেছেন, কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত ব্যয়সাধ্য। বিশেষতঃ ঈদৃশ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইলে ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে অবস্থান ও শিক্ষালাভের জন্য এত অধিক পরিমাণে মাসিক ব্যয় করিতে হইবে যে, দরিদ্র ছাত্রগণের সেখানে সমাবেশ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তে ঈদৃশ সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য অস্থায়িক ব্যবস্থা করা

যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে মহৎচরিত্র ব্যক্তিগণের জীবনী-পাঠ ও ত্যাগী মহাত্মাদিগের দ্বারা উপদেশদানের ব্যবস্থা করিলে সুফল ফলিতে পারে।

সাধনা না হইলে কোন বিষয়ে শিক্ষালাভ হয় না। এ বিষয়ে সাধনার প্রভাবে শিক্ষকগণকেও আদর্শচরিত্র ও ত্যাগী হইতে হইবে। বালকদিগের সহিত বন্ধুভাবে অবাধে মিলিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। তবেই তাঁহাদের শিক্ষা বালকগণের মধ্যে ফলবতী হইবে। সমিতির উদ্দেশ্য মহান তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষাকে একেবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

নানা কথা।

নগ্নমূর্ত্তির বিরুদ্ধে—সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, ডানফার্ম্মলীন (Dunfermline) এবং মণ্ট্রোজ (Montrose) নামক দুইটী স্থানের শিল্পপ্রদর্শনীতে কয়েকটী স্ত্রী ও পুরুষের নগ্নমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। দর্শকগণ উহার বিরুদ্ধে সবল আপত্তি করিলেন। উক্ত মূর্ত্তিগুলি যাঁহারা প্রদর্শনীতে দিয়াছিলেন তাঁহারা আর্টের দোহাই দিয়া উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। কিন্তু ঐ দেশ তো আর ভারতবর্ষ নহে যে, সে দেশের লোকেরা বিচার না করিয়া, হাততালি বা অন্যবিধ স্বার্থের কারণে দেশের সর্ব্বনাশের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া পরের কথায় উঠিবে আর পরের কথায় বসিবে। সে দেশের লোকেরা জানে যে কিসে দেশের মঙ্গল হয় আর কিসে অমঙ্গল হয়। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কয়েকজন আর্টিষ্ট সভ্যগণের ঘোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও দেশের কল্যাণ উদ্দেশ্যে দর্শকগণের সুদৃঢ় আপত্তির ফলে সেই মূর্ত্তিকয়টী অপসারিত করা হইল। আর আমরা—আমরা nude cultকে আর্টের দোহাই দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই—দেশের ছেলেমেয়েরা তাহার ফলে নরকে বা যেথা ইচ্ছা সেথা যাক !!

রুষিয়া নামের উৎপত্তি—সেদিন আমার নিকট মঙ্গোলিয়া দেশীয় একজন বৌদ্ধ ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন। তিনি তিব্বতস্থ দেবং সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে তাঁহার ভিতরে কত বিদ্যা আছে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তিনি সজীব কোষ অভিধান বা living encyclopeadia। কথায় কথায় রুষিয়ার কথা উঠিল। তিনি 'উড়িষা' বলিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন। আমি একটু ধাঁধায় পড়িয়া গেলাম—আমি 'রুষিয়া' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, আর ইনি 'উড়িসা' সম্বন্ধে বলেন কেন? অবশেষে তাঁহার সহিত আগত এক নেপালী ভদ্রলোকের সাহায্যে বুঝিলাম যে, তিনি 'রুষিয়া' সম্বন্ধেই বলিতেছেন—মঙ্গোলীয় ও তিব্বতীয় ভাষায় নাকি 'রুষিয়া'কে 'উড়িসা' বলে। উড়িয়া ভাষায় ওড্র দেশ বা উড়িষ্যাকে 'উড়িসা' বলে। আমার হঠাৎ মনে হইল যে, ওড্রদেশের 'উড়িসা' নাম প্রাপ্তির পর নিশ্চয়ই কোন উড়িষ্যাবাসী রাজা রুষিয়াতে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রুষিয়াবাসীগণ সে সময়ে সম্ভবত নিতান্ত অসভ্য ছিল—উক্ত রাজা সমস্ত রুষিয়া সহজে অধিকার করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজ্যের নাম 'উড়িসা' দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধায়ীগণ গবেষণার যথেষ্ট বিষয় পাইবেন। রুষিয়ার গ্রাম্যকথা (folktales) প্রভৃতি এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারে।

নারীনৃত্য—গত ২৮শে চৈত্রের সঞ্জীবনীতে দেখিয়া সুখী হইলাম যে জনৈক ভদ্রমহিলা নারীনৃত্যের অন্তত আংশিক প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদিনে সঞ্জীবনীর এবিষয়ে স্বাক্ষানি সত্ত্বেও দৃঢ়প্রতিবাদ ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। এখন নারীনৃত্যের পূতিগন্ধ বায়ু বহিতে বন্ধ হইলে বাঁচি।

গত ১৯ বৈশাখের সঞ্জীবনীতে নারীনৃত্যের বিরুদ্ধে খুব সত্য কথা বাহির হইয়াছে। এখন যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, যাঁহারা নারীনৃত্যের প্রতি পক্ষপাত দেখাইতেছেন, তাঁহাদের যেন একটা জেদ চাপিয়া গিয়াছে—যেহেতু সঞ্জীবনীর দল, তত্ত্ববোধিনীর দল উহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছে, অতএব ভাল হউক বা মন্দ হউক আমরা দেখিব না—আমরা উহা চালাইব, এবং—চালাইব with vengeance। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা একটী কথা বলিতে চাই—হিন্দুসমাজের মধ্যে কয়েকটী পরিবারের মহিলা এই প্রকার নৃত্যের পক্ষপাতী বলিয়া যেমন আমরা সমস্ত হিন্দুসমাজকে তাহার অনুরাগী বলিতে পারি না, সেইরূপ দুই-চারিটী ব্রাহ্ম পরিবারের বিবাহিত বা অবিবাহিত মেয়ে নৃত্য দেখাইয়া আত্মজাহির করিতেছেন বলিয়া যেন কেহ সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে দোষী না করেন এবং মহিলানৃত্য প্রভৃতি দুর্নীতিপোষক ক্রিয়াকলাপের পক্ষপাতী বিবেচনা না করেন। আমরা শুনিলাম যে থিয়েটারের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট একটী কাগজে কোন মহিলা লিখিয়াছেন যে, আদিসমাজ, সাধারণসমাজ এবং নববিধানসমাজ—ইহাদের কোনটীই তাহাদের কাগজে নারীনৃত্যের প্রতিবাদ করিতেছে না, সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে ঐ তিন সমাজই উহার পক্ষপাতী। কাগজখানি আমরা পাই না, সুতরাং লেখাটী স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পাই নাই।

লেখিকা অন্ততঃ আদিসমাজের উপর খুবই অবিচার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইতেন যে, আদিসমাজ তাহার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্বারা নির্ভীকভাবে যথাশক্তি এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়েছে। আমরা অবশ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদীকে ও Indian Messengerকে মহিলানৃত্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে অবতীর্ণ দেখিতে আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু সঞ্জীবনী ও তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে এ বিষয়ে উঁহাদিগকে কাঁধে কাঁধ দিয়া দাঁড়াইতে না দেখিয়া বড়ই নিরাশ হইয়াছি। নববিধানসমাজেরও ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে দাঁড়ানো উচিত—কেন দাঁড়াইতেছেন না কে জানে?

গত ৯ জ্যৈষ্ঠের সঞ্জীবনী বলেন,—"কিছুদিন পূর্ব্বে * * * একব্যক্তি বিশ্বসম্মেলনের সাহায্যার্থ এম্পায়ার থিয়েটারে ভদ্রমহিলাদের দ্বারা 'সীতা' নামক অভিনয় ও নৃত্য করাইয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। পুনরায় সেই ব্যক্তি নারীশিক্ষালয়ের নামে হিন্দু ভদ্রমহিলাদের দ্বারা ঐ থিয়েটারে 'ঋতুরাজে'র অভিনয়-নৃত্য করাইয়া আরও কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে।" যাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন, সঞ্জীবনী তাঁহাদের কয়েকজনের নাম দিয়াছেন। আমরা সেই নামগুলি দিয়া তাঁহাদিগকে নিজেদের নাম "ছাপার অক্ষরে" প্রকাশিত দেখিয়া বৃথা গর্ব্ব অনুভব করিবার অবসর দিতে চাহি না এবং আমাদের লেখনীকেও কলঙ্কিত করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা ঐ সকল মহিলাদিগকে to say the least, বুদ্ধিমতী বলিতে পারি না। যাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের অভিভাবক কেহ আছেন কি না সন্দেহ করি।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, পত্রিকাতে আমরা এবিষয়ে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, সঞ্জীবনীর সাহায্যে তাহাতে সুধীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে।

কাপুরুষের অধম—হইল কি? গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠের সঞ্জীবনীতে দেখি যে, "কোন মহিলা এক সংবাদপত্রে নারীনৃত্যের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহা দেখিয়া একদল তরুণ যুবক সেই মহিলার বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে শাসাইয়া আসিয়াছে, তিনি যেন ভবিষ্যতে আর এরূপ প্রবন্ধ না লিখেন। মহিলাটী ভয় পাইয়াছেন।" নারীরক্ষাসমিতি হইতে এই বীর মহিলাকে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে জানানো উচিত যে ভগবানের রাজ্যে তিনি আছেন—তাঁহার চরণে সমস্ত নিবেদন করিয়া নির্ভীকহৃদয়ে যাহা সত্য, যাহা কল্যাণ বুঝিবেন তাহা প্রচার করুন। দরকার হয় ভগবানের কার্য্যে তাঁহারই দেওয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকুন। যাহারা এই মহিলাকে শাসাইয়াছে—ধিক তাহাদিগকে; ইহা অপেক্ষা কাপুরুষতা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া জানি না।

নারী-ধর্ষণ—এ কাগজ সে কাগজ সকল কাগজেই আজকাল নারীধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায়। মজা এই যে, যে কাগজে এই প্রকার প্রতিবাদ বাহির হয়, সেই কাগজেই আবার থিয়েটার মহিলানৃত্য প্রভৃতি দুর্নীতিপোষক অনুষ্ঠানগুলির শতমুখে প্রশংসা বাহির হয়। লোককে মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া তার পর তাহাকে মাতলামী করিতে নিষেধ করার সঙ্গে এই সকল কাগজের নারীধর্ষণের প্রতিবাদের তুলনা করা যাইতে পারে। তুলার গুদামে চারিদিকে তুলার গুঁড়া উড়িতেছে, সেখানে জলন্ত অঙ্গার লইয়া গিয়া তুলার গুঁড়াগুলিকে জ্বলিয়া উঠিবার নিষেধ করাও যেরূপ, জনসাধারণের কামপ্রবৃত্তিকে শতবিধ উপায়ে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়া পরে তাহাদিগকে নারীধর্ষণের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টাও অনেকটা সেইরূপ।

২৫০ বৎসরের বৃদ্ধ চীনেম্যান—লি চিংয়েন নামক একজন ঔষধ বিক্রেতা ও পর্য্যটক নিজের বয়স বলেন ২৫০ বৎসর। তাঁহার অনেক বন্ধু নাকি তাঁহা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ও জীবিত! নর্থ চায়না হেরল্ড পত্রে লি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে তিনি "সুজেচুয়ানস্থ ওয়ানশনের উত্তরবর্ত্তী কাইসিনস্থ যাংচুয়ান গ্রামের একজন প্রাচীন ও সম্মানিত অধিবাসী।" মঞ্চুবংশীয় অন্যতর প্রথম সম্রাট কাংসির রাজত্বের সপ্তদশতম বৎসরে লি জন্মগ্রহণ করিয়া বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। অনেক সামরিক ও নাগরিক নেতা তাঁহাকে নানাবিধ সম্মানে বিভূষিত করিয়াছেন। তিনি খুব অল্প বয়সে পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি ঔষধোপযোগী ভৈষজ্য-সংগ্রহ ব্যবসায় হিসাবে অবলম্বন করিয়া ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত উহাতেই নিরত ছিলেন। তাহার পর তিনি পুনরায় পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন এবং জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ঔষধবিক্রয়ে নিযুক্ত রহিলেন। প্রতিদিন তিনি ১০০ লাই পরিভ্রমণ করেন। চিনীয় এক লাইয়ের পরিমাণ ২১১৫ ফুট। সুতরাং লি প্রতিদিন ৪০ মাইল করিয়া বেড়ান। লি ১৪ বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অধস্তন একাদশ পুরুষ দেখিয়াছেন। তাঁহার বংশে ১৮০ জন আছে। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি উত্তম; দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি ও নখ সুন্দর আছে, তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।

এই বিবরণ গত ৩রা সেপ্টেম্বরের (১৯২৮) ষ্টেট্স্‌ম্যান কাগজে বাহির হয়। আমি ইহা প্রকাশ করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে, আজ প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে গীতায়

একটী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহার ভূমিকার প্রয়োজন হওয়ায় আমি দেখাইয়াছি যে, মহাভারতকার বেদব্যাস অন্ততঃ ২০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তজ্জন্য অনেকে আমার প্রতি উপহাস বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দৃষ্টান্তে এবং অন্যান্য অনেক ১২৫, ১৫০ প্রভৃতি বৎসরের দীর্ঘজীবী পাশ্চাত্যদিগের দৃষ্টান্তে আমি বুঝিতেছি যে, আমার অনুমান কিছুমাত্র অমূলক নহে। দীর্ঘজীবী যাঁহাদের কথা সংবাদপত্রে পাইয়াছি বা পাইব, তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

রাধাস্বামী সম্প্রদায়ে বিরোধ—সংবাদ-পত্রে (আ. বা. প.) দেখি যে, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের সম্পত্তি লইয়া দুই দলে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। মামলার বিচার্য্য বিষয় এই যে, প্রয়াগস্থ এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্রসমিতির অধীন সম্পত্তি ট্রাষ্টের অধীন কি না এবং সমিতির জমাখরচের হিসাব তলব করা যায় কি না। সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

রাধাস্বামী সম্প্রদায়

রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের ধারণা এই যে, ঈশ্বর বা রাধাস্বামী দয়াল, সর্ব্বদা মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহাকে অবতার বা সদ্‌গুরু বলা হয়।

আগরার এক ধনী নাগরিক এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনি স্বামীজী মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। আগরায় তিনি যে উদ্যানে বাস করিতেন সেই উদ্যানের নাম স্বামীবাগ। এই উদ্যানে স্বামীজীর একটি সমাধিমন্দির আছে। এই মন্দিরনির্ম্মাণে প্রায় এককোটী টাকা খরচ হইয়াছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী মহারাজের আবির্ভাব হয়। তাঁহার অনুচরগণ বলেন যে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈশ্বরত্ব লাভ করেন।

অতঃপর রায় শালগ্রাম সিংহ বাহাদুর এই সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু হন। তিনি কিছুকাল যুক্তপ্রদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ছিলেন। ১৮৯৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি হুজুর মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। হুজুর মহারাজের উত্তরাধিকারী হন মহারাজ সাহেব। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র। ইনিও পূর্ব্বে সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৯০৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রাধাস্বামী সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রয়াগী দল বলেন যে, মহারাজ সাহেব অবতার ছিলেন না, তাঁহার এক ভগ্নী অবতার ছিলেন। তিনি বুয়া সাহেবা নামে পরিচিতা ছিলেন। ১৯১৩ সালে বুয়া সাহেবার মৃত্যু হয়। বাবুজী মহারাজ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার আসল নাম ছিল রায় সাহেব মাধোপ্রসাদ সিংহ। তিনি সরকারী একাউণ্ট বিভাগে কাজ করিতেন।

দ্বিতীয় দল বুয়া সাহেবাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা গাজীপুরের উকীল কামতাপ্রসাদ সিংহকে অবতার বলিয়া মানিতেন। ১৯১১ সালে কামতাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহারা শিবাজী মহারাজকে অবতার মানেন। শিবাজী মহারাজের নাম ছিল শ্রীআনন্দ স্বরূপ। তিনি টেলিগ্রাফ বিভাগে কাজ করিতেন।

প্রয়াগী দলের কথা

প্রয়াগ সৎসঙ্গ বলেন যে, তাঁহাদের সম্পত্তির জন্য কোন ট্রাষ্টের কথা কল্পনাও করা যায় না। সদ্‌গুরু ঈশ্বরের অবতার, সুতরাং সম্পত্তিতে তাঁহার পূর্ণ অধিকার আছে, তাঁহার নিকট কেহ হিসাব চাহিতে পারে না।

দ্বিতীয় দলের কথা

দ্বিতীয় দল বলেন যে, সদ্‌গুরু দুই ভাবে বিরাজ করেন। সাধারণ মনুষ্যরূপে তিনি সাংসারিক বিষয়-সম্পত্তি দেখেন, সদ্‌গুরুরূপে আধ্যাত্মিক বিষয় দেখেন। সুতরাং তাঁহার সম্পত্তির হিসাব তলব করা চলে।

সবজজের রায়

কাশীর সবজজের আদালতে প্রথমে এই মামলা হয়। তিনি রায় দেন যে, সৎসঙ্গের সম্পত্তি সার্ব্বজনিক ট্রাষ্ট, তাহার হিসাব তলব করা চলে। সেই রায়ের বিরুদ্ধে এই আপীল করা হইয়াছে।

এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অতীত দৃষ্টিতে দেখিলে সবজজের রায় সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে হয়। সকল সমাজের, বিশেষত ধর্ম্মসমাজের আয়ব্যয়ের বিবরণ পরিষ্কার রাখিতে হয় এবং সকল সময়ে তাহা যে কেহ দেখিতে চাহিবেন, তাঁহাকে দেখাইবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। মধ্যে মধ্যে হিসাবপত্র সংবাদ-পত্রাদির সাহায্যে সাধারণের গোচর করিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়।

প্রতাপ জয়ন্তী—১০ই জুন, জ্যৈষ্ঠ শুক্ল তৃতীয়াতে রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ বীর রাণা প্রতাপের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। আমরা ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। বীরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে আমাদেরই উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়।

গ্রন্থ-পরিচয়।

প্রকৃতি পরিচয়—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় লিখিত ভূমিকাসম্বলিত—শ্রীসতীন্দ্র নারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল প্রণীত। কালীতারা যন্ত্রালয় হইতে (১৩ টাউন-

সেণ্ড রোড, ভবানীপুর কলিকাতা) শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।৹ পাঁচ সিকা।

গ্রন্থকার আমাদের পরিচিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তাঁহার উড়িষ্যার কথা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে বঙ্গভাষায় তাঁহার যথেষ্ট শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সংবাদ-পত্রাদিতে উহার উপযুক্ত সমালোচনাও প্রকাশ হইয়া-ছিল। গ্রন্থকারকে পদ্যেও হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কবিশেখর কালিদাস বাবু গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমরা অনেকাংশে একমত। কিন্তু কয়েকটী কবিতায় তাঁহার হাত বেশ একটু ফুটিয়াছে। "শীত", "শুষ্কপত্র" প্রভৃতি এমন কতকগুলি কবিতা আছে, যেগুলিকে আমরা কবিশেখরোক্ত "step" বা "সোপান" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ধরিতে পারি না—সেগুলির ভিতরে বেশ একটু মোলা-য়েম কবিত্বের ছাপ আছে। লেখক যদি কবিতা-লিখনের চর্চ্চা রাখেন, তবে অচিরে উচ্চশ্রেণীর কবিগণের মধ্যে তিনি নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস (১ম খণ্ড)—পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সম্পাদিত। ৫নং ডাঃ জগবন্ধু লেন বৌবাজার হইতে প্রকাশিত—মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ ডবলক্রাউন আকারে ৯৬পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গের কৃতী পুরুষের জীবনকথা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল কৃতী পুরুষের অনেকেরই কথা অনেকেই বোধ হয় জানেন না। সেই জন্যই আমরা এই পুস্তককে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। এইরূপে বঙ্গের কৃতী পুরুষগণের চরিত্র আমাদের উত্তরপুরুষদিগের সম্মুখে ধারণ করা প্রার্থনীয় মনে করি। যাঁহাদের জীবনকথা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের জীবনের মহত্ত্বের কারণ-কেন্দ্রটী ফুটাইয়া তুলিলে ভাল হইত। রায় সাহেব বিনোদবিহারী বাবুর মৃত্যুকালে পুত্রদিগের প্রতি উপ-দেশ বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—

"আমার চরম কথাগুলি স্মরণ রাখিও—বিলাসিতায় কখনও মজিও না। যতই উচ্চ পদ হউক না কেন, ব্যবসায় ভিন্ন কদাচ বংশের মধ্যে যেন কেহ চাকরী না করে। ব্যবসায়ে ফেল হইলে বরং পানের দোকান করিয়া খাইও, তবু কোন উচ্চ রাজপদ পাইলে চাকুরী করিও না।" বীরের উপযুক্ত কথা।

হোমিওপ্যাথিক নীতিরত্নমালা—ডাক্তার শ্রীঅজিতশঙ্কর দে প্রণীত। প্রকাশক:—হোমিওপ্যাথি সার্ভিং সোসাইটি (ইণ্ডিয়া) ৫নং ভিক্টোরিয়া রোড, পোঃ বরাহনগর, কলিকাতা। মূল্য আট আনা মাত্র।

হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যতই বেশী পুস্তকাদি প্রকাশিত হয় এবং যতই উহার প্রচার বেশী হয়, ততই আমি দেশের মঙ্গল বিবেচনা করি। আমার কর্ম্ম হইতে যখন দুই বৎসরের দীর্ঘ অবকাশ লইলাম, তখন আমি অন্তরে এবং বাহিরে বন্ধুগণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই দুই বৎসরের মধ্যে এমন কোন্ বিষয় শিক্ষা করিতে পারি যাহাতে Greatest good of the greatest mumber within the shortest time করা যাইতে পারে। শেষে ভালরূপ আলোচনা করিয়া স্থির করিলাম যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশিক্ষা করাই একমাত্র পন্থা। বাল্যকালে আমার এক-আধটু ঠাণ্ডা লাগিলেই গলায় বীচি দেখা দিত। অবশেষে হোমিওপ্যাথিতে অভিজ্ঞ আমার এক আত্মীয় Calcarea Carb 3o এক ফোঁটা দিলেন, ফলে আর বীচি দেখা দিত না—ধাতই বদলাইয়া গেল। তাহার পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিতে একটুও বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু সেই অবধি বিশ্বাস জন্মিল। অ্যালো-প্যাথিভক্ত বন্ধু যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমি তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমার পরম বন্ধু পরলোকগত ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রলাল গুপ্ত (Dr. G. L. Gupta) আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবানকে কৃতজ্ঞতাভরে নমস্কার করি যে, তিনি এই পথে আমাকে নামাইয়া-ছিলেন। ইহার ফলও এইখানে বলিয়া রাখা সঙ্গত মনে করি। কটক হইতে সুদূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত জমি-দারীতে প্রজাগণের মধ্যে একবার রক্তামাশয়ের epi-demic লাগিয়াছিল। সেখানে নিকটবর্ত্তী দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে চিকিৎসার কোনই ব্যবস্থা ছিল না। আমি গিয়া শতাধিক রোগীর চিকিৎসা করিয়া প্রায় শতকরা ৯৫ জনকে আরোগ্য দানে সক্ষম হইয়াছিলাম। এস্থলে অ্যালোপ্যাথিক বা কবিরাজী প্রভৃতি ব্যয়সাপেক্ষ ঔষধ ব্যবহার করিবার না ছিল প্রজাদের ক্ষমতা, না ছিল সুবিধা।

যাক, আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। আমাদের কিন্তু মনে হয় প্রশ্নোত্তরের পরিবর্ত্তে ধারাবাহিক আকারে লিখিত হইলে বেশী ভাল হইত—শিক্ষার্থীর মনে বেশী বদ্ধমূল হইত। আমার যাহা মনে হয় তাহা লিখিলাম, কিন্তু আমার অপেক্ষা গ্রন্থকারের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অধিক। প্রশ্নোত্তর হিসাবে এসকল বিষয় লিখিত হইলে মনে হয় যেন চিন্তার সূত্র কাটিয়া যায়। আর একটী কথা বলিতে চাই, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় গ্রন্থ-

কার হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধীয় অনেকগুলি তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এক-একটী বিষয়ের এক-একটী সহজবোধ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিলে এবং একখানি পুস্তকে সংক্ষেপে একটী বিষয়ের সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট করিলে ভাল হয়। আলোচ্য পুস্তিকা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উপকারী হইলেও, যে ভাবে ইহা লিখিত হইলে ইহার উপকারিতা বেশী হইবে, তাহাই আমরা দুই চারি কথায় প্রকাশ করিলাম।

শোকসংবাদ।

৺অমরকুমার মুখোপাধ্যায়—আদিব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা অমরকুমার মুখোপাধ্যায় গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার প্রাতঃকালে লক্ষ্ণৌএ হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম মাত্র ৫১ বৎসর হইয়াছিল। ইহাঁর এই অকালমৃত্যুতে শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাঁদের গভীর শোকে সান্ত্বনাবিধান পূর্ব্বক লোকান্তরিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় দান করুন।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে ৺অমরকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীমান অমিতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বালিগঞ্জে ৭-১ বাণ্ডেলরোডে স্বকীয় বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ষোড়শদ্রব্য সহিত ভোজ্যাদি উৎসর্গের পর পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়াছেন।

চতুর্থাহ শ্রাদ্ধ—৺অমরকুমার মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীঅনুভা দেবী ও শ্রীঅমিয়া দেবী আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি চতুর্থী ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

উপনয়ন—গত ২৮শে বৈশাখ শনিবার পূর্ব্বাহ্নে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষিত শিষ্য ৺তারিণীচরণ গুপ্তের জ্যেষ্ঠপৌত্র শ্রীমান সমীন্দ্র-কুমার গুপ্তের উপনয়ন-সংস্কার আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে তাঁহাদের শ্রীরামপুরের বাসভবনে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সংবাদ।

প্রবর্ত্তকসঙ্ঘে সাহিত্যসভা—প্রবর্ত্তকসঙ্ঘের অক্ষয়তৃতীয়ার উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ মহাশয় গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্নে উহার সাহিত্যসভার অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। রায়বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সর্ব্বপ্রথম অধ্যাপক শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া বৌদ্ধ-জাতক অবলম্বনে একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। ইহাতে তিনি মহাভারতের সঙ্গে বৌদ্ধজাতকের তুলনামূলক সমালোচনায় হিন্দু আদর্শ হইতে বৌদ্ধ আদর্শের ভিন্নতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় বহুবিস্তারসাপেক্ষ। একটী মাত্র প্রবন্ধে বা বক্তৃতায় উহার কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করা চলে না। উক্ত সভাতেই এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, প্রসঙ্গত বৌদ্ধজাতক সম্বন্ধে এখানে একটী প্রশ্ন তুলিতে চাই। এবার এই জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে 'রাজকুমার বেস্‌সন্তর' নামে জাতকের একটী গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে জনৈক বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্বলাভের আকাঙ্ক্ষায় দানপারমিতার উৎকর্ষ দেখাইতে যেভাবে পিতৃধর্ম্ম ও পতিধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছেন, আমাদের আধুনিক চিত্ত তাহাতে মোটেই সায় দেয় না। অত্যাচারী ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় আশ্রয়-প্রার্থী পুত্রকন্যার প্রতি বেস্‌সন্তরের উদাসীনতা দুর্ব্বোধ্য। সত্য বটে, মহাভারতে দানবীর কর্ণও আপন পুত্রের শিরশ্ছেদ পূর্ব্বক অতিথির তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তো পুত্রের সম্পূর্ণ সম্মতিতে। ভয়ার্ত্ত পুত্র যদি প্রাণভয়ে পিতার শরণ লইত, আর পিতা যদি সেই নিঃসহায় ও নিরুপায় পুত্রের বধসাধন পূর্ব্বক আপন গর্ব্বময় দাতৃধর্ম্ম চরিতার্থ করিতেন, তবে তাহা কতদূর সুসঙ্গত হইত বলিতে পারি না। আর এই সকল আখ্যায়িকাতেও যে বৌদ্ধভাবের প্রভাব নাই, তাহাও বলা কঠিন।

অতঃপর মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় অধুনা বঙ্গীয় সমাজের অধঃপাতের পূর্ণ নিদর্শন 'নারীনৃত্য' সম্বন্ধে একটী আগামী রচনা পাঠ করেন। তাঁহার এই সুসঙ্কল্প ও শুভ প্রচেষ্টার জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। প্রথম হইতেই সঞ্জীবনী ও তত্ত্ববোধিনী এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখনী

সঞ্চালন করিয়াছেন ; কিন্তু উহা পর্য্যাপ্ত নহে। ব্যাধি যেরূপ বিস্তারশীল তাহাতে দেশব্যাপী একটা প্রবল আন্দোলন-সৃষ্টি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ব্যাধির প্রকোপও যে কিরূপ ভীষণ, তাহা উক্ত সভায় সমাগত সভ্যগণের (আমরা আর নাম করিয়া তাঁহাদের লজ্জার কারণ হইব না) মধ্যে মাত্র একজন ব্যতীত বাকী সকলেই চারুবাবুর বক্তব্যের অংশতঃ প্রতিবাদ করায় জানা গিয়াছে; সুতরাং আশু প্রতীকার-চেষ্টা কর্ত্তব্য। জ্যৈষ্ঠের 'প্রবর্ত্তক' এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই ; সেদিন নারীনৃত্য লইয়া যে সাহিত্যিক বাদপ্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে মতি বাবুর সুস্পষ্ট মন্তব্য আমরা দেখিতে চাই।

রাজদ্রোহে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।—আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, আমেরিকাবাসী শ্রীযুক্ত সাণ্ডারলাণ্ড সাহেবের 'শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারত' (India in bondage) নামক পুস্তকের প্রকাশ ব্যাপারে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'-পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে তাঁহার স্বগৃহে রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বন্দী হন এবং আপাততঃ জামিনে মুক্ত আছেন। মানবাত্মার স্বাধীনতা এভাবে রুদ্ধ করিতে যাওয়া শুধু অসমীচীন নহে, কিন্তু বৃথা মনে করি। শাসকবর্গকে বলা বাহুল্য যে বাতাসকে অতিমাত্র চাপে আবদ্ধ করিবার ন্যায় মানবাত্মাকেও অতিমাত্র চাপে আবদ্ধ করিতে গেলে তাহা কাটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিবেই। বহিঃপ্রকৃতির ন্যায় আধ্যাত্মিক রাজ্যেরও ইহা একটী মহা সত্য।

সাপ্তাহিক উপাসনা।—আমরা সানন্দে জানাইতেছি বৈশাখ অবধি নানা উপায়ে আদিব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার উৎকর্ষ বিধানের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইতেছে। যদি কোন হিতৈষী এই কার্য্যে আমাদের সহায়তা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাহা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

উপনিষৎপাঠ।—প্রায় ৪ মাস হইতে চলিল আদিব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উৎসাহে ও উদ্যোগে গত ২৪শে মাঘ বুধবার হইতে আদিব্রাহ্মসমাজে একটী আলোচনাসভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পূর্ব্বে সাপ্তাহিক উপাসনা অন্তে সমাজের দ্বিতল-গৃহে উহার অনুষ্ঠান হইত। গত বৈশাখ অবধি উপাসকগণের অনুরোধে ত্রিতলে বেদীর নিম্নে বসিয়া আপাততঃ ঈশোপনিষদের পাঠ ও আলোচনা হইতেছে। পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পাঠের ভার গ্রহণ করায় আমরা সুখী হইয়াছি। বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সমবেত বন্ধুগণের বড়ই চিত্তপ্রসাদক ও প্রাণস্পর্শী হইতেছে।

মেডিক্যাল মিশন।—আদিব্রাহ্মসমাজের নিম্নতলে একটী "মেডিক্যাল মিশন" প্রতিষ্ঠার শুভ সঙ্কল্প বহুদিন হইতে আমাদের অন্তরে জাগরূক আছে। পূর্ব্বে দুইবার ইহা কার্য্যে পরিণত হইলেও উপযুক্ত সেবকের অভাবে দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। সম্প্রতি দুই জন চিকিৎসক স্বেচ্ছায় আমাদিগকে এবিষয়ে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হওয়ায় আমরা সত্বরই পুনরায় ইহা খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছি। এবিষয়ে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য ভাবিয়া যিনি অন্নবিত্তর যতটুকু সাহায্য করিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। সাহায্যদাতার নাম ও দানের পরিমাণ ও হিসাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।

বুদ্ধাষ্টমী।—গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলেজ স্কোয়ারে 'মহাবোধি সোসাইটী হলে' বুদ্ধাষ্টমী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৭ ঘটিকায় আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের জগদ্ব্যাপী শান্তিবাণী সম্বন্ধে যে সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটী দিয়াছিলেন, উহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

চিত্রকথা।—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ মহাশয়ের সংগৃহীত বাঙ্গলার খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের জননীদের ফটো-চিত্রের বাকী অংশ 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সৌজন্যে প্রকাশিত হইল। এবিষয়ে মন্মথবাবুর সুলিখিত প্রবন্ধটী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও এবারে স্থানাভাবে ঘটিয়া উঠিল না। উহা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভ্রমসংশোধন।

গত বৈশাখ-সংখ্যা পত্রিকায় 'আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধে ২১ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ২য় প্যারায় দ্বিতীয় পংক্তির পর "স্বীয় স্বীয় স্বাতন্ত্র্য গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রতিকূল। উভয়ের" এই অংশটুকু বসিবে।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে নিম্নলিখিত দানগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি :—

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবীর নিকটে
৺সাহানা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে ... ২৲
৺বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে ... ২৲
শ্রীযোগানন্দ সিংহ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী
শ্রীশোভারাণী দেবীর দীক্ষাগ্রহণ উপলক্ষ্যে ২৲

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা।

[সমালোচনা]

(হিমালয় পরিভ্রমণকারিণী শ্রীরত্নমালা দেবী)

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি-বিরচিত, বহু চিত্রশোভিত, সুন্দর সবুজ কাপড়ের স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই; কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট, ৪১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান—আদিব্রাহ্মসমাজ-কার্য্যালয় ৫৫, আপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি পুস্তক আমরা পাইয়াছি। তাঁহার পুস্তকখানির ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং উহা বহু গবেষণাপূর্ণ। আর্য্য নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার বিষয় তিনি সরলভাবে নির্ভীকভাবে সুস্পষ্ট-রূপেই বলিয়াছেন। তাঁহাকে এই পুস্তকখানি লিখিতে মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি বহু শাস্ত্রগ্রন্থের সহায়তা লইতে হইয়াছে। প্রাচীন যুগের ঋষিবাক্যের অনেক স্থলেই তিনি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি উদারহৃদয়, স্পষ্টবাদী ঋষিকল্প ব্যক্তি। তাঁহার পুস্তকখানিতে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়াছেন। বৈদিকযুগে যে আর্য্যনারীর শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়; কেননা সেই যুগের নারীরাও বেদপাঠ করিতেন ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা ছিলেন। মহাভারত প্রভৃতি পুরাণপাঠে জানা যায় যে, গার্গী মৈত্রেয়ী অরুন্ধতী অনসূয়া প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন। মধ্যযুগের ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, দ্রৌপদী ভদ্রা রুক্মিণী সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী সকলেই বিদুষী ছিলেন।

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ধর্ম্মানুরক্তি প্রবল ছিল। আর্য্যরমণীর শিক্ষা যে তাঁহাদের অনুরূপ ভাবেই হওয়া উচিত, একথাটী খুব সত্য। আমাদের সমাজ ধর্ম্মের উপর স্থাপিত। যে শিক্ষায় আর্য্যনারীদের হৃদয়ে দয়া দাক্ষিণ্য সরলতা স্নেহ মমতা প্রভৃতি সদ্বৃত্তির বিকাশ হইয়া তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণা ও পতিসেবাপরায়ণা হইতে পারেন, এবং তাঁহারা গার্হস্থ্যনীতি শিক্ষা করিয়া মাতৃত্বের মহিমময়ী মূর্ত্তিতে নারীসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, সেই শিক্ষাই আর্য্যনারীর প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবের চরিত্র গঠন করা।

ক্ষিতীন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকের সর্ব্বত্রই নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মনুসংহিতায় "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" এটীও দেখাইয়াছেন। আর্য্যনারীদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বেচ্ছাচার শোভনীয় নহে। যে শিক্ষায় আর্য্যনারীদিগকে বহির্মুখী করে, চঞ্চল করে, বিলাসপরায়ণ করে, স্বার্থপর করে, সে শিক্ষা কখনই আর্য্যনারীর প্রকৃত শিক্ষা নহে। আজকাল আমাদের দেশের নারীরা উচ্চ শিক্ষা পাইয়া এম-এ, বি-এ পড়িয়া পাশ্চাত্যভাবেই গঠিত হইতেছেন। তাঁহাদের বিলাস-ব্যসন অতিমাত্রায় বাড়িয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তাঁহারা বহু বিলাস-আড়ম্বর ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য লইয়াই সময় কাটাইয়া থাকেন। কিন্তু নারীসমাজের মঙ্গলের দিকে কেহই বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না। তাঁহারা থিয়েটারে বায়স্কোপে ডিনার পার্টিতে টেনিশ পার্টিতে যোগ দিয়াই নারীত্বের পূর্ণতা দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু যে শিক্ষায় আর্য্যনারীরা ক্ষুধায় অন্ন তৃষ্ণায় পানীয় রোগে সেবা শোকে শান্তি দিয়া অভাব-অসচ্ছলতাপূর্ণ বঙ্গগৃহের সুখ শান্তি পবিত্রতা আনয়ন করিতে পারেন সেই শিক্ষাই প্রার্থনীয়। যাঁহাদের অল্পশিক্ষা, তাঁহারা নাটক নভেল ও বাজে পুস্তক পড়িয়াই সময় কাটাইয়া থাকেন। কিন্তু আর্য্যনারীগণ যে শিক্ষায় জগতের মাতা জগতের বন্দনীয়া হইয়া সংসারে মাতৃত্বের মহিমায় ও পত্নীত্বের ঐশ্বর্য্যে বিভূষিতা হইতে পারেন, সেই শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়।

বৈদিক যুগের নারীগণের উপনয়ন-সংস্কার ও ব্রহ্মচর্য্য ছিল, ক্ষিতীন্দ্রবাবু তাহারও প্রমাণ দিয়াছেন। বিধবারা আমরণ ব্রহ্মচর্য্য করিবেন। যাগযজ্ঞে ব্রতে তপস্যায় ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসবে স্ত্রীই পতির সহধর্ম্মিণী ছিলেন। রামায়ণে লিখিত হইয়াছে যে, রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাসে দিয়াও সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি গঠিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণও নারীগণকে বারম্বার পতিসেবার উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ঋষিরা কখনই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না; তবে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যানুশীলন বেদবেদাঙ্গ উপনিষদাদি পাঠ অপেক্ষা তাঁহাদের পিতাপুত্রের সেবা ও গার্হস্থ্য নীতিপালন, যাহা নারীজীবনের কর্ত্তব্য, সেই দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

আমার মাতামহদেব ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী-শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রবাবু সরলভাবে অকাট্য যুক্তি দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা বুঝাইয়াছেন। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে বিশেষ সুফল হইতেছে আমরা তাহা মনে করি না। সেকালের প্রাচীনা বর্ষীয়সীগণ নিরক্ষর হইলেও তাঁহাদের মধ্যে দয়াভক্তি স্নেহমমতা বা কর্ত্তব্যপরায়ণতার ত্রুটী ছিল না। তাঁহাদের অনেকেই আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ জননী ছিলেন। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর দয়াগুণে বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে দয়ার উৎস ছুটিয়াছিল। আর্য্য শাস্ত্রকারগণ যে স্ত্রীশিক্ষার

বিরোধী ছিলেন না, তাহা পুরাণ মহাভারত পাঠে স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষা যে আর্য্য নারীর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে, পাশ্চাত্য জগতে স্ত্রীশিক্ষার ফলে নারী সম্বন্ধীয় ঘটনা লইয়া যে সকল মামলা মোকদ্দমা অশান্তির সৃষ্টি হয়, তাহা হইতেই বুঝা যায়। যেস্থানে অন্যের মুখের গ্রাস লইয়া কাড়াকাড়ি, যেখানে বৈষয়িক বিবাদের বাড়াবাড়ি, যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসার, যেখানে যদৃচ্ছা আমোদপ্রমোদের বাহুল্য, সেস্থান আর্য্যনারীর নহে। বঙ্গসংসারে আর্য্যনারীর পৃথক অস্তিত্ব নাই। আর্য্যনারী গৃহের সমগ্র পরিবারের অস্তিত্বে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মিলাইয়া দেন, তিনি নিজের সুখ-দুঃখের পৃথক দাবী রাখেন না।

তৎপরে ক্ষিতীন্দ্রবাবু আর্য্যনারীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা যে বহু যুক্তিপূর্ণ সার সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আর্য্যনারী বিবাহিতা হইলে সম্রাজ্ঞী হইয়া থাকেন। এক-একটী ক্ষুদ্র সংসাররাজ্যের পরিচালনা নারীই করিয়া থাকেন। সেখানে তাঁহাদের অবাধ স্বাধীনতা থাকে। আর্য্যনারী প্রকৃতপক্ষে কোন কালেই পরাধীনা নহেন। যাগযজ্ঞ ব্রতপূজা বিবাহাদি মহোৎসবে তীর্থযাত্রায় তাঁহাদের অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা আছে। পিতা ভ্রাতা খুড়া জ্যেঠা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের নিকট তাঁহারা অবাধে সম্মুখীন হইয়া থাকেন। তবে, প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকেরা নিঃসম্পর্কীয় পুরুষগণের সহিত এখনকার মত এত অবাধে মেলামেশা করিয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া গীতবাদ্য করিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ছিল। ক্ষিতীন্দ্রবাবু আর্য্যনারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে যে চিন্তাশীলতা, ভাবপ্রবণতা ও গবেষণা দেখাইয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ দূরদর্শী লেখক ক্ষিতীন্দ্রবাবু প্রাচীনকালের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যে সকল আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহার একটীও অতিরঞ্জিত নয়। শিক্ষা, স্বাধীনতা বা সমাজসংস্কারে ঋষিপ্রদর্শিত পথই যে আমাদের পরিণামে সুফলসাধক তাহাতে ভুল নাই। পাপদোষ ও ব্যভিচারের ফলে যে জাতি উৎসন্ন হয়, তাহার তিনি অনেক অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। আমাদের সমাজদেহে ক্ষত হইয়াছে। সে ক্ষত আরোগ্য করিতে হইলে বিধিমত চিকিৎসা করা চাই। বর্ত্তমান হিন্দুনারীসমাজের স্বেচ্ছাচারিতাই রোগের অনেকটা কারণ। লেখক অকপটে তাঁহার পুস্তকখানিতে স্ত্রীসমাজের ও পুরুষসমাজের নৈতিক আচার-ব্যবহারের প্রকৃত চিত্র চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া সুস্পষ্টভাবে দোষগুণ ব্যক্ত করিয়াছেন। এখন নব্যতন্ত্রের শিক্ষিতা নারীগণের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা ও বহির্মুখীভাবই প্রবল। তিনি কোনও বিষয়েই কিছু গোপন না রাখিয়া সমাজের দোষ ও গুণ যে অকপটে দেখাইয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় তাঁহাকে অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইবে। কিন্তু সত্য কথা অপ্রিয় হইলেও প্রয়োজন পড়িলে বলিতে হয়। এজন্য সত্যনিষ্ঠ লেখক ক্ষিতীন্দ্র বাবু সমাজচিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া সমাজের উপকারসাধনই করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের সঙ্গে নব্যযুগের ধর্ম্মাধর্ম্ম সমাজনীতি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে কতটা পার্থক্য প্রবীণ লেখক তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য রীতিনীতি যে আর্য্য নারীদিগকে সর্ব্বতোভাবে উন্নতিসোপানে লইয়া যাইতে পারে না, তাহা তিনি তাঁহার পুস্তকে পরিষ্কার দেখাইয়াছেন। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা প্রাচীন আর্য্যযুগের পবিত্র চিরন্তন বিধি পদদলিত করিয়া এখন পাশ্চাত্য ভাবেরই আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের অবনতি ভিন্ন উন্নতির আশা করা যায় না। ধর্ম্মেই মানবজীবনের উন্নতি চিরকালই হইয়া থাকে। লেখক এই উদ্দেশ্যেই পুস্তকখানি লিখিয়া সাধারণের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মোটের উপর বলিতে পারি যে, গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া নারীসমাজ নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন। গ্রন্থে তিনি নির্ভয়ে স্পষ্ট কথা ও সার সত্য লিখিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

সঞ্জীবনী—২৩শে ফাল্গুন, ১৩৩৫।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১১০ অঞ্জলি—জ্যোতির্ম্ময় দেবতা।

১। এই উষাকালে তোমারই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান রথে আরোহণ করিয়া অরুণতপন চতুর্দ্দিকে আলোক বিস্তার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। বাহিরের এই জ্যোতিতে যেমন সকল পদার্থ আমাদের নয়নের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, সেইরূপ তোমার জ্ঞানজ্যোতি দ্বারা আমাদের অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া দাও। তোমার জ্ঞানে উদ্ভাসিতচিত্তে আমরা যেন আমাদের গৃহের ও সমাজের যথাকর্ত্তব্য সংস্কারসাধনে পথ দেখিতে পাই এবং তোমার প্রিয়কার্য্য বলিয়া জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হই।

২। এই পবিত্র উষাকালে অরুণতপনের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কপিলা ও অকপিলা সকল গাভী চরিয়া তৃণশষ্প খাইবার জন্য হাম্বারব করিতে করিতে মাঠে বাহির হইয়া গেল। নরনারী সকলে নিদ্রালস্য পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। যেখানে যত জীবজন্তু যত নরনারী আছে, সকলেই জাগ্রত হইয়া তোমারই প্রবর্ত্তিত কর্ম্মযজ্ঞ সফল করিবার উদ্দেশ্যে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে।

৩। উদ্যোগী ও ধর্ম্মপথে অগ্রসর এবং অধর্ম্মের সহিত নিত্য সংগ্রামশীল ব্যক্তিকে যেরূপ শ্রী সহজেই আশ্রয় করে, সেইরূপ শুভকর্ম্মসাধক ও তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে নিয়ত উদ্যোগশীল আমাদিগকে যথোচিত ধনরত্ন ও শ্রীসম্পদ প্রদান করিয়া পরিপুষ্ট করিয়া তোল।

৪। উষা ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাহার বিমল সৌন্দর্য্যে তোমারই সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গাভীসকল বৎসগণকে স্তন্যপান করাইতেছে এবং লেহন করিয়া তাহাদের দেহে উত্তাপ ও বল প্রদান করিতেছে। এই সকলের ভিতর দিয়া তোমারই অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়া আমাদিগকে বিমুগ্ধ করিতেছে। তুমি আমাদের অন্তরে তোমার সুস্নিগ্ধ বিমল মূর্ত্তিতে আমাদের অন্তরে আসন গ্রহণ কর এবং আমাদের হৃদয়ের সর্ব্ববিধ মলিনতা তোমার করুণাবারিতে বিধৌত কর।

৫। উষাকালে অরুণভানু পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া আকাশের অন্ধকার যেমন অপসারিত করিতে

থাকে, তুমিও সেইরূপ আমাদের চিত্তগগনে সমুদিত হইয়া আমাদের হৃদয়ের সকলপ্রকার সংশয় ও মলিনতার অন্ধকার ছিন্ন করিয়া দাও। ঘৃত ও ইন্ধন পাইলে যজ্ঞাগ্নি যেমন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, তোমার চরণে আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি, আমাদেরও জ্ঞান ও প্রেমের অগ্নি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক। দুহিতা যেমন পিতার চরণসেবা করিবার অবসর পাইয়া কৃতার্থ হয়, আমরাও যেন সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে তোমার সেবা করিবার অধিকার পাইয়া ধন্য হই।

৬। নিশীথের অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে। জগতবাসী সকলেই নূতন প্রাণ লাভ করিয়া চারিদিকে হাসি বিকীর্ণ করিতেছে। এই নবজাগরণের সঙ্গে আমরাও যেন নব বলে নব উৎসাহে তোমার নামের মহিমা প্রচার করি এবং সকলের প্রাণ হইতে দুঃখ-বিষাদের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সুখশান্তির বিমল জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

৭। আমাদের বংশের সন্তানগণ তাহাদের সকল কার্য্যে যেন সর্ব্বপ্রথম তোমাকে সুনৃত বাক্যে রচিত স্তবস্তুতি দ্বারা আহ্বান করে, এবং তোমার আশীর্ব্বাদে তাহারা যেন জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে অর্থে মানে সকল বিষয়ে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। তুমি আমাদিগকে বীর ও সুকর্ম্মা পুত্রপৌত্রাদি প্রদান কর। আমাদের যেন দাসপরিজনের এবং গো অশ্ব প্রভৃতির কখনও অভাব না হয়।

৮। এই বিমল প্রভাতে আমরা সূর্য্যের অন্তর্যামী পরম পুরুষ তোমার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি আমাদিগকে যশ ও কীর্ত্তি, ধৈর্য্য ও বীর্য্য প্রদান কর। আমাদের যেন দাসপরিজন এবং যানবাহনের অভাবে না পড়িতে হয়। হে পরম সুন্দর! তোমার সৌন্দর্য্যে আমাদের মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও এবং আমাদিগকে প্রভূত ধনরত্ন ও প্রচুর অন্নজল প্রদান করিয়া সুখে ও শান্তিতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অধিকার প্রদান কর।

৯। উষার বিমল প্রভায় সকল গগনভুবন প্রভান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। উষা তোমার নাম গান করিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। সেই আহ্বানের মধ্যে আমরা তোমারই সত্যবাণী শ্রবণ করিতেছি।

১০। এই সুবিমল প্রাতঃকালে প্রভাতপবন আমাদের অঙ্গস্পর্শ করিয়া সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা দূর করিয়া নববল বিধান করিতেছে। গতকল্যকার ভয়ভাবনা উষার আবির্ভাবের সঙ্গে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! এই উষার অমৃতস্পর্শে তোমারই মাতৃহস্তের স্পর্শ অনুভব করিতেছি। তোমাকে বারবার প্রণাম করি।

১১। উষার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া আমাদের অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার হিংসা বিদূরিত হৌক এবং স্নেহ প্রেম দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি সাধুভাবসকল আমাদের অন্তর অধিকার করুক। উষার নিত্য নব সৌন্দর্য্যের ভিতর সকল সৌন্দর্য্যের একমাত্র অক্ষয় উৎস তুমিই প্রকাশিত হও এবং জীবগণকে নিত্যনব জীবনে পরিবর্দ্ধিত কর। এই উষার বিমল আলোকপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও হৃদয়গগন হইতে সংশয়ের অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তোমার প্রেমের আলোক আমাদের আত্মাকে তোমার সহিত একযোগে যুক্ত করিয়া দিতেছে। পতিব্রতা পত্নীর সেবাশুশ্রূষায় যেমন তাহার স্বামী শীঘ্র সবল হইয়া উঠে, সেইরূপ আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ স্তবস্তুতি দ্বারা তোমার নাম ও মহিমা মহীয়ান হইয়া উঠুক।

১২। উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাখাল যেমন গাভীসকলকে সুন্দর তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে পরিচালিত করে, তুমিও সেইরূপ আমাদিগকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত কর এবং আমাদিগকে তেজস্বী ও সৌভাগ্যবান কর, যাহাতে আমরা দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র এবং বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে সকল সময়ে বিজয় লাভ করিতে পারি। শত সূর্য্যের জ্যোতিতে তুমি আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হও।

১৩। উষার আলোকে আমরা জাগ্রত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই এবং বহুবিধ ধনরত্ন আহরণের প্রয়াস পাই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের পুত্রপৌত্রাদিকে যেন কখনও অন্নবস্ত্রের অভাব অনুভব করিতে না হয়।

১৪। উষার অভ্যুদয়ের সঙ্গে আমরা আমাদের বাসগৃহের এবং গোশালা অশ্বশালা প্রভৃতির

সকল অংশই সুমার্জ্জিত করিতেছি। তুমি আমাদের গৃহের লোকসকলকে এবং গোশালার গাভীগণকে ও অশ্বশালার অশ্বদিগকে সুস্থ ও সবল কর, যাহাতে তাহারা ধনরত্ন আহরণার্থ অনুষ্ঠিত আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে সহায়তা করিতে পারে।

১৫। আমরা যেন কাহারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ না করি। আমাদের মিষ্টবাক্যে তুষ্ট হইয়া শত্রুমিত্র সকলেই যেন আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে সহায় হইয়া সৌভাগ্য আনয়ন করে।

১৬। উষা যেমন অরুণ-অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে, আমরাও সেইরূপ তোমার নাম লইয়া আমাদের কর্ম্মযজ্ঞের বার্ত্তা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বহন করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছি। আমরা যেন আমাদের কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

১৭। হে জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষ! তোমারই আদেশে উষার আবির্ভাবে দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ সকলই আলোকে আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের অন্তরও তোমার সুবিমল আলোকে প্রকাশিত হইয়া উঠুক। তোমার সত্য তত্ত্ব সকল আমাদের অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

১৮। এই পবিত্র উষাকালের আলোক ও বায়ু তোমারই পবিত্র সংস্পর্শ লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকে স্বাস্থ্য বিতরণ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। আমরা যেন সেই আলোক ও বায়ু সেবন করিয়া স্বাস্থ্য ও আরোগ্য লাভ করি। আমরা যাহা কিছু আহার করিব ও যাহা কিছু পান করিব, সে সমস্তই আমাদিগকে মহাকায় হস্তীর উপযুক্ত বল ও বীর্য্য প্রদান করুক। আমাদিগকে প্রভূত ধনরত্নের অধিকারী কর; আমাদিগকে নানাবিধ জ্ঞানে ও গুণে বিভূষিত কর; আমাদিগকে তোমার চরণতলে বসিবার উপযুক্ত করিয়া লও।

—

দেবমন্দিরে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সম্মুখে একটী প্রাচীন—বহুপ্রাচীন দেবমন্দির অতীত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপে দাঁড়াইয়া আছে। কি সুন্দর ইহার কারুকার্য্য! অনেক স্থলে কারুকার্য্য ধ্বসিয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহা দেখিয়াই তো মুগ্ধ হইতে হয়—তাহা হইতে চক্ষুকে তো উঠাইতে পারা যায় না। যে ভক্ত নিজের প্রাণ দিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার করি। তাহার পর একপুরুষ-একপুরুষ করিয়া ধরাপৃষ্ঠে যে কত পুরুষের আবির্ভাব হইল, আর কত পুরুষ যে অনন্ত কালের অতল গর্ভে নিলীন হইয়া গেল, কে-ই বা তাহার সম্বাদ রাখে? এই দেবমন্দিরের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে পুত্রের আরোগ্য কামনা করিয়া কত জননী কত দীর্ঘকাল ধর্ণা দিয়া পড়িয়াছিলেন; ভ্রাতার দুঃখকষ্টে আকুল হইয়া কত ভগিনী এই দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতার চরণে দুঃখকষ্ট মোচনের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; জরাজীর্ণ রোগে মৃতপ্রায় পিতামাতার সুস্থ জীবন ফিরিয়া আনিবার আশায় কত কন্যা আঙ্গুল মটকাইয়া মাথা খুঁড়িয়া দরদরধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—কে-ই বা সে সমস্তের খোঁজ খবর রাখিয়াছে? আর কে-ই বা জানে, তাহাদের মধ্যে কে বা প্রার্থনার সাড়া পাইয়াছিল, আর কে বা পায় নাই। কিন্তু ধ্যানে বসিয়া প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এই মন্দিরে সমাগত ঐ সকল প্রার্থীগণের সকলেরই অন্তরে এই একটী মহান প্রশ্ন তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি?

আজ পর্য্যন্ত সেই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি এই দেবমন্দিরের চারিদিকের দেওয়ালে আসিয়া আঘাত করিতেছে এবং আশ্রয়স্থানের অভাবে আকুলভাবে ফিরিয়া যাইতেছে। বুঝি বা সেই প্রতিধ্বনিরও একটী ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমার কানের ভিতর দিয়া হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঐ প্রশ্ন আমার প্রাণে থাকিয়া থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি? এক সময়ে পূজকদিগের প্রার্থনার গভীরতায়, ভক্তদিগের শ্রদ্ধাভক্তির প্রাবল্যে মন্দিরের অন্তর গাম্ভীর্য্যে মূর্ত্তিমান ও সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে আমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—কোথায় বা কে? ভক্তিশ্রদ্ধার গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে শোকের করাল মূর্ত্তি যেন মৃত্যুর লোলজিহ্বা বাহির করিয়া আগন্তুকদিগকে গ্রাস করিবার বিভীষিকা দেখাইতেছে। আমার আত্মা কিন্তু

এই মৃত্যুর মাঝে দাঁড়াইয়া অমৃতের সন্ধানে শবসাধনায় বসিবার জন্য অবসর খুঁজিতেছে, এবং মুহুর্মুহু ঐ একই প্রশ্ন করিয়া ঘুরিতেছে ফিরিতেছে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি?

মন্দিরটীর দ্বাদশ "রত্ন"। সুবর্ণখচিত দ্বাদশটী রত্নচূড়া উৰ্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া ভক্তহৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তির পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে। কে জানে?—হয়তো ভক্ত এই দ্বাদশ রত্নে মন্দিরটীকে সুশোভিত করিবার জন্য নিজের যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া পরিণামে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাকেও আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেও ঐ দ্বাদশ রত্ন গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়খানি নিশ্চয়ই সুবর্ণের রঙ্গে রাঙ্গিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই অতীত কালে গিয়া ঐ ভক্তের নিকট একবার উপস্থিত হইয়া জানিতে ইচ্ছা হয় যে, তিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহার ভিতর এই প্রশ্নের সমাধান পাইয়াছিলেন কি না—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

আমার মৃতপ্রায় আত্মা এবং এই জীর্ণদেহের ভগ্নতরী লইয়া আজ এই প্রাচীন দেবমন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি! এখানে কে এমন আছে, যে আমার প্রাণে সোনার কাঠি বুলাইয়া দিয়া নূতন বল ও নূতন শক্তি সঞ্চার করিতে পারে? তেমন কাহাকেও তো এখানে দেখি না। আমি যে দেবতার সন্ধানে বাহির হইয়াছি, দিবানিশি যাঁহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছি, চক্ষু অন্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছে, সে দেবতা এখানে কোথায়? যাঁহার চরণের রেণুকণার স্পর্শে পঙ্গু যে, সেও গিরিলঙ্ঘনে সক্ষম হয় এবং মূক যে, সেও বাগ্মিতা লাভ করে, সে দেবতা এখানে কোথায়? যাঁহার কৃপা লাভ করিলে দুর্ব্বল সবল হয়, অনাথ সনাথ হয়, এবং মৃত ব্যক্তিও নবজীবন লাভ করিয়া নববলে ও নবশক্তিতে জাগ্রত হয়, সে দেবতা এখানে কোথায়? বুঝি, তিনি এই মন্দিরের ক্ষুদ্র সীমা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—যাদুযষ্টিহস্তে এমন কাহাকেও তো এখানে দেখিতেছি না, যিনি দেবতার মৃতসঞ্জীবন স্পর্শ অনুভব করাইতে পারিবেন। স্বামীর জীবদ্দশায় যে গৃহলক্ষ্মী গৃহের সকল স্থানে ও সকল কর্ম্মে স্বীয় মোহন স্পর্শে শ্রী ও সুষমা আনয়ন করেন; আবার সেই গৃহলক্ষ্মীই স্বামীর বিরহে শুষ্ক সুগন্ধ পুষ্পের ন্যায় ম্লান হইয়া পড়েন—তখন তাঁহার সেই শ্রী ও সুষমা আনিবার মত সে স্পর্শ কোথায়? যে ভক্ত নিজের প্রাণের বিনিময়ে এই জড় মন্দিরেও প্রাণ আনিয়াছিলেন, আজ তাঁহার বিরহে সেই দেবমন্দির অতীত গৌরবের স্মৃতিমাত্র বহন করিয়া চলিয়াছে—ইহার প্রকৃত প্রাণ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যে দেবতা ইহার প্রাণ ছিলেন, আজ তিনি কোথায়? মনে হয় যেন, ভক্তেরা ঐ প্রশ্ন লইয়া এখানে আসেন বটে,—কোন্ দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি—কিন্তু উত্তরে সেই দেবতার সন্ধান না পাইয়া হতাশহৃদয়ে ফিরিয়া যান।

এই দেবমন্দির কত ভক্তের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাভক্তির সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া আছে; আবার এই দেবমন্দিরই কত অজ্ঞান ও মূঢ় ব্যক্তির কত অনাচার কদাচারের ও স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অপরের কত অনিষ্ট অমঙ্গল চিন্তারও সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান! বুঝি, ইহারাই এই দেবমন্দিরের প্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছে; ইহাদেরই অত্যাচারে ও ক্রিয়াকলাপে বিরক্ত হইয়া যিনি ইহার প্রাণের উৎস খুলিয়া দিবেন, যাঁহার অমৃতধারা লাভ করিয়া ইহা অমরত্ব লাভ করিবে, সেই অমৃতপুরুষকে লইয়া সাধুভক্তগণ হিমালয়ের নাকি কোন্ পাদদেশে, কোন্ এক নির্ঝরিণীর উপকূলে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনে হয় যেন, সেই সাধুদিগের অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া এই দেবমন্দির প্রাণের ব্যথায় দিবানিশি অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, নিজের জ্বালায় নিজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

এই দেবমন্দির বলিতে গেলে এখন শ্মশানে পরিণত। এই শ্মশানে এখনও কত শত লোক দীর্ঘ—দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হয়—কে জানে কেন? তাহাদের প্রাণের কি আকুল আকাঙ্ক্ষা—তাহারা আসে প্রাণের ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য, কিন্তু ফিরিয়া যায় ব্যর্থতার উপলখণ্ড লইয়া। তাহারা সন্ধানে আসে—কোন্ দেবতার পদে দিবে তারা হবি; ফিরিয়া যায় জড়ের চরণে আত্মবলি দিবার উপদেশ পাইয়া। জীবনপ্রদ অমৃতসলিলের অভাবে, প্রাণপ্রদ শক্তিদান করিবার ক্ষমতার অভাবে এই দেবমন্দিরের মত কত শত দেবমন্দির জরাজীর্ণ হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা রাখে?

সেই সকল মন্দিরের অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য্যও উহাদিগের ধ্বংসের পথে শ্মশানের পথে অগ্রসর হওয়া রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়া পৃথিবীর যতই কেন ভাল বস্তু হৌক না, তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া অন্তরে বিষাদের আগুন ধকধক জ্বলিতে থাকে। হায়! এই মন্দিরের কারুকার্য্যসকল বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ইহার নির্ম্মাতা অকাতরে কত সময়, কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু ইহা জরার করাল কবল হইতে কিছুতেই রক্ষা পাইল না। মন্দিরের প্রাণ যিনি, সেই আসল দেবতার অভাবে এ সমস্তেরই ব্যর্থতা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে কাতরতা প্রকাশ করিতে সমুদ্যত! যাঁহার অন্বেষণে সমস্ত জগতবাসী ধাবিত হইতেছে; সমস্ত জগতের প্রাণ হইতে যাঁহাকে পাইবার

জন্য সর্ব্বদাই এই প্রশ্ন উঠিতেছে—কোন্ দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি ; সমস্ত বিশ্বজগত যাঁহার অচল অটুট মন্দির, সেই দেবতার স্থান এ মন্দিরে কোথায় ? তাঁহার স্থান যদি এই মন্দিরে এবং ইহার মত অন্যান্য সকল মন্দিরে রক্ষিত হইত, তাহা হইলে জগতের ইতিহাস নিশ্চয়ই নবতর ভাবে লিখিত হইত ; জগতের ইতিহাস অন্যায় যুদ্ধবিগ্রহ ও দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অন্যায় অত্যাচারের রক্তবর্ণে মণ্ডিত হইবার পরিবর্ত্তে ন্যায় ও ধর্ম্মের এবং শান্তি ও অহিংসার বিশুভ্র শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইত নিঃসন্দেহ।

এই প্রাচীন দেবমন্দিরকে বিনা বার্দ্ধক্যেই জরা আসিয়া অধিকার করিয়াছে, তবু এখানে যাত্রীসমাগমের বিরাম নাই—অগণিত যাত্রী ইহাকে অমৃতধাম বিশ্বাস করিয়া দিনরাত্রি আসিতেছে আর যাইতেছে। মন্দির হইতে যে প্রসাদ বিতরিত হইতেছে, তাহা উহারা পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে মাথায় তুলিয়া লইতেছে। কিন্তু প্রসাদ বলিয়া যাহা বিতরিত হইতেছে, তাহার সহিত আধ্যাত্মিক কল্যাণের কোনও স্পর্শ আছে বলিয়া অথবা সত্যের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া দেখি না। যে দেবতার আসন সমস্ত বিশ্বজগত জুড়িয়া পাতা আছে, যিনি সর্ব্বকালে ও সকল স্থানে সমভাবে জাগ্রত এবং যাঁহাকে গাঢ়তর অনুভবের মধ্যে আনিবার ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য এই মন্দিরে আসিয়া পড়িয়াছি, সে দেবতা যে এই মন্দিরে স্থাপিত দেবতা নন, এবং এই প্রসাদ যে তাঁহার প্রসাদ নয়, তাহার প্রমাণ দেখি যে, এই মন্দিরের ঐ ক্ষুদ্র দেবতাকে অধিকাংশ সময়ই ঢাকিয়া রাখা হয়—যেন জনসাধারণের দৃষ্টিতে তাঁহার অমঙ্গল ঘটিবে ! মশামাছির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং দিনের বেলায় যাহাতে তাঁহার সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত না হয়, তদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে মশারি খাটাইয়া ঘিরিয়া রাখা হয় !! সমস্ত মন্দিরটী এমনভাবে বিরচিত যে, তাহার অন্তর্নিহিত অন্ধকারে ইন্দুর বাদুড় প্রভৃতি জীবজন্তু অনায়াসে আশ্রয় পায়,—আশ্রয় পায় না কেবল মানুষ !

প্রসাদ যাত্রীগণকে বিতরণ করা হয়, কারণ মন্দিরনির্ম্মাতা ভক্তের হৃদয় এই উদ্দেশ্যে বহুপরিমাণে দেবোত্তর জমি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন ; তদ্ব্যতীত আরও কতশত ভক্ত নিজের স্বার্থসিদ্ধির পর উচ্ছ্বসিত ভক্তির নিদর্শনরূপে আরও কত কিছু দান করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত দানের সঙ্গে ভগবানের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ যোগ খুঁজিয়া পাই না। এই নির্জ্জীব জড় বস্তর পূজার সঙ্গে মিশর দেশে বহুপূর্ব্বে প্রচলিত মৃত রাজারাণীর শবদেহের পূজার তুলনা দিতে বাধা কি ? বিশ্বজগত যাঁহাকে কোন্ দেবতা কোন্ দেবতা করিয়া অন্বেষণ করিয়া ভূধর সাগর গিরিকন্দর সর্ব্বত্র ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, এই মন্দিরের মধ্যে সেই দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত না করা পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে প্রকৃত প্রাণ আসিবে বলিয়া মনে হয় না। একই দেবতা—যিনি অনাদি অতীতে ছিলেন, যিনি বর্ত্তমানে আছেন এবং যিনি অনন্ত ভবিষ্যতে থাকিবেন, ধ্যানস্তিমিতনেত্রে অন্তরে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে তিনিই নব নব আকারে প্রকারে, নব নব শক্তিতে ভাবেতে নিত্য প্রকাশ পাইতেছেন। ইহা উপলব্ধি কর, দেখিবে—কি মন্দিরের অভ্যন্তরে, কি উহার বহিঃপ্রাঙ্গনে, অন্ধকার কিছুমাত্র থাকিবে না—সমস্ত অন্ধকার এক অপূর্ব্ব আলোকে ঝলসিয়া উঠিবে। ঐ প্রাচীন জরাজীর্ণ মন্দিরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিও না। অন্তরে নূতন জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত কর, প্রীতির নবতর প্রশস্ত পথে চলিতে থাক এবং আধ্যাত্মিকতার শিখরদেশে আরোহণ কর, তবেই মৃতধর্ম্মের কঙ্কাল জড়পূজা ও ভগবৎপ্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্ম, উভয়ের পার্থক্য তোমার সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠিবে।

বিজ্ঞান যখন এক একটী জগতকে দাঁড়িপাল্লার ওজনেও ফেলিবার জন্য সদর্পে দাঁড়াইয়া উঠিতেছে এবং ভূগর্ভ হইতে অতীতের ইতিহাস নিষ্কাশিত করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেছে না ; প্রজ্ঞান যখন আধ্যাত্মিক গভীর তত্ত্বসকল প্রকাশ করিয়া মানুষকে স্তম্ভিত করিতেছে, তখন যে নামেই হোক, জড়-পূজার সাহায্যে পরাধীনতার যন্ত্রতলে আপনাকে নিক্ষেপ করিলে তাহা আত্মহত্যার অতিরিক্ত আর কিছুই হইবে না। অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ কর এবং আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে তাঁহাকে অন্বেষণ কর—যিনি জলে স্থলে শূন্যে সমভাবে বিদ্যমান ; অচিরে তিনি সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে তোমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হইবেন।

মন্দিরে আর পবিত্রতা নাই। এখন সেখানে দস্যুগিরির প্রাদুর্ভাব। এখন সেখানে জাগিয়া আছে—অর্থের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ফেল কড়ি, আর প্রতি পদ নিক্ষেপ কর। অর্থের অতিমাত্র আকাংক্ষার নিকট পবিত্রতা প্রভৃতি শতবিধ সদ্ভাব দূরে পলায়ন করে। কিন্তু পরাধীনতা মানুষকে কি প্রকার আশ্চর্য্য রূপ অবশ করিয়া রাখে—ভিক্ষার ঝুলি খোলা রাখিয়া দস্যুগিরি চলিতেছে প্রত্যক্ষ করিলেও ভিক্ষাদাতাগণ বৃথা দানেও পুণ্যকর্ম্ম করিল ভাবিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছে ! যাহা কিছু দান কর, সে সমস্ত কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়া যায় তাহা কে জানে ? মন্দিরের সিঁড়ি প্রভৃতি যে সকল অংশ সাধারণের বহির্দৃষ্টির প্রত্যক্ষ হইবে, সেইগুলির যৎকিঞ্চিৎ সংস্কার হইলেই হইল ; আগন্তুকদিগের অন্তর কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে,

সেদিকে কোনই লক্ষ্য নাই। যাত্রীদিগের স্নানাহার কিরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে, সেদিকে কাহারও কোনও লক্ষ্যই নাই। তাহাদের অন্তরে পরাধীনতাজনিত দাস-মনোভাব এতই বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কৃমিপূর্ণ জলাশয়কেও পবিত্রতার পরম আধার বলিয়া মনে করে ও তাহার জলকে তদনুরূপ ব্যবহার করে। এই মন্দিরে মনের স্বাস্থ্যপ্রদ জ্ঞানশিক্ষাকে স্থান পাইতে দেখি না; প্রত্যুত যাত্রীদিগকে পরাধীনতার পরিপোষক সর্ব্ববিধ শিক্ষা দিবারই অনুকূল ব্যবস্থা করা হয়। কোন্ দেবতারে আর পূজি দিয়া হবি, এই যে প্রশ্ন লইয়া আমি আজ এই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, মন্দিরের চারিভিতের মধ্যে, কৈ, তাঁহার সন্ধান পাইবার উপযুক্ত কোনও শিক্ষা দিবারই তো ব্যবস্থা দেখি না; প্রত্যুত, জড়পূজার শিক্ষা দিয়া মানুষকে জড়ে পরিণত করিবার ব্যবস্থাই তো সর্ব্বত্র দেখি।

আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়াছে—মন্দিরে নহে, মন্দিরের বাহিরে; মন্দিরের চারিভিতের ক্ষুদ্র সীমার ভিতরে নহে, কিন্তু বিরাট বিশাল প্রকৃতির সীমাহীন সীমার মধ্যে। আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়াছে—এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত জড়মূর্ত্তি সন্দর্শনে নহে, কিন্তু আত্মার হিরণ্ময় আসনে অধিষ্ঠিত জীবন্ত জাগ্রত দেবতার চরণস্পর্শ লাভ করিয়া। যে দেবতার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, তাঁহার সন্ধান পাইয়াছি বাহিরের ভিক্ষাঝুলি পূর্ণ করিবার ফলে নহে, কিন্তু অকিঞ্চনগুরু প্রাণের দেবতার স্নেহপ্রেমের ভিক্ষাদানে আমার নিজের আত্মার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিবার ফলে।

প্রশ্ন—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতারে
 আমি পূজি দিয়া হবি?

উত্তর—ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
 য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥
 অগ্নির অগ্নি হয়ে বিরাজেন সদা যিনি;
 জলেতে স্নেহরূপে আছেন পশিয়া যিনি;
 ওষধি বনস্পতি ভুবন ভরিয়া যিনি—
 তাঁহারে ভক্তিভরে নমি নমি সদা নমি,
 নমি নমি সদা নমি—নমি নমি সদা নমি॥

রংপুরে রামমোহন রায়।

(২)

[সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে]

(শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

রামমোহনের উপর ডিগবী সাহেবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সহজে নিরস্ত হইলেন না,—বোর্ডের পত্রের প্রতিবাদ করিয়া, রামমোহনকে দেওয়ানী দিবার জন্য পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন,—

"আমি আপনার ১৫ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, বোর্ড আমার সুপারিশ এতই তুচ্ছ মনে করেন যে, রামমোহন রায়ের চরিত্র সম্বন্ধে এমন অনুকূল মন্তব্য-প্রকাশ এবং তাঁহার অতি উচ্চ গুণগ্রামের বিবৃতি-সত্ত্বেও বোর্ড মৎকর্ত্তৃক তাঁহার দেওয়ান-পদে নিয়োগে আপত্তি করিলেন।

"আপনার পত্রের প্রথমাংশ পড়িয়া মনে হয়, প্রস্তাবিত পদে রামমোহন রায়ের নিয়োগের মঞ্জুরীতে বোর্ডের অসম্মতির একটি কারণ এই,—দেওয়ান পদ-সংক্রান্ত কার্য্যনির্ব্বাহে অনভিজ্ঞতার দরুণ তাঁহারা তাঁহাকে ঐ পদের কর্ত্তব্যসম্পাদনে অনুপযুক্ত মনে করেন। গত মাসের ৩০শে তারিখের পত্রে আমি জানাই, যশোহর জেলায় অস্থায়ী কালেক্টর হিসাবে যখন আমি কাজ করিতেছিলাম, তখন আমার ব্যক্তিগত মুন্সীরূপে কার্য্য করিবার কালে তিনি রাজস্ব-আদায়ের আইন-কানুন ও সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন; আমি ভাবিয়াছিলাম ইহাতেই সমস্ত আপত্তি দূর হইবে। আরও আমি না জানাইয়া পারিতেছি না, কখনও সরকারী কাজ করেন নাই এমন লোকদের কালেক্টরীর দেওয়ান পদে নিয়োগ বোর্ড সমর্থন করিয়াছেন,—এরূপ উদাহরণও বিরল নহে।

"আমি যে লোকটির নাম প্রস্তাব করিয়াছি, তাঁহার চরিত্র ও গুণপনা সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের কাজী-উল্-কুজাৎ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ফার্সীর প্রধান মুন্সী এবং ঐ সকল বিভাগের অপরাপর প্রধান কর্ম্মচারীদের নিকট খোঁজ লইবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করি।

"তাঁহার গুণ ও যোগ্যতা ভালরূপে জানি বলিয়া, যে কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছি সে কাজ হইতে তাঁহাকে অপসৃত করিয়া দেশীয়দিগের চক্ষে তাঁহাকে হীন প্রতিপন্ন করিতে আমার মনে আঘাত লাগে। আমি তাঁহাকে অস্থায়িভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম এই আশায় যে, যাঁহাদের নিকট সন্ধান লইবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছি সেই দেশীয়গণ তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যাহা জানাইবেন সেই ধারণা এবং কাজকর্ম্মে তাঁহার যে জ্ঞান আছে বলিয়া জানাইয়াছি সেই জ্ঞান, আমার আপিসের দেওয়ানের পদ-নিয়োগ-সমর্থনে বোর্ডকে প্ররোচিত করিবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি এই কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

"জামিন সম্বন্ধে বোর্ডকে এই কথা জানাইতে চাই

যে, তিনি অন্যান্য জেলা হইতে যত টাকা হোক জামিন জোগাড় করিতে পারেন।" (৩১ জানুয়ারী, ১৮১০) *

১৮০৭, ২৩শে ডিসেম্বর ডিগবী অস্থায়ীভাবে যশোহর জেলার কালেক্টরের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। † এই পদে তিনি ছয়মাস কাল—১৮০৮, ৯ই জুন পর্য্যন্ত ছিলেন। ‡ সুতরাং এই সময়েই রামমোহন ডিগবীর বে-সরকারী মুনশীরূপে যশোহরে অবস্থান করেন। যশোহর ত্যাগ করিয়া, ডিগবী রেজিষ্টারের পদে ভাগলপুর গমন করেন। রামমোহনও যে এই সময় (১৮০৯) ভাগলপুরে ছিলেন, সরকারী কাগজপত্রে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। ভাগলপুরেও রামমোহন ডিগবীর বে-সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

অধীন বাঙালী কর্ম্মচারীর অনুকূলে ইংরেজ সিবিলিয়ানের এরূপ উচ্চগুণগান বড় সুলভ নহে,—বিশেষতঃ সে যুগে। কিন্তু বোর্ড-অফ-রেভিনিউ তাঁহাদের পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিলেন না, অধিকন্তু চটিয়া কালেক্টর ডিগবীকে কড়া চিঠি লিখিলেন,—

"আমাকে বোর্ড-অফ-রেভিনিউ আপনার গত মাসের ৩১শে তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ইহাও জানাইতে বলিতেছেন যে, আপনার পত্রে এমন কোন কারণ দেওয়া আছে বলিয়া বোর্ড মনে করেন না যাহার জন্য আপনার জেলার দেওয়ান-পদে রামমোহন রায়ের নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে বোর্ড তাঁহাদের পূর্ব্বমত বদল করা আবশ্যক মনে করেন; এই হেতু তাঁহারা ইচ্ছা করেন, আপনি তাঁহাদের গত মাসের ১৫ই তারিখের চিঠি অনুযায়ী ঐ পদের জন্য অপর কাহাকেও মনোনীত করিবার চেষ্টা দেখুন।

"বোর্ডের ইচ্ছামত আপনাকে আরও জানাইতেছি, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনি যেরূপ ভঙ্গীতে পত্র লিখিয়াছেন বোর্ড তাহা অত্যন্ত অপছন্দ করেন; তাঁহাদের প্রতি পুনরায় এরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে, বোর্ড যে তাহা অত্যন্ত গুরুতরভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন ইহা সুনিশ্চিত।" (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮১০) §

বোর্ডের নিকট ডিগবীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল। কিন্তু তবুও তিনি শেষবার রামমোহনের নিয়োগের জন্য চেষ্টা করিতে ছাড়িলেন না। অন্ততঃ আরও কিছুদিন রামমোহনকে কাজ করিতে দিবার জন্য বোর্ডের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন:—

"এই জেলার দেওয়ান-পদে মৎকর্ত্তৃক রামমোহন রায়ের নির্ব্বাচনের প্রস্তাব সম্পর্কিত এবং গত ৩১শে জানুয়ারী লিখিত আমার চিঠির লিখন-ভঙ্গীর প্রতি বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর বিরক্তি-প্রকাশক, আপনার গত মাসের ৮ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

"যাঁহার নাম বোর্ডের কাছে সুপারিশ করিয়াছিলাম, তাঁহার উচ্চাঙ্গের প্রতিভা, বিচার-শক্তি এবং চরিত্রবলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে বলিয়াই, এবং যে ব্যক্তি জ্ঞানের গভীরতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা হেতু আমার আপিস-সংক্রান্ত কাজে জনসাধারণের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন বোর্ড সেইরূপ ব্যক্তির নিয়োগ নামঞ্জুর করাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম বলিয়াই আমার মন্তব্যে যদি এমন-কিছু তীব্রতা প্রকাশ পাইয়া থাকে—যাহা অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহা হইলে আমার অনবধানতার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। জানিয়া-শুনিয়া অসম্মান-প্রদর্শনের ইচ্ছা দূরে থাকুক, এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের প্রত্যাখ্যানে সম্মান-সহকারেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলাম এবং বোর্ড বাতিলের যে-সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই-সকল কারণ বেশী করিয়া বর্ত্তমান থাকিলেও রামমোহন রায় অপেক্ষা অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগও যে মঞ্জুর করা হইয়াছে সে-সম্বন্ধে নজির আছে তাহাও বোর্ডকে মনে করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, আমি প্রার্থনা করি আপনি একথা বোর্ডকে বুঝাইয়া বলিবেন।

"দেওয়ানের কাজে একজন সুদক্ষ লোককে নিযুক্ত করাই বোর্ডের উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্যও আমার ইচ্ছার অনুরূপ। কিন্তু রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি কাজে অভ্যাস নাই বলিয়া যখন অনুমান-বলে ধরিয়াই লওয়া হইতেছে যে, আমার মনোনীত লোকটি রাজস্ব-আদায় ব্যাপারের সাধারণ পদ্ধতিতে অজ্ঞ, তখন আমি প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বোর্ডের নিকট আমার এই একান্ত আশা জানাইবেন যে তাঁহারা যেন রামমোহন রায়কে আরও কয়েক মাস দেওয়ানের কার্য্য করিতে দিবার অনুমতি আমাকে দেন; তাহা হইলে বোর্ড তাঁহার প্রকৃত গুণপনা ও দেওয়ান-পদে তাঁহাকে বাহাল রাখার ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে বিচার করিতে পারিবেন; যদিও আমি নিজে আশা করি যে, অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘ মাসের তৌজী ও রিপোর্টগুলি দেখিয়া (এ কয় মাসে অতি অল্পই খাজনা বাকি পড়িয়াছে) বোর্ড

* Board of Revenue Con. 8 Feby. 1810 No. 9.

† Board of Revenue Procdgs 29 Dec. 1807. No. 93.

‡ Ibid., 14 June 1808. No. 34.

§ Board of Revenue Con. 8 Feb. 1810, No. 10.

তাঁহার গুণ ও সাধুতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অনুকূল মত পোষণ করিয়া থাকিবেন।" (৮ই মার্চ্চ, ১৮১০)*

এবারও বোর্ড ডিগবীর প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কালেক্টরকে লেখা হইল,—

"আপনার এই মাসের ৮ই তারিখের পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার করিতে আমাকে আদেশ করা হইয়াছে এবং আমাকে জানাইতে বলা হইয়াছে যে, আপনি আপনার ৩১শে জানুয়ারী তারিখের পত্রের ভঙ্গী সম্বন্ধে যে জবাব-দিহি করিয়াছেন, তাহাতে বোর্ড সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

"আপনার কালেক্টরীতে যে দেওয়ান-পদ খালি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে ১৫ই জানুয়ারী ও ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রদত্ত বোর্ডের আদেশ, সঙ্গতি বা ঔচিত্যবোধের দিক দিয়া দেখিলে বোর্ড বদল করিতে পারেন না—ইহার জন্য তাঁহারা দুঃখিত, এবং আপনি যেন রাম-মোহন রায় ছাড়া অপর কাহাকেও ঐ পদে মনোনীত করেন,—বোর্ডের এই ইচ্ছা আপনাকে জানাইবার জন্য পুনরায় আমাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"বোর্ড মনে করেন, ঠিক সময়ে সরকারী রাজস্ব-আদায়কার্য্য সাধারণতঃ কালেক্টরেরই প্রযত্ন প্রমাণ করে—যদিও সেই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও অস্বীকার করিতে চাহেন না যে, হয়ত সেই কৃতিত্বের কতকাংশ সতর্কতা ও মনোযোগিতার জন্য দেওয়ানেরই প্রাপ্য। কিন্তু বছরের তিন মাস বা তাহার অধিক কালের অনুকূল তৌজীগুলিই শুধু ঐ পদাভিষিক্ত দেশীয় কর্ম্মচারীর প্রতিভার অথবা সাধুতার বিচারে মানদণ্ডস্বরূপ ধরিতে হইবে,—এরূপ যুক্তি বোর্ড কখনই মানিয়া লইতে পারেন না।" (১৬ই মার্চ্চ, ১৮১০) †

রামমোহনের নিয়োগ-সম্বন্ধে লেখালেখি করিয়া যে কোন ফল হইবে না, তাহা বুঝিয়া ডিগবী দেওয়ান-পদের জন্য অন্য লোকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কয়েক মাস পরে বোর্ডকে জানাইলেন,—

"বোর্ডের অবগতির জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, অদ্য আমি মুনশী হেমায়েৎ-উল্লাকে আপাততঃ অস্থায়ি-ভাবে এই আপিসের দেওয়ানের পদে মনোনীত করিয়াছি। লোকটি সুযোগ্য ও সচ্চরিত্র, রংপুরের ফৌজদারী আদালতে বারো বৎসর, এবং দেওয়ানী আদালতে প্রায় দুই বৎসর শেরিস্তাদারের কাজ করিয়াছেন। আশা করি, বোর্ড এই ব্যবস্থা সানন্দে মঞ্জুর করিবেন।" (২৮শে মার্চ্চ, ১৮১১) ‡

এবার বোর্ড ডিগবীর কথায় কর্ণপাত করিলেন। ১৮১১, ১৯শে এপ্রিল তারিখের পত্রে তাঁহারা মুনশী হেমায়েৎ-উল্লাকে দেওয়ান-পদে পাকা করিলেন।

রামমোহনের দেওয়ানী লইয়া কালেক্টর ডিগবী ও বোর্ডের মধ্যে যে বাদানুবাদ চলিয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা গেল, রামমোহন রায় প্রকৃতপক্ষে রংপুরের দেওয়ান হন নাই, তবে নূতন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় দেড় বৎসরকাল অস্থায়িভাবে এই পদে কাজ করিয়াছিলেন মাত্র। এই দেওয়ান-পদের বেতন তখনকার দিনে দেড়শত টাকার বেশী ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার ন্যায় লোকও বোর্ডের চক্ষে এই কার্য্যের উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই।

ঢাকা, রামগড়, যশোহর, ভাগলপুর ও রংপুরে সিবিলিয়ানদের সংস্পর্শে আসিয়া রামমোহন রাজস্ব ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের যে বহুমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন চার্টার প্রাপ্তির সময় তিনি ১৮৩১-৩২ সালে হাউস-অফ-কমন্স সভায় ভারতের শাসনতন্ত্র-সম্পর্কে যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

রংপুরে অবস্থান কালে রামমোহন নিজ বাসায় সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধব লইয়া ধর্ম্মতত্ত্বের—প্রধানতঃ পৌত্ত-লিকতার অসারতার কথা—আলোচনা করিতেন। রংপুরে তখন বহুলোকের বসতি; বাসিন্দাদের মধ্যে জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী মারওয়াড়ী-ব্যবসায়ীও কম ছিল না। তাহাদের অনেকেই এই সান্ধ্য-সভায় যোগ দিত। এই কারণে রামমোহনকে কল্পসূত্র ও অন্যান্য জৈনধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই একদল লোক রামমোহনের ঘোরতর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নেতা—গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য ছিলেন রংপুর জজ কোর্টের দেওয়ান, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। "ইনি রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে একখানি বাংলা পুস্তক লেখেন। উহা সংশোধিত হইয়া বাংলা ১২৪৫ সালে (১৮৩৮) কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকখানিতে জানিতে পারা যায় যে, রামমোহন রায় রংপুরে ফার্সী ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং বেদান্তের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক লোক গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের অনুগত ছিল। তিনি তাহাদিগকে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচারী হইতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।"*

---

* Board of Revenue Con. 16 March 1810. No. 11.

† Ibid. No. 12.

‡ Board of Revenue Con, 19 April 1811 No. 18.

* নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রাজা রামমোহন রায়" (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ৩১

১৮১৪ সালের শেষাশেষি ডিগবী সাহেব কিছুদিনের ছুটিতে বিলাত গমন করিলেন। ঐ বৎসরে রামমোহনও রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

ঈশ্বর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ—ভগবান সত্ত্ব বা ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সতের ভাব হইল সত্ত্ব। সৎ বলিতে যাহা আছে তাহাকেই বুঝায়; যাহা নাই তাহাই অসৎ। আবার, সৎ বলিতে যাহা সাধু যাহা ভাল তাহাকেও বুঝায়; সত্ত্ব বলিতে সাধুতাও বুঝায়। সত্ত্ব অর্থে ধর্ম্মও বুঝায়। ধর্ম্ম অর্থে যাহা ধারণ করে; বিশ্ব যাহা দ্বারা বিধৃত হয় তাহাই ধর্ম্ম। কাজেই দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত ভাষায় অথবা হিন্দুশাস্ত্রের ভাবার্থে ধর্ম্ম ও সাধুতা একই অর্থবাচক; এই সাধুতাই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে, এবং এই সাধুতারই একমাত্র প্রকৃত অস্তিত্ব আছে।

প্রকৃত যাহা আছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল এবং তাহাই ধর্ম্মের অঙ্গ। ইহার বিপরীতে যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাই মিথ্যা, তাহাই অশুভ এবং তাহাই অধর্ম্মের উপকরণ। অধর্ম্ম জগতকে ধারণ করিবার পরিবর্ত্তে বিধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। ন্যায়বিচারের যথার্থ অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ ন্যায়বিচার প্রকৃত সত্যকেই দাঁড় করাইতে চায়; সেই কারণে সকলেই ন্যায়বিচারই প্রার্থনা করে, সকলে ন্যায়বিচারেরই জয়জয়কার করে। ন্যায়বিচারই এই জগতকে ধারণ করিয়া আছে। অন্যায় বিচারের প্রকৃত অস্তিত্বই নাই। ন্যায়বিচারের অভাবই হইল অন্যায় বিচার। প্রকৃতির নিয়ম হইল ন্যায়বিচার। তাহারই বিরুদ্ধে দাঁড়ায় অন্যায় বিচার; তাই কেহই অন্যায় বিচার প্রার্থনা করে না। সকলেই জানে যে, উহা ধর্ম্ম নহে, উহা জগতকে ধারণ করিতে পারে না—প্রত্যুত, উহা জগতকে বিশ্লিষ্ট করিয়া নষ্ট করিতে চায়।

এই প্রকার আরও অনেক শুভজনক চিন্তা, ভাব ও কর্ম্ম আছে, যাহার প্রতি জগতবাসী আগ্রহশীল হয়, যে গুলিকে জগতবাসী ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতে একপ্রকার বাধ্য হয়। এই যে বিভিন্ন বিষয়কে বিভিন্ন জগতবাসী আমরা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লইতেছি, ইহাই তো ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানেরই প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে। তিনিই এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনিই তাঁহার ধর্ম্মের দ্বারা এই জগতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ও পালন করিতেছেন। তাঁহারই অচ্ছেদ্য নিয়মে তিনি এই জগতসংসারকে মঙ্গলভাবে পরিচালিত করিতেছেন। আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি বা নাই পারি, এই জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সে সমস্তই তাঁহার ন্যায়বিচারে, তাঁহার ধর্ম্মনিয়মে বাঁধা—কোনও ঘটনাই তাঁহার প্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারে না।

তিনিই আমাদের পরম আশ্রয়স্থান, তিনিই আমাদের একমাত্র নির্ভরস্থল। যে কোন সীমাবদ্ধ প্রাণীর উপরে নির্ভর কর, কোন-না-কোন সময়ে সেই নির্ভর টলিলেও টলিতে পারে; কিন্তু ভগবানের উপর নির্ভর করিলে তাহা কিছুতেই টলিতে পারে না, কারণ তিনি তাঁহার নিজের সত্যধর্ম্মে বাঁধা। যাঁহার ধর্ম্ম অটল; যাঁহার ধর্ম্ম ধরিয়া চলিলে আমরা জানি যে, মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল আসিতে পারে না; যাঁহার ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিলে আমরা নির্ভয় হই, শান্তি পাই, সেই ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিলে আমাদের প্রকৃত নির্ভরস্থল আর কোথায়? পিতামাতার উপর সন্তান নির্ভর করে, বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। পিতামাতাও সন্তানকে তাঁহাদের স্নেহ দান করিয়া কৃতার্থ হন। এই যে লক্ষ কোটী জীবের নির্ভর ও বিশ্বাস, এই যে লক্ষকোটী জীবের স্নেহপ্রেম,—এসকল আসে কোথা হইতে? এগুলি তো তুমি আমি জগতে আনয়ন করি নাই, বরঞ্চ এগুলি পাইবার জন্য, সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য আমরা একান্ত উৎসুক হইয়া থাকি। কাজেই আমরা বুঝিতে পারি এবং অন্তরে দৃষ্টি করিলে সেখানে ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে নিহিত দেখি যে, এসকলের মূল উৎসরূপে এক অখণ্ড ভগবান বিদ্যমান। আরও দেখি যে, এই নির্ভর ও স্নেহের অস্তিত্বে, ইহাদের পরস্পর আদানপ্রদানে সংসার মধুময় হয়, সংসারে মঙ্গল শতধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

অনেক সময়ে তাঁহার কার্য্যের ধারা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারা যায় না বলিয়া তাঁহার অস্তিত্বে ও তাঁহার মঙ্গলভাবে যদি এতটুকু সংশয় তোমার অন্তরে সমুদিত হয়, তবে তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেল। তাঁহার সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করিবার অধিকারও আমাদের নাই, আর অবসরও নাই। আমাদের জ্ঞানই বা কতটুকু, আর আমাদের শক্তিসামর্থ্যই বা কতটুকু? এই যে আমাদের পরমায়ু, নিরবধি কালের সঙ্গে যখন ইহার তুলনা করিতে যাই, তখন সেই কালের বিশালতা এবং আমাদের পরমায়ুর ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া আমাদের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এই যে আমাদের জ্ঞান, যাহার বড়াই করিয়া আমরা ভগবানের প্রতি সংশয় পোষণের স্পর্দ্ধা প্রদর্শনে সাহস করি, সেই জ্ঞানই বা আমাদের কতটুকু? একটীমাত্র বালুকণার তত্ত্বসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিলে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কারে এক

জীবনে তো কুলাইবে না, কত জীবন যে লাগিবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না; আর এই জ্ঞানেও কুলাইবে না—আশ্চর্য্য, একটী একটী করিয়া যতই তত্ত্ব আবিষ্কার করি, আরও কত তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সম্মুখে বাকী পড়িয়া আছে উপলব্ধি করি।

আমাদের শক্তিই বা কতটুকু—সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্ডলের কোনও একটীকেই কি তাহার কক্ষপথ হইতে এক কেশাগ্রও বিচ্যুত করিতে পারি? সকল বিষয়েই যখন ক্ষুদ্রতার শতবিধ সীমা আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া আছে, তখন বিশ্বপতি বিশ্ববিধাতা ভগবানের অস্তিত্বে, তাঁহার শক্তিতে, তাঁহার মঙ্গলভাবে সংশয় করিবার স্পর্দ্ধার অবসর কোথায়? যেটুকু শক্তিও আমরা পাইয়াছি, যেটুকু জ্ঞানই বা আমরা পাইয়াছি, এগুলি কেহই তো বাহির হইতে আসিয়া আমাদের অন্তরে বসাইয়া দেয় নাই। এই যে কোটী কোটী জননীর অন্তরে কোটী কোটী সন্তানের মঙ্গলের জন্য স্বীয় জীবনেরও বিনিময়ে প্রাণের আকাংক্ষা নিহিত দেখি, সমস্ত মঙ্গলভাবের এক অখণ্ড উৎস, সমস্ত স্নেহপ্রেমের এক অদ্বিতীয় নির্ঝর এক ভগবান ব্যতীত আর কে ইহা নিহিত করিতে পারেন? তিনিই যখন সমস্ত জগতের একমাত্র স্রষ্টা, তিনিই যখন সমস্ত বিশ্বজগতের একমাত্র বিধাতা, তিনিই যখন সমস্ত মঙ্গলভাবের, সমস্ত স্নেহপ্রেমের এক অখণ্ড উৎস, তখন তাঁহার সকল বিধান আমরা বুঝি বা না বুঝি, তাঁহার অস্তিত্বে বা তাঁহার মঙ্গলভাবে সংশয় দেখাইবার স্পর্দ্ধা প্রদর্শনের কোনও অধিকারও আমাদের নাই, অবসরও নাই।

তিনি সর্ব্বশক্তিমান। সর্ব্বশক্তিমান বলিয়াই তাঁহার ন্যায়বিচারও অক্ষুন্ন। তাঁহার শক্তির কোনও দিকে কোনও সীমা থাকিলে তাঁহার ন্যায়বিচারে আঘাত পড়িবারও সম্ভাবনা থাকিত। আমরা দেখিতেছি, বিশ্বজগত উন্নতির অভিমুখে ধাবমান। সমগ্র জগতের অধিবাসী ন্যায় ধর্ম্ম সত্য দয়া স্নেহ প্রেম প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ অবলম্বন করিবার জন্যই আকুল। এ অবস্থায় তাঁহার প্রতি, তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রতি, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম্মের প্রতি সংশয় করিয়া আপনাকে বিনাশের মুখে, মৃত্যুর মুখে ভাসিয়া যাইতে দিও না। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া, বলক্রিয়া, সমস্তই স্বাভাবিক, সকলই আশ্চর্য্য। তাঁহারই ইঙ্গিতে এই প্রকৃতি বিকশিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার বিচার করিতে গেলে আমাদিগকেও প্রকৃতির অতীত হইতে হইবে!—ইহা অসম্ভব। তিনিই আমাদের ঈশ্বর। ন্যায় সত্য প্রভৃতি জগতে যাহা কিছু সদ্‌গুণ আছে, তাঁহার চরণ স্পর্শ লাভ করিবার সেই সমস্ত সদ্‌গুণই এক একটী সুপ্রশস্ত পথ। তিনিই রাজগণ-রাজা। আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা হইতে মুক্তিদান করিবার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম্ম ও তাহার অনুকূল নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর—অবিলম্বে স্বাধীনতা হস্তগত হইবে।

তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা, তিনিই আমাদের স্নেহময়ী মাতা। তিনি কেবল ন্যায়বিচারের তৌলদণ্ড হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া নাই। আমরা যখন দুঃখশোকের কঠিন আঘাতে, বিপদ-আপদের মর্ম্মভেদী প্রহারে দিশাহারা হইয়া পড়ি এবং তাঁহারই ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া দুই মুহূর্ত্ত প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবার অবসর লাভের জন্য আকুল-প্রাণে তাঁহাকে ডাকি, তখন তিনি ব্যতীত আর কেহই তো এই মরণস্পৃষ্ট নরনারীকে কোলে তুলিয়া লয় না, অমৃতবারিতে অভিষিক্ত করিয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে আসে না। তাঁহার করুণা, তাঁহার স্নেহপ্রেম, পদে পদে তাঁহার দয়ার পরিচয় যে অনুভব করিয়াছে, সে যে তাঁহার বিষয় বলিতে গিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে অক্ষম হয়। তিনি আমাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া উপলব্ধি করিতে দিয়াছেন; আমরা আপনাদিগকে সেই অমৃত পুরুষের সন্তান অমরণধর্ম্মা বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি, তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য সকল বিষয়েই উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী বলিয়া জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেমের অধিকতর পরিচয় আর কি হইতে পারে?

আমাদের চারিদিকে মৃত্যু ও তাহার অনুচরবর্গ সর্ব্বদাই সগর্ব্ব পদক্ষেপে বিচরণ করিতেছে। আমরা অনেক বিষয়ে ফাঁকি দিয়া চলিলেও চলিতে পারি, কিন্তু মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করা আমাদের কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই কারণেই আমাদের চিত্ত মৃত্যুর বিভীষিকায় নিতান্তই বিহ্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু মৃত্যুকে যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, মৃত্যু যাঁহার আদেশবাহী অনুচর, মৃত্যু যাঁহাকে জানে না, সেই মৃত্যুর অতীত অমৃতপুরুষের চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, সেই শত বিভীষিকা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। তখন তুমি আপনাকে সেই অনন্তস্বরূপের অনুচর বলিয়া এবং তাঁহাকে তোমার সখা বলিয়া উপলব্ধি করিবে। তখন তুমি আপনাকেও মৃত্যুর অতীত বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। তোমার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যাইবে এবং তুমি দেখিবে যে, এই বিশ্ব-জগত সমস্তই, তোমার যিনি পিতামাতা, একমাত্র তাঁহারই রাজ্য; সুতরাং তুমি এই পৃথিবীতেই থাক বা অন্য যে কোন স্থানেই থাক, তুমি তাঁহারই রাজ্যে বাস করিবে, মৃত্যু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ভগবান যে প্রেমময়, স্নেহময়, তিনি যে আমাদিগকে

প্রীতি করেন ও ভালবাসেন, আমাদের প্রেম হইতেই আমরা তাহা সহজেই উপলব্ধি করি। আমরা প্রতি পদেই দেখি যে, এখানে আমরা যতই কেন স্নেহ প্রেম লাভ করি না, তাহা কিছুতেই চরম তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না—কোথায় যেন বেশ একটু অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই অতৃপ্তির আঘাত পাইলেই আমাদের সমস্ত হৃদয়, সমস্ত দৃষ্টি পরম পরিতৃপ্তি লাভের আশায় ঊর্দ্ধমুখে তাঁহার প্রীতির একবিন্দু লাভ করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। আমরা প্রকৃতিতে এই সত্য নিহিত দেখি যে, প্রীতি একক থাকিতে পারে না—প্রীতির পাত্র পরস্পরের আদানপ্রদানসাপেক্ষ; তুমি আমাকে যদি প্রাণ দিয়া প্রীতি কর, তবে আমিও তোমাকে প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারিব না। এই ভাবটা তুমি আমি প্রকৃতিতে নিহিত করিয়া দিই নাই। সুতরাং আমরা বলের সহিত বলিতে পারি যে ভগবানই ইহা প্রকৃতিতে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিহিত এই নিয়মের উপর দাঁড়াইয়াই আমরা বলিতে পারি যে, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার মত ডাকিলে তিনি সাড়া দিতে বাধ্য—সাড়া না দিয়া থাকিতে পারেন না। শতসহস্র মুনিঋষি, সাধু এবং পাপদগ্ধ অসাধুও এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং দিতেছেন। সেই ভগবান স্বীয় প্রেম-মূর্ত্তিতে এই প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন বলিয়াই সত্যধর্ম্ম এই সত্য ঘোষণা করিবার অধিকারী যে, ভগবানের রাজ্যে অনন্ত নরক নাই, এবং থাকিতে পারেও না। তাঁহার সূর্য্য তাঁহার চন্দ্র যেমন সকল গৃহে সকল ক্ষেত্রে সমভাবে কিরণ বিকীর্ণ করে—ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা প্রদান না করিলে কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না, সেইরূপ সেই পিতামাতার স্নেহপ্রেম হইতে পাপীতাপী সাধু অসাধু কেহই বঞ্চিত হয় না—সকলেরই উপর তাহা সমভাবে শতধারে বর্ষিত হয়। পাপাত্মারা পাপচিন্তা ও পাপাচরণের অন্ধকার আবরণে আপনাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে বলিয়াই তাহারা সেই স্নেহপ্রেম সকল সময়ে সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না।

হৃদয় হইতে সকল সংশয় বিদূরিত করিয়া ভগবানকে একমাত্র পিতামাতা বলিয়া জান; তাঁহাকেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া জান। তিনিই একমাত্র অকূলের কূল, দুর্ব্বলের বল এবং অনাথের নাথ। সমস্ত হৃদয় দিয়া, প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাক; ছোটবড় তোমার যে কোন অভাব, যে কোন আশা ভরসা, সকলই তাঁহাকে জানাও—তিনি যাহা মঙ্গল বুঝিবেন, তাহাই পূর্ণ করিবেন। তাঁহাকেই অন্তরতম সখা বলিয়া জানিও। হৃদয়ের আসন অশ্রুজলে বিধৌত করিয়া পবিত্র কর—তিনি তাহাতে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। ব্যাকুল অন্তরে ডাকিবার মত তাঁহাকে ডাক, তিনি আপনাকে দিয়াও তোমাকে কৃতার্থ করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজের পতনের কারণ।

(শ্রীশুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়)

[আমরা এই প্রবন্ধটী সাদরে পত্রস্থ করিলাম। লেখক ব্রাহ্মসমাজহিতৈষী এক তরুণ যুবক। প্রবন্ধোক্ত বিষয়টী আজকাল ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক প্রবীণ ব্যক্তির অন্তর আলোড়িত করিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। জানিলেও বলের সহিত স্পষ্টভাবে আলোচিত হয় না বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজের অন্তরে যে কি রোগ প্রসারিত হইয়া উহাকে ক্ষয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রবন্ধের সকল মতামতের সহিত সকলে একমত না হইলেও সেগুলি প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজহিতৈষীর ধীরভাবে আলোচনার বিষয়। ব্রাহ্ম-সমাজকে রক্ষা করিতে গেলে অবিলম্বে আমাদের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তং সং]

ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্বের উন্নতির পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে কেন? কারণগুলি জোরে ও স্পষ্টভাবে ধরা উচিত—কোনটী লুকাইয়া রাখিয়া বা কোনটীর বল কমাইয়া বলা উচিত নহে। চিকিৎসকের নিকট অতি ভীষণ ক্ষতও খুলিয়া দেখাইতে হয়, নতুবা আরোগ্য-লাভের আশা কম। সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজেরও পতনের কারণগুলি খুলিয়া দেখাইলে সুচিকিৎসা সম্ভব হইবে এবং আরোগ্যলাভ হইলে ব্রাহ্মসমাজের পুনরায় উন্নতির পথে চলা সম্ভবপর হইবে নিঃসন্দেহ।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য প্রধানত ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণই দায়ী। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থানের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার বর্ত্তমান মলিন অবস্থারও কারণ বুঝিতে পারিব। মহাত্মা রাজা রাম-মোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন, তখন দেশের চতুর্দ্দিকে দুর্নীতি, উপধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের নামে অন্যায় অত্যাচার উচ্ছৃংখলতা প্রভৃতি রাজত্ব করিতে-ছিল। তখন দেশের যাবতীয় মঙ্গলকার্য্যে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী ছিল। তখন অন্যায় অবিচার দেখিলেই ব্রাহ্ম-সমাজই মাথা তুলিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে দাঁড়াইত; যাহা সত্য, যাহা মঙ্গল বলিয়া বুঝিত, ব্রাহ্মসমাজ তখনই তাহার পক্ষে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিত। তখন ব্রাহ্ম-সমাজ লোকের মুখ চাহিয়া কাজ করিত না, ভগবানের আদেশ বলিয়া যাহা বুঝিত, তদনুসারেই কার্য্য করিত; তখন ব্রাহ্মসমাজ প্রাণপণে যথার্থ ভগবৎপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত থাকিত; যেখানে কোন অন্যায়

দুর্নীতি ও কুপ্রথা দেখিত, ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। বঙ্গদেশে উমেশচন্দ্র নামক এক যুবক যখন পাদরিদের প্রলোভনে পড়িয়া সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং তাহার স্ত্রীকে অন্যায়পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করাইতে চেষ্টা করে, তখন রাজরোষকে উপেক্ষা করিয়াও ব্রাহ্মসমাজই তাহার প্রতিবাদ করে এবং উমেশচন্দ্রকে পুনরায় হিন্দুসমাজে ফিরাইয়া আনিয়া শুদ্ধির পথ সর্ব্বপ্রথম খুলিয়া দেয়। ইহারই ফলে ভদ্র হিন্দুসমাজে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রখরবেগে অগ্রসর হওয়া রুদ্ধ হইল। বলিতে গেলে, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবেই বহুবিবাহ প্রতিরুদ্ধ হয়, মদ্যপানের প্রসার কমিয়া যায় এবং বাংলা-দেশ শিক্ষাদীক্ষায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা উন্নতির পথে খরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

কিন্তু এখন?—এখন ব্রাহ্মসমাজ লোকের মুখ চাহি-য়াই কার্য্য করিতে ভালবাসে; অন্যায় বুঝিলেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করে না—ভয়, পাছে সমাজের লোকসংখ্যা কমিয়া যায়। বর্ত্তমানে মন্ত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ লক্ষ্য দেখা যায় না—লক্ষ্য দেখা যায় শুধু লোকসংখ্যাবৃদ্ধির দিকে এবং অর্থ-সংগ্রহের দিকে।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে সাধনার বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ব্রাহ্মের গৃহে নিত্য উপাসনার কোনই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম যুবকগণের অনেকেই উপা-সনার উপকারিতায় সন্দিহান। ব্রাহ্ম যুবকগণের অনেকেই আজকাল আপনাদিগকে মুখে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহাদের কার্য্য ও ব্যবহারে মনে হয় যে, তাঁহারা অন্তরে নাস্তিকতাই পোষণ করেন। অনেকে আবার প্রকাশ্যেও নাস্তিকতার প্রচারে ইতস্তত করেন না।

এই সকল ব্যক্তিকে যদি বলা যায় যে, নাস্তিকতার কোন ভিত্তি নাই, তখন তাঁহারা তর্ক করিতে বসেন যে তাহা মোটেই ভুল নহে এবং নিজেদের স্বপক্ষে নানা ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শনেও ত্রুটী করেন না। তাঁহাদিগকে যদি বলা যায় যে, অমুক অমুক গ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন, তখন তাঁহারা সময়াভা-বের অছিলায় তাহা করিতে অস্বীকার করেন এবং ঢাক পিটাইয়া লোকসকলকে বুঝাইতে চান যে তাঁহারাই তর্কে জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় এই যে, যে সকল অসংখ্য গ্রন্থে প্রমাণসহযোগে নাস্তিকতাকে উচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থোক্ত প্রমাণরাশি তাঁহাদিগকে এক নিশ্বাসে, এক ঘণ্টায় বুঝাইতে হইবে; তাহা না পারিলেই নাস্তিকতার জয়জয়কার ধরিতে হইবে।

আসল কথা এই যে, তাঁহারা নিজের চেষ্টায় ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করিতে প্রস্তুত নন, ধর্ম্মার্জ্জনে সচেষ্ট নন। বিনা চেষ্টাতে তাঁহাদের বুদ্ধির এক পা ফেলিতে না ফেলিতেই তাঁহারা সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে চান, ধর্ম্মার্জ্জনের সকল সুখ মুহূর্ত্তে উপভোগ করিতে চান। বিনা অভ্যাসে যখন কোনও বিদ্যাই আয়ত্ত হয় না, বিদ্যার্জ্জনের সুখও বিনা অভ্যাসে উপভোগ করা যায় না, তখন সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ কেবল ব্রহ্মবিদ্যাই কি বিনা অভ্যাসে লাভ করা যায় বা ধর্ম্মার্জ্জনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দই কি বিনা চেষ্টায় লাভ করা যায়? তাঁহারা অস্বীকার করিবেন না যে, গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি অপরা যে কোন বিদ্যাই হোক, তাহা বিনা যত্নে বিনা চেষ্টায় লাভ করা যায় না, তজ্জনিত সুখও বিনা আয়াসে পাওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহাদের যত ওজর আপত্তি পরাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ এবং ধর্ম্মসাধনজনিত সুখলাভের বেলায়। এই শেষোক্ত দুইটীর বেলায় তাঁহাদের নিকট সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া আবশ্যক—বিনা আয়াসে প্রয়াসে তাঁহারা ব্রহ্ম-বিদ্যাও লাভ করিতে চান, ধর্ম্মসাধনের আনন্দও পাইতে চান। তাহা না পাইলেই তাঁহাদের মতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি আস্তিকের সমস্ত কথাই মিথ্যা! ধৈর্য্য ও ইচ্ছার অভাবে তাঁহারা মিষ্টদ্রব্যের আস্বাদ না লইয়াই বলিতে চান যে জগতে মিষ্ট বলিয়া কোন কিছুই নাই।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান দোষ সাধনার অভাব। এই সাধনার অভাব আসে কেন? "জাত-ব্রাহ্মে"র সৃষ্টিই ইহার মূল কারণ বলিয়া অনুমান হয়। 'সাধনা থাক বা নাই থাক, ব্রাহ্মের সন্তান হইলেই ব্রাহ্ম হইবে' এই ভাবটীই ব্রাহ্মসমাজের পতনের অন্যতর প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান হয়। বলিতে কি, বর্ত্তমানে "ব্রাহ্ম" নামক এক পঞ্চম জাতির সৃষ্টি করাই যেন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। যদি জাতিভেদই স্বীকার করিতে হয়, তবে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের জাতিভেদ কি অপরাধ করিল? সেই হিন্দুসমাজেও তো ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ গণ্য হয়। আদিব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের সমুদয় প্রথা সুসংস্কৃত করিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন বলিয়া এবং আদিসমাজ জাতিভেদপ্রথা উঠাইতে চাহেন না মূলত এই অপবাদ দিয়াই না একদল ব্রাহ্ম আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন শাখা স্থাপন করিলেন? প্রকৃতই, জন্মগত জাতিভেদের অনেক দোষ আছে। ব্রাহ্মণের পুত্র সাধনা-বিহীন হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া সর্ব্বজনপূজ্য হইবে, এবং চণ্ডাল অতি শুদ্ধ ও পবিত্র হইলেও সর্ব্বজনহেয় হইবে, এই বিধান কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শাখা মুখে জাতিভেদবিরোধী হইলেও কার্য্যত কি তাহা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন

করিতেছেন? অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ব্রাহ্মদিগের অনেকেই মুখে না হইলেও কার্য্যত হিন্দুসমাজপ্রচলিত জাতিভেদের পক্ষপাতী। তদ্ব্যতীত, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ আদিসমাজের উপর সত্য হৌক বা মিথ্যা হৌক যে দোষ আরোপ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, এখন ব্রাহ্ম নামক পঞ্চম জাতির সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা প্রকারান্তরে সেই জাতিভেদরক্ষার দোষে কি নিজেরাই দোষী হইতেছেন না?

প্রকৃত ব্রাহ্ম কে? সংক্ষেপে বলা যায় যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থই প্রকৃত ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম কি বিষয়কর্ম্ম করেন না? ব্রাহ্ম কি আমোদপ্রমোদ করেন না? প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি, তিনি সবই করেন; কিন্তু তাঁহার সকল কর্ম্মই ব্রহ্মকেন্দ্রক। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া তিনি কিছুই করেন না। এমন কথা নহে যে, ব্রাহ্মমাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ থাকিবে না বা তাঁহাকে কোন প্রকার পাপতাপ স্পর্শ করিবে না। পাপ বা ভ্রমপ্রমাদ থাকিলেও ব্রাহ্ম বলা চলে, যদি দেখা যায় যে, তিনি সেই ভ্রমপ্রমাদ বা পাপ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যিনি বুক ফুলাইয়া বলেন, "বেশ করিয়াছি, এই পাপ আমি করিয়াছি এবং আরও করিব", যিনি প্রকাশ্যে পাপাচরণ করিতেছেন, অথচ তাহা ত্যাগ করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন না, তাঁহাকে কিছুতেই ব্রাহ্ম বলা চলে না।

বর্ত্তমানে কি দাঁড়াইয়াছে? অন্যান্য শাখাসমাজে দেখা যায়, ব্রাহ্ম হইবার তিনটী উপায়—(১) খাতায় নাম লিখানো, (২) কিঞ্চিৎ চাঁদা প্রদান এবং (৩) ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী বিবাহ। যে ব্রাহ্মসমাজ জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, আজ সেই ব্রাহ্মসমাজই ব্রাহ্ম নামক জন্মগত পঞ্চম জাতি সৃষ্টি করিতে সমুদ্যত! হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা অপেক্ষা বাহ্যিক আড়ম্বরের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিবার কারণে ব্যথা অনুভব করায় যে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই ব্রাহ্মসমাজ আজ ধর্ম্মসাধনা অপেক্ষা বাহ্যিক আচার ব্যবহার ও আড়ম্বরকেই উচ্চ আসন প্রদান করিতেছে! সেই পাপেই আজ ব্রাহ্মসমাজ পতনোন্মুখী! ইহা অনেকেই জানেন যে, কোন এক শাখাসমাজের অন্তর্ভুক্ত, ধর্ম্মসাধনাহীন কিন্তু ধনে মানে অগ্রগণ্য কোন এক ব্রাহ্মকে যখন বলা গেল যে, তিনি অমুক অন্যায় কার্য্য করেন, তাহা তাঁহার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; তখন তিনি প্রকাশ্যেই বলিয়াছিলেন—'অমুক পাপ আমি করি? বেশ করিয়াছি, আরও করিব; ইচ্ছা হয়, তোমরা সভ্যশ্রেণী হইতে আমার নাম কাটিয়া দিও।' কিন্তু তাঁহার নাম তুলিয়া দিতে কি কেহ সাহস করিলেন? না—করিলেন না, কারণ তিনি একজন নামজাদা ব্রাহ্ম এবং নামজাদা ব্রাহ্মের পুত্র; সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি সাধনাবিহীন ও অনাচারী হইলেও প্রকৃত ব্রাহ্ম!

বর্ত্তমানে তথাকথিত ব্রাহ্মসমাজে এবং শিক্ষিত হিন্দুসমাজে মাদকসেবন ব্যভিচার প্রভৃতি পাপসকল যে খরধারে বহিয়া চলিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইবেন। ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই সংবাদ রাখেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কাহারা ঐ সকল পাপে ডুবিয়া আছেন; কিন্তু কাহার এত বড় সাহস আছে যে, সেই সকল অনাচারী ব্যক্তির নাম ব্রাহ্মসমাজের তালিকা হইতে কাটিয়া দেন? এই যে পাশ্চাত্যদেশ হইতে নবাগত পাপ মহিলানৃত্য—একমাত্র আদিসমাজ ব্যতীত আর কোন্ ব্রাহ্মসমাজ উহার বিরুদ্ধে সবলে দাঁড়াইতে সাহস করিতেছেন? ব্রাহ্মসমাজের পতনের কারণই তো এইখানে। সাধনা নাই; এবং সাধনার অভাবেই সাধনাবিহীন ব্যক্তিগণকে প্রকাশ্যে অব্রাহ্ম বলিবার ক্ষমতাও নাই। এমন কি, অন্যায় আচরণ, পাপাচরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে কার্য্যত কোন প্রকার প্রতিবাদ করিবারও ক্ষমতা নাই! তাঁহাদের মনের ভাব এই যে, অন্যায় বা পাপাচরণ যাঁহারা করেন, তাঁহাদের প্রতিবাদ করিলে সমাজের লোকসংখ্যা কমিয়া যাইবে, সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে। তবেই কি প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইতেছে না যে, অন্যায় বা পাপকারীগণকে ধরিয়া রাখিয়াই আমরা একটি ধর্ম্মসমাজ গঠনে প্রয়াসী? সে আশা বৃথা!

পাপ কখনই ধর্ম্মসমাজের উন্নতির কারণ বা সহায় হইতে পারে না। পাপাচারীদিগকে অন্তরঙ্গরূপে লইয়া যে সমাজ, তাহা ধর্ম্মসমাজরূপে কখনই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। পাপগর্বীদিগকে ত্যাগ করিলে সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে, এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। বরং বিপরীতে আমরা দেখি যে, ব্রাহ্মসমাজে পাপগর্বীদিগের আধিপত্য থাকাতেই তাহার উন্নতি দেখা যাইতেছে না—ব্রাহ্মসমাজ পতনের অভিমুখেই চলিয়াছে। পাপগর্বীগণ বিনা যদি ব্রাহ্মসমাজ না চলে, তবে সেরূপ ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া যাক। তাহাও শতবার প্রার্থনীয়, কিন্তু ধর্ম্মসমাজের আবরণে, ধর্ম্মের ছদ্মবেশে পাপের প্রশ্রয়দান ও ভণ্ডামি নিতান্তই অসহ্য। পাপগর্বীদিগকে পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মসমাজে যদি একটী লোকও না থাকে তাহাও বরং লক্ষবার প্রার্থনীয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে একটীও অননুতপ্ত পাপগর্বী থাকে, তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও ঈপ্সিত নহে। আদর্শ ঠিক থাকিলে মানুষ পাওয়া কঠিন হয় না; কিন্তু আদর্শ নষ্ট হইলে সর্ব্বনাশ হয়।

প্রত্যেক ধর্ম্মই আরম্ভে এক-একজন মহাত্মা প্রতি-

ষ্ঠিত করেন; পরে তাঁহার ও তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্যদিগের আদর্শ ও জীবনের সামঞ্জস্য দেখিয়াই অন্যান্য লোকে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মসমাজের কথাই ধরা যাক। রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহার কয়জন শিষ্য ছিলেন? যে কয়জন ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার আদর্শ ও জীবনের সামঞ্জস্য দেখিয়াই তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত সাধনা ছিল। তাহারই ফলে, সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ স্বদেশের যতটা উন্নতিসাধন করিতে পারিয়াছিলেন, আজ লক্ষ বক্তৃতাতেও তাহার শতাংশের একাংশ কাজ হইতেছে কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের সাধনার ফলেই তৎকালীন বঙ্গদেশ সকল বিষয়ে উন্নতির পথে দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, ইহা যেমন অবিসম্বাদিত সত্য; সাধনার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ আজ পতনের অভিমুখে দ্রুতগতিতে চলিতেছে, ইহাও তেমনি ধ্রুব সত্য। সেকালে ব্রাহ্ম বলিলে আদর্শচরিত্র ব্যক্তিকেই বুঝাইত—ব্রাহ্মকে আদালতে শপথ করিতে হইত না, তাহার ব্রাহ্মত্বই সত্যসাধনের প্রমাণরূপে গণ্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজ, কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন—উহার অনুসরণে শিক্ষিতসমাজ ও উচ্ছৃঙ্খলতা যেন অনেকটা একার্থবাচক হইয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মচর্য্যের ও উপাসনার অভাব, এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি একাধিপত্য স্থাপনে বড়ই অগ্রসর দেখা যায়।

ইহার প্রতীকার কি? ইহার প্রতীকার ব্রাহ্মসমাজের নিজের হাতে। ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য—ব্রাহ্মদিগকে শৈশবাবধি ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করা। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারের প্রতীকার-ব্যবস্থা প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তার হাতে। তাঁহার কর্ত্তব্য—পরিবারে পারিবারিক উপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্মসাধনে দৃষ্টি রাখা। গৃহে ধর্ম্মসাধনার ব্যবস্থা না করিলে গণ্ডা গণ্ডা রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ে বিশেষ কোন ফল হইবে না, শত ব্রহ্মবিদ্যালয়েও কিছু হইবে না এবং লক্ষ উপদেশেও কিছু হইবে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম, সুতরাং প্রতি পরিবারের কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য—সেই পরিবারস্থ প্রত্যেক শিশুকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ কারবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া। ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য প্রত্যেক পরিবারে যাহাতে নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা এবং ধর্ম্মসাধনা হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা। সময়ের অভাব প্রভৃতি আপত্তিতে যেন উপাসনা বন্ধ না হয়। তাস-পাশার আড্ডায়, বা চা-পার্টি প্রভৃতিতে যাইবার সময় হইতে পারে, আর উপাসনারই সময় পাওয়া যায় না, ইহা অবিশ্বাস্য—ইচ্ছার অভাবই প্রকৃত কারণ।

কেবল পারিবারিক উপাসনা করিলেও চলিবে না। পরিবারের কর্তৃপক্ষের প্রত্যেককে নিজ জীবনে ধর্ম্মসাধন করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের দ্বারা বালকবালিকাকে ধর্ম্মপথে চলিবার উৎসাহ দান করিতে হইবে। পরিবারের কর্ত্তা উপদেশ দিলেন—মদ্যপান করিও না, ব্যভিচার করিও না, অথচ নিজে সেই সকল পাপে লিপ্ত রহিলেন, বলা বাহুল্য, সেরূপ উপদেশ বা উপাসনা হইতে কোনও ফল আশা করা যায় না। যিনি প্রকাশ্যে পাপ আচরণ করেন এবং সগর্ব্বে বলেন যে "যেহেতু সমাজ বিধান করিতেছে যে, অমুক পাপ করিবে না, অতএব আমি ঐ পাপ করিয়া আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার (??) মর্য্যাদা রক্ষা করিব" (!!), অর্থাৎ যিনি স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতার নামে প্রশ্রয় দিয়া সমাজের সর্ব্বনাশসাধনে সমুদ্যত হন, সমাজের উচিত—সাহসের সহিত সমাজের সভ্য-তালিকা হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া; অর্থাৎ সমাজ যাহাতে পাপীসংঘে পরিণত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।

এইরূপে সমাজ হইতে পাপ দূর করিতে হইলে ঠগ বাছিতে যদি গাঁ উজাড় হয়, তাহাও শ্রেয়, তথাপি ঠগ বাছিবার কার্য্যে নিরস্ত হওয়া উচিত নহে। ধার্ম্মিকের ছদ্মবেশধারী ঠগদিগকে চালাইবার চেষ্টা প্রকৃত ধর্ম্মসমাজের পক্ষে অনুচিত ও অধর্ম্ম। আর ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় হইবে কি না, সে ভাবনা তোমার আমার নহে। আমাদের অন্তরে ভগবান যে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, তদনুসারে আমরা কার্য্য করিবারই অধিকার পাইয়াছি। আমাদের কাজ—ভগবানের স্বহস্তে প্রজ্বলিত শুভবুদ্ধির প্রদীপের সাহায্যে যেখানে যাহা কিছু আবর্জ্জনা দেখিব, তাহা দূর করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে পবিত্র ভাবের সুগন্ধে পূর্ণ রাখা। এবিষয়ে ইতস্তত করিলে স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে, আমরা মুখে ভগবানকে যতই স্বীকার করি না কেন, কাজে তাঁহাকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি—ভগবান অপেক্ষা সংসারসুখই আমাদের নিকটে বেশী প্রিয়। আর, ইহাই বা মনে করিব কেন যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাপকে নিষ্কাশিত করিতে গেলেই ব্রাহ্মসমাজ বিলুপ্ত হইবে? ব্রাহ্মসমাজের যদি সেই দশাই আসিয়া থাকে, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, তেমন ব্রাহ্মসমাজ বিস্মৃতিসাগরে নিলীন হইয়া যাক এবং তাহার স্থলে নির্ম্মল বিশুদ্ধ নবতর ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করুক; পূর্ব্বের মত দেশকে এবং সমগ্র জগতকে পুণ্যের পথে, ধর্ম্মের পথে, জ্ঞানের পথে, উন্নতির পথে ও স্বাধীনতার পথে সবল ধাক্কা দিয়া অগ্রসর করিয়া দিক। কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মধনে এখনও তত দরিদ্র হয় নাই।

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

(চতুর্থে ব্রহ্মণ এবাক্ষিগতত্বাধিকরণে সূত্রাণি—)

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥ স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥ সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১৫ ॥ শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥১৬॥ অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥১৭॥

চতুর্থাধিকরণমারচয়তি—

ছায়াজীবৌ দেবতেশৌ বাঽসৌ যোঽক্ষণি দৃশ্যতে ॥
আধারদৃশ্যতোক্তেশাদন্যেষু ত্রিষু কশ্চন ॥ ৭ ॥
কং খং ব্রহ্ম যদুক্তং প্রাক্ তদেবাক্ষণ্যুপাস্যতে ॥
বামনীত্বাদিনাঽন্যেষু নামৃতত্বাদিসম্ভবঃ ॥ ৮ ॥

ছান্দোগ্যস্য চতুর্থাধ্যায়ে—উপকোসলবিদ্যায়ামুপকোসলং শিষ্যং প্রতি সত্যকামো গুরুরাহ। তত্রত্যং বাক্যমেতৎ—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ। এতদমৃতং এতদ্ব্রহ্ম" ইতি। তত্র চতুর্ধা সংশয়ে সতি—'অক্ষণি সর্ব্বৈর্দৃশ্যমানা ছায়া' ইতি তাবৎ প্রাপ্তং, অক্ষ্যাধারত্বদৃশ্যত্বয়োস্তস্যামপি স্পষ্টত্বাৎ। যদ্বা—জীবোঽয়ং ভবিতুমর্হতি, রূপদর্শনবেলায়াং তস্য চক্ষুষ্যবস্থিতত্বেনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দৃশ্যমানত্বাৎ। অথবা —দেবতা স্যাৎ, "আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশৎ" ইতি দর্শনাৎ। সর্ব্বথা ন পরমাত্মা তস্যাঽধারত্বদৃশ্যত্বাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ—ছায়াজীবদেবেষু যঃ কোঽপ্যস্তু।

ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"কং ব্রহ্ম" "খং ব্রহ্ম" ইতি সুখরূপং, আকাশবৎ পরিপূর্ণং যদ্ব্রহ্ম পূর্ব্ববাক্যেনোক্তং, তদেব "য এষোঽক্ষিণি"—ইতি প্রকৃতবাচকেনৈতচ্ছব্দেন পরামৃশ্যাক্ষণ্যুপাস্যত্বেনোপদিশ্য বামনীত্বভামনীত্বসংযদ্বামত্বাদিগুণানুপাসনায়োপদিশতি। বামনীত্বং কামপ্রাপকত্বং। ভামনীত্বং জগদ্ভাসকত্বং। সংযদ্বামত্বং প্রাপ্তকামত্বং। এতৈর্গুণৈরুপাস্য ব্রহ্মণঃ সোপাধিকত্বাদক্ষ্যাধারত্বং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা দৃশ্যমানত্বং চ ন বিরুধ্যতে। ছায়াজীবদেবতেষু অমৃতত্বাভয়ত্বাদীনি ন সম্ভবন্তি। তস্মাৎ ঈশ্বরোঽত্রোপাস্যঃ ॥

(চতুর্থে ব্রহ্মের অক্ষিগতত্ব অধিকরণে সূত্রগুলি—)

সূত্রের অনুবাদ। অন্তরে উপপত্তি হেতু ॥ ১৩ ॥ স্থানাদির কথনপ্রযুক্ত ॥১৪॥ এবং সুখবিশিষ্ট অভিহিত হওয়া প্রযুক্ত ॥১৫॥ উপনিষৎ যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার গতি অভিহিত হওয়া হেতু ॥১৬ ॥ অনবস্থিতি হেতু এবং অসম্ভব হওয়ায় অন্য নহে ॥১৭॥

চতুর্থ অধিকরণ রচনা করিতেছে—

শ্লোকের অনুবাদ।—চক্ষে যিনি দৃষ্ট হইতেছেন, তিনি ছায়া বা জীব বা দেবতা বা ঈশ্বর? আধার এবং দৃষ্টির বিষয় বলিয়া উল্লিখিত থাকা হেতু ঈশ্বর ভিন্ন অপর তিনটীর মধ্যে কোনটী (হউক) ॥৭॥

পূর্ব্বে "কং ব্রহ্ম" "খং ব্রহ্ম" যাহা উক্ত হইয়াছে, তাঁহাকেই চক্ষে উপাসনা করা হয়। "বামনীত্ব" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অপরগুলিতে "অমৃতত্ব" প্রভৃতির সম্ভাবনা নাই ॥ ৮ ॥

টীকার অনুবাদ। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে—উপকোসল বিদ্যাপ্রকরণে শিষ্য উপকোসলের প্রতি গুরু সত্যকাম বলিয়াছেন। সে স্থলে এই বাক্য (আছে)—"যে এই পুরুষ চক্ষে দৃষ্ট হইতেছেন, ইনি আত্মা, এই কথা বলিলেন। ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম" ইতি। সেই বাক্য বিষয়ে চারি প্রকার সংশয় হইলে—'চক্ষে সকলের দৃশ্যমান ছায়া' ইহাই প্রাপ্ত হয়; কারণ সেই ছায়াতে চক্ষুর আধারত্ব দৃষ্টিবিষয়ত্ব স্পষ্ট প্রতীতি হয়। অথবা—ইনি জীব হইতে পারেন, কারণ রূপদর্শনের সময়ে তাহা চক্ষুতে অবস্থিতি হেতু অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা দৃশ্যমান হয়। অথবা দেবতা হউক —কারণ (শ্রুতিতে) দৃষ্ট হয় যে, "আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন।" পরমাত্মা কোনপ্রকারেই নহেন, কারণ তাঁহার আধার থাকা এবং দৃষ্টিবিষয় হওয়া অসম্ভব। অতএব, ছায়া জীব এবং দেবতা, ইহাদের মধ্যে যে কেহ হউক।

ইহা প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—"কং ব্রহ্ম" "খং ব্রহ্ম" এই পূর্ব্ববাক্যে সুখরূপ আকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ যে ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই "যে ইনি চক্ষে"—এই প্রকৃতবাচক "ইনি" শব্দের দ্বারা স্থির করিয়া চক্ষে উপাস্যরূপে উপদেশ করিয়া বামনীত্ব (শুভদাতৃত্ব) ভামনীত্ব (প্রকাশরূপত্ব) সংযদ্বামত্ব (আপ্তকামত্ব) ইত্যাদি গুণসমূহকে উপাসনার জন্য উপদেশ করিতেছেন। বামনীত্ব অর্থে কামপ্রাপকত্ব। ভামনীত্ব অর্থে জগদ্ভাসকত্ব। সংযদ্বামত্ব অর্থে প্রাপ্তকামত্ব। এই সকল গুণের দ্বারা উপাস্য ব্রহ্মের সোপাধিকত্ব হেতু চক্ষুর আধারত্ব এবং শাস্ত্রদৃষ্টিতে দৃষ্টিবিষয়ত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না। ছায়া জীব ও দেবতাতে অমৃতত্ব অভয়ত্ব প্রভৃতি সম্ভবপর নহে। অতএব এস্থলে ঈশ্বর উপাস্য ॥

তাৎপর্য্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে উপকোসল-সত্যকামসংবাদ নামক একটী উপাখ্যান আছে। সেই উপাখ্যানে উপকোসল নামক এক শিষ্যের প্রতি তাঁহার গুরু সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যার যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার নাম 'উপকোসলবিদ্যা'। উক্ত উপদেশে এই একটী বাক্য আছে—"যে এই পুরুষ চক্ষে দৃষ্ট হন, ইনি আত্মা, ইহা সত্যকাম বলিয়াছিলেন।

ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম।" এস্থলে চারিটী সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। প্রথম সন্দেহ হইল, নয়নতারার মধ্যে সকলের নিকট যে প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হয়, "অক্ষিতে দৃষ্ট এই পুরুষ" অর্থে সম্ভবত উক্ত প্রতিবিম্বই উপলক্ষিত হইতেছে? কারণ, শ্রুতিবাক্যে যে ভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত "প্রতিবিম্বের" খুবই মিল দেখা যায়। চক্ষুতে দৃশ্যমান পুরুষের উল্লেখে দুইটী বিষয় স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে—উক্ত পুরুষের আধার চক্ষু এবং উহার দৃষ্টিগোচরতা; প্রতিবিম্বেরও আধার চক্ষু এবং প্রতিবিম্বও সকলের দৃষ্টিগোচর।

দ্বিতীয় সংশয় "অক্ষিতে দৃষ্ট এই পুরুষ" অর্থে "জীব" হইতে পারে? কারণ, কোন কিছু রূপ দেখিতে গেলেই চক্ষুর ভিতর দিয়াই জীবের সেই রূপকে দেখিতে হয়—চক্ষুতে জীবের অধিষ্ঠান হইলে চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করে (ইহাকেই "অন্বয়" বলা যায়) এবং ঐ প্রকারে চক্ষুতে জীবের অধিষ্ঠান না হইলে চক্ষু দর্শন করিবার শক্তি লাভ করে না (ইহাকেই "ব্যতিরেক" বলা যায়)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোন কিছু দেখিবার কালে জীব চক্ষুকে আশ্রয় করে এবং অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা দৃশ্যমান বা উপলব্ধ হয়। অন্বয় ও ব্যতিরেকের শাস্ত্রীয় লক্ষণ হইতেছে "তৎসত্ত্বে তৎসত্তা" এবং "তদসত্ত্বে তদসত্তা" অর্থাৎ একটীর অস্তিত্বে অপরটীর অস্তিত্ব এবং একটীর অভাবে অপরটীর অভাব। দৃষ্টান্ত যথা—ধূমের অস্তিত্বে বহ্নির অস্তিত্ব (অন্বয়) এবং বহ্নির অভাবে ধূমের অভাব (ব্যতিরেক)। সেইরূপ, জীবের চক্ষুতে অবস্থিতিতেই রূপ দৃষ্টিবিষয় হয় এবং চক্ষুতে অনবস্থিত হইলেই রূপ দৃষ্টির অবিষয় হয়। এই প্রকারে অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা জীব চক্ষুতে অবস্থিত বলিয়া দৃশ্যমান বা উপলব্ধ হয়। অতএব "চক্ষুতে দৃশ্যমান এই পুরুষ" অর্থে "জীব"ই উপলক্ষিত, ইহা পূর্ব্বপক্ষ সংশয় করিতেছে।

তৃতীয় সংশয়—"চক্ষুতে অবস্থিত দৃশ্যমান এই পুরুষ" অর্থে "দেবতা"ও হইতে পারে? শ্রুতিতে আছে—"আদিত্য চক্ষু হইয়া (জীবমাত্রের) অক্ষিগোলকদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন।" এখানে শ্রুতিবাক্য অনুসারে চক্ষুকেই আদিত্য-দেবতার আধার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শঙ্করভাষ্যে একটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে—"রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" অর্থাৎ এই আদিত্য এই চক্ষে রশ্মি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। উপরোক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা করিয়া প্রতিপন্ন হয় যে, আদিত্য দেবতা রশ্মি বা তেজের দ্বারা চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তেজ দৃশ্যমান অর্থাৎ সকলেরই দৃষ্টিগোচর বিষয়; সুতরাং আদিত্যও চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইলেও দৃশ্যমান বা দৃষ্টিবিষয় হইলেন। কাজেই পূর্ব্বপক্ষের মতে—"চক্ষুতে অবস্থিত এই যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে" ইহার অর্থে আদিত্যরূপ দেবতা হওয়া অসম্ভব নহে। পূর্ব্বপক্ষ স্থির করিলেন যে, ঐ পুরুষ অর্থে পরমাত্মা হইতে পারে না, কারণ পরমাত্মা সকলের আধার; অতএব তাঁহার কোন আধার সম্ভব নহে, এবং তিনি যখন স্বয়ং সর্ব্বদ্রষ্টারূপে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন, তখন তিনি দৃষ্টিবিষয় হইতে পারেন না, কারণ দ্রষ্টৃত্ব ও দৃষ্টিগোচরতা উভয়ে বিরুদ্ধধর্ম্মী।

উত্তরপক্ষ বলিতেছেন যে পূর্ব্বপক্ষের উপরোক্ত তিনটী সংশয় সঙ্গত নহে। যে শ্রুতির ভিত্তিতে এই বিচার চলিতেছে, ইহার পূর্ব্বে "কং ব্রহ্ম" ও "খং ব্রহ্ম" এই দুইটী শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে। "কং ব্রহ্ম" অর্থে ব্রহ্ম সুখস্বরূপ এবং "খং ব্রহ্ম" অর্থে ব্রহ্ম আকাশস্বরূপ, অর্থাৎ আকাশের ন্যায় পরিপূর্ণ। বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে "অক্ষিতে অবস্থিত যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে" বলিয়া যে পুরুষ উল্লিখিত হইয়াছেন, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে সুখস্বরূপ ও আকাশস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া যিনি উক্ত হইয়াছেন, উভয়ের দ্বারা একই ঈশ্বর উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। বিচার্য্য শ্রুতিবাক্যে "এই" যে শব্দ আছে, তাহা দ্বারা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের উদ্দিষ্ট ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে। "চক্ষুতে দৃশ্যমান" বলায় বুঝা যাইতেছে যে, সেই ব্রহ্মকে অক্ষিস্থরূপে বা চক্ষুর চক্ষুরূপে উপলব্ধি করিয়া উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে এই যে, তাঁহাকে কি প্রণালীতে উপাসনা করা যাইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে, তাঁহার "বামনীত্ব" "ভামনীত্ব" "সংযদ্বামত্ব" প্রভৃতি গুণসকল অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিবে। "বামনীত্ব" অর্থে "কামপ্রাপকত্ব" অর্থাৎ জীবের কামনাসকল পূর্ণ করিবার শক্তি। "ভামনীত্ব" অর্থে "জগদ্ভাসকত্ব" অর্থাৎ জগত প্রকাশ কবিবার শক্তি। "সংযদ্বামত্ব" অর্থে "প্রাপ্তকামত্ব" অর্থাৎ "পূর্ণকামত্ব"; ব্রহ্মের কামনার অবসরই নাই, কারণ তাঁহার সকল ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ হইয়া যায়। এই সকল গুণ অবলম্বনে উপাস্য ব্রহ্ম সোপাধিক হইলেন অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে গুণরূপ উপাধি আরোপিত হইল। এই গুণত্রয়ের মধ্যে অন্তত "ভামনীত্ব" বা জগৎপ্রকাশকত্ব গুণ স্বীকার করিবার কারণে ব্রহ্মকে জগতের মধ্যে সহজেই অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া ধরা হইতেছে, অর্থাৎ তিনি জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াই ইহাকে প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং জগৎরূপ আধারে তিনি অবস্থিত বলিলে অসঙ্গত হইবে না। চক্ষু যখন সমগ্র জগতেরই এক অংশ, তখন তাঁহাকে চক্ষুরূপ আধারেও অবস্থিত সহজেই বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা না গেলেও তিনি শাস্ত্র অবলম্বনে অর্থাৎ শাস্ত্রের সাহায্যে দৃশ্যমান বা উপলব্ধির বিষয়। পূর্ব্বপক্ষ যে

বলিয়াছেন, ঈশ্বরের আধার থাকা এবং দৃষ্টিবিষয় হওয়া অসম্ভব, সিদ্ধান্তপক্ষ তদুত্তরে বলিতেছেন যে, তাঁহার যুক্তি অবলম্বনে ঐ উক্তির সঙ্গে চক্ষুকে ঈশ্বরের আধাররূপে গ্রহণ এবং ঈশ্বর দৃশ্যমান, এই উক্তির কোনই বিরোধ দৃষ্ট হয় না। আর, ইহা সর্ব্ববাদসম্মত যে, ছায়া, জীব ও দেবতাতে অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রভৃতি থাকা সম্ভব নহে—শ্রুতিবাক্য অনুসারে একমাত্র ঈশ্বরেই ঐ সকল গুণ আছে। অতএব, বিচার্য্য শ্রুতিতে ঈশ্বর উপাস্য, ইহাই সিদ্ধান্ত।

(পঞ্চমে পরমেশ্বরস্যৈবান্তর্যামিতাধিকরণে সূত্রাণি—)

সূত্র—

অন্তর্যামাধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥১৮॥

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥১৯॥

শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥২০॥

পঞ্চমাধিকরণমারচয়তি—

ব্যাখ্যাশ্লোক—

প্রধানং জীব ঈশো বা কোঽন্তর্যামী জগৎপ্রতি।
কারণত্বাৎ প্রধানং স্যাৎ জীবো বা কর্ম্মণো মুখাৎ ॥৯॥
জীবৈকত্বামৃতত্বাদেরন্তর্য্যামী পরেশ্বরঃ।
দ্রষ্টৃত্বাদের্ন প্রধানং ন জীবোঽপি নিয়ম্যতঃ ॥১০॥

বৃহদারণ্যকে পঞ্চমাধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকং প্রত্যাহ—"যঃ পৃথিবী মন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইতি। তত্র—পৃথিব্যাদিজগৎপ্রতি হ্যন্তর্য্যামী শ্রূয়তে, তস্মিন্ ত্রেধা সংশয়ে সতি "প্রধানং" ইতি প্রাপ্তম্। তস্য সকলজগদুপাদানত্বেন স্বকার্য্যং প্রতি নিয়ামকত্বসম্ভবাৎ। অথবা—জীবোঽন্তর্য্যামী। স হি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপং কর্ম্মানুষ্ঠিতবান্। তচ্চ কর্ম্ম স্বফলদানায় ফলভোগসাধনং জগদুৎপাদয়তি। অতঃ কর্ম্মদ্বারা জগদুৎপাদকত্বাজ্জীবোঽন্তর্যামী॥

ইতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"এষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইত্যন্তর্যামিণো জীবতাদাত্ম্যমমৃতত্বং চ শ্রূয়তে। তথা—পৃথিব্যন্তরিক্ষাদিষু সর্ব্ববস্তুম্বন্তর্যামিত্বোপদেশেন সর্ব্বব্যাপিত্বং প্রতীয়তে। তেভ্যো হেতুভ্যোঽন্তর্যামী পরমেশ্বরঃ। ন চ প্রধানস্যান্তর্যামিত্বং সম্ভবতি, "অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা" ইতি দ্রষ্টৃত্ব-শ্রোতৃত্বাদ্যবগমাদচেতনস্য প্রধানস্য তদসম্ভবাৎ। নাপি জীবোঽন্তর্যামী, "য আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি জীবস্য নিয়ম্যত্বশ্রবণাৎ। তস্মাৎ—অন্তর্যামী পরমেশ্বরঃ॥

(পঞ্চম অধিকরণে পরমেশ্বরে অন্তর্যামিত্ব বিষয়ক সূত্রসকল—)

সূত্রের অনুবাদ—

অন্তর্যামী (ব্রহ্ম) অধিদৈবাদি শব্দে; তাঁহার ধর্ম্ম উল্লিখিত হওয়ায় ॥১৮॥ স্মার্ত্ত বা সাংখ্যস্মৃত্যুক্ত "প্রধান" নহে; তাহার ধর্ম্ম অযুক্ত থাকা হেতু ॥১৯॥ শরীর বা শরীরস্থ জীবও (নহে), উভয় (কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন) শাখাতেই ইহাকে ভিন্নভাবে বলা হইয়াছে ॥২০॥

পঞ্চম অধিকরণ রচিত হইতেছে—

শ্লোকের অনুবাদ—

জগতের অন্তর্যামী কে—প্রধান, জীব অথবা ঈশ্বর? কারণত্ব প্রযুক্ত প্রধান হউক, বা কর্ম্মের মুখ বা অনুষ্ঠাতা হওয়ায় জীব হোক ॥৯॥ জীবের সহিত একত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতি হেতু অন্তর্যামী পরমেশ্বর। দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি হেতু প্রধান নহে; নিয়মিত হওয়া প্রযুক্ত জীবও নহে। ১০

বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালককে বলিতেছেন—"যিনি পৃথিবীকে অন্তরে (থাকিয়া) নিয়মিত করিতেছেন, ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত"। সেই বাক্যে—পৃথিবী প্রভৃতি জগতের যিনি অন্তর্যামী শ্রুত হন, সে বিষয়ে তিন প্রকার সংশয় উপস্থিত হইলে "প্রধান" প্রাপ্ত হইতেছে। সকল জগতের উপাদানত্ব হেতু তাহার নিজ কার্য্যের নিয়ামক হওয়া প্রযুক্ত। অথবা জীব অন্তর্যামী—উহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এবং সেই কর্ম্ম স্বীয় ফলদানের জন্য ফলভোগের সাধনস্বরূপ জগৎ উৎপাদন করে। অতএব কর্ম্মের দ্বারা জগতের উৎপাদকত্ব হেতু জীব অন্তর্যামী।

ইহা প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—"ইনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত" এই বাক্যে অন্তর্যামীর জীবের সহিত তাদাত্ম্য এবং অমৃতত্ব শ্রুত হয়। সেইরূপ—পৃথিবী অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সকল বস্তুতে অন্তর্যামিত্বের উপদেশের দ্বারা সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতীত হয়। ঐ সকল কারণে অন্তর্যামী পরমেশ্বর। প্রধানের অন্তর্যামী হওয়া সম্ভব নহে, "অদৃষ্ট দ্রষ্টা অশ্রুত শ্রোতা" এই বাক্যে দ্রষ্টৃত্ব শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি জানা যাওয়ায় অচেতন প্রধানের পক্ষে তাহা অসম্ভব হওয়া প্রযুক্ত। জীবও অন্তর্যামী নহে—"যিনি আত্মাকে অন্তরে (থাকিয়া) নিয়মিত করিতেছেন" এই বাক্যে জীবের নিয়মিত হওয়া শ্রুত হয় বলিয়া। অতএব—অন্তর্যামী পরমেশ্বর।

তাৎপর্য্য।—বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য-উদ্দালকসংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকের প্রতি উপদেশ দিতেছেন—"যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনিই তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।" ঐ স্থলে দেখা যায় যে, যাজ্ঞবল্ক্য অনুরূপ আরও অনেক উপদেশ দিয়াছেন। ঐ সকল উপদেশে দেবতা, লোকচরাচর, বেদ বা জ্ঞান, যজ্ঞ, ভূত বা প্রাণী এবং আত্মা এই সকলের অন্তরে অবস্থিত নিয়ামক কোন একজন অধিষ্ঠাতা অন্তর্যামী বলিয়া শ্রুত হন। এখন পৃথিব্যাদি জগতের অন্তর্যামী কে, এই বিষয়ে তিন প্রকার সংশয় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে প্রথম সংশয়

এই যে, এই অন্তর্যামী "প্রধান" কি না। স্মার্ত্ত অর্থে স্মৃত্যুক্ত। বেদকে স্মরণ করিয়া যে সকল শাস্ত্র রচিত হয়, সে সকল শাস্ত্রই স্মৃতি নামে অভিহিত হয়। সাংখ্যও বেদ অবলম্বনে লিখিত বলিয়া স্মৃতির পর্য্যায়ভুক্ত এবং স্মৃতি নামে উহার ব্যবহার পরম্পরাসিদ্ধ। যে বস্তু যাহার উপাদান কারণ, সে বস্তু স্বভাবতই তাহার অন্তর্যামী বা নিয়ামক হওয়া সম্ভব। সাংখ্যেই "প্রধান" বা সত্ত্ব-রজ-তম ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া বলা হইয়াছে। সেই কারণে এস্থলে "স্মার্ত্ত" শব্দের অর্থে "প্রধান" ধরা হইয়াছে। ইহা ধরিয়াই পূর্ব্বপক্ষ সংশয় উপস্থিত করিতেছেন যে, "প্রধান" যখন জগতের উপাদান কারণ, তখন তাহারই জগতের অন্তর্যামী হওয়া সম্ভব। সিদ্ধান্তপক্ষ তদুত্তরে বলেন যে, প্রধানের অন্তর্যামিত্ব সম্ভব নহে। সাংখ্যে প্রধানকে অচেতন বলা হইয়াছে। দেখা শোনা প্রভৃতি চেতনের ধর্ম্ম। সুতরাং দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি অচেতন প্রধানে অসম্ভব। কিন্তু শ্রুতি অন্তর্যামী বাক্যের শেষে অন্তর্যামীকে "অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা" বলিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে "যিনি পৃথিবীকে অন্তরে থাকিয়া নিয়মিত করিতেছেন, ইনি তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত" এই বাক্যের "অন্তর্যামী" শব্দে প্রধানকে ধরা হয় নাই।

তখন পূর্ব্বপক্ষ এই সন্দেহ উপস্থিত করিলেন যে, তবে চেতনধর্ম্মা জীবই অন্তর্যামী হউক। জীব চেতন; তাহাতে দ্রষ্টৃত্ব শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি চেতনের সকল ধর্ম্মই সংগত হইবে। অদৃষ্ট ও অশ্রুত এই দুইটী বিশেষণও জীব সম্বন্ধে বেশ সংগত হয়। আবার, জীবই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। কর্ম্মবাদীরা বলেন, কর্ম্মমাত্রেরই ফল আছে; কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাকে ফল দিবার জন্য ফলভোগের উপায়স্বরূপে জীব এই জগৎ উৎপাদন করিতেছে। অতএব কর্ম্মের ভিতর দিয়া জগতের উৎপাদক হওয়ায় জীব জগতকে নিয়মিত করিতেছে বলা যায়; সুতরাং জীবকে অন্তর্যামী বলা যাইতে পারে। সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, জীবকে অন্তর্যামী বা জগতের নিয়ামক বলা যায় না। কারণ, শ্রুতিতে এই অন্তর্যামী বাক্যের শেষে আছে—"যিনি আত্মাকে অন্তরে থাকিয়া নিয়মিত করেন"। এই বাক্যের "আত্মাকে" শব্দে যে জীব বুঝাইতেছে, তাহা বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্য-উদ্দালক সংবাদের পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে। এখন, জীবাত্মা যখন স্বয়ং নিয়মিত হইতেছে, তখন উহা নিয়ামক বা অন্তর্যামী হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, একমাত্র পরমেশ্বরই অন্তর্যামী শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ (৩)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৭৩ শকের বৈশাখে—"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" এবং "ব্রাহ্মধর্ম্মোদ্ধৃত" পাই। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায় প্রকাশিত। জ্যৈষ্ঠ—"শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ—ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য"।

১৭৭৪ শকের ফাল্গুন মাসে—"ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বক্তৃতা—১১ মাঘ ১৭৭৪ শক—ব্রাহ্মসমাজের বয়ক্রম আর এক বৎসর বৃদ্ধি হইল। অদ্য ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"। ১৭৭৫ শক জ্যৈষ্ঠে—"বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন।" ১৭৭৫—ফাল্গুন—"শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত * * * পাঠ করিলেন।" "অদ্য (১৭৭৫—১১ই মাঘ) আমাদের চতুর্বিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"। ১৭৭৬—ফাল্গুন—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন, "অদ্য (১৭৭৬—১১ মাঘ) পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"।

১৭৭৭—ফাল্গুন—"এই ব্রাহ্মসমাজ * * * ষড়্‌বিংশতি বৎসর অতীত হইল রোপিত হইয়াছে।"

১৭৭৮—ফাল্গুন—"গত ১১ মাঘ ব্রাহ্মসমাজের সপ্তবিংশ সাম্বৎসরিক * * * নির্ব্বাহ হয়" শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় * * পাঠ করিলেন—

"মাঘ মাসের একাদশ দিবসে এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়।"

১৭৭৯—ফাল্গুন—"গত ১১ মাঘ * * * ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক * * * নির্ব্বাহ হয়।" "শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর * * পাঠ করেন—অদ্য আমাদিগের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"।

১৭৮০—ফাল্গুন—"গত ১১ মাঘ * * ব্রাহ্মসমাজের উনত্রিংশ সাম্বৎসরিক * * নির্ব্বাহ হইয়াছে।" "শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা করেন—অদ্য ব্রাহ্মসমাজের উনত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল।"

১৭৮২—ফাল্গুন—"গত ১১ মাঘ * * কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎরিক * * নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে।"

ঐ সংখ্যায়—"ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত" প্রবন্ধে—"গত ২৪ পৌষ * * ব্রাহ্মদিগের যে বার্ষিক সভা হইয়াছিল তাহাতে সুধীবর শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।" * * "একত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল * * এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত হয়।"

রাজা রামমোহন রায় "এক উপাসনা সমাজ স্থাপন" করেন, সেই সমাজ আমাদিগের এই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ। ১৭৫১ শকে ইহা সংস্থাপিত হয়। "প্রথমে কমল বসুর বাটীতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মসমাজ হইত; তথায় এক বৎসর কাল মাত্র ছিল। পরে ১৭৫১ শকে বর্ত্তমান সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা হইতে লাগিল।"

১৭৮৩—ফাল্গুন—"গত ১১ মাঘ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশ সাম্বৎসরিক * * নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে।"

১৭৮৪—ফাল্গুন—"অদ্য (১১ মাঘ) ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিবস।"

১৭৮৫—মাঘ—"আগামী মাঘ মাসের একাদশ দিবসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ চতুস্ত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে।" এই মাঘ মাসে দেখি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার সহঃসম্পাদক।

১৭৮৬—পৌষ—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক নিযুক্ত।

ফাল্গুন—"পঞ্চত্রিংশ—সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ—১১ মাঘ ১৭৮৬ শক"।

১৭৮৭—জ্যৈষ্ঠ—"রামমোহন রায়ের অনুগত শিষ্য" লেখেন—

"ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তিকাল ১৭৪১ শক হইতে" "এবং ১৭৫১ শকে * * উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল।" "রামমোহন রায় এই কলিকাতাতে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত করেন * * ১৭৫১ শকের ১১ মাঘে সংস্থাপন করেন।" "১৭৪১ শকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম আন্দোলন; ১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা"।

১৭৮৭—আষাঢ়—"রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য" লেখেন—

"রামমোহন রায় ১৭৪১ শকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষাতে ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে অবতরণিকা নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন—ইহাতে ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মোপাসনা বিধানের প্রথম আভাসমাত্র অঙ্কুরিত হয়।" "১৭৫১ শকে রামমোহন রায়ের দুইটী অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। একটী কলিকাতাতে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন।" * * "১১ মাঘে সাম্বৎসরিক সমাজের উপলক্ষে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সমাজস্থ হইতেন, তাঁহাদিগকে উক্ত (ব্রহ্মসভার) দলপতিরা ধনদান দ্বারা বিশেষ সম্মান করিতেন"।

১৭৮৭—অগ্রহায়ণ—ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত—"যখন তিনি (রাজা রামমোহন ১৭৩৬ শকে * * এখানে (কলিকাতায়) আইলেন"। "রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হইবার কতক দিন পূর্ব্বে * * খ্রীষ্টানদিগের উপাসনাগৃহে যাইয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। * * একদিন সেই উপাসনাগৃহ হইতে আসিবার সময় * * কথায় কথায় বলিলেন—আমরা পরের সমাজে কেন যাই? * * তারি কিছুদিন পরে কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। যখন প্রথম ইহা সংস্থাপিত হইল, তখন সেখানে কি হইত?" ইহার পরে উপাসনাপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

১৭৮৭ ফাল্গুন—"ষট্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"। এই উৎসবে মহর্ষিদেবের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আচার্য্যকার্য্য করিয়াছিলেন।

১৭৮৮—ফাল্গুন—"সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ—১৭৮৮ শক ১১ মাঘ।"

[মন্তব্য :—আমরা এবারে ১৭৭৩ শক হইতে ১৭৮৮ শক পর্য্যন্ত ষোল বৎসরের পত্রিকা হইতে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক প্রসঙ্গে উপযোগী যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিলাম। আমরা গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিবসে ব্রাহ্মণবিদায় উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম—"এই জন্মদিবস কবে—১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসে অথবা ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘে?" "রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্যের" (৺শিবচন্দ্র দেবের) উক্তিতে আমরা পাইতেছি (১৭৮৭—আষাঢ়ের উদ্ধৃত অংশ দেখ) যে ১১ মাঘের উৎসবেই ব্রাহ্মণবিদায় হইত। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, ১৭৫০ শকের বা ১৭৫১ শকের ৬ ভাদ্রে ব্রাহ্মণবিদায় হয় নাই, কারণ তখনও ব্রাহ্মসমাজরূপে কিছুই দাঁড়ায় নাই। কিন্তু ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রামমোহন রায়ের সমক্ষেই ব্রাহ্মণবিদায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাহাই পরে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বজায় রাখা হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের বৃত্তান্তে বলেন যে, (১৭৮৭—অগ্রহায়ণ দেখ) "কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল।" এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, ১৭৫০এর ভাদ্রে কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজের মূল রোপিত হয়; তথাপি ১১ মাঘে উহা উক্ত বাড়ী হইতে সমূলে উত্তোলিত হইয়া বর্ত্তমান আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে স্থানান্তরিত হইয়া পুনরায় রোপিত হয়। সেই বৃক্ষই প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। সেই কারণে রামমোহন রায়ের শিষ্য শিবচন্দ্র দেবপ্রমুখ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক ব্যক্তি অবধি অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি পরবর্ত্তী সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক ঐ ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাদিবসরূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ইহারা সকলেই যে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘকে ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠার দিবস বলিয়া ভুল করিয়াছেন, আমরা তাহা মনে করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। শত শত বীজ ছড়াইয়া দিলেও তাহার কোনটী হইতে অঙ্কুরিত বৃক্ষকে যেদিন পৃথকরূপে রোপিত করা হয়, সেই দিনই বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার দিবস বলিয়া ধরা হয়। আমাদের মনে হয়, এই শতবার্ষিকের বৎসর লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিতণ্ডাবিতর্ক আনয়ন না করিয়া সকলের সদ্ভাবে মিলিতভাবে বৎসর স্থির করিয়া উৎসব সম্পন্ন করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।]

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

পুরিয়া—আড়াঠেকা।

১ম গান	২য় গান
থরে থরে ফুটিল রে	কোলে লহ জননী হে
কুসুম মুঞ্জরিয়া	নয়ন দু' বহিয়া
নব রূপ নব ঢঙ্গ ;	ঝরে বারি মহাতঙ্কে।
নব গীত জাগে চিতে অনুখন—	কর দূর ভয়, ভয়নিবারণ
চাহি আকুল তোমারি সঙ্গ ॥	মোরে রাখিয়া তোমারি সঙ্গে ॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

```
                 ১                        ২´                    ৩                 [ঋসসা]   ॥
সন্‌া। ঋা ন্‌া ধক্ষা্‌ ধক্ষা্‌। I সা -া সা সা। সা ন্‌া সা ঋা। সা -া -া ন্‌া।
(১) থ•   •  রে  থ   ••       •  •  রে ফু   টি •  •  ল    রে •  •  কু
(২) কো•  •  লে  ল   ••       •  •  হ  জ   ন  •  •  নী   হে •  •  ন

   ১                    ২´                 ৩                 •
। সা গা -া -া I      ক্ষা -া ধা ক্ষা।     গা -া ঋা -া।      সা -া -া ন্‌া।
(১) সু ম  •  •       মু  •  •  ঞ্জ      রি •  •  •        য়া •  •  ন
(২) য়  ন  •  •       দু' •  •  ব        হি •  •  •        য়া •  •  ঝ

   ১                    ২´                 ৩                 •
। ঋা গা -া -া I      ক্ষা -া -া -া।      ধা না ধক্ষা -া।    গা -া -া -া।
(১) ব  রূ •  •       প   •  •  •       •  ন  ব    •      •  •  •  •
(২) রে বা •  •       রি  •  •  •       •  ম  হা   •      •  •  •  •

   ১ [সা -া ন্‌সা]  ২´              ৩            •
      ঢ  •  •
      ত
। -া -া সা সা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা গা। -া -া ঋা -া। সা -া -া II
(১) •  •  ঢ  •     •   •   •   •    •  •  •  •   ঙ্গ •  •
(২) •  •  ত  •     •   •   •   •    •  •  •  •   ঙ্কে •  •

        ১                       ২´                ৩                •
{গা। গা ক্ষধা নর্সা র্সা I   র্ঋা না র্সা -া।  -া -া র্সা -া।  -া -া -া র্সা।
(১) ন  ব  গী•  ••   ত        জা  •  •   •     •  •  গে  •     •  •  •  চি
(২) ক  র  দূ•  ••   র        ভ   •  •   •     •  •  য়   •     •  •  •  ভ

   ১                    ২´                 ৩                    •
। র্সনা ধক্ষা -া ধা I   না -া -া -া।     র্ঋা ন্না ধক্ষা -া।    গা -া -া} ন্‌া
(১) তে  অ   •  •        নু  •  •  •      •   খ   ন   •       •  •  •  চা
(২) য়  নি  •  •        বা  •  •  •      •   র   ণ   •       •  •  •  মো
```

১ ২´ ৩ •
| সা গা -া গা I *ক্ষা *ক্ষা -া না | ধা ক্ষা -া গা | -া -া ঋা -া |
(১) • হি • আ ফু ল • • তো মা • • • • • •
(২) • রে • রা খি রা • • তো মা • • • • • •

১ ২´ ৩ •
| সা -া সা সা I ক্ষা ক্ষা ক্ষা গা | -া -া ঋা -া | সা -া -া IIII
(১) রি • স • • • • • • • • • ঙ্গ • •
(২) রি • স • • • • • • • • • ঙ্গে • •

* পুরো মধ্যম ও কড়ি মধ্যমের মধ্যবর্ত্তী স্থিত শ্রুতি লাগিবে নির্দ্দেশ করিতেছে।

বুদ্ধের ভাবপরিবর্ত্তন।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

বাৎসরিক হলকর্ষণোৎসবের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সিদ্ধার্থ-গৌতমের বয়স তখন দ্বাদশ মাস। রাজা-রাজন্য, স্ত্রী-পুরুষ সকলে উৎসবার্থে ক্ষেত্রে উপস্থিত। উৎসবের প্রধান অঙ্গ হলপরিচালন। রাজা স্বহস্তে আপনার স্বর্ণলাঙ্গল পরিচালন করিলে পর, রাজন্যবর্গ স্ব স্ব রৌপ্যলাঙ্গলসহ তাঁহার অনুসরণ করিতেন। তদনন্তর সাধারণ কৃষকশ্রেণীর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা-মূলক চাষক্রিয়া প্রদর্শিত হইত। শিশু গৌতমকেও উৎসবক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। অদূরে একটি জম্বুবৃক্ষতলে মনোরম পালঙ্কে তিনি শায়িত। তাঁহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত বহু সুদর্শনা ধাত্রী নিযুক্তা রহিয়াছে। কিন্তু উৎসব আরম্ভ হইতেই তাহারা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উৎসবক্ষেত্রে গমন করিল। সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। ধাত্রীগণ ফিরিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিল শিশু আসনাবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ও ধ্যানমগ্ন! ওদিকে সূর্য্যদেব ঢলিয়া পড়িলেও জম্বুবৃক্ষের ছায়া স্থির থাকিয়া শিশুকে রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। অবিলম্বে তাহারা মহারাজকে এই সংবাদ দিল। মহারাজ শুদ্ধোদন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দ্বিতীয়বার শিশুর পদে প্রণত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে সিদ্ধার্থ-গৌতম দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিলেন। গৌতম রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন, রাজন্যবর্গের মনে এই কথাই বিশেষভাবে জাগরিত ছিল। তাঁহারা ভবিষ্যতে লাভের আশায় আপন আপন পুত্র ও স্বজন-পুত্রগণকে কুমারের সহচর করিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। রাজন্যবর্গ ও প্রজাবৃন্দ রাজকুমার সিদ্ধার্থের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে মনে যাহাই কল্পনা করুন না কেন, পিতা শুদ্ধোদনের মনে কিন্তু পুত্রের সংসারত্যাগের আশঙ্কা ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া দিতেছিল। শৈশব অতিক্রম করামাত্রই নিমিত্তজ্ঞ জ্যোতিষাচার্য্যগণের আবার ডাক পড়িল। কোন্ কোন্ কারণ ঘটিলে পুত্রের সংসারত্যাগের সম্ভাবনা জন্মিতে পারে, এইবার তাহার মীমাংসা আবশ্যক। জানা গেল, সংসারত্যাগের সাক্ষাৎ কারণস্বরূপে গৌতম চারিটি দৃশ্য দেখিবেন—একটি জরাগ্রস্ত মানুষ, একটি ব্যাধিগ্রস্ত লোক, একটি মৃতদেহ এবং একজন ভিক্ষু। *

শুদ্ধোদনের এখন হইতে প্রধান লক্ষ্য হইল এই চারিটি দৃশ্য যাহাতে কোনক্রমে গৌতমের দৃষ্টিপথে না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা এবং তাহাকে বিবাহবদ্ধ করিয়া সংসারমোহে আকৃষ্ট করা। কুমারের জন্য মনোরম প্রাসাদ-ভবন নির্ম্মিত হইল। এই চতুর্দৃশ্যের অপসারণ কল্পে চারিদিকে অসংখ্য প্রহরী নিযুক্ত রহিল।

গৌতমের বয়স যখন ষোড়শ বৎসর, শুদ্ধোদন তখন তাহার উপযুক্ত পাত্রীর অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। শাক্য সুপ্রবুদ্ধের † কন্যা যশোধরার প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি বিশেষ-

---

* অপর মতে নামকরণের সময় যে ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছিলেন তাঁহারাই এই চারিটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। See—Manual of Buddhism—H. Kern, p. 14. Buddha and the Gospel of Buddhism—A. Coomerswami—p. 16; and Manual of Buddhism—Spence Hardy—p. 154.

† কাহারো মতে সুপ্রবুদ্ধ কোলিয়রাজ। কিন্তু তাঁহার অনু-

ভাবে আকৃষ্ট হইল। তথাপি পুত্রের মনোভাব পরীক্ষার জন্য তিনি একটি উৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। কুমার কর্ত্তৃক সমাগত শাক্যকুমারীগণকে রত্নবিতরণ, উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। যথাসময়ে বিতরণ-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। শাক্যকুমারীগণ একে একে উপহার লইয়া যাইতে লাগিল। উপহারসামগ্রী নিঃশেষ হইল; ব্রীড়াযুক্তা যশোধরা ধীর পদসঞ্চারে সকলের শেষে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গৌতম সসঙ্কোচে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। উভয়ে মৃদু বাক্য-বিনিময় হইল। পরক্ষণেই কুমার তাহাকে আপন অঙ্গুরীয় উপহার দিলেন। মহারাজা সংবাদ পাইয়া পরম হৃষ্ট হইলেন।

শুদ্ধোদন যথারীতি সুপ্রবুদ্ধের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু সুপ্রবুদ্ধ উত্তরে জানাইলেন যে খ্যাতি-সম্পন্ন বীর ব্যতীত তাঁহার পরিবার কাহারো সহিত বিবাহসম্পর্ক স্থাপন করেন না। বিলাসী গৌতমের বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ কিছুই তিনি অবগত নহেন। ব্যর্থতার গ্লানি শুদ্ধোদনের অন্তর ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। এসংবাদ অবগত হইয়া গৌতম স্বীয় বীর্য্য-কৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য সকল শাক্যগণকে অবিলম্বে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিতে মহারাজকে অনুরোধ করিলেন। শুদ্ধোদন দ্বিধাবোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুমারের বিশেষ অনুরোধে অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। এক শুভদিনে শাক্যগণ একত্রিত হইলেন,—যত শাক্য-বীরগণ কুমারের বীর্য্যদম্ভ নাশ করিবার অভিপ্রায়ে মল্লক্ষেত্রে আসিয়া সমবেত হইলেন। শুদ্ধোদনের শঙ্কা দূর করিয়া, এবং সমগ্র শাক্যকুলকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া গৌতম একে একে সকল বীরগণকে ক্রীড়াক্ষেত্রে ম্লান-জ্যোতি করিয়া দিলেন—কেহই তাঁহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল তাহাই নহে, অষ্টাদশ শিল্প ও চৌষট্টী কলায়ও তাঁহার অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা প্রমাণিত করিয়া উপস্থিত সকলকে গৌতম এককালে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।* সুপ্রবুদ্ধের আর কোনও আপত্তি রহিল না। মহা সমারোহে গৌতম ও যশোধরার পরিণয়ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল।

পরমানন্দে গৌতমের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বহু রূপসী নর্ত্তকী নিযুক্ত হইল। কোনরূপ চিন্তার অবসর না দিবার জন্য উহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে নৃত্যগীতে প্রফুল্ল রাখিতে প্রয়াস পাইত।

দেখিতে দেখিতে অষ্টাদশ বর্ষ আমোদপ্রমোদে কাটিয়া গেল। বোধিসত্ত্বকে আত্মবিস্মৃত দেখিয়া দেবগণ প্রমাদ গণিলেন। অবিলম্বে তাঁহারা তাঁহাকে আত্মস্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

উদ্যানভবনে এইরূপ বিলাসিতার মধ্যে সমস্ত দিন-যামিনী ডুবিয়া থাকিয়া গৌতমের ক্রমে বিরক্তি ধরিতে লাগিল। তিনি একদিন রথে বহির্ভ্রমণে বাহির হইলেন। রথ কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তিনি দেখিলেন একটি দন্তহীন পক্ককেশ জরাগ্রস্ত লোক, কম্পান্বিত-কলেবরে যষ্টিভর করিয়া অতিকষ্টে অগ্রসর হইতেছে। বৃদ্ধকে দেখিয়া গৌতমের অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে তাঁহার সারথিকে প্রশ্ন করিলেন—

"এ কী ছন্দক?"

"একটি জরাগ্রস্ত লোক।"

"ইহার কি এই ভাবেই জন্ম হইয়াছে?"

"না। এ ব্যক্তি পূর্ব্বে আমাদের মতই ছিল।"

"জগতে এরূপ আরো আছে কি?"

"বিস্তর আছে।"

"আমাকেও জরাগ্রস্ত হইতে হইবে কি?"

"হাঁ কুমার, সকলকেই হইতে হয়।"

গৌতম আর অগ্রসর হইলেন না, তিনি চিন্তিতমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ব্যাপার শুনিয়া শুদ্ধোদন বিষম ভাবিত হইয়া পড়িলেন। এই সকল দৃশ্য কুমারের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তরে রাখিবার জন্য তিনি কত শাস্ত্রী-সামন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন, তথাপি এ কি ঘটিল! দেবগণের একজনই যে বৃদ্ধবেশে গৌতমের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, শুদ্ধোদন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বহু সান্ত্বনাবাক্যে তিনি কুমারকে চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে চারি ক্রোশ ব্যাপিয়া অধিক সংখ্যক প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। এইবারে আর কোন দৃশ্য গৌতমের দৃষ্টিপথে পড়া সম্ভব নয় মনে করিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

প্রায় চারিমাস পরে গৌতম আর একদিন ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। দেবগণ সুযোগ হারাইলেন না। রোগে-তাপে অভিভূত, জীর্ণশীর্ণ ব্যাধিগ্রস্তরূপে* একজন আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। সারথি ছন্দককে প্রশ্ন করিয়া ব্যাধি শরীরধর্ম্ম জানিতে পারিয়া গৌতম বিষণ্ণচিত্তে

তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী আচরণ (বুদ্ধের প্রতি) দেখিয়া তাহা মনে হয় না।

* ললিতবিস্তরের মতে সিদ্ধার্থ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়ের নিকট রীতিমত বিদ্যাচর্চ্চা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশ বিদ্যাভূষণ প্রণীত বুদ্ধদেব ৬৬ হইতে ৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

* অপর মতে গলিত কুষ্ঠরোগীরূপে। See—Manual of Buddhism—Hardy—pp. 188.

ফিরিয়া আসিলেন—আর অগ্রসর হইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। শুদ্ধোদন সংবাদ পাইয়া এইবারে প্রহরীসংখ্যা দ্বিগুণিত করিলেন।

কিছুকাল পরে গৌতম আবার একদিন পূর্ব্ববৎ নগর-বিহারে বহির্গত হইলেন। এই দিনও এক দেবতা মৃত-দেহরূপে উদ্যানপথে পড়িয়া রহিলেন। প্রহরী-শাস্ত্রী কেহই দেখিতে পাইল না, দেখিলেন শুধু গৌতম ও ছন্দক। গলিত মৃতদেহোপরি অসংখ্য কীটের পৈশাচিক ভোজব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া গৌতমের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। 'প্রত্যেক মানবকেই মরিতে হইবে'—দেবপ্রভাবাভিভূত ছন্দকের মুখে এই উত্তর শুনিয়া তিনি জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সংবাদ শূলের মত শুদ্ধোদনকে বিদ্ধ করিল। প্রবল ভবিতব্যের সহিত আপনার দুর্ব্বল মানুষী শক্তির তুলনা করিয়া মানুষের মতই তিনি সহায়হীনতার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, আবার মানুষেরই মত হৃদয়ের উত্তেজনায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত আশার শেষ অবলম্বনটুকুর ত্যাগও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। আর একটি মাত্র দৃশ্য বাকী! রাজধানীর আট ক্রোশের ভিতরে যাহাতে কোন সন্ন্যাসী ভিক্ষু প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া তিনি অশান্ত-উৎকণ্ঠায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অদৃষ্টবাদী ভারতবাসীর অদৃষ্টে বিশ্বাস আরও দৃঢ় করিবার জন্যই যেন শুদ্ধোদনের সমস্ত যত্নপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল! জন্মতিথি বৈশাখীপূর্ণিমাদিনে গৌতম ছন্দক সহ পুনরায় ভ্রমণে বাহির হইতেই দেখিলেন এক গৈরিক-ধারী ভিক্ষু। তাঁহার শান্ত-সংযত দৃষ্টি, তাঁহার মৃদুমন্থর-গতিভঙ্গিমা, তাঁহার উজ্জ্বল মুখকান্তি গৌতমের চিত্ত অধিকার করিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন—

> কিং সারথে পুরুষঃ শান্তঃপ্রশান্তচিত্তো
> নোৎক্ষিপ্তচক্ষু র্ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী।
> কাষায়বস্ত্রবসনো সুপ্রশান্তচারী
> পাত্রং গৃহীত্বা ন চ উদ্ধত উন্নতো বা॥

সারথি, শান্ত প্রশান্তচিত্ত কে এ গৈরিকধারী পুরুষ? ইনি উদ্ধতও নহেন, অবনতও নহেন। চক্ষু ইঁহার উৎ-ক্ষিপ্ত নহে। ভিক্ষাপাত্র হস্তে ইনি কে?

সারথি ছন্দক উত্তর দিল—

> এষোহি দেব পুরুষ ইতি ভিক্ষুনামা
> অপহায় কামরতয়ঃ সুবিনীতচারী।
> প্রব্রজ্যাপ্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমাণো
> সংরাগদ্বেষবিগতো ভিক্ষতিপিণ্ডচর্য্যা॥

দেব, ইনি ভিক্ষু। কামরতি অপহার করিয়া ইনি বিনয়সম্পন্ন হইয়াছেন। রাগ-দ্বেষবিবর্জ্জিত হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষাজীবী ইনি আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন। *

জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত আতুর ও গলিত মৃতদেহ দর্শন করিবার পর হইতে উত্তরোত্তর গৌতমের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ ও মন চিন্তাভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল, আজ এই প্রশান্তবদন ভিক্ষুকে দেখিয়া তাঁহার অন্তর হঠাৎ অস্বাভাবিকরূপে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি উদ্যান-বাটীতে যাইয়া সমস্তদিন জলক্রীড়া ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইলেন। অপরাহ্নে সংবাদ আসিল যশোধরার গর্ভে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করি-য়াছে। তাঁহার অন্তর ছাপিয়া উচ্ছ্বাস উঠিল—"'রাহুল-জাতো', 'আমার একটি বন্ধন জন্মিয়াছে'।" নবজাত শিশুর নাম রাহুল রাখা হইল। গৌতমের মনে পুত্রের মুখদর্শনের প্রবল ইচ্ছা জাগিল। তিনি রথারূঢ় হইয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। কিসা-গৌতমী নাম্নী এক শাক্যরমণী গবাক্ষপথে অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত রথারূঢ় গৌতমকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল—

> নিব্বুতা নূন সা মাতা
> নিব্বুতা নূন সো পিতা;
> নিব্বুতা নূন সা নারী,
> যস্স-যন্ ঈদিসো পতি। †

'নিব্বুতা' শব্দ শ্রবণ মাত্রই গৌতমের 'নিব্বুতি', নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ মনে পড়িল। পুত্রদর্শনেচ্ছা অপেক্ষা তাঁহার মনে নির্ব্বাণলাভেচ্ছাই প্রবলতর হইয়া উঠিল। তিনি কিসা-গৌতমীকে বহুমূল্য মণিহার গুরুদক্ষিণাস্বরূপে প্রেরণ করিলেন। অল্পবুদ্ধি কুমারী ভাবিলেন গৌতম তৎপ্রতি প্রণয়যুক্ত হইয়াছেন।

গৌতমীর মনে যাহাই হউক না কেন, গৌতমের সমস্ত অন্তঃকরণ তখন একমাত্র নির্ব্বাণচিন্তায় ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আপন পালঙ্কে শয়ন করিয়া রহিলেন। অসংখ্য নর্ত্তকী আসিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পাইল। কিন্তু তাহাদের সঙ্গীত সেদিন তাঁহার শ্রবণে মধুবর্ষণ করিল না, সুন্দরী নর্ত্তকীগণের লীলায়িত নৃত্যভঙ্গী তাঁহার চক্ষে

* 'ললিতবিস্তর' হইতে এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইল। ললিত-বিস্তরের মত বর্ত্তমান গ্রন্থে অনুসৃত হয় নাই। তবে পালি মতের সহিত এই স্থানে কোন অসামঞ্জস্য নাই বলিয়া এবং ললিতবিস্তরের এই অংশের বিবরণের সৌষ্ঠবদৃষ্টে এই অংশ উদ্ধৃত হইল। ললিতবিস্তরের বিবরণের জন্য মহামহোপাধ্যায় সতীশ বিদ্যাভূষণের পুস্তক দ্রষ্টব্য। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, ললিতবিস্তরের ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা নহে। 'দীঘনিকায়' মতে চারিটি দৃশ্য গৌতম একই দিনে দেখিয়াছিলেন।

† ধন্য ইঁহার পিতা, ধন্যা ইঁহার মাতা, ধন্যা সেই নারী যাঁহার ঈদৃশ পতি।

প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল—কিছুই আজ তাঁহার ইন্দ্রিয়পথে প্রবেশাধিকার পাইল না। ধীরে ধীরে গৌতমের নিদ্রাকর্ষণ হইল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ব্যর্থতার গ্লানি বহিয়া পরিশ্রান্ত নর্ত্তকীগণ একে একে যত্র তত্র অসংযতভাবে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

——

হুগলী বরফডাঙ্গার মাঠ।

[আমরা বড়ই আনন্দের সহিত বংশবাটীর রাজপরিবারের কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের নিম্নলিখিত পত্রখানি (হুগলী "বরফডাঙ্গার মাঠ" সম্বন্ধীয়) প্রকাশ করিলাম। এই পত্র হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, পত্রিকার প্রবন্ধাদি পত্রলেখকের ন্যায় মনীষীগণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। তং সং]

মাননীয়

শ্রীযুক্ত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদক

মহাশয় মান্যবরেষু—

বিগত আষাঢ়-সংখ্যা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ৯১ পৃষ্ঠা "বঙ্গে বরফ-বার্ত্তা"য় হুগলীর যে মাঠে বরফ প্রস্তুত হইত তাহা এখনও আছে কি না লেখক তাহা জানেন না লিখিয়াছেন। তাঁহার ও সাধারণের অবগতির জন্য লিখিতেছি যে হুগলীর "বরফডাঙ্গা"র মাঠে এখন বরফ প্রস্তুত না হইলেও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। তাহা আমার বহুকালের পৈত্রিক জমিদারী মৌজা কুলীহান্দার অন্তর্গত। এই মহলটী হুগলী রেলষ্টেসনের পশ্চিম মাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া হুগলী সহরের গঙ্গার ধার বাবুগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হুগলী রেল ষ্টেসন হইতে চুঁচুড়া রেল ষ্টেসনের ধারে যে মাঠ আছে তাহার মধ্যে "বরফডাঙ্গার" মাঠ অবস্থিত। বরফের কল যখন ছিল না ও আমেরিকা হইতে জাহাজে করিয়া বড় বড় বরফের চাঙ্গড় যখন আমদানি হইত না, সে সময় এই "বরফ ডাঙ্গার" প্রস্তুত বরফ আমীর ওমরাহ প্রভৃতি ভাগ্যবন্তগণ ব্যবহার করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও এখানে বরফ প্রস্তুত হইত, তাহা বিশেষ লাভজনক ব্যবসা ছিল। যে প্রণালীতে বরফ প্রস্তুত হইত তাহা আড়ম্বরশূন্য হইলেও নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না। এক শ্রেণীর লোক বরফ প্রস্তুত প্রণালী জানিত, তাহাদের বংশেই এই শিল্প আবদ্ধ ছিল। বিদেশের আমদানী বরফ ও কলজাত বরফ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বরফডাঙ্গা মাঠের বরফপ্রস্তুত শিল্পও লোপ পাইয়াছে। বাষ্টীড্ সাহেবের "প্রাচীন কলিকাতার প্রতিধ্বনি" পুস্তকে হুগলী বরফডাঙ্গা মাঠের এইরূপ উল্লেখ আছে:—"সেকালে মুখোষ পরিধান করিয়া আমোদপ্রমোদের খুব প্রচলন ছিল; নৃত্যাদির ছদ্মবেশ ও পুরুষের মেয়েলি পোষাক ভাড়া প্রায়ই বিজ্ঞাপিত হইত; বস্তুতঃ উদ্দাম আনন্দপ্রবাহ প্রচণ্ড ভাবেই চলিত, পরিশেষে নৈশ ভোজের সময় শীতকালে টাট্‌কা অইষ্টার মৎস্য ও বরফ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কুমারী গোল্ডবোর্ণ বলেন যে গঙ্গার দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র নদীর ধার হইতে বরফ আসিত; সম্ভবতঃ তিনি হুগলীর নিকটে সেই সময়ের ও তাহার পরবর্ত্তী কালের বরফমাঠের কারখানার কথাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" *

শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায়।
(বাঁশবেড়িয়া, জেলা হুগলী)

——

প্রতিবাদ।

মাননীয় "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণেষু—

বর্ত্তমান কালে অস্মদ্দেশে অদ্ভুত নব্য রসসাহিত্যের অতিপ্রচলনকালে অমৃতসমান মহাভারতের কথা লিখিতেছি, তাহা কে-ই বা পড়িবে, কে-ই বা শুনিবে? ইহাই ভাবিয়াছিলাম।

গত আষাঢ়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে আমার প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন দেখিয়া সুখী ও আনন্দিত হইলাম। সুখী এই জন্য যে আমার প্রবন্ধ অন্ততঃ একজন শিক্ষিত যুবকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে জানিয়া; আর আনন্দিত এই জন্য যে আধুনিক কালের শিক্ষিত যুবক হইয়াও ক্ষেমেন্দ্রবাবু মহাভারত আলোচনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া। ভরসা করি যে তাঁহার সদৃষ্টান্ত অন্যান্য

* Masquerades were a very common means of amusement in the old days; dominoes were advertised for hire, also various female costumes for gentlemen; and evidently the fun raged fast and furious. They generally wound up with suppers, at which in the cold weather, fresh oysters and ices were to be had in abundance. Miss Goldborne says the ice came from "some slender inland rivulets of the Ganges," by which she probably meant to indicate the "ice fields" that were worked near Hooghly then and much later.—" Echoes from Old Calcutta by H. E. Busteed, p. 127.

যুবজনেরও অনুকরণীয় হইবে এবং তাঁহারাও সকলে দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনায় নিজেরাও আনন্দলাভ করিবেন এবং তাঁহাদের সকলের আলোচনার ফলে আর্য্যজাতির অতীত অপূর্ব্ব গৌরবকাহিনী প্রচারিত হইয়া সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করিবে।

এক্ষণে ক্ষেমেন্দ্র বাবুর উক্ত প্রতিবাদ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য নিম্নে দিলাম। আশা করি ইহা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

প্রতিবাদ (১) সম্বন্ধে :—

অ

মহাভারত—আদি, সম্ভব—১১৯ অধ্যায় মধ্যে দৃষ্ট হইবে যে পাণ্ডু—

(ক) পত্নীদিগকে হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক জ্ঞাতিদিগকে কহিতে বলিলেন যে—"পাণ্ডু রাজ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; আর গৃহে আসিবেন না।" পাণ্ডুর পত্নীদ্বয় প্রত্যাবর্ত্তনে রাজি না হইয়া যে কোনও অবস্থাতেই স্বামী সহবাস ত্যাগ করিয়াও তাঁহার সমীপে থাকিতে চাহিলেন।

(খ) তখন পাণ্ডু নিজের ও পত্নীদের আভরণ ও রত্নাদি সমুদায় দ্রব্য বিপ্রগণকে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—"আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া কহিবেন যে, পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না।"

উক্ত ১১৯ অধ্যায়ে পাণ্ডুর প্রব্রজ্যাগ্রহণ সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাহা আমার কল্পিত নহে। সম্ভবতঃ কোন প্রকার ভ্রমবশতঃ উক্ত reference প্রকাশ না হওয়ায় ক্ষেমেন্দ্রবাবুর মনে সন্দেহের অবকাশ ঘটিয়া থাকিবে।

ক্ষেমেন্দ্র বাবুর উক্ত প্রতিবাদ প্রকাশ হওয়ায় reference অভাব নিমিত্ত আমার প্রবন্ধের অঙ্গহানি পূরণ করিবার সুযোগ পাইয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আ

পাণ্ডুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষেমেন্দ্রবাবু যাহা অনুমান করিয়াছেন, মহাভারতে কিন্তু তদ্বিপরীতই দৃষ্ট হয়, যথা—

(ক) "ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও মহামতি বিদুরকে মহাত্মা ভীষ্ম জন্মাবধি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন ....উপযুক্ত শিক্ষকের সন্নিধানে নিযুক্ত করিয়া অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়ামে সুনিপুণ করিয়াছিলেন। রাজতনয়েরা তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ব্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিচর্ম্মপ্রয়োগ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত অধ্যেতব্যবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

"তন্মধ্যে পাণ্ডু অদ্বিতীয় ধানুষ্ক........ছিলেন"। (মহা—আদি, সম্ভব, ১০৯ অধ্যায়)।

(খ) কুন্তীর স্বয়ম্বরকালে—কুন্তী স্বয়ম্বরসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন "তথায়......মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ" পাণ্ডুকে, তাঁহার "প্রতাপ সিংহসম, বক্ষোদেশ কপাটোপম......কুন্তী পাণ্ডু নরবরে বরত্বে বরণ করিলেন: দেখিয়া অন্যান্য ভূপতিগণ ...... প্রস্থান করিলেন।"

[মহা—আদি, সম্ভব, ১১২ অধ্যায়]

(গ) মহাভারত—আদি, সম্ভব, ১১৩ অধ্যায়ে পাণ্ডুর দিগ্বিজয় বর্ণিত আছে তথায় পাণ্ডুর শৌর্য্য বীর্য্য কহিয়া কবি তাঁহাকে "অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী" আখ্যা দিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তির স্বাস্থ্য যে খারাপ তাহা সম্ভবপর কি?

জন্মাবধি যিনি তৎকালীন ক্ষত্রিয়োচিত পরিশ্রম ও ব্যায়ামাদিতে সুনিপুণ ও অদ্বিতীয় ধানুষ্ক হইয়াছিলেন, যাঁহাকে কুন্তী বরমাল্য দেওয়াতে অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ "দ্বন্দে মাতনম্" অপেক্ষা প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন, যিনি অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী বীর ছিলেন—তাঁহার স্বাস্থ্য মন্দ ছিল, ইহা মহাভারতের কোন্ অংশ হইতে মনে হওয়া সম্ভব তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইতাম।

ই

পাণ্ডুর জন্মাবধি মন্দ স্বাস্থ্যের অনুমান সমর্থনের জন্য তাঁহার মৃত্যুর প্রণালী যাহা উল্লিখিত হইয়াছে উক্ত প্রতিবাদে, তাহা মহাভারতের উপরি উদ্ধৃত ও অন্যান্য অংশে সমর্থিত হয় না।

"স্বাস্থ্যলাভার্থ বনগমন" কল্পনা মাত্র। ইহার বিপরীত কথাই মহাভারতে দৃষ্ট হয়। যথা—

মহাভারত—আদি, সম্ভব, ১১৪ অধ্যায় যেখানে পাণ্ডুর বনগমন প্রথম উল্লেখ আছে—তদধ্যায়ে জানা যাইবে যে বনে গিয়া পাণ্ডু সর্ব্বদা খড়্গহস্ত ও ধনুর্ব্বাণধারী হইয়া মৃগয়াতে ও পত্নীদ্বয়ে আসক্ত রহিতেন।

মহাভারত—আদি, সম্ভব, ১১৮ এবং ১২০ অধ্যায় হইতে জানা যায় যে মুনিশাপে পাণ্ডুর অপত্যোৎপাদনশক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল। এবং ১২৫ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে কনিষ্ঠা পত্নীকে বলাৎকার করিতে গিয়াই পাণ্ডু দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে—বলা যাইতে পারে যে পাণ্ডুর পিতা বিচিত্রবীর্য্য যেরূপ অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গ করিয়া যক্ষ্মাক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন (১০২ অধ্যায়) সেরূপ বনে অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গ হেতু পাণ্ডুও অপত্যোৎ-

পাদনশক্তি বিরহিত হইয়াছিলেন। মুনিশাপের কথা—হেতু প্রদর্শন মাত্র—তাহা গল্প হইতে পারে।

স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেই লোকে তল্লাভার্থ বায়ুপরিবর্ত্তনে (changeএ) যায়। মহাভারতের বর্ণনামতে বনগমনকালে বা তাহার পরেও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত পাণ্ডুর ভগ্নস্বাস্থ্যের কোনই বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং আমার মনে হয় স্বাস্থ্যলাভার্থ পাণ্ডুর বনগমন করার অনুমান ঠিক নহে।

প্রতিবাদ (২) সম্বন্ধে :—

এই প্রতিবাদে যুধিষ্ঠিরের দাবী সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আমার মতামত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিব।

এক্ষণে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে "একই পরিবারভুক্ত" শব্দ দ্বারা উক্ত প্রতিবাদে যদি একান্নবর্ত্তীতার কল্পনা করা হইয়া থাকে তবে তাহা যে ভুল তাহাও উক্ত ভিন্ন প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে।

ক্ষেমেন্দ্র বাবু অনুমান করিয়াছেন যে "একই পরিবাররূপে গণ্য হওয়াতে কৌরব ও পাণ্ডবগণ একই দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতেন" ইত্যাদি।

একই আচার্য্যের নিকট শিক্ষা পাইলেই কি একই পরিবারভুক্ত বা একান্নবর্ত্তী হয়?

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রত্যেকেই পরশুরামের শিষ্য ছিলেন—মহাভারতেই দৃষ্ট হয়। তাই বলিয়া কি ইঁহারা একই পরিবারভুক্ত ছিলেন বলা যায়?

পুনশ্চ—মহা, আদি, সম্ভব ১৩২ অধ্যায়ে দেখা যায়, "আচার্য্য দ্রোণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। এই সম্বাদ শ্রবণে অন্ধকবংশীয় রাজা ও সুতপুত্র কর্ণ এবং অনেকানেক রাজকুমার অস্ত্রশিক্ষার্থ দেশদেশান্তর হইতে দ্রোণের নিকটে আগমন করিলেন।"

ঐ—আদি, চৈত্ররথ, ১৬৭ অধ্যায়ের শেষে দৃষ্ট হইবে 'প্রবল প্রতাপান্বিত দ্রোণ পাঞ্চাল দেশ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ নিলয়ে আনয়ন পুর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা করাইতে লাগিলেন এবং……ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে একান্ত যত্ন করিতে লাগিলেন।" সুতরাং ধৃষ্টদ্যুম্নও—দ্রোণশিষ্য।

ঐ—দ্রোণপর্ব্ব, ৩য় অধ্যায়ে জানা যায় যে বহুদেশীয় "রাজপুত্রগণ ব্রাহ্ম ও দৈব শস্ত্রের নিমিত্ত" দ্রোণাচার্য্যের "উপাসনা করিতেন।" এবং "সত্যসন্ধ দ্রোণাচার্য্যের বিদ্যা সকল ধনুর্দ্ধরের উপজীবিকা" ছিল।

একই দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য বিধায় ইঁহারাও সকলেই কি তাহা হইলে "একই পরিবারভুক্ত" ছিলেন? ক্ষেমেন্দ্র বাবু "প্রতিবাদে" reference গুলি দিলে সুখী হইতাম।

প্রতিবাদ (৩) সম্বন্ধে :—

এই সংখ্যক প্রতিবাদের উত্তর উক্ত পত্রিকার আষাঢ়-সংখ্যাতেই প্রকাশিত আমার প্রবন্ধাংশে দৃষ্ট হইবে। বোধ করি যখন "প্রতিবাদ" লিখিত হয় তখন ঐ প্রবন্ধাংশ ক্ষেমেন্দ্রবাবুর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

আশা ও ভরসা করি প্রতিবাদ সম্বন্ধে বক্তব্যগুলি যে আলোকে ও অন্তরের সহিত লিখিত হইল সেই ভাবেই ইহা গৃহীত হইবে; এবং ইহা লেখার জন্য ধৃষ্টতা হইয়া থাকিলে স্বীয় ঔদার্য্যগুণে তিনি তাহা মার্জ্জনা করিবেন। ইতি।

বিনয়াবনত

শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ।

নানা কথা।

অশ্লীল ছবি—সেদিন কলেজ মার্কেটের সম্মুখে ফুটপাথে চলিতেছি, এমন সময়ে, একটী লোক Paris pictures চাই বলিয়া হাঁকিতেছিল। আমি দেখিবার জন্য বলিলাম যে, পুলিশে যদি ধরে। তখন সে স্পর্দ্ধা সহকারে বলিল যে পুলিশ কিছুই করিতে পারে না, যতক্ষণ আমি লেফাফার ভিতর বন্ধ করিয়া এই ছবিগুলি বিক্রয় করি। তার পর আমাকে একটু আড়ালে ডাকিয়া একটা লেফাফা দেখাইয়া বলিল যে, উহার ভিতর বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের অতীব অশ্লীল চিত্র আছে। যাক, যিনি এগুলি বিক্রয়ের জন্য বাহির করিয়াছেন, তিনি লেফাফার উপরে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সময় দিয়া ছাপা অক্ষরে বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি কেহ ঐ সময়ের মধ্যে ছবিগুলি উপভোগ করিয়া অপছন্দ করেন ও ফেরত দিতে চান, তবে তাঁহাকে মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে। এই সকল হইতে কি বুঝা যায়? মনে হয় না কি যে, প্রকাশক কেবল নিজের পকেট টাকায় ভরাইবার জন্য এই ঘৃণিত ব্যবসায়ে, দেশবাসীর সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে? এ প্রকার মনোভাবকে আমরা পশুভাবের অতিরিক্ত কিছুই বলিতে চাহি না। আমরা আরও শুনিলাম যে প্রকাশক একজন বাঙ্গালী। আমাদের গ্রাহক ও পাঠকগণের মধ্যে কেহ কি আমাদিগকে ঠিক করিয়া বলিয়া দিবেন, এইভাবে উক্ত ছবি সকল বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলে আইনের কবলে আনা যায় কি না? প্রকাশকের ঠিকানা আমরা জানি। যদি কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়গণ প্রকাশককে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিতে সম্মত থাকেন, তবে আমি তাহার ঠিকানা

প্রকাশ করিব। তাহার কি বালকবালিকা প্রভৃতির মনোভাব কলুষিত করিতে এতটুকু কষ্ট হয় না? প্রকাশক কি পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে নাই? তাহার কি ভাইবোন নাই? ধিক তাহাকে। একদল লোক হইয়াছে, যাহারা দেশকে উৎসন্নদশায় মৃত্যুমুখে লইয়া চলিবার জন্য আড়েহাতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—নিজের পকেট পূর্ণ হইলেই হইল; বিলাতের মতামতের পদে পদে দোহাই দিয়া এদেশে অশ্লীল বিষয় চালাইতে দ্বিধা করে না। এ সকল ভাবিয়া প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে, ফুকারিয়া কাঁদিতে চায় এবং ইহার প্রতিবিধানের জন্য ভগবানের নিকট দুবাহু বাড়াইয়া প্রার্থনা করিতে থাকে।

ভিক্টর হিউগো ও নাস্তিকতা—নাস্তিকতা সম্বন্ধে হিউগো:বলেন—"নাস্তিক্য কি তুচ্ছ, কি হেয়, কি অযৌক্তিক! ঈশ্বর আছেন। আমি নিজের অস্তিত্বের মত ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সুনিশ্চিত। প্রার্থনা যে আত্মার জন্য কি প্রকার আবশ্যক ও সুফলপ্রসূ তদ্বিষয়ক গ্রন্থ লিখিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে সময় দিয়াছেন। ব্যক্তিগত হিসাবে আমি প্রার্থনা না করিয়া ক্রমান্বয়ে চার ঘণ্টা কাটাইতে পারি না। ভগবানের কাছে আমি কি বিষয়ে প্রার্থনা করি? আমাকে শক্তি দিবার জন্য। ন্যায় ও অন্যায় আমি জানি, কিন্তু আমি দুর্ব্বল এবং আমার নিজের দুর্ব্বলতা বুঝি। যাহা ন্যায়, তদনুসারে আমার নিজের ক্ষমতায় কার্য্য করিতে অক্ষম,—একমাত্র ঈশ্বরই আমাকে তুলিয়া ধরেন এবং রক্ষা করেন। তাঁহাতেই আমরা বাস করি—তাঁহার ভিতর দিয়াই আমরা জীবন লাভ করি, গতি এবং যাহা কিছু সকলই লাভ করি। তিনি universal creator (বিশ্বস্রষ্টা)। কিন্তু তিনি জগত সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলা ঠিক নয়। তিনি অনাদি অনন্ত কাল জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি বিশ্বজগতের প্রাণ। তিনি অনন্তের ego বা আত্মা" (Liberty, ৩০-৬-২৯ দেখ)

আমাদের শাস্ত্রে ঠিক এই কথা বলিলেও তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত যখন ইহা বলিয়াছেন তখন ইহা সহস্রবার মান্য!

দেবদাসী প্রথা রহিত—আঃ বাঁচিলাম। দেশ হইতে অন্তত একটী অত্যন্ত অনিষ্টকর কুপ্রথা দূর হইল। মাদ্রাজের বহু মন্দিরে একটী প্রথা সুদূর অতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। বহু নারী চিরদিন কুমারী অবস্থায় থাকিয়া এই সকল মন্দিরের সেবিকারূপে মন্দিরের সম্মুখে সঙ্গীত ও নৃত্য করিত। ফলে তাহাদের প্রায় সকলেরই চরিত্র কলুষিত হইত। মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার মহিলা ডেপুটী প্রেসিডেন্ট ডাঃ মুথু লক্ষ্মীর উপস্থাপিত একটী বিল গৃহীত হইবার ফলে এই পাপপ্রথা সমাজ হইতে বিদূরিত হইল। আমরা ডাঃ শ্রীমতী মুথু লক্ষ্মীকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছি। (সঞ্জীবনী ২০ আষাঢ় ১৩৩৬ দেখ)

বন্যা নিবারণের উপায়—গত ১৫ শ্রাবণের আনন্দবাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে চীন দেশের প্রাচীন পন্থা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বড়ই সময়োপযোগী। এই প্রবন্ধ হইতে (বিশেষত যখন ইহার মূল আমেরিকার Literary Digestএ প্রকাশিত হইয়াছে) প্রাচ্যগণ যে বন্যাপ্রতিবিধায়ক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না। কিন্তু এই দেশে এই উপায় কি কার্য্যে লাগান হইবে? আমাদের অনুরোধ আনন্দবাজারসম্পাদক মহাশয় এই প্রবন্ধটী মুদ্রিত করিয়া broadcast বিলি করুন।

বিলাতের মিল বন্ধ—কাগজে দেখি, প্রধানত প্রাচ্যদেশের খরিদ্দারের অভাবে ল্যাঙ্কাসায়ারে ১৮ শত মিল বন্ধ। দেশীয় অনেক সংবাদপত্রে ইহার জন্য আনন্দ প্রকাশের ইঙ্গিত দেখি। সত্য কথা বলিতে কি, আমার এজন্য দুঃখই হইয়াছে। কারণ এই যে, এত বড় উন্নত জাতি ইংরাজেরা প্রাকৃতিক নিয়ম ভুলিয়া গিয়া আমাদেরও কষ্ট দিতেছে এবং নিজেদেরও কষ্ট আনিতেছে। নিয়মটী এই যে, আঘাতের সমপরিমাণে প্রতিঘাত পাওয়া যায়। ইংরাজশাসনের অধীনে থাকিয়া আমরা যে পরিমাণে আঘাত পাইব, ইংরাজজাতি ভুলিয়া যান বা নাই যান, তাহাকে তদনুরূপ প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে। আমাদের মন্ত্র হইতেছে live and let live—নিজে বেঁচে থাক এবং অপরকে বাঁচিতে দাও। ভগবানের মঙ্গল বিধানে ভারতবর্ষ ইংরাজের শাসনে আসিয়াছে, ভাল কথা। ইংরাজ যদি নিজের ভাল চান, আমাদের ভাল নাই চান, তবু তাঁহাকে আমাদেরও প্রকৃত ভাল, প্রকৃত মঙ্গলবিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পনের আনা নয় পাই নিজের পকেটের দিকে চাহিয়া করিলে চলিবে না। হৃদয় খুলিয়া মঙ্গলবিধানে অগ্রসর হও—ভারতবাসীরও হৃদয় কৃতজ্ঞতাভারে অবনত হইয়া পড়িবে। আঘাতের অনুরূপ প্রতিঘাত আসে এবং প্রীতি প্রীতিকে আকর্ষণ করে, এ সমস্ত নিয়ম জড়, মন ও অধ্যাত্ম রাজ্যে—প্রকৃতির সকল বিভাগেই কার্য্য করে দেখা যায়।

বস্ত্রের কথা—বিগত ১৮শত খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও ভারতের লোকেরা চরকা কাটিত। ভারতের বস্ত্রও ইংলণ্ড ও ইউরোপে কোটি কোটি টাকার রপ্তানি হইত। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ভারতে ৫ কোটী টাকারও কম বস্ত্র আমদানি হয়। ১৮১৯ অব্দে ৭ কোটি টাকার কম

আমদানি হয়। ঐ সময়ে এদেশের চরকাকাটা সুতায় তৈরি কাপড়ের সঙ্গে ইংলণ্ডের কলের কাপড় হার মানিত। ১৮০০ অব্দে মিঃ রিভার্ট কর্ণেল লিখিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের কলনির্ম্মিত কাপড় দেশীয় কাপড়কে এখনও পরাস্ত করিতে পারে নাই! বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দেশে কেহ ভারতীয় কাপড় আমদানী করিলে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং এই ভাবে জবরদস্তি করিয়া ও ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শুল্ক বসাইয়া এদেশে বিলাতী বস্ত্র চালাইয়াছিলেন। আজ আমরা বৎসরে ৬৬ কোটি টাকার বস্ত্র আমদানি করিতেছি!

(আনন্দবাজার ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬)

এবিষয়ে আমরা—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥
পরবশ যাহা কিছু সকলি দুঃখের কারণ।
আত্মবশ যাহা কিছু সকলি সুখের কারণ॥
অবহিত হয়ে শোন কহিছেন আচার্য্যগণ।
সুখের আর দুঃখের ইহাই সুগম লক্ষণ॥"

সহবাসসম্মতিকমিটির রিপোর্ট—মোটের উপর আমরা আইনের সাহায্যে সামাজিক সংস্কারবিধানের পক্ষপাতী নহি। যে প্রথা অবলম্বনে লোকের জীবনহানির সম্ভাবনা, যথা সতীদাহ প্রভৃতি, সেই সকল প্রথা আইনের সাহায্যে বন্ধ করা হোক। সহবাসসম্বন্ধীয় প্রথার যে অংশ স্ত্রীলোকের বা তাহার সন্তানের জীবনহানির বা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে সমাজধ্বংসের সহায়তা করিতে পারে, সেই অংশ মাত্র আইনের সাহায্যে রহিত বা নিয়মিত করা হোক; অবশিষ্ট অংশকে স্বতঃ-অভিব্যক্ত হইতে দিলেই ভাল হয়। তবে এই রিপোর্ট প্রাচীনপন্থীগণকে সহবাস প্রভৃতি বিষয়ে সাবধান হইবার জন্য যথেষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে নিঃসন্দেহ। এ বিষয়ে কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহারও ভিত্তি অধিকাংশ পাশ্চাত্য প্রথার উপর গ্রথিত—আমাদের দেশে উহা সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তিত হইলে হিন্দুসমাজ নামেমাত্র হিন্দুশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সম্পূর্ণ নূতন সমাজরূপে গঠিত হইবে সন্দেহ নাই।

নারীধর্ষণ—সংবাদপত্রের সম্পাদক মহোদয়দিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি, তাঁহারা থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতির বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ করিয়া এই নারীধর্ষণের কি প্রকার সহায়তা করিতেছেন। নারীধর্ষণের জন্য শুধু হাহুতাশ বা অশ্রুবর্ষণ করিলে কি হইবে, যদি না তাহার প্রতিবিধানের যে সকল প্রকৃত উপায়, সেগুলি, আত্মসুখের পাছে ত্রুটী ঘটে সেই ভয়ে অবলম্বন না করি? এই যে থিয়েটার প্রভৃতির সাহায্যে লোকের কামভাবকে উদ্দীপ্ত করা হইতেছে, এই যে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের এক বাড়ী হইতে ভদ্রনামধারী ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত অশ্লীল ছবি প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, ইহার পর নারীধর্ষণ যে নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে, তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? পয়সার লোভ ছাড়িয়া সমবেতভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ঐসকল কামোদ্দীপক ব্যবস্থাকে বয়কট করিবার উপায় অবলম্বন কর, তবে নারীধর্ষণ প্রতিরুদ্ধ করিবার আশা করিও।

গ্রন্থপরিচয়।

পূজোবাড়ি—(সামাজিক নক্সা)—শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সুলভ প্রেস, পৃঃ ৩৯, মূল্য।০

এই ক্ষুদ্র বইখানিতে যে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ আছে তাহা যেমন সরল তেমনি স্বচ্ছ। নক্সাটি হয় ত একটু মোটা তুলিতে অঙ্কিত, ইহাতে হয় ত ততটা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও শিল্পানুভূতি না থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যে মানুষ, পূর্ব্বকালের পূর্ব্বানুশিষ্ট আচরণ মতে সরল নিষ্ঠা, ভক্তি বিশ্বাস ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠান ভুলিয়া দৈবানুগ্রহ বা দৈববল লাভে বঞ্চিত আছেন, তাহা এই চিত্রে সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। যাঁহাদের সাধনফল ও দৈববলে আস্থা আছে; তাঁহারা যেন এই পুস্তিকা যত্নের সহিত পাঠ করেন।

শোকসংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৯ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে গগনচন্দ্র হোম পরলোক গমন করেন। ময়মনসিংহ জেলায় ইহার জন্ম। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। ২২ বৎসর ধরিয়া "সঞ্জীবনী"র লেখক ছিলেন। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে এবং উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের মধ্যে বড়ই গোঁড়ামির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। গগনবাবুর অন্তরে একখানি নিরপেক্ষ ও উদারভাবের কাগজ বাহির করিবার ইচ্ছা জাগিল, যাহাতে ঐ গোঁড়ামী সকল সমাজ হইতে দূর হইতে পারে। আমার বেশ স্মরণ হইতেছে, তিনি পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়া এই ভাবটী প্রকাশ করিলেন। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া সবেমাত্র ছোটখাটো লেখকের পদে পদার্পণ করিয়াছি। আমিও তাঁহাকে এবিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিলাম। তিনি "আলোচনা" মাসিকপত্র প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দেশ তখন নিরপেক্ষ ভাবে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। কাজেই কাগজখানি নিরপেক্ষভাবে সুপরিচালিত হইলেও অল্পকালের মধ্যেই উঠিয়া গেল! আমরা তাঁহার পরিবারস্থ সকলকে আমাদের আন্তরিক গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহাদিগকে এই শোকভার বহনে সামর্থ্য প্রদান করুন এবং পরলোকগত আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া শান্তি দান করুন।

সুভাষিত সংগ্রহ।

(ডাঃ শ্রীব্রজবল্লভ সাহা)

ওঁ সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবামহি
তেজস্বিনাবধিতমস্তু মা বিদ্বিষামহি ।

গুরু আর মোরে রাখ দয়াময়,
শুভাশুভ যেন, পাই গো সমানে ;
বীরের যে কাজ করি যেন দোঁহে
লভি যেন তেজ পঠন পাঠনে।
বিদ্বেষ যেন গো আমাদের মনে
নাহি পায় ঠাঁই মাগি ও চরণে ॥

ওঁ যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যোবনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোঃ নমঃ।

যে দেব আগুনে, জলে সমীরণে
পশেছে সবার পরাণে ;
তরুলতা তৃণে, নিখিল ভুবনে
নমি নমি তাঁরি চরণে।

ময়ি সর্ব্বং ইদম্ প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।

গীতা।

হে ভারত, মণিমালার ভিতরে
সূতো নাহি চোখে পড়ে
নিখিল ভুবনে মরমে গোপনে
আছি আমি সবে ধরে।

উৎক্ষেপনং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিম্ কল্পিতং মাতুরধোক্ষ আগসে,
কিমস্তি নাস্তি ব্যপদেশ ভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ।

ভাগবত দশমস্কন্ধে ব্রহ্মব্রহ্মার স্তোত্র।

যবে শিশুর মুরতি উঠে গো বিকশি,
জননী জঠর মাঝে।
কর-পদাঘাত করে চারিভিতে
বিষম বেদনা বাজে ॥
করুণার ছবি জননী তাহার,
ল'ন না ত অপরাধ।
মরমের ডোরে, বাঁধিয়া নিবিড়ে,
আনেন ভুতলে চাঁদ ॥
আমাদেরো দোষ নিওনা হে হরি
মাগি এই তব ঠাঁই।
আছি যে নিয়ত তোমার জঠরে
তুমি ছাড়া কিছু নাই ॥

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু,
অপ্রাপ্যবোধিং বহুজন্ম দুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতঃ চলিষ্যতে।

ললিতবিস্তর।

এই আসনেতে শরীর আমার
যাক্ তবে শুকাইয়া।
ত্বক্ মাস্ হাড়, প্রলয়ে এবার
যাক্ তবে মিলাইয়া ॥
না পাইলে বোধি, দুর্ল্লভ নিধি
বহুজনমের সার ;
এ আসন হ'তে পরাণ থাকিতে
উঠিব না আমি আর ॥

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

পূর্ণ রয়েছে ঐ মহালোক পূর্ণ মোদের ধরা,
পূর্ণ হইতে এসেছে পূর্ণ নিখিল সৃজন করা।
পূর্ণ হইতে পূর্ণই নিলে জেনে রাখো সাধু ভাই
হেঁয়ালির মতো পূর্ণই থাকে ইথে কোনো ভুল নাই ॥

জেলেছে যে জনা রবি আর শশী
বিছায়ে শ্যামল ধরা
নিতুই দেওয়ালি, যাঁর তারাবলি
সে নহে কাহারো গড়া।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
স্তুত্যাংনির্ব্বচনিয়তা দূরীকৃতা যন্ময়া
ব্যাপিত্বং চ নিরাকৃতং যত্তীর্থযাত্রাদিনা—
ক্ষন্তব্যো জগদীশ তৎ বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং।

অরূপ তোমার রূপের মাধুরী
ভাবিলাম যাহা মনে,
কথায় তোমারে কহনে না যায়
রচিলাম গাথা গানে।
নিখিল ভুবনে ছেয়ে আছ তুমি
বলে দিনু সবে তীরথের ভূমি
সাধিলাম পরমাদ।
ক্ষমিও দাসেরে, জগদীশ হরে,
(এই) বিকলতা-অপরাধ।

সঙ্গীত-স্বরালাপের মর্য্যাদা।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস)

সঙ্গীত-বিদ্যা অতি প্রাচীন, যখন বিজ্ঞান দর্শন ও গণিতশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে নাই, তখনও সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কারে এ দেশ মুখরিত হইত। ইহা সকল মানবের চিরন্তন ধন। কি রোম, কি গ্রীস্, কি ভারত, কি চীন যাহারই প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করা যায়, দেখা যায়, সঙ্গীতের চর্চ্চা বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। যখন কোনও বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই, তখনও ইহার বিলক্ষণ সাধনা ছিল। এই সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি জগতের সমস্ত শক্তিকে সম্মোহিত করিয়াছে। সঙ্গীতের অপরাজিতা শক্তি, কবির কবিত্ব, তার্কিকের তর্ক ও বক্তার বাগ্মিতাকে স্তম্ভিত করিয়াছে। এ জগতের শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রই সঙ্গীতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আদি কবি বাল্মীকির সঙ্গীতশক্তি না থাকিলে, লব-কুশ কি করিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার সভাসদগণকে মোহিত করিয়াছিল। প্রতীচ্যের সেক্ষপিয়ার, মিল্টন, ও এডিসন প্রভৃতি রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। হোমার দ্বারে দ্বারে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার যখন পারশ্য দেশ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় টিমথিয়স নামে একজন উচ্চ শ্রেণীর বীণাবাদক তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে, যখন তিনি বীররসের গান করিতেন, সেই সময়ে বীরপ্রবর আলেকজাণ্ডার সঙ্গীতে তন্ময় হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। আবার যখন করুণ রসের আলাপ হইত, তখন সেই বীরশ্রেষ্ঠের মস্তক নত হইয়া পড়িত, তিনি নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন। ইতিহাসে কথিত আছে, ইংলণ্ডের রাজা অ্যালফ্রেড শত্রু-শিবিরে গিয়া বীণার সঙ্গীতে শত্রুপক্ষকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের সমস্ত গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ ও তাহাদিগকে রণে পরাজিত করিয়াছিলেন। শুনা যায়, গ্রীক্ সঙ্গীতবিশারদ আরফিয়স্ যখন বীণাযন্ত্রে গান করিতেন, তখন বনের জীবজন্তু তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিত। এ দেশেও নায়ক গোপাল, হরিদাস স্বামী, তানসেন প্রভৃতি সঙ্গীত-বিশারদগণ সঙ্গীতের সাহায্যে বন্য পশুকেও মন্ত্রমুগ্ধ ও পাথর গলাইতেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। বনের কুরঙ্গকুল ব্যাধের সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। কাল ভুজঙ্গ বিবর ত্যাগ করিয়া অহিতুণ্ডিকের হস্তে অহিংস ভাবে ধরা দেয়। জলের জীব সঙ্গীতের আহ্বানে জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া আনন্দে ছুটাছুটি করে, ইহাও এক অদ্ভুত ব্যাপার। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, নবাব সিরাজদ্দৌলা বয়স্যগণ সহ যখন উদ্যানে গীতবাদ্যে রত থাকিতেন তখন দুইটি গণ্ডার তাঁহাদের গান শুনিতে আসিত, একদিন ঐ গণ্ডার দুইটি তাঁহাদের গানে এত আত্মহারা হইয়াছিল যে, নবাব তাহার একটিকে তীরের দ্বারা আঘাত করিলে সে সেইখানে নীরবে দাঁড়াইয়া প্রাণত্যাগ করে। এইরূপ পশুদের সঙ্গীতানুরাগের বিষয় অনেক শুনা যায়। আর আমরা স্রষ্টার প্রধান জীব, সেই প্রাণমাতান সঙ্গীতশাস্ত্রকে অমর্য্যাদা করিয়া তাহাকে চির অন্ধকারময় রাজ্যে নির্ব্বাসিত করিতে উদ্যত হইতেছি। মহাত্মা প্লেটো বলিয়াছেন, সঙ্গীত না জানিলে মানবের জ্ঞান সম্পূর্ণ ও সার্থক হয় না। লুথার বলিয়াছেন, যে আচার্য্য ছাত্রদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারেন না, তাঁহাকে তিনি যথার্থ আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না। প্লুটার্ক বলেন, বিশ্বনিয়ন্তা এই জগৎকে ঠিক সঙ্গীতের প্রণালীতে সৃষ্ট করিয়াছেন। সঙ্গীত ঈশ্বর-উপাসনার প্রথম ও বিশেষ সহায়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। একাধারে আনন্দ, আমোদ, বিশ্রাম ও ভগবানে বিশ্বাস লাভ করিতে হইলে সঙ্গীতকেই প্রথম সহায়রূপে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতের সঙ্গীত অতি পুরাতন। দেবতা হইতে ইহার উৎপত্তি এবং দেবতারাই প্রথম ইহা শিক্ষা করিতেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। আর সেই সময়ের লোক সঙ্গীত দেবতা-অধিকৃত মনে করিত। এমন কি সা-রে-গ-মাদি ৭টি সুরকে সাতটি দেবতার অধিষ্ঠিত বলিয়া ধারণা করিত। ষড়জ-অগ্নি, ঋষভ-ব্রহ্মা, গান্ধার-সরস্বতী, মধ্যম-মহাদেব, পঞ্চম-লক্ষ্মী, ধৈবত-গণেশ, নিষাদ-সূর্য্য। হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে পাঁচটি আর মহামায়ার মুখ হইতে একটি, এই ছয়টি রাগ প্রথম সৃষ্ট হয়। লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই ছয়টি রাগ প্রথম শিক্ষা করেন; আর ছয়টি রাগের সাধনার জন্য ছয়টি ঋতু নির্দ্দিষ্ট করিলেন যথা বসন্তে বসন্ত, গ্রীষ্মে পঞ্চম, বর্ষায় মেঘ, শরৎকালে ভৈরব, হেমন্তে শ্রী এবং শিশিরে নটনারায়ণ; তৎপরে তিনি প্রত্যেক রাগের অনুগত করিয়া ছয়টি রাগিণী সৃষ্টি করেন, আর ঐ রাগিণীগুলি প্রত্যেক রাগের ভার্য্যা বলিয়া প্রচলিত করেন। নারদ, রম্ভা, তুম্বুরু, হুহু আর ভরতকে তিনি এই সমস্ত রাগরাগিণী শিক্ষা দেন। মহর্ষি নারদ ও ভরত সঙ্গীত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। উক্ত পঞ্চশিষ্যের ভিতর প্রায় সকলেই সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহর্ষি ভরত-বিরচিত গ্রন্থের অস্তিত্ব অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে এবং উক্ত ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর আরও ৪৮টী উপরাগের সৃষ্টি করিয়া উহাদিগের পুত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট করেন। ভদ্র নামক এক নট ঐ সমস্ত গ্রন্থের শিক্ষা দিতেন, ইহা নারদকৃত পঞ্চম সারসংহিতাতে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। মহর্ষি ভরত ভারতীয় সঙ্গীতের এক প্রকার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যে কেবল সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন এমন নহে, কলা-কৌশলের যথাযোগ্য প্রয়োগপ্রণালীর প্রবর্ত্তয়িতা তিনিই। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থ এই মতের পরিপোষক।

(ক্রমশঃ)

পাতিয়ালা রাজ্যের শিল্পবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর

প্যারিসের কেমিষ্ট মিঃ জে, চক্রবর্ত্তী,

বি-এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন) এম, সি, এস (প্যারিস) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত

ফুলেলিয়া

"ক্যান্থারো ক্যাষ্টর অয়েল"

ক্যান্থারাইডিন ও ভৃঙ্গরাজযুক্ত মহোপকারী কেশটনিক।

নিত্য ব্যবহারে স্নানে স্নিগ্ধতা, সুগন্ধে প্রীতি এবং "কেশস্বাস্থ্য" লাভ। এই তেলটী কিরূপ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ তাহা শুনুন—

"আমার এই বৃদ্ধবয়সে ক্রমাগত চুল পড়িয়া যাইতেছিল, এক শিশি "ফুলেলিয়া ক্যান্থারো ক্যাষ্টর অয়েল" মাখিয়া আমার সেই চুলপড়া বন্ধ হইয়াছে। অন্যান্য অনেক তৈলের পরীক্ষা করিবার পর আপনার এই তৈলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল পাইয়াছি।"—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"গত কয়েক মাস যাবত আপনার "ক্যান্থারো ক্যাষ্টর অয়েল" ব্যবহার করিতেছি। চুলপড়া বন্ধ, মস্তিষ্ক শীতল রাখা, খুস্কি নিবারণ সম্পর্কে এই তেল মাখিয়া যে আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি তজ্জন্য আপনাকে কিরূপে সমুচিত ধন্যবাদ জানাইব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার কয়েকজন বন্ধুও এই তেল ব্যবহার করিয়া প্রভূত ফললাভ করিয়াছেন।" শ্রীকামিনীকুমার লস্কর বি-এ, এসিষ্টাণ্ট মাষ্টার, হরগোবিন্দ হাই স্কুল, শ্রীহট্ট।

বিশুদ্ধ মনোহরগন্ধ ফুলেলিয়া নারিকেল তৈল এবং ফুলেলিয়া তিলতৈলও প্রস্তুত হয়।

ফুলেলিয়া পারফিউমারী কোম্পানী,

৯।১।১ বি, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ।

৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর যাবত আবিষ্কৃত হইয়া শত-সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনা মূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা

এস, সি, রায় এণ্ড কোং

১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমি অতি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে W. C. Ray আবিষ্কৃত পাগলের মহৌষধ আমার এক পিতৃব্য ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। তাঁহার উন্মাদরোগ প্রবল হইলেই তিনি উহা ব্যবহার করিতেন এবং তাহা অগ্নিতে জলের ন্যায় কার্য্য করিত। আমি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া নির্ভয়ে প্রত্যেক উন্মাদরোগীর জন্য ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিতে পারি। ইতি—

[illegible])　　　　শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C 462

১৭৬৫ শক ২১শে ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০৩৩

১৮৫১ শক ভাদ্র

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভারতের ঋষিরা ভগবানের অভয়বাণী ঘোষণা করিয়া আমাদিগকে অভয় দান করিয়াছেন। তাঁহারা বজ্র-নির্ঘোষে বলিয়াছেন যে, ঐ আকাশের সুবিস্তৃত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নিরাকার পরব্রহ্মকে ধরিয়া থাক, এই আমাদের প্রত্যেকের আত্মার অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত নিরাকার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি কর, আর সঙ্গে সঙ্গে অভয় প্রাপ্ত হও। তাঁহারা বলিয়াছেন যে পিতামাতার নিকটে সন্তান যেমন নির্ভয়ে স্থিতি করে, তেমনি সেই অদৃশ্য ও সকলের স্রষ্টা, নিরাধার ও বিশ্বের আধার, সর্ব্বাশ্রয় ও নিরাকার পরমাত্মাকে পিতামাতা জানিয়া, তাঁহাকেই একমাত্র সুহৃৎ ও সহায় জানিয়া তাঁহার সঙ্গে নির্ভয়ে স্থিতি কর এবং সম্পূর্ণ অভয় প্রাপ্ত হও। পর্ব্বত সকল যেমন ধ্রুব, এই পৃথিবী যেমন ধ্রুব, সেই মঙ্গল-স্বরূপ পিতামাতা পরমেশ্বর আমাদের তদপেক্ষা ধ্রুবতর আশ্রয়স্থান। তিনিই আমাদের একমাত্র পরম আশ্রয় তিনিই আমাদের একমাত্র নির্ভরস্থল। সেই পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া হৃদয়ের সমস্ত ভয়ভাবনা ভস্মীভূত করিয়া ফেল। সংসার তাঁহারই সৃষ্টি—অভয়ের সন্তান তুমি—তোমায় সংসার কিসের ভয় দেখাইবে? অন্ধকারেই ভয় হয়; যেখানে অজ্ঞান, যেখানে নিজের পদক্ষেপ দেখিতে পাই না, সেইখানেই ভয়। কিন্তু যখন সেই প্রাণারামকে আমাদের আশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষ করিব; যখন দেখিব যে, তাঁহার অনিমেষ নয়ন আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের উপর জ্বল-জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে; যখন জানিব যে আমাদের জীবনের চতুর্দ্দিক তাঁহারই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, তখন আমাদের ভয় কোথায়? তখন আমরা "অভয় তো হয়ে গেছি"। তোমরা প্রত্যেকে সেই মৃত্যুর অতীত অমৃত পুরুষের সন্তান, ইহা জানিয়া অভয় প্রাপ্ত হও। সমস্ত বিভীষিকা পদদলিত কর। তোমাদের নিকটে মৃত্যু অমৃতে পরিণত হউক।

আমরা নির্ভীক হৃদয়ে আমাদের কর্ত্তব্য করিয়া চলিব; ফল সেই ফলদাতার হস্তে রাখিব—ফলের বিষয় চিন্তাই করিব না। তাঁহার কার্য্য করিয়া চলিয়াছি, এই কথাটাই মন্ত্রের ন্যায় হৃদয়ে ধরিয়া রাখিব। ফলের চিন্তা না থাকিলে ভয়েরও কোনও কারণ থাকিবে না। অতীতের ভুল ভ্রান্তির জন্য হা-হুতাশ করিবার কোনই কারণ নাই। হা-হুতাশ করিবার, নিরাশা নিরানন্দের তপ্তনিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। একদিকে অতীতের ভুলভ্রান্তি, অপর দিকে ভবিষ্যতের সমুজ্জ্বল আশা, সমস্ত অতিক্রম করিয়া একমাত্র ভগবানকে পিতামাতা জানিয়া তাঁহারই আদেশ শুনিয়া চল। সকল স্বার্থ তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া, তোমার যোগক্ষেমের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, সেই অমৃত পুরুষের কার্য্যে আপনাকে চিরনিযুক্ত করিয়া দাও। সমস্ত ভয়ভাবনা বিদূরিত হইবে। নিশ্চয় জানিও, যিনি সকল ভয়ের ভয়, তিনিই তোমার নিত্য

সঙ্গী। জীবনের প্রতি নিশ্বাসে তাঁহাকে জীবনের সঙ্গী জানিয়া নির্ভয় হও। তাঁহাকে মহান প্রভু বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ববিধাতা পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি কর; তাঁহাকে অন্তর্যামী পরমপুরুষরূপে উপলব্ধি কর; তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত সখাসুহৃৎরূপে থাকিয়া, পিতামাতার মূর্ত্তিতে জাগ্রত থাকিয়া, অনুক্ষণ তোমার মঙ্গলবিধান করিতেছেন, বিপদে আপদে তোমাকে নিজ স্নেহের বর্ম্ম-দুর্গে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারই প্রেমের নিশ্বাসে এই বিশ্বজগৎ নিশ্বসিত হইয়াছে এবং এই বসুন্ধরা জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারই জ্ঞানের একবিন্দু জ্ঞান-সিন্ধুতে পরিণত হইয়া বিশ্বজগতের অণুপরমাণুতে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাকে ছাড়িয়া অপর কোনও দেবতাকে সমস্ত হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়া হৃদয়মনকে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া নিজের অধোগতি ও বিনাশ নিজে ডাকিয়া আনিও না। তাঁহার হস্তে তোমার জীবনতরীর হালটী নির্ভয়ে ছাড়িয়া দিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপা-ইয়া পড়—তিনিই তোমাকে ঠিক পথে পরিচালিত করি-বেন। বিপদের অন্ধকার তোমাকে শতবার আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিলেও বিফল হইবে। তিনিই সমস্ত পুণ্যের, সমস্ত মঙ্গলের, সমস্ত কল্যাণের একমাত্র উৎস। সেই অখণ্ড উৎস হইতে এই সংসারের সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও মঙ্গল শতধারে উৎসারিত হইয়া বিশ্বসংসারকে আশ্চর্য্য-রূপে সিক্ত রাখিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা আসেন, ব্রাহ্মধর্ম্মকে যাঁহারা সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতির উৎস বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা নির্ভীক হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ের সঙ্গে অবলম্বন করুন এবং নির্ভীক হৃদয়ে নির্জ্জনে ও সজনে, অন্তরে ও বাহিরে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে, সকল কার্য্যে ও অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে প্রচার করিয়া নিজের ও সন্তানগণের, দেশের ও জগতের কল্যাণ সাধনে নিরত হউন। ঈশ্বরকে সকলের অগ্রে আসন প্রদান করিয়া আমাদিগকে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ যাহাতে সাধিত হইতে পারে, সেই উপায় আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। অন্য বৃথা কথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেশের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে বৃথা হাস্যে বৃথা কথায় সময় নষ্ট করিয়া আত্ম-হত্যা করিবার সময় নাই। আমাদের সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত—আমাদের কার্য্য পর্ব্বতের সমান উচ্চ এবং সমুদ্রের ন্যায় গভীর। এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে ভয় পাইও না। ভগবানের অভয়বাণী দিবানিশি আকাশ হইতে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী হইতে আকাশে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহাকে জীবনের—ইহজীবনের এবং অনন্তকালের জীবনের নিত্য সঙ্গী, প্রতি মুহূর্ত্তের সঙ্গী জানিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হও—তাঁহারই কর্ম্ম জানিয়া প্রত্যেক শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হও। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহারই প্রেরিত বীরের ধর্ম্ম জানিয়া অবলম্বন কর এবং একনিষ্ঠ ভাবে তাহা জীবনে সাধন কর। দেশের মুখ নিশ্চয়ই উজ্জল হইবে; সন্তানসন্ততি নিশ্চয়ই উন্নতি ও মঙ্গল লাভ করিবে; দেশের দুঃখ দারিদ্র্য নিশ্চয়ই বিদূরিত হইবে। পরমেশ্বর আমাদের সহায় হউন।

—

ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, তোমাকে নমস্কার।

আজ প্রায় ৩৬ বৎসর হইতে চলিল, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। আমার আগ্রহ দেখিয়া পূজ্যপাদ পিতামহদেব আমার স্কন্ধে আদিব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকীয় গুরুভার ক্রমে ক্রমে ন্যস্ত করিয়া-ছিলেন। অনেক উন্নত আশাভরসা লইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু বলিতে বড়ই দুঃখ হয় যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে বড়ই গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলাম। প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বড়ই আশা ছিল যে শত মতভেদের ভিতরেও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একতা দেখিতে পাইব এবং ব্রহ্মোপাসকদিগের সমবেত চেষ্টার ফলে ব্রহ্মোপাসনাকে কেবল ভারতবাসীর নহে, সমগ্র জগৎবাসী সকল কার্য্যেরই নিয়ামকরূপে অচিরকালেই সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিব। প্রবেশ করিয়া দেখি যে, ব্রাহ্ম-সমাজে সম্প্রীতির একান্তই অভাব। এবিষয়ে মহর্ষিদেবের সহিত আলাপ আলোচনা উপস্থিত হইলেই তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে, রাজা রামমোহন রায় কোথায় বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিবার জন্য "বিগতবিবাদং" পরমে-শ্বরের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিলেন, আর সেই বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসকগণে মধ্যে বিবাদের অন্ত নাই!

ব্রাহ্মসমাজে মনোমালিন্যের প্রাবল্য দেখিয়া কেবল আমি কেন, ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণেরও অনেকে হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইতেন এবং ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের মধ্যে মিলনের আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের মঙ্গলস্বরূপে আমি প্রাণের সহিত বিশ্বাস রাখি বলিয়াই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মিলনের আশা আমি কখনই সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করি

* গত ৩ই জানু, আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পঠিত।

নাই। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ ভগবৎপ্রসাদে আমার সেই বিশ্বাস সেই আশা সফলতা লাভ করিতে চলিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে প্রথম প্রবেশের সময় সম্প্রীতির অভাব দেখিয়া যেরূপ নিরাশার কঠোর আঘাত পাইয়াছিলাম, আজকাল সকল সম্প্রদায়ের ব্রহ্মোপাসকদিগের মিলিতভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিবার ইচ্ছা দেখিয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিতেছি। ভগবানের নিকটে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি যে. তিনি সকল সম্প্রদায়ের ব্রহ্মোপাসকগণের মধ্যে সম্প্রীতিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিয়া তুলুন; এবং তিনি আমাদের হৃদয়কে এমনভাবে গড়িয়া তুলুন যে আমরা বিগতবিবাদংএর উপাসক হইয়া সত্যসত্যই বিগতবিবাদ হই।

যে দিন পিতামাতার চরণে সম্মিলিতভাবে হৃদয়ের পূজা সর্ব্বপ্রথম নিবেদন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, এবং পরস্পরকে পরস্পরের বক্ষে টানিয়া লইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল সম্মুখের সেই ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটী অতীব পবিত্র দিন। ৬ই ভাদ্রকে আমরা ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

এই ৬ই ভাদ্রের পবিত্রভাব আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছি কি না সন্দেহ। যাঁহারা এই দিনের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভাদ্রোৎসব অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। এই দিনে কি মহান ঘটনার বীজ এদেশে রোপিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে নির্ব্বাক হইতে হয়, ভগবানের চরণে মস্তক স্বতই অবনত হইয়া আসে। আজ শতাব্দী হইতে চলিল, এই পুণ্যাহে এই দুর্ব্বল ভারতের দুর্ব্বলতম অংশ বঙ্গদেশের এক অধিবাসী রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া জগতের ভাবসাগরে এমন একটা তরঙ্গ চালাইয়া দিলেন, যে তরঙ্গ আজ সমুদয় জগৎকে স্বীয় করায়ত্ত করিবার সূত্রপাত করিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। একজন বাঙ্গালীর দ্বারা সেই তরঙ্গ প্রথমে পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে গৌরব অনুভব করিতেছি।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে ধর্ম্মের বিভিন্নতার মধ্যে মিলন আনয়ন দুঃসাধ্য। কিন্তু পবিত্র ৬ই ভাদ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বঙ্গদেশের সরস ভূমিতে উপ্ত হইবার ফলেই ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্রের হৃদয় হইতে শত শত বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে মিলন সংস্থাপনের উপায়স্বরূপে ধর্ম্মমহাসঙ্ঘের কল্পনা নিঃসৃত হইয়াছিল। যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, নব্যযুগে বঙ্গদেশের এবং ভারতের যে কোন বিষয়ে যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, এবং হইতেছে, রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহার মূল। ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল আত্মার স্বাধীনতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা না করিলে ভারতবাসী স্বামী বিবেকানন্দকে লাভ করিত কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীনতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমুদ্রযাত্রার নিষেধ-বন্ধন যদি অবলীলাক্রমে ভাঙ্গিয়া না ফেলিতেন, তবে ভারতবর্ষীয়ের উচ্চতর রাজপদে প্রবেশ লাভের প্রথম পথপ্রদর্শক সত্যেন্দ্রনাথকে অথবা বিশ্বের সাহিত্যক্ষেত্রে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথকে অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবাসীর সম্মুখে উন্নত আশার প্রথম দীপ্ত দীপধারক সুরেন্দ্রনাথকে পাইতাম কি না জানি না; জড় ও জীবের সামঞ্জস্যপ্রকাশক জগদীশচন্দ্রকে অথবা রসায়নবিদ্যার অন্যতর অগ্রণী প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইতাম কি না জানি না। এইরূপে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্থিরভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে, নব্যযুগে ভারতের যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন উন্নতি দেখিতে পাই, এবং ভারতের যে কোন সত্যসুন্দরমঙ্গল ভাব জগতের গাত্রে স্বীয় মঙ্গল চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিতেছে, সেই সকলেরই মূল পত্তনভূমি ব্রাহ্মধর্ম্ম। সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজরূপে সর্ব্বপ্রথম আবির্ভাব যে শুভদিনে, সেই শুভদিন কেবল ব্রাহ্মসমাজের কেন, কেবল ভারতবর্ষের কেন, সমগ্র জগতের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন—জগতের ইতিহাসে তাহা পুণ্যাহ নিঃসন্দেহ।

আমাদের দেশে অন্যান্য শুভদিনের ন্যায় পুণ্যাহেরও কার্য্য আরম্ভ হয় ভগবানের পূজার দ্বারা। যিনি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে, দুর্ব্বল-সবল-নির্ব্বিশেষে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যিনি সকলের পিতামাতা, ৬ই ভাদ্রের পুণ্য দিবসে তাঁহারই পবিত্র নাম যখন বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইতে সূত্রপাত হইয়াছে, তখন সেই ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহকেও আমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিবার পক্ষে তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া সেই ভগবানেরই চরণতলে আমাদের সম্মিলিতভাবে প্রতি বৎসর ভক্তিকুসুম নিবেদন করা অপেক্ষা অন্য কোন প্রকৃষ্টতর উপায় আছে কি না সন্দেহ। প্রাচ্যদিগের, বিশেষত ভারতবাসীদিগের মনের স্বাভাবিক গতিই ধর্ম্মের দিকে, তাই উচ্চ-নীচনির্ব্বিশেষে ভারতবাসীমাত্রই প্রত্যেক পর্ব্বাহে প্রত্যেক শুভদিনে সর্ব্বাগ্রে ভগবানের পূজা করিয়া তবে অন্যান্য শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

ভগবানের প্রসাদে আমরা এই পবিত্র দেশে, সত্যধর্ম্মের আদিভূমি এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এই ভারতবর্ষই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে যে, আমাদের সকল ধর্ম্মকেই, আমাদের আহার বিহার, শয়ন জাগরণ প্রত্যেক কর্ম্মকেই ভগবৎ-

কেন্দ্রক করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা স্থির জানিয়াছি যে ঈশ্বরকে সত্যসত্য হৃদয়ের দেবতা বলিয়া গ্রহণ না করিলে পরিণামে বিনাশের পথে নামিতে হয়। অনেক বিপ্লব, অনেক আঘাতের ফলে ভারতবাসী এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। জগতের ইতিহাসে পাশ্চাত্য জগত বলিতে গেলে নবযৌবনে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। তাই পাশ্চাত্য জগত সকল কর্ম্ম সকল ভাবকে আত্মকেন্দ্রক করিয়া তুলিতে তুলিতে পরিণামে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল বিগত মহাসমরে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু বিগত মহাসমরের কঠোর আঘাতেও পাশ্চাত্য জগতের অন্তর হইতে বলদর্প ধনদর্প প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রক করিবার মূল ভাবসকল তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে আশা আছে যে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধান সেই অমঙ্গলপ্রসূ দর্প চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া যথাসময়ে পাশ্চাত্য জগতকে স্বীয় মঙ্গলপথের পথিক করিয়া দিবেন।

আমাদের দেশে পুণ্যাহের সূত্রে দুইটী প্রধান কার্য্য সংসাধিত হয়—রাজা ও প্রজার পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধন, এবং প্রজাগণের পরস্পরের মধ্যে সম্মিলন ও সম্প্রীতিবর্দ্ধন। রাজাপ্রজার এবং প্রজাগণের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বিবাদ দূর করিবার এমন শুভ অবসর সহজে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মসমাজেরও পুণ্যাহে আমাদের রাজাকে চিনিয়া লইতে হইবে। আমাদের হৃদয়ের দেবতা যিনি, তিনিই যে ব্রাহ্মসমাজেরও রাজা। সুতরাং তাঁহাকে চিনিয়া লইতে, তাঁহার মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে আমাদের বেশী বিলম্ব ঘটিবে না। আমরা যাঁহাকে প্রতিদিন আমাদের হৃদয়ের পূজার্ঘ্য প্রদান করি, তিনি এক দরিদ্র বঙ্গবাসীর দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপিত করাইয়াইতো তাঁহার অনন্ত মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছেন।

পরমেশ্বরের নানাবিধ স্বরূপের বিষয়ে আমরা অনেক সময়ে আলোচনা করি, আত্মার অন্তরে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। আমরা অনেক সময়েই তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ শুনিয়াও থাকি, আর উপদেশ দিবারও চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন তাঁহার বিগতবিবাদ স্বরূপের বিষয়ে আলোচনা করি বা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি? আমরা কয়বার তাঁহার এই স্বরূপের বিষয়ে উপদেশ শুনিতে পাই অথবা উপদেশ দিবার চেষ্টা করি? এই স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা যদি বিশেষ মনোযোগ দিতাম, তাহা হইলে ব্রহ্মোপাসকগণের মধ্যে কখনই বিবাদের সম্ভাবনা আসিতেই পারিত না। উপনিষদে আছে—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি, ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়েন। কথাটীর মধ্যে একটী গভীর সত্য নিহিত আছে। ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছার সহিত যিনি আপনার ইচ্ছা, ভাব এবং নিজের অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত একযোগে যুক্ত হইয়া তাঁহার নানাবিষয়ক স্বরূপ বিষয়ে যে সিদ্ধিলাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ আমরা যদি ব্রহ্মের বিগতবিবাদ-স্বরূপে তন্ময় হই, তবে আমরাও যে অচিরে বিগতবিবাদ হইব, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? রাজা রামমোহন রায় ভগবানের এই স্বরূপটীর বিষয় অন্তরে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার তিরোভাবের পর তিনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এই বিষয় লইয়া হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে তর্কবিতর্ক লাগিয়া গিয়াছিল। ধর্ম্ম লইয়া বিবাদের উপর তাঁহার এতই বিদ্বেষ ছিল যে, একদিকে তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের নিজ নিজ শাস্ত্রগ্রন্থের প্রমাণ দিয়া ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেন, অপরদিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম ভিত্তিই এই করিলেন যে, সেখানে এমনভাবে উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, যাহাতে বিবাদের পরিবর্ত্তে লোকসকলের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করে। আমরা যদি সত্যসত্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি যথার্থ সম্মান দিতে প্রস্তুত হই, যদি আমরা ভগবানকে যথার্থ বিগতবিবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়া অন্তরে তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের অস্তিত্বই থাকিতে পারিবে না। রাজা রামমোহন আমাদিগকে যেভাবে ব্রহ্মোপাসনা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যেভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহার পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের মধ্য হইতে বিবাদ বিসম্বাদ নিশ্চয়ই চলিয়া যাইবে এবং তখনই আমাদের ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ সার্থক হইবে।

আমরা প্রত্যেকে মায়ের সন্তান; একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে প্রত্যেক মাতা, তাঁহার সন্তানগণ বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া সম্প্রীতির সহিত পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিলে কতদূর সুখী ও আনন্দিত হয়েন। প্রত্যেক মাতা যাঁহার প্রতিনিধি, আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে তিনিও কি আনন্দিত হইবেন না? বিবাদবিসম্বাদ আসিবারই বা কারণ কি? বিগতবিবাদং পরমেশ্বর যে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে আত্মার স্বাধীনতা স্থাপিত করিয়া বিবাদের মূল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। প্রকৃতিতে দেখি যে দুইটী অণুপরমাণুর ভিতর একান্ত সৌসাদৃশ্য নাই, অথচ তাহারা কেহ কাহাকে বিনাশ করিতে পারে

না—প্রত্যেকেই আপনাপন কার্য্য অবিচলিত নিয়মে করিয়া চলিতেছে। প্রকৃতি হইতেই বিশ্বজননী আমাদিগকে এই কথা স্পষ্টভাবে শিক্ষা দিতেছেন যে আমরা কেহই কাহারও সহিত একেবারে সম্পূর্ণ মিল প্রত্যাশাই করিতে পারি না—পরস্পরের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকিবেই। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা বৃথা বিবাদবিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইব? পিতার সহিত কি পুত্রই সম্পূর্ণ একমত হয়? হয় না; হইতে পারে না বলিয়াই কি পিতার সহিত পুত্র বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে? স্বামীর সহিত কি স্ত্রীই একমত হয়? হয় না; হইতে পারে না বলিয়াই কি স্বামীর সহিত স্ত্রী অথবা স্ত্রীর সহিত স্বামী চিরবিবাদে প্রবৃত্ত থাকিবে? ভগবানের সৃষ্টিতে যদি অণুপরমাণুর মধ্যে, জীবজন্তুসমূহের মধ্যে প্রভেদ ও পার্থক্য না থাকিত, তবে তো তাঁহার সৃষ্টিই থাকিতে পারিত না। তাঁহার সৃষ্টিও থাকিবে এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্যও থাকিবে। আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে, নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুর ন্যায় পার্থক্য ও বিভিন্নতার কারণে বিবাদকলহে আপনাদের বিনাশ সাধন না করি।

ঈশ্বর বিগতবিবাদং বলিয়াই আমাদের মধ্যে আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছেন। সেই আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ নিশ্চয়ই থাকিবে। কিন্তু আমাদের সেই আত্মার স্বাধীনতা আছে বলিয়াই শত শত ভেদের ভিতরেও বিবাদ আনয়নের প্রয়োজন নাই। বিগতবিবাদংএর পূজাতে বিবাদ আসিবে কেন? শ্রীক্ষেত্রে দেখি, সেখানে শতসহস্র যাত্রী বিশ্বাসের বলে সমস্ত জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিতে পারে; আর আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্রহ্মোপাসক—আমাদের কি এতটুকু বিশ্বাসের বল নাই যে আমরা বলিতে পারি যে, আমরা বিগতবিবাদং ব্রহ্মের উপাসক—আমাদের মধ্যে কিছুতেই বিবাদ বিসম্বাদ স্থান পাইতে পারে না? এখন চারিদিকেই মিলনের বাতাস উঠিয়াছে, সকলেই সেই বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়াছে, আমরাই কি কেবল আলস্যকে সম্বল করিয়া পাল নামাইয়া রাখিব? যে সকল বিষয়ে মতভেদ আসিতে পারে, অভিমানশূন্য হৃদয়ে সেগুলিকে আলোচনার জন্য পশ্চাতে রাখিয়া মাতৃমন্দিরে আসিবার সময় আমরা নির্ব্বিবাদ হইয়া আসিব। এই প্রকার নির্ব্বিবাদ ভাবে যখন সেই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের নাম ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারিব, যখন ভারতের ত্রিশকোটী সন্তান একহৃদয়ে একই মায়ের সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিবে, তখন সমগ্র জগতে কি যে অপূর্ব্ব বিরাট সাড়া পড়িবে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমাদের ভিতর হইতে হিংসা দ্বন্দ্ব চলিয়া যাক, নির্ম্মূল হইয়া যাক। হৃদয় খুলিয়া সেই পরমদেবতার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া দাও, দেখিবে প্রাণটা কতদূর সবল হইয়া উঠে।

হে পরমাত্মন্ তোমার বিগতবিবাদ স্বরূপ আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে দাও। আমাদের হৃদয় হইতে হিংসা-দ্বেষ, বিবাদকলহ বজ্রের আঘাতে বিচূর্ণ করিয়া দাও। হে বিগতবিবাদ পরমেশ্বর, তোমারই শক্তিতে আমরা শক্তি লাভ করিয়াছি। তোমাকেই জীবনের কর্ণধার করিয়া শত বিভিন্নতার মধ্যে, শত পার্থক্যের মধ্যেও যেন আমরা তোমার আদেশ সুখে বহন করি এবং তোমার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা সম্মিলিত করিয়া আমরাও যেন বিগতবিবাদ হই। তোমাকে আমাদের একই পিতামাতা জানিয়া আমরা পরস্পরকে যেন ভাল বাসিতে শিক্ষা করি। হে হৃদয়ের দেবতা আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত করিয়া আমাদিগকে ব্রাহ্মোপাসক নামের উপযুক্ত কর।

শিশুদের সঙ্গীতশিক্ষার প্রয়োজন*

(শ্রীবাণীদেবী)

শিশুদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক—তাহাদের শিক্ষার একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুমিষ্ট সুর শুনিলে শিশুদিগের মন স্বভাবতই সেই দিকে ছুটিয়া যায়। ইহা সকলেরই বোধ হয় প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে, মায়েরা সুমধুর সুরে গান গাহিলে শিশুরা কেমন সহজে ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু বে-সুরা গান করিলে তাহাদের কাণ ও প্রাণ তাহা সহ্য করিতে পারে না দেখা গিয়াছে। ভাল হাল্কা ছেলে-ভুলোনো গানের সঙ্গে শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণের সমস্ত দুঃখ দূর হয় এবং আনন্দের হাসি তাহার সমস্ত প্রাণটুকু দখল করিয়া বসে।

ছেলেরা যে সমস্ত গান শোনে সে সমস্তের ভিতর যেগুলো তাহাদের প্রাণে ভাল লাগে, সেগুলো তাহারা অনেকটা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কেমন সহজে ধরিয়া লয়। অনেক ছেলে গলার সুরের অভাবে বাহিরে গানগুলি গাহিতে না পারিলেও মনের ভিতরে গাহিতে ছাড়ে না। যাঁহাদের গৃহে ছোট ছেলে মেয়ে আছে, স্থিরচিত্তে লক্ষ্য করিতে থাকিলেই তাঁহাদের ইহা নিশ্চয়ই দৃষ্টিগোচর হইবে। সমস্ত গানটা যদি তাহারা গাহিতে নাও পারে,

* বঙ্গীয় মহিলাশিক্ষাসঙ্ঘের অধীনে ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবীর সভানেত্রীত্বে গত ১৭ই আগষ্ট ১৩৪ কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট Y. W. C. Aর মণ্ডপে পঠিত।

তবু সেই গানের কতকগুলি সুমিষ্ট সুর এক সঙ্গে করিয়া গাহিবার চেষ্টা করিতে বিরত হইবে না। আর যদি তাহারা কোন একটা গান শিখিতে পারে, তবে তাহাদের আনন্দ দেখে কে? তাহারা সেই গান ক্রমান্বয়ে আওড়াইতে আওড়াইতে গাহিতে গাহিতে একপ্রকার মুখস্থ করিয়া ফেলে।

গানের ভিতর দিয়াই শিশুরা অনেক সময়েই নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করিতে উৎসুক হয়। এই প্রকারে ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই শিশুরা বড়ই আনন্দ পায় এবং অতিশয় আত্মতৃপ্তি লাভ করে। যদি কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, শিশুরা কোন একটা হাল্কা সুরের গান কিছুক্ষণ মনোযোগ সহকারে শুনিতে শুনিতে কিপ্রকার একপ্রাণে আহ্লাদের সঙ্গে সেই গান গাহিয়া প্রাণটাকেও হাল্কা করিতে চায়, তিনিই বুঝিবেন যে, শিশুদিগের সঙ্গীতশিক্ষার প্রাধান্য দেওয়া উচিত কেন? তাহা ছাড়া দেখা গিয়াছে যে, শিশুরা পড়িতে পড়িতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে গান করিতে ছাড়িয়া দিলে তাহারা যেন বাঁচিয়া যায়—তাহাদের সে সময়ের আগ্রহ দেখে কে! আমার বেশ মনে পড়ে,—Loreto Conventএ আমি যখন পড়িতাম, অনেকক্ষণ একটানা পড়ার পর যখন শিক্ষয়িত্রী Nunরা আমাদিগকে গানের শ্রেণীতে লইয়া যাইতেন, তখন আমাদের তাহা কিরকম ভাল লাগিত। গান শিক্ষার ফলে আমরা যেন নূতন প্রাণ পাইতাম। গানের শ্রেণী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পড়িতে বসিতাম। এইরূপ দিনে দুই তিন বার শিক্ষয়িত্রীগণ গানের দ্বারা পড়ার শুষ্কতা কমাইয়া দিতে সমর্থ হইতেন। বাঙ্গালীর পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণীতে এইভাবে গান শিক্ষা দেওয়া আমাদের নজরে পড়ে নাই—শুনিতে পাই, এখন কতকটা এ বিষয়ের চেষ্টা চলিতেছে।

শিশুদের অন্তরে গানের প্রতি একটা রুচি জন্মাইয়া দিবার শৈশবই সুপ্রশস্ত সময়। এই সময় তাহাদের মন প্রাণ যাহা সম্মুখে দেখিবে তাহাই যেন গিলিবার জন্য প্রস্তুত থাকে, সুতরাং গানে রুচি জন্মাইবার এমন অবসর হেলায় হারাণো কিছুতেই উচিত নয়। এমন সময় হেলায় হারাইলে পরে তাহাদের বয়স যতই বেশী হইবে, ততই ঐ রুচি অন্তরে প্রবেশ করানো কঠিন হইবে। আজকাল যখন গান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষার অন্যতর বিষয়রূপে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে, তখন শৈশব অবধি গান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়সমূহে প্রবর্ত্তিত করিয়া বালকদিগের গানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পথ সুগম করিলে ভাল হয়।

আর একটী বিষয় আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। গানের সাহায্যে শিশুদিগের এবং বালকবালিকাদের মন ভগবানের দিকে যেমন সহজে লইয়া যাওয়া চলে, এমন আর কিছুতে নয়। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় এইটুকু বুঝিয়াছি যে, শিশুদিগকে গান শিক্ষা দিবার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য করা উচিত, যাহাতে তাহাদের মতিগতি সহজেই ভগবানের দিকে যায়। শিশুরা যখন উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করিবে তখন তাহাদেরও উচিত, সকল গানের উৎস ভগবানেরই চরণপূজায় তাহাদের ক্ষমতা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বতোভাবে নিয়োগ করা।

শৈশবে শিশুদিগকে কানের ভিতর দিয়া গান শেখানো উচিত; পড়ার মত বইয়ের ভিতর দিয়া শেখানো সঙ্গত নহে। এই তত্ত্ব আজকাল হার্ব্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি শিক্ষাতাত্ত্বিকদিগের কল্যাণে অনেকেরই নিকটে সহজ সত্য বলিয়া মনে হইলেও, আজ অর্দ্ধশতাব্দীরও পূর্ব্বে আমার পিতামহদেব স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইহা কিরূপে হৃদ্গত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়াই আমি আশ্চর্য্য হই। আমরা বাল্যকাল অবধি শুনিয়া আসিতেছি যে, পিতামহদেব তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে অতি শৈশবকালেই, বৎসর দুই তিন বয়স অবধিই, তিনি যেখানে গান শিক্ষা করিতেন, সেইখানেই শোয়াইয়া রাখিতেন এবং বলিতেন যে, উহাদের কান ঠিক করিবার জন্যই তিনি এই ব্যবস্থা করিতেছেন। ৮প্রতিভা দেবী প্রভৃতির সঙ্গীতে পারদর্শিতায় আমরা তাঁহার এই কার্য্যের সাফল্য প্রত্যক্ষ করিতেছি।

সঙ্গীতে যাঁহারা পারদর্শিতা লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন, যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ হইবার ইচ্ছা পোষণ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে নানাবিধ সঙ্গীত-কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদদিগের নিকট শুনিয়া দেখিয়া গান প্রভৃতি শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত-বিষয়ক শাস্ত্র, স্বরলিপি প্রভৃতিরও সহিত পরিচিত হওয়া উচিত। কিন্তু শৈশবেই শিশুদিগের মাথায় এগুলি হাতুড়ি পিটিয়া বসাইবার চেষ্টা করা কিছুতেই ঠিক নহে। প্রথম অবধি সঙ্গীত-কৌশল প্রভৃতি শিশুর মস্তকে ঢুকাইতে গেলে তাহার মাথার ভিতর সমস্ত গোলমালে পরিণত হইবে এবং তাহার ফলে গানের বিরুদ্ধে শিশুর বিদ্রোহী হইয়া ওঠার সম্ভাবনা আছে। ইহার বিপরীতে যদি ভাল ভাল সুরের হালকা গান শুনাইয়া শিশুর প্রাণে গানের প্রতি একটা ভালবাসা জাগাইয়া তোলা যায়, তবে সে যথাসময়ে সঙ্গীত-কৌশল শিখিবার জন্য আপনিই ঝুঁকিয়া পড়িবে। সেই ভালবাসা জাগাইবার জন্য প্রথম-প্রথম শিক্ষকের মুখে অর্থাৎ গুরুমুখে শুনিয়া এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া হালকা লয় ও সুরের গান শিক্ষা করাই শিশুর পক্ষে বিধিসঙ্গত।

এখন একটু ভাবিয়া দেখা যাক যে, শিশুদিগের জন্য কি ধরণের গান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা বলিয়াছি বটে যে, ঈশ্বরের উপাসনাই শিশুদিগের গান শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং ঐ প্রকার উপাসনাতে গানের সদ্ব্যবহার করিলে গানশিক্ষা সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু আমরা এমন কথা বলি না যে, শিশুরা কেবল ধর্ম্মসঙ্গীতই শিক্ষা ও অভ্যাস করিবে, কোন প্রকার আনন্দের বা হাসির গান শিক্ষা করিবে না। এরূপ করিলে তাহাদের মনে আনন্দের উৎস বিকশিত হইবার পরিবর্ত্তে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। শিশুদের, বালকবালিকাদের, বয়সের ধর্ম্মই হইল দুঃখবিষাদের পরিবর্ত্তে, গুরু-গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে হর্ষে আনন্দে হাসি-খুসিতে বেশী রকম গা ভাসাইয়া দেওয়া। সেই আনন্দ, সেই হর্ষ, সেই হাসি-খুসি যে সমস্ত গানে শিশুদিগের মনে ফুটিতে পায় এবং তাহাদের সরল প্রাণে নানা আকারে প্রকারে প্রকাশ পাইতে পারে, সেই সমস্ত গানও নিশ্চয়ই শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই সমস্ত গান হালকা তালের ও ছন্দের, হালকা সুরের এবং হালকা ভাষা ও ভাবের হওয়া উচিত। গুরুগম্ভীর ছন্দের গান তাহাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব মনে হয় না; দুঃখের গানও তাহাদের মনের সঙ্গে খাপ খাইবে না।

তাই বলিয়া নিধুবাবুর টপ্পাজাতীয় গান শিশুদের পক্ষে কখনই উপযোগী হইতে পারে না, প্রত্যুত সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়। এইপ্রকার গান দেহমনের স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার পক্ষে যে বিশেষ সহায়তা করে, যাঁহারা ঐ সকল গানের তত্ত্ব রাখেন, তাঁহারাই এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শৈশবে শিশুদের অন্তরে যে বীজ রোপিত হইবে, তাহাই উত্তরকালে বর্দ্ধিত হইয়া সেই বীজেরই উপযুক্ত ফল প্রদান করিবে। কুরুচিসম্পন্ন অনিষ্টকর গান শিক্ষা দিলে শিশু যৌবনে পদার্পণ করিয়া যখন বুঝিবে যে তাহার অভিভাবকেরা ও তাহার গানশিক্ষাদাতা তাহার কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছে; যখন সে বুঝিবে যে, সে ঐ প্রকার গানশিক্ষার ফলে চেষ্টা করিয়াও দুর্নীতিপরতার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, তখন সে তাহার অভিভাবক বা শিক্ষককে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না। শিশুগণ যখন ভবিষ্যতের আশা ভরসা, তখন উহাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া যে কিরূপ দায়ীত্বপূর্ণ তাহা আমাদের প্রতি পদে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমরা তাই বলি যে, শিশুসঙ্গীতে ভাল ভাব, ভাল সুর, ভাল কথা যাহাতে থাকে, তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

"সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ লাভ করিবার জন্য এবং সঙ্গীত করিয়া অপর পাঁচজনকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি মানবহৃদয় লালায়িত। পশুপক্ষীরাও যখন সঙ্গীত শুনাইতে ও শুনিতে ভালবাসে, তখন মানবাত্মাও যে তাহাতে সুখী হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?" এই ইচ্ছাকে উন্মেষ অবধি সুপথে চালিত না করিলে শিশুরা কৈশোরে ও যৌবনে পদার্পণ করিলে ঐ ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধনের জন্য কুসংসর্গে আপনাকে আহুতি প্রদান করে। সুতরাং শিশুবিদ্যালয়েই গান নির্বাসিত করিবার পরিবর্ত্তে ভাল গান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাই প্রার্থনীয়, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যায়। * এই কারণে শিশুদের মনে যাহাতে প্রফুল্ল অথচ ভাল ভাবই জাগিয়া উঠে, তাহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি কতকগুলি গান নির্ব্বাচন করিয়াছি, যেমন, "আজি প্রাণ আকুলিয়ে" "এলো বসন্ত আজিকে" ইত্যাদি। শিশুদের জন্য বিলম্বলয়ের গান কেন যে অনুপযোগী, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। দুঃখবিষাদপূর্ণ বা অন্যান্য গুরুগম্ভীর গানের ভাবই যেন উহাকে বিলম্ব-লয়ের দিকে স্বভাবতই লইয়া যাইতে চায়। ওস্তাদী গানের সুর ও লয়ের সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিয়াও এবং নিজের বিশেষত্ব রাখিয়াও বাঙ্গলা গান কিরূপে শিশুদের উপযোগী করা যাইতে পারে, পিতৃদেবের "আজি প্রাণ আকুলিয়ে" "বাঁশরী বাজায় কে" প্রভৃতি গানে তাহা সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে।

শিশুদিগকে প্রথম অবধিই বেশী উচু সুরে গান শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। আমার মনে হয় ইংরাজীতে মধ্য স্বরগ্রামের যাহাকে C সুর বলে, সেই সুরেই আরম্ভ করানো উচিত। আমাদের তানপুরার সুর ঐ ভাবেই বাঁধা থাকে। আমি দেখিয়াছি তানপুরার সঙ্গে স্বরসাধনা অর্থাৎ সা-রে-গা-মা সুরের চর্চ্চা করিলে গলা বেশ সহজে আয়ত্ত হয়। হারমোনিয়ম প্রভৃতির সঙ্গে স্বরসাধনা করিলে সাময়িক খুব চটক দিতে পারা যায়—তাহার প্রতি note বা সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিলেই চলে। কিন্তু তানপুরার সঙ্গে গাওয়া অভ্যাস করিলে গান অনেকটা সহজে আয়ত্ত হয় বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ বিনা যন্ত্রের সাহায্যে, এমন কি তানপুরারও সাহায্য না লইয়া গান গাওয়া সহজে আয়ত্ত হইতে পারে। অনেক কাল ধরিয়া ঐ মধ্য সপ্তকের ভিতরেই শিশুর স্বরসাধনা আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা বেশী উচু

* পিতৃদেব আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত "আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা ২২৩—২২৮পৃঃ দেখ। (২য় সংস্করণ)।

সুরে অভ্যাস করাইতে থাকিলে গলা খারাপ হইয়া যায়। এক সুর হইতে যে অপর সুরে যাইতে হইবে, সে সুরটী কাছাকাছি সুর হওয়া উচিত—দূরবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। সা হইতে রে বা গা বা মা-তে যায় এই রকম গান দেওয়া উচিত। কিন্তু নীচু সা হইতে একেবারে সহসা উঁচু সা বা ধা বা নি লাগে, এমন গান শিশুকে দেওয়া উচিত নয়। বেশী গিটকিরি বা গমক প্রভৃতি আছে এমন গানও শিশুদের উপযোগী নয়। চৌতাল মধ্যমান প্রভৃতি তালের গান শিশুদের অনুপযোগী। শিশুদের গানের তাল একতালা, কাওয়ালি, ঝাঁপতাল প্রভৃতি যে সমস্ত তাল কানে সহজে ধরা যায়, সেই রকম তাল হওয়া উচিত। আমরা দেখিয়াছি যে অনেক তাল theoretically খুবই কঠিন হইলেও কার্য্যত সহজে আয়ত্ত করা যায়।

একই গান দুই তিন জন মিলিয়া দুই তিন অংশে গান করাও আমার মনে হয়, প্রথম অবস্থায় শিশুদের উপযোগী নহে। প্রথম অবস্থায় সমস্ত গানটী বেশী ভাগ একসঙ্গে মিলিতভাবে অভ্যাস করাইয়া পরে পৃথকভাবে অভ্যাস করাইলেই শিশুদের পক্ষে গানটী "আদায়" বা আয়ত্ত করিবার সুবিধা হয়।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি, শিশুদের গান নির্ব্বাচনে কেবল সুর বা তালের দিকে দেখিলে চলিবে না, তাহার কথা এবং তাহার অর্থের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কথাগুলি যদি কেবলই উপদেশপূর্ণ অথবা তত্ত্বরাশিতে পূর্ণ থাকে, তাহা শিশুদের মোটেই ভাল লাগিবে না। এই কারণে দেখা যায় যে, শিশুরা গণিত বা ভূগোল প্রভৃতি সম্বন্ধে রচিত শ্লোকগুলি সহজে বরদাস্ত করিতে চাহে না। গানের কথাগুলি সহজবোধ্য হওয়া উচিত এবং তাহার ভাব এমন হওয়া উচিত, যাহাতে শিশুরা আনন্দ পায়, যাহাতে গানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রাণ তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে।

শিশুদিগকে ভাল গানই শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভাল গান শিক্ষার একটা ফল মনেতে সুরুচি আনা। শিশুদিগকে প্রথম অবধিই সভ্যভব্য ভাবেও গান গাহিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সকল শিশু সকল সময়ে যে সুরুচিসম্মত সভ্যভব্য প্রণালীতে গাহিতে থাকিবে, তাহা সম্ভব নয়। কিন্তু যে শিশু ঠিক সুরে গাহিতে পারিবে না, তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যেন সে অন্যদের গানের মাঝখানে সহসা একটা বিকট চীৎকার করিয়া না ওঠে; যদি অন্যদের সঙ্গে মিলিতকণ্ঠে সে গাহিতে না পারে, তবে তাহার পক্ষে নীরব থাকা, মুখ বুজিয়া থাকা শতগুণে ভাল। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, অন্যেরা সুস্বরে গান গাহিয়া যে আনন্দ পাইতেছে সে আনন্দে ব্যাঘাত দিবার তাহার অধিকার নাই।

উপসংহারে, আমি পুনরুক্ত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, শিশুদের মন হইতে পড়ার বা কাজের বোঝা হালকা করিবার পক্ষে গানের মত সহায় দ্বিতীয় নাই বলিলেও চলে। সকলেই তো দেখিয়াছেন যে, কোন একটা ভারী বোঝা বহিতে গেলে কুলিরা কষ্টলাঘবের জন্য গানের সুরে নানা কথা আওড়াইতে থাকে। কাজের শেষে গান করিতে থাকিলে শ্রান্তি ও ক্লান্তি সহজেই দূর হয়, এবং কাজের আরম্ভে গান করিতে থাকিলে কাজ করিবার একটা জোর পাওয়া যায়। মনের উপর গান হাওয়া খেলার কাজ করে; শিশুদের প্রাণে যে সমস্ত ভাবরাশি চাপা থাকিয়া তাহাদিগকে পীড়া দিতে থাকে, সেগুলি গানের ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায়, এবং তাহার ফলে শিশুরা শান্তি পায়। গ্রীষ্মকালের বদ্ধ উষ্মা যেমন বর্ষার বারিধারা লাভ করিয়া বাহির হইবার অবসর পাওয়ায় একটা নবোৎফুল্ল ভাব ধারণ করে, সেইরূপ শিশুদেরও প্রাণে যখন গানের অমৃতধারা নামিয়া আসে, তখন তাহাদের প্রাণের উষ্মা বাহির হইবার অবসর পাওয়ায় তাহাদের প্রাণে নবভাব জাগিয়া উঠিয়া একটা ঝরঝরে ভাব আনিয়া দেয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে যথোচিত শাসনে ও নিয়মে অর্থাৎ disciplineএর অধীনে রাখিবার গান এক অব্যর্থ উপায়। শিশুবিদ্যালয় বেশ ভালভাবে চালাইতে গেলে আমার মনে হয় সঙ্গীতবিদ্যাকে শিশুদের শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ করা উচিত। তাহাদের প্রথম বয়সে পড়াশুনার পরিবর্ত্তে আমার মতে সঙ্গীত চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বাহিরের যে সকল বিষয়ে তাহাদের প্রাণে সাড়া দেয়, সেই সকল বিষয়েই বেশী ঝোঁক দেওয়া উচিত এবং সেই সকল বিষয় যাহাতে শিশুবিদ্যালয়ে ক্ষণে ক্ষণে মধ্যে মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে খুব বেশী লক্ষ্য ও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশুদিগকে ভালরকমে সুভাব সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিলে শিশুবিদ্যালয়ের প্রাণ সজীব থাকিবে এবং শিশুরা দেহে মনে ও আত্মাতে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া উত্তরকালে যথাসময়ে জগতের মঙ্গলসাধনে ও কল্যাণবিধানে সহজে অগ্রসর হইতে পারিবে। এই সকল কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী কতকগুলি গান গ্রন্থাকারে সংগ্রহ করিলে শিশুদিগের শিখিবার এবং শিক্ষয়িত্রীর ও শিক্ষকদিগের শিক্ষা দিবার বিশেষ সুবিধা হয় ও জনসাধারণের উপকার হয়।

—

ব্রাহ্মধর্ম্মের দান।*

ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া এই ভাদ্রোৎসব যে শুভদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেই শুভ ৬ই ভাদ্র দিবসে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতির মূল ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ সর্ব্বপ্রথম এদেশে রোপিত হয়। এই কারণে ৬ই ভাদ্র আমাদের প্রিয় এবং তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবও আমাদের প্রিয়। ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্রে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অঙ্কুরিত বৃক্ষ শতাব্দী পূর্ব্বে ১৭৫১ শকের শুভ ১১ই মাঘে উত্তোলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসকদিগের পুণ্য তীর্থভূমি আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শতাব্দী পূর্ণ হইতে তো আর কয়েক মাস মাত্র বাকী। আজ শতাব্দী পরে আমাদের দেখিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে কি পাইয়াছি; দেশকে জাতিকে এবং জগতের অধিবাসীকে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি দিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবাসী এবং জনসাধারণকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দান হইতেছে সত্যধর্ম্মের এই কল্যাণপ্রদ বীজমন্ত্র—"বিশ্বস্রষ্টা, নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, স্বতন্ত্র, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, নির্ব্বিকার, পরিপূর্ণ ও অপ্রতিম পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়"। এই বীজমন্ত্রেরই উপরে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্ম দণ্ডায়মান। মানবের যাহা কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, যত কিছু শুভ অনুষ্ঠান হয় বা হওয়া সম্ভব, এই বীজমন্ত্রে সে সমস্তেরই সমাবেশ হইতে পারে।

ঈশ্বরের উপাসনাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। তাঁহার উপাসনাতেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি সন্নিবদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্মকে শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে অন্তরে ধারণ করিয়া বিশ্বপতি পরমাত্মাকে হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি সমর্পণ করিলে এবং তাঁহার আদেশ ও প্রিয়কার্য্য জানিয়া নিজের মঙ্গল এবং দেশের ও জগতের কল্যাণসাধনে নিরত থাকিলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী তাহা বলাই বাহুল্য।

উপাসনার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ হইল ভগবানকে সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রীতি করা। সেই অনন্তস্বরূপের প্রতি আমাদের প্রকৃষ্ট প্রীতিভক্তি স্বতই ধাবিত হয়। ভগবানকে বিশ্বপিতা অখিলমাতা বলিয়া প্রাণে উপলব্ধি করিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেও প্রবৃত্তি স্বতই আসিবে। ব্রহ্মপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন, উপাসনার এই দুইটী অঙ্গ ভগবৎপ্রীতিরই দুই আকার। উভয়ে এত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ যে, একটীর অভাবে অপরটী শুষ্ক ও ম্লান হইয়া মৃত্যুমুখে ঝরিয়া পড়ে।

ভগবানের পূজার জন্য বাহির হইতে ধূপধুনা পুষ্পাদি সংগ্রহেরও প্রয়োজন নাই, রাশি রাশি যাগযজ্ঞের আয়োজন, বা রাশি রাশি জীবজন্তুর বলিদানেরও ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই, অথবা প্রতিমা গঠনেরও প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মোপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ হইল তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। তাঁহাকে করুণাময় পিতা ও স্নেহময়ী জননী বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে। সরল প্রাণে সরল পথে জননীর নিকট সন্তানের ন্যায় তাঁহার অভিমুখে চলিতে হইবে। বাহিরের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখিলে আমরা অন্তরের বিষয় ভালরূপ জানিতে পারি না, দেখিতে পাই না। আমাদের মন চারিদিকে এতই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এদিকে ওদিকে এতই ছুটাছুটি করে; বাহিরের কোলাহল কলরবের সঙ্গে এতই তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে যে, আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমাদের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে পরম স্নেহময়ী জননী তাঁহার শান্তস্নিগ্ধ মূর্ত্তিতে নিত্যই অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার মধুময় ইঙ্গিতে শত দুঃখশোক, সহস্র বিপদআপদের মধ্যেও শান্তি আসিয়া আমাদের প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করে।

ভগবানের মঙ্গলবিধানে আমরা চিরকাল বাহিরের দিকে চাহিয়া আনন্দও লাভ করি না, সুখশান্তিও খুঁজিয়া পাই না। সময়ে সময়ে এমন ঘটনা আসিয়া পড়ে, যাহা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাদের দৃষ্টিকে অন্তরের দিকে নিবদ্ধ রাখিতে বাধ্য করে। আমরা যখন দুঃখশোকের কঠিন আঘাতে, বিপদ আপদের মর্ম্মভেদী প্রহারে দিশাহারা হইয়া পড়ি, এবং তাঁহারই ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া দুই মুহূর্ত্ত প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবার অবসর লাভের জন্য আকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাকি, তখন তিনি ব্যতীত আর কেহই তো এই মরণস্পৃষ্ট নরনারীকে কোলে তুলিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা দিবার জন্য অগ্রসর হয় না। তখন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জননীর শান্তস্বরূপ ও মধুর গম্ভীর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই এবং তাঁহার চরণে আমাদের মস্তক স্বতই অবনত হয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া জগতের কার্য্যসকল আলোচনা কর, যুক্তি তোমাকে শূন্যের কোটায় লইয়া যাইবে; তাঁহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া সকল বিষয় আলোচনা কর, সকলই তোমাকে পূর্ণের অভিমুখে লইয়া যাইবে।

---

* ভবানীপুর সম্মিলনসমাজে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ৯ই ভাদ্র ১০০ ব্রাহ্ম সম্বতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

তিনি বহিরাকাশেও আছেন; আবার তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটে আত্মার নিভৃততম প্রদেশেও আছেন। এই বিশ্বজগতের যতটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা, এবং তাহার যে বিরাটবিশাল অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা দৃষ্টির অতীত তাহা, সমস্তই তাঁহার মঙ্গলরাজ্য। সমস্ত বিশ্বজগতে, বিশ্বজগতের প্রতি অণু পরমাণুতে তাঁহার মঙ্গলদৃষ্টি প্রসারিত। তাঁহার আসন সর্ব্বত্র। কোটী কোটী রবিশশী গ্রহতারকামণ্ডিত দ্যুলোকে যাও, সেখানেও তিনি; লক্ষ কোটী ওষধিবনস্পতিশোভিত, লক্ষবিধ জীবজন্তুসমন্বিত এই ভূলোকই দেখ, সেখানেও তিনি। গগনস্পর্দ্ধী মেঘচুম্বী হিমালয়ের উন্নততম শিখরে উঠিয়া যাও, সেখানেও তিনি; অতলস্পর্শ সাগরগর্ভে নামিয়া যাও, সেখানেও তিনি। কনকতপনের উদীয়মান অরুণমহিমার মধ্যেও তিনি; সূর্য্যের অস্তমিত মহিমার মধ্যেও তিনি।

তুমি শুভ চিন্তা কর, তাহাও যেমন তাঁহার দৃষ্টির অতীত নয়, সেইরূপ তুমি পাপচিন্তা কর, পাপ আচরণ কর, তাহাও তাঁহার দৃষ্টির অতীত নয়। পাপ করিয়া তাঁহা হইতে লুকাইবার চেষ্টা বৃথা। তিনি জননী। তাঁহার নিকটে নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের পাপতাপ সমস্ত নিবেদন করিয়া দাও, এবং পাপ চিন্তা এবং পাপ আচরণ অতিক্রম করিবার বল ভিক্ষা কর।

তিনিই আমাদের নেতা, তিনিই আমাদের পুরোহিত। তিনি আমাদিগকে নিমেষে নিমেষে অভয়দান করিতেছেন। তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি কদাপি ভয়প্রাপ্ত হন না। তাঁহাকে যিনি জানেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না। ভুলভ্রান্তিও যদি কিছু আমরা করি, নিশ্চয়ই জানিও যে, সে সমস্তও সেই অভয়দাতা পরম পুরুষ এক অপূর্ব্ব মঙ্গলসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিবেন। অন্তরের দ্বন্দ্ববিবাদ দ্বেষহিংসা সমস্তই তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দাও। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতে সেই মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা পরম পুরুষের মঙ্গলহস্ত উপলব্ধি কর এবং শান্তিসমুদ্রে অবগাহন কর।

তিনি অনাদি। সমস্ত ব্রহ্মচক্রের আদিতে গিয়া দাঁড়াইলেও কেহ পরব্রহ্মের আদি বলিতে পারিবে না। যখন এই বিশ্বজগত গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, অন্ধকারও যখন ছিল না; মৃত্যুর উত্তপ্ত নিশ্বাসে যখন এই বিশ্বচক্র দগ্ধ হইতেছিল, মৃত্যুও যখন ছিল না, তখন একমাত্র তিনিই স্বীয় মহিমায় অবস্থিত ছিলেন। ধ্রুব পর্ব্বতসকল যখন জন্মগ্রহণ করে নাই, তখনও তিনি ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই ইচ্ছাতে পর্ব্বতসকল শক্তিলাভ করিয়া সমুন্নত মস্তকে গগন ভেদ করিতে সমুদ্যত; তাঁহারই আদেশে পর্ব্বতসকল স্বীয় জীবনের বিনিময়েও শত শত নির্ঝরিণীর সাহায্যে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া কোটী কোটী প্রাণীর জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে। সকলের আধার এই পৃথিবী যখন জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই ইচ্ছাতে কোটী কোটী ফুল্লকুসুমের বিচিত্র শোভাগন্ধে এই পৃথিবী নিত্য প্রফুল্লিত হইয়া উঠিতেছে এবং কোটী কোটী জীবজন্তুর আনন্দধ্বনিতে নিত্য মুখরিত হইয়া উঠিতেছে; এই পৃথিবীর শতবিধ ওষধি বনস্পতির ভিতর দিয়া একমাত্র তাঁহারই অনুপম প্রেম নিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। কোটী সূর্য্য কোটী চন্দ্র, কোটী গ্রহতারকসমন্বিত এই ব্রহ্মচক্র যখন জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন; জন্মগ্রহণ করিয়া এই অগণিত সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র এই সুবিশাল গগনমণ্ডলকে একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছাতে বিচিত্র বসনে বিভূষিত করিল; তাঁহারই প্রাণশক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া এই ব্রহ্মচক্রে প্রাণের উৎস উৎসারিত হইল; তাঁহারই আদেশে এই ব্রহ্মচক্রে জ্ঞান ও প্রেমের অফুরন্ত উৎসসকল খুলিয়া গিয়া প্রাণীসমূহকে দিবানিশি দেবত্বের অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে। তিনি যে শক্তি এই আকাশে বিকশিত করিলেন; তিনি যে প্রাণ, যে জীবনীশক্তি প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন, সেই শক্তি ও প্রাণ অবলম্বনে আশ্চর্য্য প্রণালীতে এই আকাশ শতখণ্ডে বিখণ্ডিত হইয়া লক্ষকোটী সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রের জন্মদান করিল। সেই সকল সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র আশ্চর্য্য প্রণালীবশে শতসহস্র লক্ষকোটী জীবজন্তুর জন্মদান করিয়া জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল।

তিনি অনন্ত। তাঁহার আদিও নাই, তাঁহার অন্তও নাই। তাই কবির সঙ্গে একহৃদয়ে প্রত্যেক মানবেরই হৃদয় হইতে এই প্রশ্ন স্বতই সমুদিত হয়—অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর? বিশ্ববিধাতারই ইঙ্গিতে এই বিশ্বজগত প্রকাশিত হইয়া মহাশূন্যে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, এবং তাঁহারই মঙ্গল আদেশে আশ্চর্য্য সুনিশ্চল নিয়মে ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—কে জানে কোথায়? এই অনন্ত স্থান ও অনন্ত কাল তাঁহারই অনন্তভাবের ছায়ামাত্র।

তিনি অনাদ্যনন্ত বলিয়াই অদ্বিতীয় ও অপ্রতিম। তাঁহার তুলনা নাই। কোনও সৃষ্টপদার্থকেই তাঁহার প্রতিমা ধরা যাইতে পারে না। কোনও মনুষ্যকেও তাঁহার পূর্ণাবতার বলা যাইতে পারে না। তাঁহার প্রতিমা কে জানে যে, সে তাহা সংগঠন করিবে? নিজে

পূর্ণ পুরুষ না হইলে কে সেই পূর্ণ পুরুষকে ধারণা করিবে? কল্পনাবলে তাঁহার প্রতিমা গড়িতে যাওয়া বা প্রতিমা গড়িয়া পূজা করা বৃথা কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করার অধিক কিছুই নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্মে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোনও বস্তুর আরাধনা করিবার অবসর নাই। ভূমা পরমেশ্বর সৃষ্টির অতীত—স্থান, কাল ও সর্ব্ববিধ সীমার অতীত। তিনি সীমার অতীত বলিয়াই নিরবয়ব ও নির্ব্বিকার। সুতরাং তিনি কোন এক ব্যক্তিতে বা জাতিতে বা দেশে বা কালে আবদ্ধ হইতে পারেন না। তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা। এই সরল কথা ভুলিয়া মানুষকে যতই শ্রদ্ধা কর না কেন, অতিপ্রাকৃত অবতাররূপে ভগবানের আসনে বসাইও না। একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অতিপ্রাকৃত বা প্রকৃতির অতীত আর কেহই হইতে পারে না।

তিনি অন্তরে বাহিরে স্বপ্রকাশ। আকাশে বাতাসে, সূর্য্যে চন্দ্রে, পুষ্পে পত্রে, ভূধরে সাগরে, গ্রহতারার নীরব গানে এবং পাপতাপের সহিত সংগ্রামে জয়লাভজনিত অপার শান্তিতে, সকলের মধ্যেই তিনি নিত্য স্বপ্রকাশ। তাঁহার সুন্দর প্রকাশ যেমন বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে, তাঁহার সুন্দরতর প্রকাশ সেইরূপ মানবাত্মার অন্তরে। অরুণতপন যখন শতবিধ বর্ণে পূর্ব্বগগন রাঙ্গাইয়া উদয়াচলে আরোহণ করে; পূর্ণিমা নিশীথে যখন চন্দ্রমা ধরাপৃষ্ঠকে জ্যোৎস্নাধবলিত করে, তখন তাহার ভিতর সাধক সূর্য্যের অন্তরাত্মা, চন্দ্রের অন্তরাত্মা ভগবানেরই আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখেন। বর্ষাগমে যখন পূর্ব্বগগন অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি দেখা দিয়া কৃষকগণের হৃদয়কে আনন্দিত করে, তখন অগ্নিতে জলেতে ও বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট পরম দেবতা একমাত্র ভগবানেরই মঙ্গলমূর্ত্তি তাহার মধ্য হইতে সাধকের সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠে। আবার যখন মানুষ শুভ কামনা করিয়া তাহাকে সফল করিবার জন্য প্রাণের সহিত ভগবানকে ডাকিয়া সাড়া পায়, তখন তো সে অন্তরে তাঁহারই মঙ্গলমূর্ত্তি জাগ্রত দেখে। মানুষ পাপতাপে দগ্ধ হইয়া দুঃখকষ্টের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তাঁহার চরণে আছড়াইয়া পড়িলে তিনি যখন তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লয়েন, তখন মানুষ অন্তরে তাঁহারই জননীমূর্ত্তি দেখিয়া শতধারে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করে।

ভগবান যে আমাদের প্রেমময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা, আমাদের প্রেম হইতেই আমরা তাহা সহজেই উপলব্ধি করি। এই প্রেমই আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে তিনি সাড়া দেন। এই প্রেম হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, তিনিই সংসারে শান্তিবিধানের জন্য সত্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; তিনিই একমাত্র অকূলের কূল, দুর্ব্বলের বল এবং অনাথের নাথ। এই প্রেমসূত্রেই তিনি আমাদিগকে তাঁহারই শক্তি, প্রীতি ও জ্ঞানের কণামাত্র দিয়াও, কেবল পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নহে, কিন্তু ইহলোক হইতে পরলোক পর্য্যন্ত এক অখণ্ড প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

শতাব্দী পূর্ব্বে ভগবদুপাসনার যে সত্যতত্ত্ব রোপিত হইয়াছিল, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্রের আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই বীজমন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম জগতবাসীকে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও মুক্তির উদারতম অমোঘ বাণী প্রদান করিলেন—"ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে। * * * ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি কালবিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে।" এই উদার বাণী ঘোষণার ফলে সমগ্র জগতের নরনারীর অন্তর হইতে আধ্যাত্মিক পরাধীনতার সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ক পরাধীনতারই শৃঙ্খল খসিবার অবসর আসিল।

এই মুক্তিবাণী পাশ্চাত্য জগতেও কি আধ্যাত্মিক, কি মানসিক স্বাধীনতা আনয়নে যে সহায়তা করে নাই তাহা বলিতে পারি না। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং ভাই প্রতাপচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ ইঁহারা ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এবং পত্রব্যবহার প্রভৃতি নানা উপায়ে এই মুক্তিবাণী বহন করিবার ফলেই আমেরিকার সেই সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মমহাসভের অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছিল। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, সেই ধর্ম্মমহাসভ জগতের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা প্রদানে ও মুক্তিসাধনে কি বিপুল সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে। পাশ্চাত্য দেশের কথা ছাড়িয়া আমাদের দেশেও দেখি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐ মুক্তিবাণী প্রদেশে প্রদেশে সবলে প্রচারিত হইবার ফলে আজ সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথে ভারতের নরনারীমাত্রেরই অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে স্ত্রীলোক ও নিম্নশ্রেণীর জাতিসমূহকে অজ্ঞান ও কুসংস্কারে ডুবাইয়া রাখিবার সর্ব্ববিধ সম্ভবপর উপায়সকল অবলম্বিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মই ঐ মুক্তিবাণী ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে মুক্তির মুক্তবায়ুতে তুলিয়া ধরিবার ব্যবস্থা করিলেন। ঐ মুক্তিবাণীর উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিলেন, কোনও নরনারীকে বেদ-বেদান্ত কোরাণ ও বাইবেল প্রভৃতি আত্মোন্নতি সাধ-

নের উপায় যাহা কিছু, সে সমস্তের আলোচনা ও অধ্যয়নাদি হইতে নিরস্ত করিবার অধিকার কাহারও নাই।

যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সম্মুখে ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ নিত্য যোগের মহাবাণী এবং স্বাধীনতা ও উন্নতির দীপ্ত দীপ ধারণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগে আজ শতাব্দী ধরিয়া সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতর দিয়া জননীর স্নেহের আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌছিতেছে। আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার আর সময় নাই। পবিত্রতার নববস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনের দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হও। নব উৎসাহে নব উদ্যমে পুণ্যের পথে অগ্রসর হও। অতীতের ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের উপযুক্ত মহত্ত্ব লাভ কর। যে সত্যের বলে বিশ্বজগত সুশাসিত হইয়া চলিতেছে, যে সত্যের বলে বিশ্বমানব ধর্ম্মের পথে, জ্ঞানের পথে ও শুভ কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, সেই সত্যের দিকে আত্মার দৃষ্টিকে স্থিরতর রাখিও। সংসারের ভয়ে তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে পশ্চাৎপদ হইও না। কথায় কথায় জনসঙ্ঘের মতে সায় দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, যাহা ভাল বলিয়া বুঝিবে, তাহাই নির্ভীক হৃদয়ে অন্তরে ধারণ করিবে এবং তাহাই নির্ভীকতার সহিত প্রকাশ করিবে। নিজের নিকট খাঁটি থাকিলে আত্মা সজীব হইয়া উঠিবে; শত বিপদের তরঙ্গ, শত দুঃখের আঘাত তোমাকে মঙ্গলের পথ হইতে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। সকল প্রকার ভয়কে পদদলিত করিয়া, সর্ব্ববিধ দীনতা ও সংশয়কে পদদলিত করিয়া নির্ভয় হও, এবং সত্যস্বরূপ ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া নূতন জন্ম লাভ কর। প্রত্যক্ষ জান যে আমরা প্রত্যেকেই সেই মৃত্যুর অতীত অমৃতপুরুষের সন্তান। আপনাকে তাঁহার সন্তান জানিয়া অভয়প্রাপ্ত হও। তাঁহার নাম দিনে নিশীথে শয়নে জাগরণে অন্তরে ধারণ কর এবং দিকে দিকে তাঁহার বিজয়-পতাকা বহন করিয়া গৃহে গৃহে নবজাগরণ আনয়ন কর।

যদি শ্রেয়ের পথে চলিতে চাও, তবে তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি সমর্পণ কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে আত্মনিয়োগ করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর। জাগ্রত ভগবানের তুমি অনুচর হইয়া থাক; তাঁহাকে করুণাময় পিতা, স্নেহময়ী জননী বলিয়া সত্যসত্য প্রাণের ভিতর উপলব্ধি কর; দুঃখকষ্টের কঠিন আঘাত পাইলে তাঁহাকেই বন্ধু বলিয়া ডাক—তোমার সমস্ত দুঃখকষ্ট সকল বিপদ আপদ কি এক অমোঘ শক্তিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাঁহার নামের গুণে তোমার তপ্তপ্রাণে শান্তিধারা বর্ষিত হইবে। তুমি সংসারে ত্রিলোকবিজয়ী হইয়া বিচরণ করিতে পারিবে। তোমার সমস্ত কার্য্যই মঙ্গলপ্রসূ ও মধুময় হইয়া উঠিবে।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

মন ভজ রে আনন্দ পরম ধন—
জননী যিনি সন্তাপনাশন।
শম দম ধর চিতে নিশি দিন রে;
স্বজন দারা সুত বন্ধু কিছু না—
শুধু তাঁহারে ধর প্রাণে অনুখন।

সন্তাপিত পরাণ তাঁরে দিয়ে
শীতল কর দেহ মন রে।
হরিপদে বিমুখ অনেক দুখ পায় রে—
কঠিন দণ্ড লভে শিরে অগণিত।
ধরি' তাঁহারি পদ লভ নিত শুভ মতি—
লভ আনন্দ প্রাণে নিশিদিন রে॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

৩ ● ১ ২´ ॥
II সা রা। গা গা গা -া। -া মা ধধা পমা। পা মা গা -া I মা রা -া গা।
ম ন ভ জ রে ০ ● ● আ০ ●● ● ন ন্দ ● ● ● ● প

৩ ● ১ ২´
। মা পা পা পা। -া মপঃ মঃ গা মা। গা ধা ধা -া I -া -া ধা ণা।
র ম ধ ন ● ● ● ● জ ● ন নী ● ● ● যি নি

৩ ০ ১ ২´
। ধা ধণা র্সর্সা ণধা I ণা ধা পা পা । পা -া পমা গা I -া -া গা মা ।
স স্তা০ ০০ ০০ ০ প না শ ম ০ ০০ ০ ০ ০ শ ম

৩ ০ ১ ২´
। গমা পধা ণা পধা I পা র্সা ণা ধা । পধা মপা ধণা ধা I পা মা গা গমা ।
দ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ম ধ ম০ চি০ ০০ তে নি শি দি ন০

।৩ ০ ১ ২´
। গমা রা রগা মপা । ধধা পমা গমা পপা । মগা রগা মমা গরা I সসা -া II
০০ ০ রে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

৩ ০ ১
{মা পা । পা ধা না -া । না না -া -া । র্সর্সা ননা ধপা ধনা I
স্ব জ ন দা রা ০ স্থ ত ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০

২´ ৩ [র্রর্সা র্সা] ১
I র্সা -া র্সা -া । র্সা র্সা -া র্সা । র্রর্সর্সা -া -া -া । -া র্সা র্সা র্সা I
০ ০ ব ০ স্থ কি ০ ছু না০ ০ ০ ০ ০ শু ধু তাঁ

২´ ৩ ০ ১
I না -া র্সা না । না -া র্সা ধা । ধনা র্সর্রা র্সা নধা । না ধা পা -া I
হা ০ রে ধ র ০ ০ ০ প্রা০ ০০ ণে অ০ মৃ থ ন ০

২´ ৩ ০ ১
I -া -া } -া মা । গমা পধা ণর্সা ধা । ণা ধা ধা -া । -া -া -া ণণা I
০ ০ ০ স স্থা০ ০০ ০০ পি ত প রা ০ ০ ০ ০ ০০

২´ ৩ ০ ১
I ধধা ণর্সা ণর্সঃ ণঃ ধা । ণা -া ধা পা । -া পা পা পা । -া -া মপঃ মঃ গা I
০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ তাঁ ০ রে দি য়ে ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I -া -া -া গমা । পধা ণা পধা পা । র্সা -া -া ণা । ধা পা -া মা I
০ ০ ০ গী০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত ন ক ০ র

২´
[ণা] ৩ ০ [গগা]
I মা গমা গমা রা । -া ররা রগা মপা । ধধা পমা গমা পপা ।
দে হ০ ০০ ০ ০ ম ন রে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

১ ২´
। মগা রগা মমা গরা I সসা -া II
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

৩ ০ ১
{ মা পা। পা ধা না না। না -া -া -া। র্সর্সা ননা ধপা ধনর্সা I
হ রি প দে বি মু খ ● ● ● ০০ ●● ●● ●●০

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা -া না। র্রর্সর্সা -া -া -া। -া র্সা র্সা র্সা I
অ নে ক দু খ পা ● য়্ রে০ ● ● ● ০ ● ক ঠি ন

২´ ৩ ০ ১
I না -া র্সা না। না -া র্সা ধা। ধনা র্সর্রা র্সা নধা। না ধা পা -া I
দ ০ ণ্ড ল ভে ● ০ ● শি০ ০● রে অ০ গ ণি ত ●

২´ ৩ ০ ১
I -া -া } -া মা। গমা পধা ণর্সাঃ ণঃ। ধাঃ ণঃ ধা ধা। -া ধা ধা ণণা I
● ● ● ধ রি০ ●০ ০০ তাঁ হা রি প দ ০ ল ভ নি০

২´ ৩ ০ ১
I ধধা ণর্সা র্সণা ধা। ণা -া ধা পা। -া পা পা পা। -া -া মপমা গা I
●● ●● ০●● ০ ● ● ভি শু ০ ভ ম্ ভি ● ● ●০ ০

২´ ৩ ০ ১
I -া গা গা গমা। পধা ণা পধা পা। র্সা -া -া ণা। ধা পা -া মা I
● ল ভ আ০ ●● ● ● ● ● ● ● ন ন্দ প্রা ● ণে

২´ ৩ ০ ১
I মা গমা গমা রা। -া ররা রগা মপা। ধধা পমা গমা পপা। মগা রগা মমা গরা I
নি শি০ ● ● ● দিন রে০ ০০ ●● ০● ●● ●● ●● ●● ০● ●০

২´
I সসা -া IIII
●● ●

মিশ্র রামকেলী—তাল ফেরতা।

জাগো সবে জাগো আজি পুণ্য দিনে
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে।
পুষ্প ফোটে পাখী জাগে ছুটে চলি' সবার আগে
পূজা দেবে চল নমি তাঁরে।
সুমঙ্গল শঙ্খ বাজে দিকে দিকে ঘণ্টা বাজে
যেথা যে বা সবে চলি' তাঁরি জয়ধ্বনি করি'
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে।

রাঙাইয়া গগনথালে, উঠছে ভানু তালে তালে,
মন আর যে রইতে নারে
ঘরের কোণের আঁধারে।
এমন মধুর সকাল বেলা কোরো নাকো বৃথা খেলা,
গীতে গন্ধে সবার মাঝে
প্রাণের দেবতা দেখবে রাজে।
পূজা দেবে চল নমি' তাঁরে॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

সুর ঝাঁকতাল

১´ ২ ৩ ॥ ১´ ২
II{ ᵍদা -া পা -াᵈ। মা গা। মা ᵍমা পা -া I পা পা পা -া। পা পমা।
আ • গো • স বে আ • গো • আ জি পু • ণ্য দি •

৩ ৩ ১´ ২ ৩
। (পা ᵍদা পমা গমা)} I পা পণা দা পপা I সা সা সা রা। গা গা। মা -া -া -া I
• নে •• •• • নে • • •• পূ জা দে • বে চ ন • • •

১´ ২ ৩
I মা গা মা পা। পণা দা। -া পমপা মগমা -া II
ন মি তাঁ • রে • • • • • • • • • • •

তেওরা

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা -া দা। না -া। র্সা -া I র্ঋা র্ঋা র্সা। র্সনা -া। র্সা -া I
পু • ষ্প ফো • টে • পা খী • জা • গে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা দা -া। না -া। র্সা -া I র্সা র্সনা র্সর্ঋা। র্ঋর্সা না। ণদা পা I
ছু টে • চ • লি • স বা• • র আ • গে •

সুর ঝাঁকতাল

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা সা রা। গা গা। মা -া -া -া I মা গা মা পা। পণা দা। -া পমপা মগমা -া II
পূ জা দে • বে চ ন • • • ন মি তাঁ • রে • • • • • • • • • •

তেওরা

১´
[নর্সা দা -া] ২ ৩ ১´ ২ ৩
II দা দা -া। না -া। র্সা -া I র্ঋা -া র্সা। র্সনা -া। র্সা -া I
সু ম • ঙ্গ • ল • শ • অ বা • জে •

১´
১´ ২ ৩ [র্জ্ঞর্জ্ঞা র্মা] ২ ৩ [-া]
I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা -া। র্জ্ঞাঃ র্ঋঃ। র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা র্ঋর্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা। র্জ্ঞর্ঋা -া। র্সা র্ঋা} I
দি কে • দি • কে • ঘ • • • ণ্টা বা • জে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা দা র্সনা। র্সা -া। নর্সাঃ র্ঋঃ I ᵍর্সা ণা -াᵈ। ᵍদা -া। পা -া I
যে থা • • যে • বা • স বে • চ • লি •

১ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা পা -া। পা -া। পা মা I পা পা ণা। ᵍদা -া। পা -া I
তাঁ রি • জ • য় • ধ্ব নি • ক • রি •

সুর ঝাঁপতাল

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা সা রা | গা গা | মা -া -া -া I মা গা মা পা | পণা দা | -া পমপা মগমা -া II
পূ জা দে ০ বে চ ন ০ ০ ০ ন মি তাঁ ০ রে০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০

তেওরা ১´ ২ ৩ [মা] ১´ ২ ৩ ১´
II {সা সা রা | গা -া | মা -া I মা মা -া | মা গা | মা -া I মা -া মগা |
রা জা ০ ই ০ য়া ০ গ গ ন্ থা ০ লে ০ উ ঠ্ ছে০

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
| মা -া | পা -া I পণা ণা দা | পদা -া | পা -া } I পর্সা র্সা -া |
ভা ০ নু ০ তা লে ০ তা ০ লে ০ ম ন ০

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
| র্সঋা -া | র্সা ঋা I পর্সা -া ণা | পদা -া | পা -া I পা পা -া | পা -া |
আ র্ যে ০ র ই তে না ০ রে ০ ঘ রে র্ কো ০

৩ ১´ ২ ৩
| পদপা মা I পা পা ণা | পদা -া | পা -া I
ণে০ ০ র্ আঁ ধা ০ রে ০ ০ ০

১´
[নর্সা] ২ ৩ ১´ ২ ৩
I {দা দা -া | না -া | র্সা -া I ঋা র্সা -া | র্সনা -া | র্সা -া I
এ ম ন্ ম ০ ধু র্ স কা ল্ বে ০ লা ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ [-া]
I র্সা র্সা র্রা | র্জ্ঞাঃ র্রঃ | র্জ্ঞা -া I র্জর্মা র্জ্ঞা -ার্ঋ | র্জর্ঋা -া | র্সা ঋা} I
কো রো ০ না ০ কো ০ বৃ থা ০ খে ০ লা ০

১´ [ণা] ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা র্সা না | ঋা -া | র্সা ঋা I পর্সা ণা দা | পদা -া | পা -া I
গী তে ০ গ ০ ন্ধে ০ স বা র্ ম' ০ ঝে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা পা -া | পা -া | পা মা I পা ণা ণা | পদা -া | পা -া I
প্রা ণে র্ দে ব্ তা ০ দে খ্ কে রা ০ জে ০

সুর ঝাঁপতাল

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা সা রা | গা গা | মা -া -া -া I মা গা মা পা | পণা দা | -া পমপা মগমা -া II II
পূ জা দে ০ বে চ ন ০ ০ ০ ন মি তাঁ ০ রে০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০

মনুষ্যত্বের বিকাশে প্রকৃত শিক্ষা।

(২)

(শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত, বি-এল)

এক্ষণে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার সাধারণ দোষ দেখাইয়া প্রকৃত শিক্ষার আভাস দিতে প্রবৃত্ত হইব।

দেশের স্কুল-কলেজগুলিতে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিচর্চ্চার ব্যবস্থা নাই। শিক্ষার্থিগণ চরিত্র-গঠন পক্ষে কোনও প্রকার সাহায্য পায় না। কেবল বুদ্ধিপরিপুষ্টির ব্যর্থপ্রয়াস ব্যতীত আধুনিক শিক্ষায় আর কিছুই লক্ষিত হয় না।

গুরুগৃহ বলিয়া এখন কোনও পদার্থ নাই। গুরুশিষ্যে প্রাণমন আদানপ্রদানের কোনও সুযোগ নাই। আচার্য্যের সহবাসে ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনাদির দ্বারা দেহমন শুদ্ধ করিবার উপায়সকল আর অবলম্বিত হয় না; তাহার ফলে দেশে ভগবৎপরায়ণতা, সার্ব্বজনীন প্রেম, স্বদেশ-প্রীতি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণসমূহ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে চলিয়াছে এবং ঘোর অধর্ম্ম, স্বার্থপরতা ও ক্লৈব্য প্রভৃতি বৈগুণ্য লোকের হৃদয় অধিকার করিতে বসিয়াছে।

অপর পক্ষে স্কুলকলেজের এই শিক্ষা লোককে সংসারের উপযোগী করিতেছে না, জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার ক্ষমতা দিতেছে না। তথাকথিত শিক্ষিত যুবক কলেজ ছাড়িয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যেন অকূল সাগরে পড়িতেছে এবং সময় হারাইয়া বুঝিতেছে যে আত্মাদরই শিক্ষা করিয়াছে, আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করে নাই।

এখন প্রতিকারের উপায় কি?

প্রাচীন ঋষিগণের সময় শিক্ষার্থিগণের গুরুগৃহবাসের যে ব্যবস্থা ছিল—পাশ্চাত্যদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক ও ছাত্রগণের একত্র অবস্থানের ব্যবস্থা যাহার অস্পষ্ট ছায়ামাত্র—তাহার পুনঃপ্রবর্ত্তন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

এই গুরুগৃহে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণ এবং নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ-শিক্ষকগণ (অধিকাংশ স্থলেই স্বামী-স্ত্রী একত্রে) সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া এবং "আচিনোতি চ ধর্ম্মার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি, স্বয়মাচরতে যস্মাত্তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে"—আচার্য্যের এই লক্ষণ সার্থক করতঃ ছাত্রগণকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া যাহাতে তাহারা ব্রহ্মচর্য্য-পালন ও সুশিক্ষা-লাভ করিয়া সংসারের জটিল কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী হয় তাহার জন্য ব্রতী থাকিবেন; এবং যাহাতে শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের যথাযথ অনুশীলন দ্বারা আত্মজীবন, গৃহস্থজীবন ও সঙ্ঘজীবন সার্থক করতঃ আদর্শ মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হয়, সেবিষয়ে বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী, তাহারা যাহাতে বর্ণাশ্রমের আচার ও অনুষ্ঠানগুলি শ্রদ্ধাপূতচিত্তে পালন করিয়া চতুর্ব্বর্গলাভের অধিকারী হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

এখানে আচার্য্যগণ মাতার ন্যায় সস্নেহে ও সযত্নে শিক্ষার্থিগণকে লালনপালন করিবেন এবং নিজেদের আদর্শে যাহাতে তাহারা নিজ জীবন গঠন করিতে পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

কেবল লেখাপড়া শিখানই এইরূপ আশ্রমের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে শিক্ষার্থিগন শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়া নিজের, সংসারের ও সমাজের উন্নতিসাধন পূর্ব্বক সুখী হইতে পারে আচার্য্যগণ তাহার চেষ্টা করিবেন; কারণ, "সা হি নাম পরা শিক্ষা যয়া জীবঃ সুখী ভবেৎ।"

এখানে ছাত্রগণের উপর পুস্তকের বৃথা ভার চাপান হইবে না; অধিকাংশ সময়ে মুখে মুখে প্রকৃতির সহবাসে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইবে এবং সে শিক্ষা যাহাতে ছাত্রগণের ভবিষ্যতে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী হয় এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয়ের পূর্ণবিকাশে সমর্থ হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে।

বর্ত্তমানে বিদ্যালয়সমূহে কেবল স্মরণশক্তিরই প্রধানতঃ অনুশীলন হইয়া থাকে, কিন্তু মানসিক শক্তিগুলির বিকাশ সাধন করিতে হইলে কেবল পুস্তকপাঠ করিলে চলিবে না। প্রথমতঃ চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির সুব্যবহার দ্বারা শিক্ষার্থিগণ যাহাতে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি লাভ করিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এজন্য বস্তুসহযোগে শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তার পর প্রকৃতির ঘটনাগুলির পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যাহাতে তাহাদের কারণানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মে তদ্রূপ চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষার্থিগণকে সহজ বিষয় স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অবকাশ দিতে হইবে। এই প্রকার প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনা লইয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহাদের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়া পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তাশক্তির বিকাশসাধন করিতে পারিলে মানসিক বৃত্তিগুলি উৎকর্ষ লাভ করিবে এবং শিক্ষার্থিরাও এরূপ শিক্ষায় বিশেষ আনন্দ লাভ করিবে।

এখানে অযথা প্রয়োজনবৃদ্ধি বা অভাবসৃষ্টি না করিয়া বিলাসিতা পরিহার পূর্ব্বক আত্মনির্ভর অবলম্বন করিয়া সংসার পরিচালনোপযোগী শিল্পকর্ম্মাদি ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় শিক্ষা দ্বারা, পরে যাহাতে শিক্ষার্থীরা শান্তিময় ও শান্তিপ্রদ জীবন যাপন করিতে পারে, সেইভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইবে।

এই আশ্রমগুলি সংসারের অনুরূপ হইবে, অর্থাৎ সংসারের যে সকল বিষয়ে মানবসন্তানকে সচরাচর নিযুক্ত থাকিতে হয়, সেই সকল বিষয়ে কার্য্যতঃ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এই সকল আশ্রমে কৃষিক্ষেত্র, শিল্পাগার, সমবায়-ব্যবসা এবং ব্যাঙ্ক ও নানাবিধ ব্যবসাবাণিজ্যের আদর্শ অনুষ্ঠান ইহার সহিত সংযুক্ত থাকিবে; এবং সেই সকল অনুষ্ঠান পরিচালন দ্বারা শিক্ষার্থিগণ হাতে কলমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জন করিবে এবং সংসারে প্রবেশ-পূর্ব্বক নিজ নিজ অবলম্বিত অনুষ্ঠানগুলি উত্তমরূপে চালাইবার উপযোগী করিয়া নিজ নিজকে গঠন করিয়া লইবে; ফলতঃ যাবতীয় সাংসারিক ব্যাপারের জ্ঞান ও কর্ম্ম-কেন্দ্রস্বরূপ এই আশ্রমগুলি গঠিত হইবে।

শিক্ষার্থিগণ ভবিষ্যতে যাহাতে আদর্শ গৃহী হয়, সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে স্ত্রীপুরুষ বুঝিতে পারেন যে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ এবং পরস্পর পরস্পরের শ্রেষ্ঠ সখা এবং উভয়কে মিলিয়াই ব্যক্তিগত, সংসারগত, জাতিগত ও মনুষ্যগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আনয়ন করিতে হইবে, এইভাবেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা উপযুক্ত পিতা ও মাতা হইয়া উত্তরোত্তর মনুষ্যত্বের উৎকর্ষসাধন করিতে পারে তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। এইরূপ শিক্ষাপ্রচারের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনা যায়। ইহার সার্থকতা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া কিছুদিন পরীক্ষা না করিলে বুঝা যাইবে না। সেইজন্য ইহার বিরুদ্ধবাদীদের মতের বিস্তৃত আলোচনার বিশেষ আবশ্যক নাই। তথাপি যেভাবে দুই চারিটি সাধারণ আপত্তির কথা উঠিয়াছে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করতঃ ইহা কি ভাবে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, তৎসংক্রান্ত নিয়মাদির একটা আদর্শলিপি দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথম আপত্তি এই যে, ইহা অন্ধভাবে ভারতের অতীতের অনুকরণমাত্র। অতএব যে অতীত ভারতের এই দুর্দ্দশা আনিয়াছে তাহার অনুকরণে আরও ঘোরতর দুর্দ্দশা আসিয়া পড়িবে। ভারতের অতীত কি ছিল এবং তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ অংশ এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশার জন্য দায়ী তাহা নিরপেক্ষ গবেষণার জন্য এপর্য্যন্ত কোনও লোক নিযুক্ত নাই এবং সেরূপ গবেষণাও হয় নাই। যতদিন তাহা না হয় ততদিন ভারতের অতীতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া কোনও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না। সেইজন্য ভারতের অতীতের যে ক'টি সনাতন মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সেই মূলসূত্রগুলি এই :—

(১) এক অবাঙ্মনসগোচর অব্যক্তের পরিদৃশ্যমান ব্যক্তাবস্থার ব্যষ্টিভাবের উৎকর্ষসাধন করিতে যাইয়া যেন সমষ্টির হানি না হয়। (২) সেই অব্যক্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া তাঁহাতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নিজ নিজ ঋজুকুটিল পথ বুঝিয়া তত্তৎপথে দৃঢ়সঙ্কল্পে যাওয়াই স্বধর্ম্মপালন এবং সেই স্বধর্ম্মপালনেই অর্থকামমোক্ষ অর্জ্জন করাই মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা। (৩) অব্যক্তের বিকাশের (অর্থাৎ সৃষ্টপদার্থের) মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও তাহারা পারমার্থিক হিসাবে যে এক (অর্থাৎ তাহারা এক হইতে উদ্ভূত, একে অবস্থিত এবং একেই লয় প্রাপ্ত)—এই চরম সত্যের উপর ব্যবহারিক অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জাগতিক ব্যাপার স্থাপন করাই অতীত ভারতের লক্ষ্য এবং প্রস্তাবিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রাণ। (৪) অন্নময় কোষের সমস্যা খুব কঠিন ও ব্যাপক হইলেও তৎপূরণে সর্ব্বশক্তি নিযুক্ত রাখিলে এবং নানাভাবে নানারূপে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই জীবনের লক্ষ্য করিলে মানব চিরদিনই অপর জন্তুস্তর হইতে উচ্চে উঠিতে পারিবে না। সেই জন্য অন্নময় কোষের উন্মেষ ও চরিতার্থতাকে যতদূর সম্ভব সংযত করিয়া, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের উন্মেষে এবং চরিতার্থতায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ এবং মানবের ভূমানন্দ-ভোগ সম্ভব হইবে।

যদি এই সনাতন সত্যের উপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে যাইয়া অতীতের অন্ধ অনুকরণ দোষে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইতে হয় এবং জগৎবরেণ্য রবীন্দ্রনাথের "অচলায়তন" এবং বিশ্ববিশ্রুত স্কটের "Dwindle sons of little men"এর দোষ আমাদের মস্তকে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে সেই গ্লানির ভার বহন করিয়াই আমাদের গন্তব্য পথে ধীরে ধীরে দোষ গুণ বিচার করিতে করিতে চলিতে হইবে। নিন্দা ও স্তুতিবাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিস্তার উদ্দেশ্যে এবং সত্যশিবসুন্দরের বিকাশ প্রকট করিতে করিতে সচ্চিদানন্দময়ের বিকাশসাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে; 'নান্যঃ পন্থা অয়নায়'।

বাঙ্গালীর আত্মদ্রষ্টা মহাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে যে পথনির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই আমাদের অবলম্বনীয়। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি ভারতের অতীত সাধনার উপর ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা করিতে যাইয়া শাস্ত্রাদির নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহার ভিতরে যে সার্ব্বজনীন সত্য আছে তদনুসারে সমাজের স্থূল ভিত্তি এক্ষণে স্থাপন করিতে হইবে, ইহাই

তাঁহার মহান্ উপদেশ। তদনুসারে এই শিক্ষাপদ্ধতি গঠন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাহাতে সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে কি না তাহা মনীষিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

আর একদল আছেন যাঁহারা বলেন যে প্রথমাবস্থায় ইংরাজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় ইংরাজের এখানে শাসনকর্তৃত্বহিসাবে অবস্থানরূপ বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে কখনও সুফল হইতে পারে না। সেইজন্য বাল্যকাল হইতে ইংরাজীশিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। আর বাল্যকাল হইতে ইংরাজীশিক্ষার বিধান না করিলে পরে ভাল করিয়া ইংরাজীশিক্ষা সম্ভব হয় না। তাঁহারা আরও বলেন যে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে স্বদেশী ভাষার সহিত শৈশবকাল হইতেই অপর আর একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে এবং সেইরূপ ব্যবস্থার ফলে জাতিগত ঈর্ষা-দ্বেষ হ্রাস হয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলনকল্পে বাস্তবিক হিসাবে ইংরেজশাসনকর্তৃত্ব উপেক্ষা করা হয় নাই। উহা যে আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমাদের আত্মোদ্বোধনের, এবং আত্মচরিতার্থতার বিশেষ প্রতিকূল ইহা স্থির বুঝিয়াই তাহার প্রতিকূলাচরণের দোষ-নিবারণার্থে তাহার সহযোগিত্ব অস্বীকার করিয়াই ইহাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। যখন সমাজের প্রাণসঞ্চার হইবে এবং সমাজ আত্মস্থ হইবে তখন বৈদেশিক শক্তির সহিত আদানপ্রদানের কথা উঠিতে পারে। এক্ষণে তাহা করিতে যাইলেই জীর্ণ শীর্ণ প্রাণের ধ্বংসের গতি আরও দ্রুত চলিতে থাকিবে।

বাল্যকাল হইতে ইংরাজীশিক্ষা না করিলে যে ইংরাজীশিক্ষা লাভ ভাল হয় না ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ মাতৃভাষা ভালরূপ শিক্ষা হইলে অপর একটি ভাষা শিক্ষা সহজ হয়। ইহার প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় যে অনেক ইংরেজ এখানে আসিয়া অল্পদিনে বাঙ্গলাভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহাও দেখিয়াছি যে সমস্ত বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করার পর শেষ দুই বৎসর মাত্র ইংরাজী বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ মেধাবী ছাত্র না হইয়াও উত্তমরূপে প্রবেশিকা (matriculation) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ইউরোপ বা আমেরিকাপ্রদেশে শৈশবে যে বিদেশী-ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানের ফলে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে এই শিক্ষাপদ্ধতির অনুরূপ শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইলে পর বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা তৎ তৎ স্থানে আছে। সে যাহা হউক, অনাত্মস্থ ক্ষীণপ্রাণ প্রবল রাজশক্তিপ্রত্যাহত ও তাহার আপাততঃ উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ ভারতের পক্ষে শাসকের ভাষা শৈশবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে আত্মোদ্বোধনের ব্যাঘাত ঘটিবে ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যায়।

আর একদল বলেন যে, যাঁহারা প্রচলিত শিক্ষার বিরোধী তাঁহারা সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতির একটা আদর্শ দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন নাই এবং এযাবৎ যাহা করিয়াছেন তাহা বর্তমান শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ মাত্র। ইহা খুব যুক্তিযুক্ত সমালোচনা এবং ইহা যে আমি অন্তরে অন্তরে অনেক দিনই অনুভব করিয়াছি তাহার প্রমাণ এই যে, আমি এই দোষ পরিদর্শনপূর্ব্বক ১৯১২ সালে জাতীয় শিক্ষাপরিষৎকে একখানি পত্র দিয়াছিলাম। তাহা আমার প্রণীত Educational Problems নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ছাপা হইয়াছে; যাহা হউক, সেই দোষ পরিহারকল্পে আমি এই পনর বৎসরকাল প্রাণপণ প্রয়াস ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াও জাতীয় জীবনসঞ্চারের এই প্রধানতম কার্য্যে কিছুই অগ্রসর হইতে পারি নাই। সেই জন্যই এক্ষণে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সম্মুখে আমার মতামত লইয়া উপস্থিত হইলাম। ভরসা এই, যদি তাঁহারা ইহাতে মঙ্গলের ও সত্যের বীজ নিহিত আছে বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই বীজের উন্মেষসাধন করতঃ ছায়াপ্রদ মহামহীরুহের আবির্ভাব সাধন করিতে কখনই বিরত থাকিবেন না। যাহা হউক, অত্র লিপিবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে, যে ইহা প্রচলিত শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ নহে। অনেক স্থলেই মূলতঃ তাহার সহিত বিসদৃশ; যে সকল সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে তাহা সকল শিক্ষার অঙ্গ বলিয়াই স্থান পাইয়াছে, অন্ধ অনুকরণার্থ নহে।

এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন কার্য্য কত আয়াসসাধ্য ও কত ব্যয়সাপেক্ষ তাহা মনে করিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তবে মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। বিশেষতঃ আমরা যে দুরবস্থায় এক্ষণে পতিত, তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে আমাদের পক্ষে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে বিরত থাকিলে চলিবে না। অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে সামর্থ্য অনুসারে পদবিক্ষেপ করতঃ শক্তিসামর্থ্য ও অর্থসঞ্চয় করিতে করিতে এই মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিতেই হইবে। নচেৎ ভারতের মরণ অবশ্যম্ভাবী।

'এগ্রিকালচারেল কমিশনে' আমি যে মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলাম তাহাতে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই, ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহাতে আরও বলিয়াছিলাম যে ইহার প্রাথমিক বিভাগে যে শিক্ষা তাহা জল বায়ু আকাশের ন্যায় সকলের পক্ষে মুক্ত ও সুলভ করিবার জন্য ইহার যাবতীয় খরচের $\frac{3}{4}$ অংশ ষ্টেট হইতে দিয়া এবং $\frac{1}{4}$ অংশ স্থানীয় লোকদিগের

নিকট হইতে লইয়া অবৈতনিক হিসাবে ভারতের প্রতি শিশুর জন্য ব্যবস্থা করা ষ্টেটের অবশ্য কর্ত্তব্য। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও না বলিয়া থাকা যায় না যে সেই মন্তব্য 'এগ্রিকালচারেল কমিশনের' মন্তব্যের প্রতিকূল বিধায় কমিশনের মুদ্রিত অংশে তাহা স্থান পায় নাই। যাহা হউক, আর স্থির হইয়া বসিবার মুহূর্ত্তমাত্র সময় নাই। ভারতের কল্যাণেচ্ছু মাত্রেরই প্রাণপণে এই কার্য্যে লাগিয়া যাইতে হইবে। নিজ নিজ বিশিষ্ট মতবাদ ফুটাইবার অবকাশ রাখিয়া সাধারণ মতানুসারে নির্দ্ধারিত কার্য্যে সকলে একদেহে একমনে ও একপ্রাণে না লাগিলে ভারতের তথা জগতের মঙ্গলের সূচনা হইবে না।

ভারত যদি আজ স্বাধীন থাকিত তাহা হইলে এই কার্য্য ষ্টেট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সুসম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমরা হতাশ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের প্রত্যেককেই এই বিরাট ব্যাপার গঠন করিতে নিজ নিজ শক্তিসামর্থ্য অনুসারে কায়মনোবাক্যে লাগিয়া যাইতে হইবে। এইরূপে যদি একদিন ভারতের জীবনীশক্তি প্রবল হইয়া উঠে তবেই ভারতের মুক্তিলাভ ও জগতের শান্তিলাভ ঘটিবে, নচেৎ নহে।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ (৪)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৮৯ শক, অগ্রহায়ণ—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—" যেদিন * * * মহাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটী সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন সেইদিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভ্যুদয় হইল"।

১৭৯১ শক, ফাল্গুন—মাঘোৎসবে তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"যে দিবস * * * ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়, সেই দিবসকে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য আমরা * * * এই ১১ই মাঘ * * * একত্রিত হই। * * * চত্বারিংশৎ বৎসর গত হইল * * * এখানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে"।

১৭৯২ শক ফাল্গুন—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে উপদেশ দেন, তাহাতে আছে—"১১ মাঘ ইহারই জন্য স্মরণীয় যে, সকল প্রকার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলাম"।

১৭৯৩ শক ফাল্গুন—শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতায়—"অদ্য দ্বাচত্বারিংশ বৎসর হইল, বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে"।

"শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন—অদ্য আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ দ্বাচত্বারিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া নববর্ষে প্রবিষ্ট হইতেছে"।

১৭৯৪ বৈশাখ—"আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ দ্বাচত্বারিংশ বৎসর অতিক্রম করিলেন।"

১৭৯৫ ফাল্গুন—"গত ১১ মাঘ শুক্রবার চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ"।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন—"চতুশ্চত্বারিংশ ব্রাহ্মসমাজ উন্নত রহিয়াছে"।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ বলিলেন—"অদ্য এই ব্রাহ্মসমাজের চতুশ্চত্বারিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল।"

১৭৯৬ ফাল্গুন—শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"এই পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষকাল প্রতি বৎসর ১১ মাঘে ব্রাহ্মগণ * * * উৎসাহিত করেন।"

১৮০৪ ফাল্গুন—পাথুরেঘাটানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন—"অদ্য ব্রাহ্মসমাজ ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষে পদনিক্ষেপ করিতেছে"।

১৮০৮ চৈত্র—"সাধারণ সমাজের অন্তর্গত ছাত্রসমাজের অভিনন্দন-পত্র—ব্রাহ্মাব্দ ৫৮, ১৭ মাঘ" এই বৎসর মহর্ষিদেবের "উপহার" প্রকাশিত হয়।

১৮১৩ চৈত্র—"হরিসেনামণ্ডলী কর্ত্তৃক" শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের প্রতি প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তর—১০ই ফাল্গুন ৬২ ব্রাহ্মসম্বত, ১৮১৩ শক।

১৮১৮ আষাঢ়—ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"রামমোহন রায় * * * ১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।"

১৮২৮ আশ্বিন—শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন—"১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া ইহা স্মরণ করিলে পরমানন্দ পাইবেন।"

১৮৩৭—মাঘ—ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—"অবশেষে ঘটনাবশে চিৎপুর রোডের উপর জোড়াসাঁকোস্থ ফিরিঙ্গি কমললোচন বসুর বাটী (বর্ত্তমান আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের সম্মুখস্থ বাটী) ভাড়া লইয়া স্বদেশীয়দের প্রথম ব্রহ্মসভা সংস্থাপিত হইল। ১৭৫০ শকে ৬ই ভাদ্র * * * ব্রাহ্মসমাজের আদিমতম ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।"

"১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ অবধি * * * নূতন গৃহে

সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল"। "১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী ব্রহ্মসভার জমিখণ্ডের ক্রেতাগণ ইহাকে ট্রষ্ট সম্পত্তি করেন।"

১৮৪০ আশ্বিন—'ভাদ্রোৎসবে ব্রাহ্মসম্মিলন' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লেখেন—"১১ মাঘ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী গৃহ প্রতিষ্ঠার দিন বলিয়া ঐ পবিত্র দিনটী ব্রাহ্মসাধারণের মাঘোৎসবের দিন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৬ই ভাদ্রে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনার সূত্রপাত হয়। ঐ দিনটীর গৌরব স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে ভাদ্রোৎসব হইয়া থাকে।"

১৮৪৪ ভাদ্র ও আশ্বিন—ব্রাহ্মসম্বৎ সম্বন্ধীয় পত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় লেখেন—"ব্রাহ্মসমাজের জন্মাব্দের গণনা সম্বন্ধে আমার মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইয়াছে * * * সম্প্রতি নানাস্থানের ব্রাহ্মমণ্ডলীতে ভাদ্র মাসে ভাদ্রোৎসব হইতেছে। * * * তাহার কারণ, ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসের ৬ষ্ঠ তারিখেই প্রথমে ব্রহ্মোপাসনাসভার প্রতিষ্ঠা হয়। * * * ১৭৫০ শকে ৬ই ভাদ্র যে উপাসনাসভার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাই ব্রাহ্মসমাজের মূল উৎস। * * * ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসকে ব্রাহ্মসমাজের জন্মের সময় বলিয়া গণনা করিলে, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মাব্দ ৯৪ হয় এবং আগামী ভাদ্র মাসের ৬ষ্ঠ তারিখ হইতে ব্রাহ্মাব্দ ৯৫ গণনা করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার প্রতিনিধি—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং তত্ত্বকৌমুদীতে ব্রাহ্মাব্দ ৯৩ লিখা হইতেছে। আরও বিবেচ্য এই যে, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং তত্ত্বকৌমুদী মাঘোৎসবের পর হইতে এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বৈশাখ মাস হইতে ব্রাহ্মাব্দের গণনা করিতেছেন।"

ইহার উত্তরে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে—"১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্রে প্রথম উপাসনাসভা সংস্থাপিত হয় বটে, কিন্তু তাহাও ইউনিটেরীয়দিগের সভাগৃহের ন্যায় ভাড়াটিয়া স্থানে হওয়াতে ঐ সভার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সংশয় ছিল। ঐ তারিখ ধরিয়া যদি ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করিতে হয়, তবে অ্যাডাম সাহেবের সহিত মিলিতভাবে যে সময়ে উপাসনাসভা হইয়াছিল, তাহা ধরিয়াই বা ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করা হইবে না কেন? ভূমি ক্রয় করিয়া তদুপরি নবনির্ম্মিত গৃহে যখন ব্রহ্মসভা স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই অবধি ধরিয়াই ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করা আমাদের মতে বিধেয়। এই হিসাবেই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যেরা ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করিয়াও আসিয়াছেন। এই গণনা যখন প্রথম অবধি স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে, তখন কোন বিশেষ কারণ বিনা এই গণনা পরিবর্ত্তিত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

"লেখক বৈশাখ হইতে বৎসরগণনা সম্বন্ধে যে আপত্তি তুলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়—ধর্ম্মসম্প্রদায় হউক, বা রাজনৈতিক সম্প্রদায় হউক বা অন্য কোন সম্প্রদায় হউক—নিজ নিজ প্রতিষ্ঠার দিন অবধি নূতন বৎসর গণনা করিতে থাকিলে নানা বিষয়ে বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি করা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সমস্ত ভারতে যখন ১লা বৈশাখ হইতে নববর্ষ ধরা হয়, তখন অন্য কোন দিন হইতে নববৎসর গণনা করিয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা যুক্তিসঙ্গত নহে। * * * যতদূর সম্ভব দেশের ভাবধারার সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া কাজ করিলেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অধিক।"

১৮৪৯ ভাদ্র—"ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকথা," শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখিত—"রাজা রামমোহন রায়ের জীবদ্দশায় চিৎপুর রোডস্থিত কমললোচন বসুর বাটীতে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র তারিখে প্রকাশ্য ব্রহ্মোপাসনা হয়। * * প্রাগুক্ত ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার তারিখে শ্রদ্ধেয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সহিত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অপর ষোলটী ব্যাখ্যান ঈশান বাবু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ বাহির করেন।......

"১৭৫১ শকের ১১ মাঘ তারিখে বর্ত্তমান আদি-ব্রাহ্মসমাজ গৃহের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ দিন হইতে গণনা করিয়া বার্ষিক উৎসবের সংখ্যা বর্ত্তমানে নিরূপিত হইয়া থাকে। রামমোহন রায় তৎপূর্ব্বে আত্মীয়সভা নামে একটী সভা—১৭৩৭ শকে স্থাপিত করেন। ঐ আত্মীয় সভাতে উপনিষদাদি পাঠ ও সঙ্গীতাদি হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ আত্মীয়সভাই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সূচনা। আদিব্রাহ্মসমাজগৃহ স্থাপনাবধি উহাতে প্রথম অবস্থায় আত্মীয় সভার অনুরূপই পাঠ ও সঙ্গীত হইতে আরম্ভ হয়। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি বলি যে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র হইতে ব্রহ্মোপাসনার সূচনা হয় নাই, উহার পূর্ব্ব হইতেই আত্মীয়সভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে উহা অসঙ্গত হয় না। * * "১৭৩৫ শকে রংপুর হইতে রাজা কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। * * * ১৭৩৭ শকে রাজা মাণিকতলায় নিজ উদ্যানগৃহে আত্মীয়সভা স্থাপন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে সে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার ষষ্ঠীতলা বাটীতে সভা হইত। তদনন্তর কতক দিবস তাঁহার শিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভা হইয়া পুনর্ব্বার মাণিকতলার উদ্যানে সভা আরম্ভ হইয়াছিল। সায়াহ্নকালে আত্মীয়-

সভাতে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত; কিন্তু বেদব্যাখ্যার নিয়ম তৎকালে ছিল না; রাজার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করিতেন ও গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিত। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় তথায় সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার * * * ইঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনারূপ পরম ধর্ম্মকে অবলম্বন করিলেন। ...... ভূকৈলাশের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে এক এক বার ব্রাহ্মসমাজ হয়। ১৭৪১ শকের পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চোবে আপনার তুলাবাজারের বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ আহ্বান করিলেন; তাহাতে......রাজা রাধাকান্ত দেব......প্রভৃতি অনেক ধনবান ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৯ শকের আশ্বিন সংখ্যা দেখ)।

...... "পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ১৭৫১। ১১ই মাঘ তারিখে ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব গৃহে স্থায়ীভাবে যে প্রকাশ্য ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত পরিপূর্ণ আবির্ভাবকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়া মহর্ষি ঠিক ঐ দিন হইতেই ব্রাহ্মসমাজের আয়ুষ্কাল গণনা করিতে আরম্ভ করেন। এক ভাবে বলিতে গেলে ১৭৩৭ শকের আত্মীয়সভা বা ১৭৫০। ৬ই ভাদ্র হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিকাশোন্মুখে অবস্থা এবং ১৭৫১।১১ মাঘেই তাহার নিজস্ব ও স্থায়ী গৃহে উহার সম্পূর্ণ বিকাশ।"

১৮৫০ শ্রাবণ—শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখিত "ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী" প্রবন্ধে—"১৭৩৭ শকে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার মাণিকতলার উদ্যানে আত্মীয়সভা স্থাপন করেন এবং উক্ত সভা নানা স্থানে পরে স্থানান্তরিত হয়। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার নির্ব্বাহক ছিলেন। ১৭৩৯ শকে রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুপ্রীম কোর্টে এক মকদ্দমা আনয়ন করায় এবং রাজা ৩ বৎসর ধরিয়া তাহাতে বিব্রত হইয়া পড়ায় আত্মীয়সভার অধিবেশন আর হইত না। রাজা ঐ অন্যায় অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া ১৭৪১ শকে উহা আবার জাগাইয়া তোলেন। অন্যান্য অধিবেশনের মধ্যে উহার এক অধিবেশন বৃন্দাবন মিত্রের গৃহে, আর এক অধিবেশন ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে এবং আর একটী অধিবেশন ১৭৪১ শকের পৌষ মাসে তুলাবাজারের শ্রীবিহারীলাল চোবের বাটীতে হইয়াছিল।

"আত্মীয়সভা উঠিয়া গেলে ১৭৪৯ শকে রাজা * * এডাম সাহেবের সভায় ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেন। * * ১৭৫০ ভাদ্র মাসে জোড়াসাঁকোস্থিত কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। * * ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ তারিখে নিজ গৃহে ব্রাহ্মসমাজ স্থানান্তরিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল ও তাহার ট্রষ্টডীড লিপিবদ্ধ হইল। বিশেষ নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে কমল বসুর বাটীর সমাজ আত্মীয় সভার অনুবৃত্তি মাত্র। * * * ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র হইতে কমল বসুর বাটীতে যে উপাসনা আরম্ভ হয় তাহা ১৭৫১। ১১ই মাঘ পর্য্যন্ত যে অবিশ্রান্তভাবে চলিয়াছিল তৎসম্বন্ধেও কেহ কেহ সন্দিহান।"

"শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবু আপনার মত সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার প্রবন্ধের (The Brahmo Somaj centenary of 1928) ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আত্মীয় সভা Private meeting ground for Ram Mohan and his friends"। একথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। "আত্মীয়" নাম দেখিয়া তিনি private বলিতে সাহসী হইয়াছেন। (১৭৬৯ শকের আশ্বিন) সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভাল করিয়া পাঠ করিলে অন্যরূপ বুঝায়।" * * * "বৃন্দাবন মিত্র, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, বিহারীলাল চোবের বাটীতে যে আত্মীয়সভার অধিবেশন হয় তাহাকে private বলা যায় না।" "কমল বসুর বাটীতে উপাসনাকালে যে পর্দ্দা উঠিয়া গিয়াছিল, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই। ট্রষ্টীনিয়োগ যাহা হইয়াছিল তাহা আদিব্রাহ্মসমাজের নূতন গৃহ সম্বন্ধেই হইয়াছিল।"

"আমরা ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্রকে বহুদিন হইতে উচ্চ স্থান দিয়া থাকি, কিন্তু ১৭৮৭ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যে প্রেরিত পত্র বাহির হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী তিন সংখ্যায় ঐ পত্রের যে অনুক্রম চলিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে আমাদের অন্যরূপ ধারণা হয়।... ...পত্রপ্রেরকের নাম প্রকাশিত না থাকিলেও আমাদের মনে হয় ইনি চন্দ্রশেখর দেব (ইহা আমরা ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছি)।... ... তিনি তাঁহার চারখানি পত্রের কোনটীতে কমলবসুর বাটীর সমাজের উল্লেখ করেন নাই বা ৬ই ভাদ্র যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিন তাহার কিছুমাত্র পরিচয় দেন নাই। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, ১৭৫১। ১১ই মাঘই ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন। প্রকৃতপক্ষে যে উহার ভিত্তির উপর ১৭৫১। ১১ই মাঘের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও যাহার বিশেষ পরিচয় আদিব্রাহ্মসমাজের অপূর্ব্ব ট্রষ্টডিডে দেখিতে পাই, তাহার অনুরূপ নিদর্শন "আত্মীয়সভা" বা কমলবসুর বাটীর প্রতিষ্ঠিত সভায় দেখিতে পাওয়া যায় না, বা তদ্রূপ কোন কথা ঘোষিত হয় নাই।... ... পত্রপ্রেরক সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ১৭৫১। ১১ই মাঘই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন। উক্ত পত্রে ১৭৫০। ৬ই ভাদ্রের একেবারেই উল্লেখ নাই।"

"বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র তারিখে যে ব্যাখ্যান দেন তাহার শিরোভাগে "ব্রাহ্মসমাজ" এই কথাটী লেখা আছে। কিন্তু ঈশানবাবু বিদ্যাবাগীশের যে ১৬টী ব্যাখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোনটীর শিরোভাগে "ব্রাহ্মসমাজ" এই কথাটীর উল্লেখ নাই। ব্যাখ্যানগুলি অনেকদিন পরে ক্রমে ক্রমে পুনর্মুদ্রিত হইবার সময় পরবর্ত্তী প্রকাশক দ্বারা "ব্রাহ্মসমাজ" নামটী সংযোজিত হইয়া থাকিবে। ঈশানবাবু ঐ পুনর্মুদ্রিত কপিতে "ব্রাহ্মসমাজ" নাম দেখিয়া থাকিবেন।"

১৮৫০, ভাদ্র—ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকথা—শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখিত—"১৭৩৭ শকে আত্মীয়সভার যে সূচনা হয় তাহাতে শিবচন্দ্র মিশ্র বেদপাঠ করিতেন, গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন। ঈশানবাবুর পুস্তকে দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উহাতে ব্যাখ্যান দিতেন। ১৭৫০ শকে ভাদ্রমাসে কমলবসুর বাটীতে যে সমাজ আরম্ভ হয়, তাহাতে দুইজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ করিতেন।"

[আমরা এইবারে ১৭৮৯ শক অবধি ১৮৫১ শকের শ্রাবণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় যাহা কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম। চিন্তামণি বাবুর এই বিষয়ে সুলিখিত প্রবন্ধগুলি সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতে বর্ত্তমান বৎসরের শ্রাবণ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের মত কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই যে, ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘকেই ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার দিন ধরিয়া বর্ত্তমান বৎসরকেই ব্রাহ্মসমাজের শততম বৎসর ধরা উচিত। শিশু যখন মাতার গর্ভে থাকে তখন অবধি তাহার জন্ম বিশেষ কারণ ব্যতীত কেহ ধরে না; ভূমিষ্ঠ হইবার দিন অবধিই তাহার জন্মদিবসের গণনা করা হয়। তং সং]

বুদ্ধের গৃহত্যাগ।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

"ক্ষণস্থায়ী বিফল জীবন,"

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে গৌতম ভাবিতে লাগিলেন,—

"ক্ষণস্থায়ী বিফল জীবন,
অর্দ্ধ সচেতন—অর্দ্ধ অচেতন
কেবা জানে কিবা ভাব ?
এই বামাদলে কুতূহলে
নাচিল গাইল,
নানা বেশে আবেশে অবশ তনু,
হাবভাব দেখাইল কত,
পুনঃ কি বিকৃত ভাব!
সংজ্ঞাহীন—নাহিক উৎসব,
শব সম নিপতিত!" *

পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট গৌতম নর্ত্তকীগণের বিশ্রী মুখভঙ্গী, উৎকট অঙ্গভঙ্গী, অসংযত আবরণ, কাহারো বা মুখের লালানির্গমন যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অন্তর ভরিয়া ঘৃণা জাগিতে লাগিল—তাঁহার সমস্ত রূপমোহ কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে সেই ভিক্ষুর সৌম্য শান্তমূর্ত্তি তাঁহার মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিল। গৌতম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ছন্দকের সমীপবর্ত্তী হইয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিলেন—'ছন্দক'। তন্দ্রাবিষ্ট ছন্দক ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ছন্দক, অশ্ব প্রস্তুত কর।"

ভাব-বিহ্বল ছন্দক দ্বিরুক্তি না করিয়া অশ্বশালায় প্রবেশ করিল। গৌতমের মনে জাগিল—'আমার পুত্র, আমার প্রিয়তমা যশোধরা!' গৌতম যশোধরার গৃহাভিমুখে চলিলেন। সন্তর্পণে সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া সদ্যোজাত শিশুর মুখপানে চাহিলেন। বড় সাধ জাগিল একবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লন। কিন্তু যশোধরার নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় অন্তরের ব্যাকুল বাসনা অন্তরেই চাপিয়া তিনি ফিরিয়া চলিলেন। সোপান-প্রান্ত হইতে শেষবার প্রেমময়ী পত্নী ও নয়নমণি শিশুপুত্রের মুখের প্রতি ব্যথিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাণপিয়াসী ধীরে ধীরে অশ্বশালাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অশ্ব প্রস্তুত। গৌতম আবেগভরে ডাকিলেন—'কন্থক'। কন্থক করুণনেত্রে চাহিল।

"কন্থক, আজ আমার সহায় হও—আমার বুদ্ধত্বলাভের সহায় হও।"

গৌতম অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। ছন্দক তাঁহার পশ্চাতে বসিল। অতিকায় অশ্ব মহানন্দে বিমানবিকম্পী হ্রেষারব করিয়া গন্তব্যপথে ছুটিল। নগরবাসীর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দেবগণ সেই রব বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন। কন্থকের পদশব্দে যাহাতে কোন প্রহরী জাগিয়া না উঠে, সেই জন্য দেবগণ তাহার প্রতি পদবিক্ষেপে পদতলে নিজ নিজ হাত পাতিয়া দিতে লাগিলেন। নগরবাসী কেহ জানিতেও পারিল না, গৌতম কখন নগর-তোরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নগরপ্রান্তে বিশাল তোরণ। উন্মোচন করিতে সহস্র জনের প্রয়োজন। গৌতম ভাবিতেছেন যেমন করিয়াই হউক তিনি তোরণ খুলিবেন; ছন্দক ভাবিল

---

* "বুদ্ধদেবচরিত"—গিরীশচন্দ্র।

যে প্রকারেই হউক পার হইতেই হইবে; কন্থক ভাবিল গৌতম ও ছন্দক সহ এক লম্ফে তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কিছুই করিতে হইল না। দেবগণ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ধরিলেন। * নগর হইতে বাহিরে পলাতক সতৃষ্ণনয়নে একবার নগরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইলে আপন প্রভাবের সমূহ ক্ষতি হইবে এই আশঙ্কায়, পাপরাজ বশবর্ত্তী (বসবত্তি) মার বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবসর বুঝিয়া তিনি এইবারে অবিলম্বে গৌতম সমীপে উপস্থিত হইলেন।

"কোথায় যাইতেছ কুমার? আর সপ্তদিবস পরেই তুমি পৃথিবীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হইবে।"

"কে তুমি?"

"ষষ্ঠ দেবলোকের অধিপতি পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী।"

"যেই হও, প্রস্থান কর। আমি রাজচক্রবর্ত্তি-পদ চাহিনা। আমি চাই 'বুদ্ধত্ব'। তুমি যাহা বলিলে তাহার সহস্রগুণ লাভও আজ আমার কাছে অতি তুচ্ছ।"

মার বিমানপথে উঠিতে উঠিতে বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল—

"দেখিয়া লইব, তুমি কেমনে বুদ্ধ হও। এখন হইতে ছায়ার মতো আমি তোমাকে অনুসরণ করিব। তোমার মনে ছিদ্রমাত্র পাইলেই, আমি তদবলম্বনে তুমুল ঝটিকা তুলিব।"

অদৃশ্যে রহিয়া মার অবিচলিত গৌতমের অনুসরণ করিলেন। †

নগরের সীমারেখা তখনও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। গৌতম আর একবার প্রিয় জন্মভূমিকে দেখিয়া লইলেন। ক্রমে সকলে 'অনোমা' নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীর নাম শুনিয়া গৌতম উল্লাসিত হইলেন। তাঁহার দীক্ষাও তবে 'অনোমা', উজ্জ্বল হইবে মনে করিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ‡ কন্থক গৌতম ও ছন্দকসহ লম্ফ দিয়া নদী উত্তীর্ণ হইল। গৌতম অবতরণ করিলেন। একে একে সমস্ত আভরণ উন্মোচন করিয়া তিনি ছন্দকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ছন্দক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল।

"যাও ছন্দক।"

"আমিও যাইব।"

"কোথায়?"

"তোমার সঙ্গে।"

"এ রত্নালঙ্কার সকলের কি হইবে তবে?

কন্থকেরই বা কি হইবে?"

ছন্দক কোন উত্তর করিল না।

"যাও ছন্দক, আমার মর্ম্মাহত পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিও, আমার দুঃখিনী প্রিয়তমাকে প্রবোধ দিও, আর আমার রাহুল—তার যত্ন নিও ছন্দক। তুমি না যাইলে এসকল হইবে না। শাক্যগণকে শোক করিতে নিষেধ করিও। সকলকে বলিবে তাঁহাদের সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্বলাভের আশায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে।"

ছন্দক আনত মস্তকে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

"শোক করিও না ছন্দক। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। এখন ফিরিয়া যাও।"

ছন্দকের বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু শোকাবেগ চাপিয়া প্রতিগমনে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

দীর্ঘ কেশ রাখা ভিক্ষুর পক্ষে অশোভন। গৌতম তরবারি সাহায্যে কেশ কর্ত্তন করিলেন। তাঁহার খেয়াল জাগিল বুদ্ধত্বলাভ সম্ভব কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

সম্ভব হইলে কেশরাশি ভূমিষ্ঠ হইবে না; মনে করিয়া তিনি শিরোভূষণ সহ কেশদাম ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলেন। কিছুই ফিরিয়া আসিল না। সকলের অলক্ষিতে শক্র তৎসমুদয় স্বর্ণপেটিকায় গ্রহণ করিয়া স্বধামে লইয়া গেলেন।

প্রভুবিচ্ছেদ ঘটিবে ভাবিয়া কন্থক মর্ম্মাহত হইয়াছিল। দেখিয়া শুনিয়া সে আর সহ্য করিতে পারিল না, সেইস্থানে প্রাণত্যাগ করিল। ছন্দকের শোকাগ্নিতে ঘৃতাহুতি হইল। গৌতম একবার মৃত কন্থকের প্রতি, আর একবার শোকার্ত্ত ছন্দকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস অন্তরে চাপিয়া লইলেন।

বহুমূল্য বস্ত্রাদি আর তাঁহার শোভা পায় না। তিনি তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মা-প্রেরিত ত্রি-চীবর পরিধান করিলেন। ছন্দককে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়া, ব্রহ্মা-দত্ত দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে নবীন ভিক্ষু বীর পদনিক্ষেপে 'অনুপিয়ের' আম্রবনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শোকাভিভূত ছন্দক কিছুক্ষণ একদৃষ্টে প্রিয়তমের প্রতি চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রত্নালঙ্কারাদি সহ কপিলবস্তু অভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

---

* পলায়নক্রিয়া বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল এবং নগরতোরণ ঘটনাক্রমে উন্মুক্তই পাওয়া গিয়াছিল, এইমাত্র বিশ্বাস করিলেই চলিবে।

† নগর-তোরণ হইতে নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুদ্ধের মনে রাজ্যাভিলাষ জাগিয়াছিল। হয়তো বা জ্যোতিষীগণের রাজচক্রবর্ত্তিত্ব সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণীও মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া জগতের হিতকামনাই বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি নীচ বাসনার জন্য আপনার মনকে ভৎর্সনা করিলেন। ঘটনাটি এই ভাবেই বুঝিতে হইবে। সমষ্টিভূত মানসিক কুপ্রবৃত্তিগুলিকে রূপদান করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রকার "মার" পরিকল্পনা করিয়াছেন।

কাহারো মতে গৌতম যখন যশোধরা ও শিশুপুত্রকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন "মার" তখনও প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। M. of B. Hardy pp. 106-10

‡ For a discussion on the significance of 'অনোমা' see Cunningham—Ancient. Geography of India pp. 488-89.

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

কীর্ত্তন।

যেমন ক'রে পারি করি, ডাকতে তোমায় ছাড়ব না।
তোমার কথা ছাড়া আমি আর কোন কথা কইব না।
শিশুর আধ আধ বাণী বুঝে না কি তার জননী
[তার মা বিনে কেউ বুঝে না]
ওগো তেমনি আমার অস্ফুট বাণী তুমি কি গো বুঝবে না।
তোমার কাজে তোমার মাঝে ডুবে রব এ সংসারে
[শত কোলাহলে ভুলে শান্ত মনে]
ওগো যে যা বলে বলুক আমায় তোমার চরণ ছাড়বো না।
স্বপ্রকাশ বোলে তোমায় ডেকে ফিরে কেহ না যায়
[তোমায় ডাকলে এসে দাও হে দেখা]
আমি সাধনভজন-বিহীন হ'লেও,
তোমার আশা করতে ছাড়ব না।
সবার ভার নিয়েছ নিজে আর আমার কি ভাবনা আছে,
[তাই বিশ্বম্ভর তোমায় বলে]
ওগো আপন শিরে আপন বোঝা আর তো আমি বইব না।
আকাশে ভূতলে জলে অযুত গগন-তলে,
[তোমার অনন্ত রূপ বিশ্বব্যাপী]
তোমার সত্যং শিব সুন্দর রূপ দেখতে কারুর নাই মানা।
অপরূপ মোহন সাজে, দাঁড়াও গো হৃদয়মাঝে
[একবার দেখে লই তোমায় নয়ন ভরে]
আমি আনন্দময় হ'য়ে রব আর দুঃখের কথা বলব না।
এ জীবনের ধ্রুবতারা কে আছে তোমা ছাড়া
[এ সংসার-জলধি মাঝে]
আমি তোমা পানে রাখবো নয়ন
আর কোন দিকে চাইব না।

বেহাগ—তেতালা।

পরাণ ছুটে তোমার পানে
দিবস-রজনী
প্রিয়তম, যেমন তটিনী
ধায় সিন্ধু পানে।
প্রাণনাথ হে মোরে দেখা দাও
আঁখিজলে আকুল নয়ন।

শ্রীক্ষি, না, ঠা.

কীর্ত্তন।

প্রভু করুণা কুরু কিঞ্চিত
কৃপাভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করে এসেছি নাথ।
[দেখা পাব বলে—ত্রাণ পাব ব'লে—চরণ পাব ব'লে]
আমি পাপেতে তাপিত হ'য়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়া।
[ওহে পতিতপাবন]
প্রভু স্থান দাও তব চরণতলে,
আমায় ত্যজ না পাতকী বলে।
[ওহে অধমতারণ]
প্রভু কৃপাসিন্ধু তব নাম, আমায় কৃপাবারি কর' হে দান।
[ওহে কৃপাময়]

নানা কথা।

ভাদ্রোৎসব—এবার ভাদ্রোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে একটী বিষয় আমরা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ ইহা সে সময়ে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং অনেকেরই উহা আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। সম্মিলিত উপাসনা প্রভৃতির জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে ইংরাজী ও বাংলা আহ্বানপত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতে ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার "President Sadharan Brahmo Somaj and Secretary Brahma Somaj Centenary Committee" বলিয়া ইংরাজিতে এবং "সভাপতি সাঃ ব্রাঃ সমাজ, ও সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসব কমিটি" বলিয়া বাংলায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহাতে জনসাধারণকে ভ্রান্ত ধারণা করানো হয় যে হেমবাবু বিভিন্ন শাখা কর্ত্তৃক উৎসব কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এরূপ ভ্রমপূর্ণ উক্তি দ্বারা কি ঐতিহাসিক কি সমাজসংক্রান্ত সকল দিক হইতেই ব্রাহ্মসমাজেরই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আসে। ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মধ্যে যে মিলনের ভাব আনা হইতেছিল, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা দ্বারা উহা ঘুচিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিরোধের বিষকণ্টক রোপিত করা হয়। আমরা ইহা ইচ্ছা করি না। অবশ্য ডাক্তার সরকার যদি মাত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামে উহা বলিতেন, তবে আমাদের কিছুই বলিবার ছিল না। আমরা এবিষয়ের বিচারের ভার ডাক্তার সরকারের নিজের উপর এবং সাধারণ সমাজের কর্ত্তৃপক্ষের উপর সন্ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

দ্বিতীয় কথা এই যে, আহ্বানপত্রের শিরে "একাধিক শততম" ভাদ্রোৎসব লিখিত হইয়াছে। ইহা যখন সর্ব্ববার-সম্মত হয় নাই তখন এই ভাদ্রোৎসবকে "একশততম" বলিয়া "একাধিক শততম" না বলিলেই ছিল ভাল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে গত কয়েক সংখ্যায় "ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ" যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিবিষ্টচিত্তে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলেই যে কেহ বুঝিতে পারিবেন যে, এইভাবে আহ্বানপত্রাদি বাহির করিয়া বিরোধের ভিত্তি স্থাপন করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। মিলনের পথে এরূপ pinprick রোপণ করিলে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মিলনের আশা সুদূরপরাহত। তাহার ফলে কোন একটী শাখায় নহে, কিন্তু সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে দুর্ব্বলতা আসা অপরিহার্য্য। তাই নিতান্ত দুঃখের সহিত অশ্রুপাতের সঙ্গে কথাগুলি বলিলাম—ডাক্তার সরকার ও সাধারণ সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ এগুলির প্রতি সুদৃষ্টিপূর্ব্বক আলোচনা করিলে সুখী হইব। এখানে prestigeএর কোন কথা নাই, মাত্র ঐতিহাসিক সত্যের কথা এবং বিরোধ অপনয়নের কথা আছে।

খাসমহলের নূতন সেটেলমেণ্ট—নূতন সেটেলমেণ্টের ফলে করবৃদ্ধির কারণে বারদৌলির ন্যায় চারিদিক হইতেই ক্রন্দনের আর্ত্তনাদ আসিয়া আমাদের কানে পৌছিতেছে। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে খুব জোরের সঙ্গে বলিতে পারি, the cup is full and

cannot hold another drop—পেয়ালা ভর্ত্তি, আর এক বিন্দুও করবৃদ্ধি ধারণ করিতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের কানে প্রজাদের অবস্থার কথা ঠিক পৌঁছায় কি না জানি না; আমরা কিন্তু জানি যে প্রজারা বর্ত্তমান করভারই বহিতে অসমর্থ, করবৃদ্ধি তো দূরের কথা। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের দৈন্য অদৈন্য কিরূপে স্থির করেন তাহা কিছু পূর্ব্বে একটা সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম। এত মণ রূপা বা সোনা বিদেশ থেকে ভারতে আমদানী হয়েছে এবং এত মণ রপ্তানি হয়েছে; তবেই দাঁড়াল এই—উভয়ের মধ্যে বাদ কাটিলে এত মণ রূপা বা সোনা ভারতবাসীরা খাইয়া ফেলিয়াছে। ঘরে টাকা না থাকিলে এত মণ রূপা বা সোনা ভারতবাসী খাইতে পারে না। সুতরাং স্পষ্টতমরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে ভারতবাসীরা অতি ধনী এবং ধনরত্নের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে! হয়তো রাজা মহারাজা বা ধনী কয়েকজনের কল্যাণে ঐ বাড়তি সোনা রূপা এবং আমদানিরও অনেক অংশ ভারতে থাকিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেটা দেখি, কাহারও গণনার মধ্যেই যেন আসে না—সকলেই সে কথাটাকে যে কোন উপায়ে হোক চাপা দিয়া রাখেন—কেহই যেন তাহা কাণে তুলিতে চান না। কিন্তু এই প্রকার চাপা দেওয়া গণনার ফলে আমরা তো প্রত্যক্ষ করি যে, দিন দিন ভারতে অশান্তি কিরকম বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অশান্তি বৃদ্ধির ফল হয় তো আজ খুব স্পষ্ট আকারে দেখা দিবে না, কিন্তু কিছু পরে দেখা না দিয়া যাইতে পারে না। মানুষের স্বাধীনতালাভের আকাংক্ষা যে আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; কিন্তু ইহা আমরা খুবই দৃঢ়তা সহকারে বলিব যে, অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছলতা থাকিলে কোন দেশেই, বিশেষত ভারতবর্ষের মত একটা সুপ্রসিদ্ধ রাজভক্ত মহাদেশে বৈপ্লবিক ভাব সহজে মাথা তুলিতে চাহিবে না। বৈপ্লবিক ভাব জাগিয়া উঠিলে ধর্ম্মভাবের পরিণতিলাভে বিলম্ব ঘটে। এই কারণে আমরা গবর্ণমেণ্ট ও দেশ উভয়েরই হিতৈষণা-প্রণোদিত হইয়াই গবর্ণমেণ্টকে ধীরভাবে দূরদৃষ্টির সঙ্গে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি যে, নূতন সেটেলমেণ্টে কর বৃদ্ধি কতদূর বা কতটুকু সঙ্গত।

উত্তরমেরু শীতল নহে—ভিলহা জলমুর ষ্টিফেনসন নামক একজন কানাডার ভ্রমণকারী সম্প্রতি উত্তরমেরু সম্বন্ধে অনেক অভিনব কথা বলিয়াছেন। তাহা সাধারণের ধারণার একেবারে বিপরীত। তিনি বলেন, "আইসল্যাণ্ডকে নামেমাত্রই তুষারদেশ বলা হয়। সেই দেশের জানুয়ারী মাসের গড় উত্তাপের পরিমাণ ইটালী দেশের মিলান সহরের উত্তাপ অপেক্ষা এক ডিগ্রী মাত্র কম। আমি যখন প্রথম মেরুপ্রদেশে গমন করি, তখন মেরুবৃত্তের একশত মাইলের মধ্যে উত্তাপের পরিমাণ ৮০ ডিগ্রীর উপর লক্ষ্য করিয়াছি এবং দেখিলাম, এস্কিমো জাতির লোকেরা নদীর ধারে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের অবিরাম ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। তাহারা রুমাল নাড়িয়া মশামাছি তাড়াইতেছিল। উত্তর মেরুতে তুষারপাত অতিশয় অল্প পরিমাণ। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তর দিকের দ্বীপের উত্তর প্রান্তে ১২০ রকমের ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। এস্কিমো জাতির লোকদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই বরফের ঘর দেখিয়াছে। একজন আমেরিকাবাসী এক এস্কিমো বালককে বলিয়াছিলেন যদি সে এক চামচে তেল খায় তবে তাহাকে তিনি একটী ডলার পুরস্কার দিবেন। ঐ বালকটী পুরস্কারের লোভে এক চামচে তেল খাইয়াছিল। এই একটী মাত্র এস্কিমোকে আমি তেল খাইতে দেখিয়াছি" (সঞ্জীবনী, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩)। আমাদের শাস্ত্রে এবিষয়ে যে সকল উক্তি আছে, সেগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিলে খুবই মূল্যবান হইবে।

জাগরণ—সেদিন একটী সাধু সুন্দর একটী শ্লোক বলিয়া গেলেন—নিম্নে দিলাম—

> পয়লে পহরে সবকোই জাগে, দুসরে পহরে ভোগী।
> তিসরে পহরে তস্কর জাগে, চৌথে পহরে যোগী॥

রাত্রির প্রথম প্রহরে সকলেই তো জাগিয়া থাকে, ইহাতে বাহাদুরী কিছুই নাই। দ্বিতীয় প্রহরে ভোগী জাগিয়া থাকে অর্থাৎ আমোদপ্রিয় লোকেরাই দ্বিতীয় প্রহরে রাত্রি জাগরণ করিয়া সময় নষ্ট করে। তৃতীয় প্রহরে চোরেরা জাগিয়া থাকে—যে সময়ে মানুষ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইতে চলিয়াছে, সেই সময়ই চোর তস্কর প্রভৃতির প্রশস্ত সময়। চতুর্থ প্রহরে অর্থাৎ প্রত্যুষ ৩।৪ ঘটিকার সময় যোগী জাগ্রত থাকেন। চতুর্থ প্রহরে গাত্রোত্থান করিয়া হাত মুখ ধুইয়া ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলে শরীর যে কিরূপ হৃষ্টপুষ্ট হয়, মন কিরূপ তেজস্বী হয়, তাহা যিনি করিয়াছেন তাঁহাকে তাহার পরিচয় দিতে হইবে না; এবং যিনি তাহা করেন নাই তাঁহাকে উহার ফলের শত পরিচয় দিলেও তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না।

এই সূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটী সুন্দর গান উদ্ধৃত করিতেছি:—

রাগিণী কেদারা—চৌতাল।

> যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে।
> ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান
> প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে।
> ধন্য সাধু সুখী সেই যে আপন মন-আসনে
> রাখিতে তাঁরে পারে।
> ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পাপত্যাগ ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া
> যাঁর তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম॥

ভগবদ্গীতা বলিতেছেন—

> যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
> যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

সকল প্রাণীগণের পক্ষে যাহা রাত্রি, সেই সময়েই [বা অবস্থাতেই] সংযমী পুরুষ জাগিয়া থাকেন; যে সময়ে বা অবস্থাতে প্রাণীসকল জাগিয়া থাকে, অন্তর্দর্শী মৌনব্রতী মুনির পক্ষে তাহা রাত্রিস্বরূপ।

কি সুন্দর কথা—ইহার অর্থে প্রাকৃতিক দিবারাত্রির কথাও ধরা যাইতে পারে, এবং আধ্যাত্মিক নিদ্রা ও জাগরণের অবস্থাও ধরা যাইতে পারে।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে প্রত্যূষে উঠিয়া ভগবানে আত্মসমাধানের সার্থকতা বা efficacy প্রতি পদে সমর্থিত দেখা যায়। সুতরাং যোগসাধনে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে ইহা অবহেলার বিষয় নহে।

পত্রিকাপরিচয়।

হিন্দু—১৯শে আষাঢ় ১৩৩৬—"কর্ম্মযোগ বা সংস্কার" প্রবন্ধ আর একটু পরিষ্কার করিয়া লিখিলে বুঝিবার সুবিধা হইত। তারপর, প্রবন্ধটী একরাশ ইংরেজী quotation-এর ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর মুখপত্র "হিন্দু" কাগজে শ্রীদানীশ রায়ের "ক্ষুধার শাস্তি"র ন্যায় গল্প উদ্ধৃত করিয়া ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে বৃথা সংশয় আনিবার কোন সার্থকতা দেখি না।

বঙ্গবাণী—২৯শে আষাঢ় ১৩৩৬—অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্যের "সংরক্ষণ বনাম সংস্কার" নিবন্ধের ষষ্ঠ কিস্তি চলিতেছে। বড় সুন্দর ভাষা এবং সার কথায় পূর্ণ। এই প্রবন্ধগুলি আশাকরি বটুক বাবু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবেন। চারিদিক হইতে দেশাচার প্রভৃতির বন্ধনপাশ হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার সুবাতাস বহিতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে সুখী, কারণ আদিব্রাহ্মসমাজ জন্ম অবধি আজ শতবর্ষ ধরিয়া এই ভাবেই সংস্কার সমর্থন করিয়া আসিতেছেন।

রাষ্ট্রবাণী—১৬ই আষাঢ় ১৩৩৬—"শিক্ষিতের ব্যর্থতা কোথায়?" সম্পাদক সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা বলি, চাকরি জুটাইবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট শিক্ষাদানেই উহার ব্যর্থতা। আমাদের পূর্ব্বতন শিক্ষায়:ছাত্রের পারদর্শিতার সাক্ষ্য দিতেন স্বয়ং গুরু; আমাদের মনে হয় তাহা খুব ভাল। "খোলা চিঠি"তে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ অনেকগুলি সত্যকথা বলিয়াছেন। চরকাই (এবং কাপড়ের কল নহে) যে আমাদের বাঁচিবার একমাত্র না হউক, অন্তত অন্যতর প্রধান উপায়, ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের মত সকলেই তাহা উপলব্ধি করিবেন। নাগ মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন—"চরকা সম্বন্ধে প্রতিযোগিতার কোন কথাই উত্থাপিত হইতে পারে না। বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আপন ব্যবহারের বস্ত্রের জন্য চরকায় সূতা কাটাতে প্রতিযোগীতার প্রশ্নই অসংলগ্ন। পরন্ত চরকার সেবা লোককে দুষ্কার্য্য হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম"। পরাধীন জাতির পক্ষে যে কোন কল হউক, সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্ত করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন নিঃসন্দেহ।

পণ্ডীচেরীর শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের আশ্রমবাসী শ্রীঅনিল বরণ রায় নিশ্চয়ই মদ্যপানের পক্ষপাতী নন। কিন্তু তিনি এদেশবাসী দরিদ্রদিগের মদ্যপান সমর্থন কি প্রকারে করিলেন, আমরা তাহা বুঝিলাম না। এবং তজ্জন্য আমরা মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—"বাস্তবিক আমাদের দেশের জনসাধারণ যেরূপ গভীর দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে পশুর অধম জীবন যাপন করে, তাহাতে তাহাদের জীবনের একমাত্র সুখ ও সান্ত্বনা মদ্যপান। সেইটুকু ছাড়িলে তাহারা বাঁচিবে কি লইয়া"? তবে তাঁহার মতে পশুর অধমত্ব দূর করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় কি মদ্যপান? সান্ত্বনালাভের যে উপায় বলিয়াছেন, উহা আশ্রমবাসী অনিল বাবুর উপযুক্ত নহে, মদ্যব্যবসায়ী বিলাতী বণিকের উপযুক্ত। আর আশ্রমে বসিয়া যদি তাঁহার ঐ শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে, তবে আশ্রমধারী অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় যত শীঘ্র আশ্রম উঠাইয়া দেন ততই দেশের মঙ্গল। আমারাও সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া নাগ মহাশয়ের সহিত একপ্রাণে একহৃদয়ে বলিব যে "মদ্যপান পরিহার না করিলে দেশের মুক্তি অসম্ভব"। এ বিষয়ে শীঘ্রই আমরা একটী প্রবন্ধে আমাদের মতামত বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করিব।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেছি যে, একাধিক পত্রে পত্রিকার মত ও প্রবন্ধাদি উদ্ধৃত হইতেছে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পত্রিকা ভগবন্নির্দ্দিষ্ট পথে নির্ভয়ে চলিতেছে এবং তাহার ফলে ভগবৎনিহিত-প্রাণ জনসাধারণের সাদর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

গত আষাঢ়-সংখ্যা দেখিয়া বাঁশবেড়িয়ার রাজবংশের সুযোগ্য বংশধর কুমার শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয় বলেন যে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এরূপ উচ্চাঙ্গের পত্রিকারূপে পরিচালিত হইতেছে তাহা জানিতাম না"।

গত শ্রাবণ-সংখ্যা সম্বন্ধে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ সেবক ও কর্ণধার এবং "ব্রহ্মবাদী" পত্রিকার সম্পাদক খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত মনমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন—"তত্ত্ববোধিনীতে আষাঢ়ের বিভিন্ন প্রকারের বহু লেখা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করি। আপনার অঞ্জলি পাঠ করিয়া বেশ লাগে। শ্রাবণ সংখ্যায় শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত প্রবন্ধ পড়িয়া ব্যথার সঙ্গে সঙ্গেও আশা ও আনন্দ হইল—এমন তাজা কথা লেখার লোক আছেন।"

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬—"বৈষ্ণবধর্ম্ম-নীতিবাদ" প্রবন্ধে শ্রীরত্নেশ্বর সেন যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে—সকল বিষয়ে একমত নাই বা হইলাম। ইহাতে "জীবের জ্ঞানদান কর্ত্তব্য", "দুঃখীকে কৃপা কর্ত্তব্য" প্রভৃতি নীতিকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিক হইতে সমর্থন করিয়াছেন। কয়েক স্থলে যুক্তির সমস্তটা মানিতে না পারিলেও প্রবন্ধটী পড়িয়া সুখী হইলাম—অনেকাংশে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর বহির্ভূত।

বিচিত্রা—আষাঢ় ১৩৩৬—আরম্ভেই বুদ্ধদেবের একটী সুন্দর ধ্যানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহা তুরফানের কোন বিহারের প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত। দেখিয়া হিন্দু জাতির পূর্ব্ব মহিমা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র হইতে একটী অংশ "বেদনার মূল্য" নাম দিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে—অংশটুকু বড় সুন্দর। আমরাও আবার সেই অংশ হইতে নিম্নোক্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। "ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আমাদের হাতে নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, যথার্থ বড় দুঃখ আপন মহত্ত্বের দ্বারাই বেদনার মধ্যেই গভীর ভাবে আপন মুক্তি আপনি সংগ্রহ করে"। "ক্ষর ও অক্ষর" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বৈতবাদের মূল কথা সংক্ষেপে সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। "কর্ত্তব্যের কথা" প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক বড়ই কঠিন বিষয় আনিয়াছেন। তাঁহার উপসংহারে বলিয়াছেন—"আমাদের গোড়াতে মেনে নিতেই হবে যে, প্রত্যেক মানুষের বিবেক একটা ব্যক্তিগত নিজস্ব অনুভব নয়—তা একটা নিত্য সাধারণ

জ্ঞান"। ইহার সূত্রটী কি, তদ্বিষয়ে পরে আলোচনা করিবেন—আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম। কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ সূত্রে মৌখিক ধন্যবাদ দেওয়া না দেওয়ায় অবতারণার সঙ্গতি ঠিক বুঝিলাম না। গুরুতর দার্শনিক বিষয় বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় সুলিখিত। "মধ্য এসিয়ায় হিন্দু সাহিত্য" প্রবন্ধ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী চিত্রসহ প্রকাশ করিয়া বড়ই সুখপাঠ্য করিয়াছেন। সার অরেল ষ্টীনের অবলম্বনেই প্রবন্ধটী লিখিত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, স্বেন হেডিনকে অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধের পরবর্ত্তী কিস্তি অলঙ্কৃত করিলে ভাল হয়।

—

গার্হস্থ্যসংবাদ।

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন।—গত ২৯শে ভাদ্র রবিবার ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র শ্রীমান হৃদীন্দ্রনাথের শিশুপুত্রের নামকরণ ও 'অন্নপ্রাশন'-সংস্কার আদি-ব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে ৬, দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনস্থ পারিবারিক উপাসনামণ্ডপে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শিশুর নাম শ্রীমান হৈমেন্দ্রনাথ হইয়াছে। ভগবান ইহাকে সাধুগুণে বিভূষিত করুন।

আদ্যশ্রাদ্ধ।—গত ১১ই ভাদ্র বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥০ ঘটিকায় ৺দিবনাথ শাস্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় পত্নী শ্রীপ্রভা দেবী কর্ত্তৃক বালিগঞ্জে ২১ নং ষ্টেশন রোডে স্বকীয় বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ষোড়শদ্রব্য সহ ভোজ্যাদি উৎসর্গের পর পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি শ্রাদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়াছেন।

—

শোকসংবাদ।

৺অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।—'সাধক রাম-প্রসাদ' 'কমলাকান্ত' 'নচিকেতা' প্রভৃতি পুণ্যজীবনীর গ্রন্থকার, পত্রিকার অন্যতর পুরাতন লেখক এবং আমাদের প্রিয় সুহৃদ সুসাহিত্যিক অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ৩১শে চৈত্র শনিবার রাত্রিতে হৃদরোগে তাঁহার রাঁচিস্থ প্রবাসভবনে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভারতীর যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ৫০ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার এই আকস্মিক অকাল-মৃত্যুতে শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে আমরা আমাদের আন্ত-রিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহাদের গভীর শোকে সান্ত্বনা বিধান করুন।

৺শিবনাথ শাস্ত্রী—আদিব্রাহ্মসমাজের ভূত-পূর্ব্ব আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ৺প্রিয়-নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান শিবনাথ গত ২রা ভাদ্র রবিবার সুদূর কলম্বোর পুণ্যভূমিতে তাঁহার দেহরক্ষা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃ-ক্রম মাত্র ২৬ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার এই অকাল মৃত্যুতে শোকার্ত্ত পত্নী ও পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহাদের প্রগাঢ় শোকে সান্ত্বনাবিধান পূর্ব্বক লোকান্তরিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় দান করুন।

—

সংবাদ।

ভাদ্রোৎসব।—এবার শতবার্ষিক উপলক্ষ্যে আদিব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ও স্থানান্তরে ভাদ্রোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গত ৫ই ভাদ্র বুধবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ কয়েকজন শ্রদ্ধাবান উপাসক সর্ব্বপ্রথম খোল-করতাল সহযোগে ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করেন। তারপর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী-গ্রহণপূর্ব্বক উদ্বোধন ও উপাসনান্তর যথারীতি উপদেশ প্রদান করেন। উপ-দেশের বিষয় ছিল "ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যাহ"। মুদ্রিত উপদেশ সভায় বিতরিত হইয়াছিল। পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরাও উহা প্রকাশ করিলাম। নিবিষ্ট-চিত্তে পাঠ করিলে ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি লইয়া ভাদ্রোৎসব ও মাঘোৎসবের মধ্যে উত্থিত বিবাদের নিগূঢ় নির্ণয় লাভ করিয়া পাঠক আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথারীতি সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-শেষে পুনর্ব্বার একটী কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। আদ্যন্তে খোল-করতাল সহযোগে কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তনায় সমস্ত উপাসনাটীর উপর একটী অভিনব দিব্য-শ্রীর সঞ্চার হইয়াছিল।

গত ৮ই ভাদ্র শনিবার প্রাতে ৭ ঘটিকায় সিটি-কলেজের ব্রিস্তল-সভাগৃহে ব্রাহ্মসমাজের শাখাত্রয়ের একটী সম্মিলিত উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-কুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কৃষ্ণকুমার বাবুর উদ্বোধন, কামাখ্যা বাবুর আরাধনা ও ক্ষিতীন্দ্রনাথের উপদেশ—সবই সুন্দর হইয়াছিল। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর উপদেশের বিষয় ছিল "নিরাশার স্থান নাই"। ইহা মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল। মানুষ যখন জীবনের পথে চলিতে চলিতে সম্মুখের সাময়িক দুঃখ-দুর্গতির বিভীষিকায় হতাশ হইয়া পড়ে, তখন দুর্দ্দিনে যে তাহার সহায় হয়—অন্ধকারে যে আলো প্রদর্শন করে, তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করি। ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার এই উপদেশে আমাদের সমাজে ঘোর হতাশার মধ্যে বিশুদ্ধ আশাভরসার প্রতি আমাদের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া-ছেন, আমাদের সাময়িক ভয়-ভাবনার অন্ধকারে উৎ-সাহ ও উদ্দীপনার আলো জ্বালিয়া দিয়াছেন। তাই এ উপদেশটী সমবেত উপাসকগণের সানন্দ অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল। দেখিয়া সুখী হইলাম তত্ত্বকৌমুদীর বর্ত্তমান সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত

উপাসনার সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন শ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীকুমুদিনী বসু এবং তাঁহার সহোদরা শ্রীবাসন্তী চক্রবর্ত্তী এবং স্বনামধন্য ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী।

গত ৯ই ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় "ভবানীপুর সম্মিলনসমাজে" ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক "ব্রাহ্মসমাজের দান" বিষয়ে একটী গভীরার্থদ্যোতক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীবাণী দেবী। সঙ্গীত ও উপদেশ মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল। পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরাও উপদেশটী প্রকাশ করিলাম। সম্মিলনী সমাজের সুবৃহৎ উপাসনাগৃহটী সমাগত উপাসকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উপাসনান্তে সকলেরই হৃদয় প্রগাঢ় প্রীতি ও তৃপ্তির সুমধুর রসে আনন্দিত ও প্রফুল্লিত হইয়াছিল। আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে এবারে ভাদ্রোৎসবের যে ক্ষুদ্র আয়োজন হইয়াছিল, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাহা সফলতা লাভ করিল। শ্রীসু. চ. চৌ।

দান।

মহামান্য 'পীথাপুরম্'-রাজ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মাননীয় যুবরাজ-মহোদয়ের শুভ বিবাহোপলক্ষ্যে আদিব্রাহ্মসমাজে ৬০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা-সহকারে আমরা উহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। ভগবান নবদম্পতীকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

ভ্রম-সংশোধন।

গত শ্রাবণ-সংখ্যা পত্রিকায় "ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ" প্রবন্ধে ১১৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের একবিংশ পংক্তির সর্ব্বশেষ শব্দ "৺শিবচন্দ্র"র পরিবর্ত্তে "৺চন্দ্রশেখর" হইবে।

ট্রেড মার্ক
PHULELIA
PERFUMERY COMPANY
CALCUTTA

Tattwabodhini Patrika   Reg. No. C 462

১৭৬৫ শক ২১এ ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
ষড়বিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০৩৫   ১৮৫১ শক কার্ত্তিক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে   সম্পাদক—   চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৷৵৹ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০৩৫

১৮৫১ শক কার্ত্তিক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

মাতৃমঙ্গল।

১। ক্ষমাপ্রার্থনা।

জননী আমার! যখনই ভাবি, তখনই আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে যে, তুমি আমার কি স্নেহময়ী মাতা এবং তোমার কাছ থেকে আমি কিপ্রকার দীর্ঘকাল দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। দূরেতে যখন তোমার এতটুকু আভাস পাইয়াছি, তখনই আমি বিপথে কুপথে পলাইয়া বেড়াইয়াছি, পাছে তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আমাকে স্নেহচুম্বনে ঢাকিয়া ফেল। কণ্টকের বিষময় আঘাতে আমার মন ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, হায়রে মূর্খ আমি, তবু তোমার কাছে ধরা দিতে চাহি নাই। মা জননী! আমার পাপের কথা বলিয়া আর শান্তি পাইতেছি না—অশান্তির অগ্নিতে সমস্ত প্রাণটা জ্বলিয়া ভস্ম হইতে চাহিতেছে। আমার মত পাপী জগতে আর কেহ নাই। তোমার নামেই আমি বিরক্ত হইয়া উঠিতাম—আমি নিজের গর্ব্বেই গর্ব্বিত হইয়া তোমার নাম শুনিতেই চাহিতাম না! তোমার অভাবে আমার প্রাণে যে কি অশান্তি গিয়াছে, তাহা তুমি জান আর আমি জানি। কতবার যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছি তাহাও তুমি জান; উঃ; মৃত্যুও আমাকে অযোগ্য বিবেচনা করিল! মা আমার! তোমার নাম ভুলিবার জন্য কত না চেষ্টা করিয়াছি। ওরে মূর্খ! অমন মধুর নাম কি ভোলা যায়? প্রভাতের কনক-তপন, নিশীথের শান্তিসুধা, যে দিকে চাহি, সেই দিকেই তো তোমারই হাতের লেখা। বাতাসের মৃদু হিল্লোল যখন তোমারই নাম বহিয়া আনিয়া কাণে কাণে বলিয়া যাইত, তখন তাহাও যেন সহ্য করিতে পারিতাম না—আমি এতবড় পাষণ্ড ছিলাম। মা! আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর; মা—মা—বলিয়া আমাকে চীৎকার করিয়া একবার তোমাকে ডাকিবার অবসর দাও, আমার প্রাণটা একটু হালকা হউক। ভূধরের গাম্ভীর্য্য, সাগরের কল্লোলধ্বনি, অরণ্যের গগনস্পর্দ্ধী বৃক্ষরাজি, উপবনের সুগন্ধ পুষ্পপত্র, সকলই আজ আমার প্রাণে তোমারই নাম জাগাইয়া তুলুক। আজ অবধি তোমারই বাণী দিবানিশি প্রতিমুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে থাকুক।

২। ফিরে আসা।

জননী আমার! জননী আমার! আমি তোমার বড়ই দুষ্ট সন্তান। যে অবধি আমার জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই অবধিই তো দেখিতেছি, আমি বিপথেই চলিয়াছি। সুপথে চলিবার জন্য তুমি

আমাকে বারবার উপদেশ দিয়াছ; আমি তোমার সেই ভাল কথা শুনি নাই। আমার মঙ্গলের জন্য তুমি কতবার আমাকে শাস্তি দিয়াছ; কিন্তু আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়াও তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছি। তখন তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিলে, যাহাতে সংসারের কঠিন কশাঘাতের আঘাত পাইয়া আবার তোমার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসি। মা! ফিরিয়া তো আসিয়াছি। সারা সংসার ঘুরিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছি। একটুখানি তুমি কোলে লইবে, সেই আশায় ফিরিয়া আসিয়াছি। আঘাত যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি। কি সুন্দর দেহ তুমি দিয়াছিলে—সেই দেহ সংসারের কাঁটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কি সুন্দর মন দিয়াছিলে—আমার মনপ্রাণ সমস্তই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ সেই জীর্ণ দেহ, সেই ভাঙ্গা মন লইয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছি। শাস্তি যথেষ্টই হইয়াছে, আর শাস্তি দিও না। একবার আমাকে কোলে তুলিয়া লও। একবার তুমি তোমার এই হারানো ছেলেকে স্নেহভরা বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধর। তোমার ঐ বুক হইতে স্নেহপ্রেম শতধারে ঝরিয়া আমাকে শান্তি দিক, আমার সেই দাবদগ্ধ প্রাণকে শীতল করুক। তোমার প্রাণের মধ্যে মিশিয়া গিয়া আমার নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে দাও। মা আমার! তোমার এই ধুলোকাদা মাখা, এই রক্তমাখা ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইতে না চাও, ঘৃণা বোধ কর, তবে তাহাকে এইটুকু অধিকার দিও, সে যেন তোমার ঐ চরণতলে আছড়াইয়া পড়িয়া মরণটুকু লাভ করিতে পারে।

ভাব সেই একে।

(৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য)

আজ আমাদের পক্ষে বিজনে একাকী কিম্বা কোন সংঘের সমিতির সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উপনিষদ বেদান্ত কিম্বা উহাদেরই ভাবে জীবন্ত সাহিত্য আলোচনা করবার সুযোগ হয়েছে বলে আমাদের মধ্যে অনেকেই ধারণা করতে পারেন না যে, এক শ' বৎসর পূর্ব্বে যখন "ভাব সেই একে" রামমোহনের কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হয়েছিল, সেই দিনের গৌরব কতখানি। তখন মানবসমাজ শ্যামল বসুন্ধরার ন্যায় সত্যই এক হলেও নানা খণ্ডে খণ্ডিত ছিল। মানবত্বের অখণ্ড ভাব ধারণা করা তখনকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের মনীষিগণের পক্ষেই দুরূহ ছিল বল্লে অত্যুক্তি হয় না। আত্মার অখণ্ডত্ব তখনকার কবিদেরও কল্পনার অতীত ছিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস পুরাণ দর্শন, এমন কি, বিজ্ঞান আলোচনা করলেও দেখা যায় যে ধর্ম্মকেই এখানকার মনীষিগণ ভিত্তি করেছিলেন, প্রবৃত্তিকে নয়। এবং বাংলা এই বিশেষত্বটি একশত বৎসর পূর্ব্বে নবরূপে রূপময় করে তুলেছিল "ভাব সেই একে"র মন্ত্রে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাই জগৎকে এই সমদর্শিত্ব দান করেছে এবং আজ য়ুরোপ আমেরিকার বিজ্ঞানও বলেছেন জগতের মূলে এক অদ্বিতীয় অবাঙ্মনসগোচরকে সত্যই প্রত্যক্ষ করা যায়।

নব যুগের আরম্ভ য়ুরোপে বেকনের আবির্ভাব হতে হলেও ফরাসীগণের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা মানবসমাজে স্থাপন করবার চেষ্টাকেই আমরা নব যুগের প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা বলতে পারি। ফরাসী জাগরণের মূলে কোন ধর্ম্মবিশ্বাস না থাকার দরুণ বর্ত্তমান য়ুরোপকে মধ্য যুগের য়ুরোপ হতে রক্তসমুদ্রে পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে; কিন্তু রামমোহনে আমরা দেখতে পাই যে ফরাসী জাগরণের ঐ তিনটী মহামন্ত্র "ভাব সেই একে"র অঙ্গীভূত হওয়াতে বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে মধ্যযুগের ভারতবর্ষ হতে আসতে হয়েছে প্রীতির দ্বারা। আমাদের সভ্যতার এই বিশেষত্বটী বিস্মৃত হলে আমরা আমাদের শক্তি কোথায়, গৌরব কোথায়, আশা কোথায় বুঝতে অসমর্থ হব; আমরা আমাদের স্ব-ভাব বিচ্যুত হওয়াতে মানবসমাজের একটা অনাবশ্যক জড় ভারস্বরূপ হব।

ফরাসি জাগরণের সার্থকতা যেমন একদিকে আছে, তার ব্যর্থতাও তেমনিই ভীষণ; য়ুরোপের সকল নেশনই উনবিংশ শতাব্দী হতে পরস্পরকে হত্যা করতে নানা অস্ত্র নির্ম্মাণ করে আসছে এবং এখন কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নেই। এ ব্যর্থতার কারণ কি? স্বাধীনতার স্পৃহা! বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত শক্তিপ্রবাহের চিরন্তন উত্থান-পতনের বিরাট আন্দোলনের মধ্যে অহোরাত্র থেকেও মানুষ যে স্বাধীনতা লাভ করতে চায়—এ কি তার দুরাশা? মাতৃগর্ভের নিঃশঙ্ক স্নেহ হতে যে জগতে মানুষ ভূমিষ্ঠ হয়, মা হতে পৃথক হয়ে জীবন উপলব্ধির প্রথম মুহূর্ত্তেই তার আশঙ্কা হয় জগৎ তার অনুকূল নয়, মাতৃক্রোড়ে থাকবার নিঃশঙ্ক স্নেহের সেই পরিচিত কোমল উত্তাপ জগতে নেই। জগৎ তার নিজের

গতিবেগে অবিরাম চলেছে বলেই নিয়ম। গতির বিরাম নেই। দিবসের আলোকে এবং রজনীর অন্ধকারে, বৈশাখের প্রখর উত্তাপে এবং পৌষের শীতে জগতের প্রত্যেক কণাটি এক আয়ত্তের অতীত শক্তিপ্রবাহের দ্বারা পরিচালিত হয়ে রূপ হতে রূপান্তরে, বর্ণ হতে বর্ণান্তরে, গুণ হতে গুণান্তরে, স্থান হতে স্থানান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে, এক যুগ হতে অন্য যুগে চলেছে; অনুকূলই হউক কিম্বা প্রতিকূলই হউক, গতির বিরাম নেই; তার দৃষ্টি সর্ব্বদাই সম্মুখে, লক্ষ্য কত দূরে কে জানে? এই যে জীবনমৃত্যুর আলোচ্ছায়ায় চককাটা ঘরখানি,—জগৎ—মানুষ দেখছে যে সে আলো হতে ছায়ায়, ছায়া হতে আলোতে যাতায়াত করছে, তার প্রাণশক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে মাত্র, এর এলাকার বাহিরে না গেলে মুক্তি কোথায়?

অথচ বাহিরে যাবে কিরূপে? জগৎ আমাদের পরিপুষ্টির পক্ষে কত আবশ্যক! একে না হলে আমরা এক লহমাও বাঁচতে পারি না। এর রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ আমরা আমাদের নানা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তেই আত্মসাৎ করি; এর আলো আমাদিগকে জাগিয়ে দেয়, এর অন্ধকার আমাদিগকে মৌন করে, স্তব্ধ করে; এর বাতাস আমাদের নিশ্বাস জোগায়, এর আকাশ আমাদিগকে কতদূরে অনন্তের মধ্যে আহ্বান করে। "কেন যে প্রাণের এত প্রবাহ, তার কোন কৈফিয়ৎ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। সেই অনন্ত কালের দুর্ভেদ্য নীরবতা সৃষ্টির প্রথম প্রত্যূষেও যেমন, আজও তেমনি রয়েছে। জগতের এই প্রাণোচ্ছ্বাসের পূর্ণ অবস্থাটিকে, যার সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়মনের ভাববিনিময় চলছে, প্রত্যেকেই শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়। কি বিস্তীর্ণ, কি ঐশ্বর্য্যশালিনী এই মহিমময়ী প্রকৃতি! মানুষের প্রত্যেক বৃত্তিকে, প্রত্যেক শক্তিকে প্রকৃতির প্রত্যেক গুণ কি আশ্চর্য্যরূপে আহ্বান করছে। এর উর্ব্বরা ক্ষেত্র, অর্ণবযানের যাতায়াতের উপযোগী মহাসাগর, নানাবিধ ধাতু এবং প্রস্তরময় শৈলমালা, নানা শ্রেণীর বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন অরণ্য; অসংখ্য জীবজন্তু, রাসায়নিক উপাদানসমূহ; আলোকের, উত্তাপের, আকর্ষণ-বিকর্ষণের জীবনীশক্তি, এবং বিচরণপ্রণালী, এই সকল নিয়েই যে জগৎ,—জ্ঞানে এই জগৎকে আয়ত্ত এবং প্রেমে ভোগ করে শক্তিশালী মহাপুরুষগণ তাঁদের শক্তির চরম সার্থকতা উপলব্ধি করছেন, ইহাই তাঁদের উপযুক্ত ক্ষেত্র।"

অথচ মানুষ স্বাধীনতা চায়, প্রকৃতির অধীন হয়ে থাকতে চায় না। জগতে অসংখ্য রূপের এবং শক্তি সংঘর্ষণের মধ্যে পড়েও মানুষ তার নিজের 'স্ব'কে জগৎ হতে স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধি করে, সে এক নূতন বাণী শ্রবণ করে, প্রত্যক্ষগোচর প্রকৃতির বাহিরে এসে আত্মবান্ হবার আনন্দ উপভোগ করে। অখণ্ড বিশ্বশক্তি যে তার মধ্যে এক বিশিষ্ট মানবস্বরূপে কেন সু-পরিচ্ছিন্ন হয়, ইহা এক নিগূঢ় রহস্য। মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিপ্রবাহে আত্মলোপ করতে পারে না বলেই তার উন্নতি, সভ্যতা। মধুমক্ষিকা আজও ঠিক সেই রকমেই তার মধুচক্র নির্ম্মাণ করছে বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেমন করত এবং বিশ হাজার বৎসর পরেও যেমন করবে; কিন্তু মানুষ যে আনন্দমধু পান করবার চক্র আজ নির্ম্মাণ করছে, বিশ শতাব্দী পূর্ব্বে তা ছিল না এবং বিশ শতাব্দী পরেও তা থাকবে না। তখন নবীন মন আবার নবীনভাবে আত্মাকে উপলব্ধি করে এক নূতন ভাবজগৎ নির্ম্মাণ করবে।

এই ভাব-জগৎ যে মানুষ নির্ম্মাণ করে, সে কি এক মাত্র তারই শক্তিতে? না তারও চেয়ে এক মহান আত্মা তার মধ্যে আপন সৃজনী শক্তি দান করেন বলেই মানুষ তার নিজের আনন্দ হতে এক নূতন ভাবজগৎ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়? জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ দুশ্ছেদ্য না হলেও দেখা যায় যে, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের স্তরে স্তরে তাহা নূতন ভাব ধারণ করে। স্থূল দেহের সুখেই যে সুখী, সে জগতের মৃন্ময় অংশ নিয়ে পাঁচ ছয় তলার ইমারত তৈরী করে তৃপ্তিবোধ করে; কিন্তু এ কাজ ত পিপীলিকাও করতে পারে। সূক্ষ্মদেহের সুখেই যে সুখী, সে জ্ঞান-জগৎ সৃষ্টি করে; কিন্তু তার হৃদয়ের নিগূঢ় অন্তঃপুরে একটা ক্রন্দন ধ্বনিত হয়,—জগতে নিয়মই কি সব? এর কি এক অদ্বিতীয় নিয়ামক নেই? কারণশরীরেই যে সুখী সে জগতের নিয়ামকের সঙ্গে এক নিগূঢ় ভাবের যোগ উপলব্ধি করে, কেহ বা নিয়ামকের সন্তানবাৎসল্য উপলব্ধি করেন, কেহ বা তাঁর সখাভাবে অনুপ্রাণিত হন। যে স্বাধীতা লাভ করবার জন্য মানুষ সকল রকম গতানুগতিকতার কারাগার হতে বাহির হয়, এতক্ষণ পরে তার যাত্রা শেষ হয়, তখন আর তার মৃত্যুভয় থাকে না।

এই যে মানুষের নব নব মনোজগৎ গড়ে তোলা, সভ্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের চেষ্টায় ঐ লক্ষ্যেই তার শক্তি কেন্দ্রীভূত দেখা যায়। এবং মানুষ তার জীবন্ত কলেবর ততদিনই স্বীকার করে যতদিন সে দেখে যে তারও চেয়ে উন্নততর, সূক্ষ্মতর কলেবর ধারণ করবার সামর্থ্য না হয়েছে। প্রাণশক্তি স্বভাবতই স্বাধীনতা চায়; যখন দেখে যে পুরাতন দেহ থাকার দরুণই তার স্ব-ভাবের বিকাশের বাধা ঘটছে, তখন জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে স্ব-ভাব ব্যক্ত হবার অনুকূল নব নব দেহ ধারণ করে। আমরা

মুখে বলি বটে অমুক লোক অকালে মারা গেল, কিন্তু জগৎনিয়ন্তার নিয়মে জগতে অকালে কোন কিছুই ঘটে না—জন্মও নয়, মৃত্যুও নয়।

ফরাসী জাগরণ যে স্বাধীনতার মন্ত্র বিশ্বমানবকে শুনিয়েছিল, তা হচ্ছে গতানুগতিকতার আধিপত্য হতে প্রাণশক্তিকে মুক্ত করে নব নব মনোজগৎ এবং তা থেকেই সংসার সমাজ গড়ে তোলবার স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা মানুষের আছে। এ চেষ্টা একমাত্র মানুষেই আছে; কিন্তু ঐ চেষ্টা নিম্নস্তরের কামনায় কলুষিত হওয়ার দরুণ উহা মানুষকে সত্যই মুক্ত করতে পারে নি, মুক্তির আনন্দ তখনো কত দূরে ছিল।

তারপর সাম্য। মানুষে মানুষে শক্তির তারতম্য থাকাতে একবার সকলকেই সমান নিঃস্ব করে তারপর সম্পদ প্রত্যেককে সমানভাগে ভাগ করে দিলেও কিছুদিন পরে দেখা যায় কেহ বা ধনী হয়, কেহ বা আবার নিঃস্ব হয়; কেহ বা স্বভাবের বলে অন্যকে শাসন করে, কেহ বা শাসিত হতেই চায়। তামসিক ভাব যে মানুষে প্রবল, সে অন্যের অধীনই হতে চায়; রাজসিক ভাব যার যে পরিমাণে জাগ্রত হয়েছে সে অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। মানবসভ্যতার সুবর্ণরথ সহস্র চক্রের মেঘমন্দ্রে অবিরাম চলেছে সত্য, যারা এই রথের রথী, তারা সম্পদশালী, দীর্ঘায়ু, দেহে মনে বলিষ্ঠ; আর যাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সেই রথের চাকাগুলি ঘুরতে ঘুরতে চলেছে, তারা কি অসহায়, কি দরিদ্র! কোটী কোটী দীনদরিদ্রের প্রাণ শোষণ করেই না দিগ্বিজয়ী বীরের শিরে স্বর্ণমুকুট শোভা পেয়েছিল? ফরাসীগণ যে সাম্য স্থাপন করবার চেষ্টা করেছিল, তাহা বাহিরের ধন সম্পদের। মানুষ তার প্রয়োজনের চেয়েও অধিক অর্জ্জন করে এবং অর্জ্জিত সম্পদ নিজের ব্যবহারে না এলেও নিজের দখলে রাখে; এ থেকেই অবস্থার বৈষম্য হয় এবং এ বৈষম্য একমাত্র মানুষেই আছে।

অবস্থার বৈষম্য, মনের বন্ধন যদি রয়েই গেল, তা হলে মানুষে মানুষে মৈত্রী হবে কিরূপে? সত্য কথা। মানুষে মানুষে মৈত্রী। দুইটী জড়বস্তুকে পাশাপাশি গায়ে গায়ে, একটার পর আর একটাকে চিরকাল রেখে দেওয়া যায় সত্য; এবং যদি কোন দেশে কোন গ্রামে এমন দেখা যায় যে জনকতক পাশাপাশি গায়ে গায়ে বহুদিন ধরে রয়েছে, তা হলে তাতে প্রমাণ হয় তারা জড়, প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মাকে উপলব্ধি করবার যে ভগবৎদত্ত অধিকার আছে, তা হতে প্রত্যেকেই বঞ্চিত। আত্মা ত সর্ব্বক্ষণই ক্রিয়াশীল। "মানুষ কি? কত যুগ-যুগান্ত ধরে পরম পুরুষ প্রকৃতিতে আত্মভাব প্রকাশ করে আসছেন, মানুষে তাঁহই সুন্দর সমগ্র ভাবটী প্রকাশ হয়ে উঠছে; ইহাই না? এই জন্য মানুষ কি প্রকৃতির সকল চেষ্টার সুন্দর সফলতা নয়? ঐ যে সুদূর দিগন্তে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী রয়েছে, মানুষ কি তাদের চেয়েও গম্ভীরতর মহত্তর প্রকাশ নয়? প্রকৃতি নীরব আকাশ হতে, স্তব্ধ গিরিশ্রেণী হতে, কলকলনাদিনী তরঙ্গিণী হতে, বীচিবিক্ষুব্ধ সমুদ্র হতে তিল তিল গ্রহণ করে যে মানুষকে সৃজন করছেন, তার ভাষা কি! তার চিত্রানুরাগই বা কি! আলোকে এবং অন্ধকারে বিচিত্রা বহিঃপ্রকৃতিকে কিম্বা আনন্দে এবং বিষাদে আন্দোলিত অন্তঃপ্রকৃতিকে ভালবাসাই বা কি! এই প্রেমই ত প্রকৃতির পরম সুন্দর সফলতা! ইহারই জন্য আমাদিগকে কত কোটী যোজন স্থান উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়েছে; আজ সেই শ্রান্তিকর পথের অবসানক্ষণে, সেই দুর্গম যাত্রার অশ্রান্ত গতির লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হবার মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে স্থানের এবং কালের ব্যবধান অন্তর্হিত হয়ে গেছে, কেবল রয়েছে সেই দীর্ঘযাত্রার অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সাধকের চিদাকাশে একটী রসমধুর সঙ্গীতমূর্চ্ছনা"। "জগতের একটী মাত্র বস্তুই যথার্থ মূল্যবান—ক্রিয়াশীল আত্মা। প্রত্যেক মানুষই ইহা লাভ করবার অধিকারী। প্রত্যেক মানুষই ইহা নিজের মধ্যে ধারণ করে,—যদিও প্রায় সকলেরই অন্তঃকরণে ইহা বাধাপ্রাপ্ত এবং এখনও যেন জন্মগ্রহণ করে নি। ক্রিয়াশীল আত্মাই একমাত্র সত্য দর্শন করে, সত্য প্রচার করে,—ইহাই সৃজন করা। প্রতিভা ত সৃষ্টি করবার শক্তি—অনুগৃহীত জনের এখানে সেখানে দুই চারিটা সুবিধা ভোগের ন্যায় নহে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ দখলী সম্পত্তি। গ্রন্থই বল, বিশ্ব-বিদ্যালয়ই বল, কলা-নিকেতনই বল কিম্বা যে কোন অনুষ্ঠানই হউক না,—অতীতকালের কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তির আত্মপ্রচার ভিন্ন আর কিছুই নয়। প্রতিভার দৃষ্টি সম্মুখে, মানুষের চক্ষু তার কপোলের অস্থিতে, পশ্চাদ্ভাগে মস্তিষ্কের খুলিতে নয়; মানুষ আশা করে, প্রতিভা সৃজন করে; শক্তিশালী বুদ্ধিমানের মগজে যে কোন শক্তিই থাকুক না, তিনি যদি সৃজন না করেন, তাহা হলে ঈশ্বরের আবিষ্কৃত ঐশী সত্তাকে, শক্তিপ্রবাহকে তিনি আপনার করেছেন বলতে পারেন না; তাঁর মধ্যে অগ্নিময়ী ঐশীবাণী এখনও জ্বলে নি, কেবল মাত্র কতকগুলা ধোঁয়া এবং পোড়া কাঠ। এমন কতকগুলি চালচলন, কাজ করবার কৌশল আছে, আত্মার এমন কতকগুলি ক্রিয়া আছে, এবং এমন সকল ভাষা আছে, যারা সৃজনই করে থাকে, ইহা কোন প্রথা নির্দ্দেশ করে না কিম্বা কোন উপরওয়ালার শিলমোহরের ছাপ এদের গায়ে দেখা যায় না; অপর পক্ষে, সত্য এবং সুন্দরের উপলব্ধি হতেই ইহারা স্বতঃ উৎসারিত হয়"।

সমাজের সত্যের মধ্যে নিশ্চলভাবে দশজনের বহুকাল থাকাকে সত্তাবে থাকা বলা যায় না। চিৎশক্তি যার জাগ্রত, সেই সত্য সত্তাবে থাকতে পারে। মৈত্রী ত জড় বস্তুর মত গায়ে গায়ে লেগে থাকা নয়। মন যার জাগ্রত, ধীশক্তি যার একেকেই বহুর মধ্যে দর্শন তারই ত হৃদয় হতে যথার্থ আত্মজ্ঞাননিঃসৃত করুণা মৈত্রী পুণ্যধারার মত সকলের মধ্যে প্রবাহিত হয়। সেই সকল মানুষের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট আত্মাকে দর্শন করে দুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হন; সুখীর সৌভাগ্যে আনন্দিত হন। তিনিই যথার্থ লোকহিতৈষী হয়ে মানুষের তাপ নাশ করতে আত্মদান করেন।

ফরাশী-জাগরণ যে সাম্য প্রচার করেছিল, তা সমদর্শনে প্রস্ফুট হয় নি বলেই বিশ্বমানবের দিক হতে সমাজে "ভাব সেই একে" প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের অবস্থা ততক্ষণই পরাধীন, যতক্ষণ না মানুষ প্রকৃতিকে ঠিকমত জেনে যে পরম একে প্রকৃতি বিধৃত হয়ে আছে তাঁকে জানতে পারে; জানতে পারলেই সে বলতে পারে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

মানুষে মানুষে শক্তির তারতম্য থাকার দরুণ সকলের অবস্থা কখনই সমান হবার নয়। একবার সকলকে সমানভাবে সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করে দিলেও ধনবান্ তার স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য ইস্পাতে এবং ভাব-ভাবনায় তৈয়ারী অস্ত্র যতই নির্মাণ করবে, ততই তার সম্পদে আরও দশজনকে মনুষ্যত্বলাভের অনুকূল অবস্থা করে দেওয়ার আবশ্যকতা স্বীকার করবে না; প্রতিযোগিতায় পরস্পরকে অবিশ্বাস করবার কলুষতায়, এবং ইস্পাতে ও ভাব-ভাবনায় তৈয়ারী অস্ত্রের ঠোকাঠুকিতে, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, নেশনের সঙ্গে নেশনের সংঘাতে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এক মহা সমরানল জ্বলে ওঠে।

কিন্তু এই জন্যই সমদর্শনমূলক সাধনপ্রণালী প্রচার করা বিশ্বমানবের দিক হতে প্রয়োজন ছিল। এত পরাধীনতা, বৈষম্য, বৈরীবুদ্ধি ও বৈরী-আচরণ থাকলেও মানুষের আত্মা মুক্তি চায়, কর্ম্মচেষ্টা সাম্য চায় এবং হৃদয় মৈত্রী চায়। কেননা জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমের ভিতর দিয়েই না তার আত্মার প্রকাশ; বাধার অন্ত নেই, অথচ চেষ্টারও বিরাম নেই। ইহাই মানবজীবন লাভ করবার গৌরব। ইহা এক নিগূঢ় রহস্য সন্দেহ নেই, মুমুক্ষুগণের জীবন এই রহস্য উদ্‌ঘাটন ভিন্ন ত আর কিছুই নয়। ইহারই কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়ে আসছে। এই আকাঙ্ক্ষা, এই চেষ্টা, এই আশা জাতি-বর্ণনির্বিশেষে প্রচার করবার উদ্দেশ্যেই রামমোহন "ভাব সেই একে" মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। সমদর্শনের বিরাট উপলব্ধির মধ্যে তিনি ফরাশিগণের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাও গ্রহণ করেছিলেন, এবং সমদর্শিত্বের শান্তিময় প্রভাবে বিপ্লবের জ্বালা তাঁর মধ্যে প্রশমিত হওয়াতে দস্যুবৃত্তিবর্জ্জিত সাধনপথে ভারতবর্ষকে পরিচালন করেছিলেন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার উন্নতিলাভ করতে জ্ঞানে ও প্রেমে রত ছিলেন। যে জ্বালায় য়ুরোপ ভস্মীভূত হয়েছিল, সে জ্বালা আসলে বিশ্বাত্মারই বুকের জ্বালা। ধর্ম্মসংস্থাপন করবার জন্য বিশ্বাত্মা তেজোকালপুরুষের মূর্ত্তিগ্রহণ যে করেন, তার প্রমাণ ইতিহাসে বহুবার পাওয়া যায়। এ প্রকাশকে রামমোহনের আস্তিক মন উন্মাদের প্রলাপ বলে তিরস্কার করতে পারে নি। সেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের মূলে যে আত্মার আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং যিনি সহস্র সহস্র নর-নারীর শোণিতের উত্তপ্ত প্রবাহ দিয়ে তাঁর দুর্দ্দমগতিতে অমোঘ প্রভাবে দেশ হতে দেশান্তরে, পাপের আশ্রয় জীর্ণ কাঠামকে ধূলিসাৎ করে অগ্রসর হতে হতে যখন ভারতবর্ষের তীরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তখন রামমোহন তাঁকে ভারতে তুলে নিয়েছিলেন এবং তখন সেই পরমপুরুষ ভক্তের কাতরতায় ভীষণা মূর্ত্তি, লোকসংহারিণী চেষ্টা নিজের মধ্যে সংকোচিত করে রামমোহনকে তাঁর প্রসন্নমূর্ত্তি, লোকস্থিতির অনুকূল দিব্য জ্ঞান, বিমলা ভক্তি দান করেছিলেন। রামমোহন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক ভিত্তি সমদর্শন এবং অন্তরে বাহিরে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে পরমপুরুষ একই ভাবে নিত্য বিরাজমান তাঁকে কেবল নির্জ্জনে ধ্যানে নয়, নানা স্বার্থের সংঘাতে কলুষিত কর্ম্মক্ষেত্রেও উপলব্ধি করতেন। জাতি-বর্ণনির্বিশেষে লোকের হিতসাধনে তিনি যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, তার মূলে দেখা যায় এই সমদর্শন—"ভাব সেই একে"।

মানুষের এবং পরমপুরুষের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে কে? রহস্যময়ী প্রকৃতি। য়ুরোপের নবজাগ্রত মন এই প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হয়েছিল এবং এখনো যে সে মোহ নেই, তা বলা যায় না। প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা হতে নবযুগের য়ুরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞান উন্নতিলাভ করেছে। প্রকৃতির নানা ঋতুর বর্ণ, গন্ধ, সঙ্গীত তাদের মনকে অসংখ্য বাসনায় জাগিয়ে তুলেছে, প্রকৃতির আলোকচ্ছায়ায় তারা কখনো পুলকিত, কখনো বিস্মিত। কিন্তু প্রকৃতি বিধৃত হয়ে আছে যে পুরুষে,

তাঁকে ধ্যান করতে, তাঁকে জানতে জনসাধারণ সাহস করে নি, এবং তাঁর সামীপ্য লাভ করবার আনন্দও উনবিংশ শতাব্দীর কবিগণে পাওয়া যায় না; কেন না তাঁরা জীবনে তাঁকে ঠিকভাবে পান নি।

কিন্তু এ সত্বেও মানুষ পশুদের ন্যায় ইন্দ্রিয়সুখেই দিনযাপন করতে পারে না এবং তাহার হৃদয় কোন এক অদ্বিতীয়, অতীন্দ্রিয় পুরুষে বিশ্বাস, ভক্তি করতে চায়। ধর্ম্মজীবন এই বিশ্বাস, ভক্তি হইতেই আরম্ভ হয়। ধর্ম্মকে এক শ্রেণীর মানুষ আকারে যতই সঙ্কীর্ণ করুক্ না, মানুষের মনে ভাবের জন্য ধর্ম্মের জন্য এই যে ব্যাকুলতা, ইহা অত্যন্ত সত্য; এমন কি স্বাভাবিক। এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় পুরুষের স্নেহে, করুণায় বিশ্বাস না থাকলে নৈরাশ্যের অন্ধকার-রাত্রিতে, বেদনার তিমির-কুজ্ঝটিকায় মানুষ কার পানে চাইবে? সে যে নিতান্তই ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, অসহায়! তার অন্তঃস্থান কোন এক মহান্ পুরুষের বরাভয়করের আশ্রয়ে না দাঁড়ালে যে আত্মঘাতী হয়ে ওঠে, সকাল-সন্ধ্যা পিতামাতাকে প্রণাম না করলে তার সংসারযাত্রা যে আত্মঘাতিনী হয়ে ওঠে। আত্মিক জীবনের ব্যর্থতা প্রতিমুহূর্ত্তেই তাকে মর্ম্মাহত করতে থাকে। কোন এক সুদূর ভবিষ্যতে তার আশা সফল হবে, এ বিশ্বাস না থাকলে আত্মিক জীবন যে তার পক্ষে দুর্ব্বহ!

সেই জন্য বিশ্বমানবকে মহাত্মা রাজা রামমোহন তথা ব্রাহ্মসমাজ জীবনের মূল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন এবং এখনও দিচ্ছেন—

"ভাব সেই একে"!

রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরিভাষা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত "প্রকৃতি"—পত্রের গত শীতসংখ্যায় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রাসায়নিক পরিভাষা" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি শুধু সুন্দর বলিলে চলিবে না, ইহার ছত্রে ছত্রে বিজ্ঞানপ্রীতি ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে লেখকের অন্তর্নিবেশ পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রবন্ধ অবলম্বনে আমাদেরও দুই চারিটি বক্তব্য বলিবার অধিকার আছে মনে করি, কারণ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই।

লেখক একস্থলে বলিয়াছেন—"কেহ কেহ বলেন যে, স্বতন্ত্র পরিভাষার প্রয়োজন নাই, ইংরাজী শব্দগুলি যেমন আছে সেইরূপ রাখিলেই চলিবে।" প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় এবিষয়ে লেখক একমত নন। লেখক ভীতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, "অতগুলি ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিলে বঙ্গভাষার দফারফা হইবে এবং কালে ইহা ইংরাজী হইতেই উদ্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইবে।" আমরা যদিও লেখকের এই আশঙ্কার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করি না, তথাপি তাঁহার সঙ্গে এবিষয়ে একমত যে, স্বতন্ত্র পরিভাষার প্রয়োজন আছে। জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশের যে দৃষ্টান্ত লেখক উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে এবং আমাদের সহজ বুদ্ধিতে স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, বিজ্ঞানে উন্নতি ও সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে বাল্যকাল অবধিই বিজ্ঞান শিক্ষা করা উচিত, এবং তাহা করিতে গেলেই সরল বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ পড়িতে হইবে; সুতরাং তাহার জন্য বাংলা পরিভাষা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ৺অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বারা অনুবাদ করাইয়াও বাংলা ভাষায় বিস্তর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখানো হইত। আমার বেশ মনে পড়ে, আমার তখন ৭।৮ বৎসর বয়স; সেই সময়ে ৺অক্ষয়কুমার দত্তের বাংলা "পদার্থবিদ্যা" গ্রন্থ ছিল বলিয়াই পিতৃদেব আমাদিগকে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম শিক্ষা দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অক্ষয় কুমার দত্তের পরেই পিতৃদেব ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ এবং তৎসঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংরচনে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার ম্যাকনামারা সাহেবের রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতাক্ষেত্রে বহিশ্ছাত্ররূপে উপস্থিত থাকিয়া notes লিখিয়া আনিতেন এবং গৃহে আসিয়া সদ্য সদ্য তাহা হইতে বক্তৃতার বিষয় যথাসম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল বাংলায় লিপিবদ্ধ করিতেন। তাঁহার লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়া শ্রদ্ধেয় ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মত পণ্ডিতবরেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। আজ ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম" বলিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সকল বিভাগই স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ত্রিবেদী মহাশয় লিখিতেছেন—"এই গ্রন্থে তাড়িতবিজ্ঞান শব্দবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখার সম্বন্ধে প্রস্তাব আছে। এই গ্রন্থের রচনার পূর্ব্বে বোধ হয় এই সকল বিষয়ে কেহ কোন কথা লেখেন নাই, অদ্যাপি সম্যক চেষ্টা হইয়াছে বোধ হয় না।" * * * "গ্রন্থকার বিবিধ বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সংকলনে বিশেষ

উদ্যোগী ছিলেন। ইহার মধ্যে অনেকে ভাষায় স্থায়িত্ব লাভ করিবে আশা করি।"

৺অক্ষয়কুমার দত্ত, পিতৃদেব ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আধুনিক পরিভাষা-রচয়িতাদিগের কার্য্যফল পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, কতকগুলি ইংরাজী শব্দ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করিলে মন্দ হয় না। দৃষ্টান্ত দিই—অক্সিজেন শব্দ। বাল্যকাল অবধি আমরা "কেতাবে" পড়িয়া আসিয়াছি—অক্সিজেনের বাংলা অম্লজান। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া গ্রন্থসাহায্যে অধীত হইলেও উহা তো সাধারণ্যে প্রচলিত হইল না। কারণ কি? কারণ এই যে, স্কুল-কলেজে ঐ গ্রন্থে পড়া বাদে সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা অক্সিজেন শব্দই ব্যবহৃত হয়। ডাক্তারখানায় গিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে—'রোগীর প্রাণসংশয়, ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন অক্সিজেন দিতে হইবে, অতএব অক্সিজেন দিবার যন্ত্র দাও।' এই স্থলে যদি অম্লজান দিবার যন্ত্র চাওয়া যায়, তবে কর্ম্মচারীরা কতকক্ষণ হয় তো আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া দিবে—'অম্লজান কি তাহা জানি না এবং তাহা দিবার যন্ত্রও নাই।' এই সকল কারণে অতিপ্রচলিত শব্দগুলিকে অপ্রচলিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া সেগুলিকে আত্মসাৎ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে করি। আর একটি ঐরূপ শব্দ মনে পড়িতেছে—সোডা। পিতৃদেব উহার প্রতিশব্দ দিয়াছেন "সর্জ্জিকা"। কিন্তু আমার মতে "সোডা" শব্দকে বাংলাভাষার বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করা কর্ত্তব্য। তবে ঐ সকল শব্দের অনেকগুলি প্রতিশব্দ বা synonymn রাখিতে চাও, সে তো ভাল কথা—গ্রন্থরচনার সময় নানাভাবে নানা শব্দের ব্যবহার আবশ্যক হয়।

উপরে যে মত বলিলাম, তদনুসারে অক্সিজেনের লেখক-প্রদত্ত "অক্ষজন" শুনিতে মূলের অনেকটা কাছাকাছি গেলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থায়িত্ব—শুধু কেতাবে নহে, কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদয়ে—লাভ করিবে কি না সন্দেহ। এক্ষেত্রে সেই সাহেবের বাংলা শেখার কাহিনী মনে পড়ে। সাহেব অনেক কাল ধরিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট বাংলা শিখিয়া একদিন মনে মনে স্থির করিলেন যে তিনি বাংলা সুন্দর শিখিয়াছেন এবং পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট পরীক্ষা দিতেও স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে একদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে পণ্ডিতমহাশয় সাহেবকে একটা নৌকা ডাকিয়া দিতে বলিলেন। সাহেব ডাকিলেন—"কর্ণধার! তরণী তীরে লইয়া আইস।" কে-ই বা তাঁহার কথা বোঝে; কাজেই কে-ই বা তাহা শোনে। শেষে তাঁহার পণ্ডিত মহাশয় যখন হাঁক দিলেন—"ও—মাঝি, নাউ কিনারে ভিড়া", তখন মাঝি কথাটা বুঝিল এবং নৌকাটা কিনারায় আনিল। সেইরূপ আশঙ্কা হয় যে, ইংরাজী অতি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির, মূল ধরিয়াই হোক বা অন্য যে কোন উপায়েই হোক, বঙ্গানুবাদ করিয়া চালাইতে গেলে আমাদেরও অবস্থা ঐ সাহেবের মত হইবে। লেখক ইংরাজী বৈজ্ঞানিক শব্দ গ্রহণের সঙ্গে কলিকাতাকে "Calcutta" উচ্চারণ করিবার যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রদত্ত প্রতিশব্দগুলির মধ্যে নিম্নের কয়েকটি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল এবং সেগুলির স্থায়িত্বের আশা আছে বলিয়া মনে হয়:—অক্ষজন (যদিও বহুল-প্রচারিত বলিয়া অক্সিজেন শব্দই বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করি), আর্দ্রজন, কারবণ, বরমীণ, ভাস্করস (এখানেও বহুল-প্রচারিত বলিয়া ফস্ফরস শব্দকেই বজায় রাখা সঙ্গত মনে করি), শুল্বারি, শিলাকণ, তলরম এবং বোরণ। nitrogenএর প্রতিশব্দ নেত্রজন ব্যবহার চলিবে কি না সন্দেহ—প্রথমেই নেত্র অর্থে চক্ষুই সর্ব্বপ্রথম মনে আসে, যাহার সঙ্গে nitrogenএর কোনও সম্বন্ধ নাই। ক্লোরীনকে প্লোরীন করিবার সার্থকতা দেখি না। কুসহরিণ (chlorine), এতিন (iodine) আমাদের তো মনে হয় অচল। অন্তমণীকম (antimony), আর্জ্জনিক (arsenic) চলিলেও চলিতে পারে। বিষমদ (bismuth) অর্থে, যে বিষে মত্ততা আসে, এই প্রকার একটা কোন ভাব মনে জাগে। সলিলীনম (selenium) চলিলেও চলিতে পারে। যেগুলি চলিতে পারে, দেখিতে হইবে, সেগুলি চলিলেও তাহাদের conotationএ কোন প্রকার গোলমাল না বাধিয়া যায়। লেখক ইংরাজী শব্দের ফরাশি ও জার্ম্মন যে প্রতিশব্দ দিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, একই শব্দ বিভিন্ন ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, কেবল উচ্চারণের তারতম্যে যেটুকু পার্থক্য ঘটিয়াছে।

স্বতন্ত্রভাবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অবতারণা করিলে যাঁহারা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানচর্চ্চার অসুবিধার কথা বলেন, তাঁহাদের যুক্তি সবল বলিয়া মনে হয় না। আমরা যে ইংরাজী বা ফরাসি বা জর্ম্মন ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্যত হই, ইহাই তো ঐ যুক্তির মূলচ্ছেদন করিতেছে। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান যদি এতদূর সমুন্নত হয় যে, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক আসন অধিকার করিতে পারে, তবে তো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির বৈজ্ঞানিকগণ বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া বাংলায় প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আয়ত্ত করিতে বাধ্য হইবেন।

উপসংহারে পিতৃদেবরচিত "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের

মূলমন্ত্র" গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদত্ত কতকগুলি ইংরাজী শব্দ ও তাহার বাংলা প্রতিশব্দ আগামী সংখ্যায় দিবার ইচ্ছা রহিল—তন্মধ্যে কতকগুলি পিতৃদেবের রচিত এবং অপরগুলি বিজ্ঞানভিক্ষু ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের রচিত। এই সকল প্রতিশব্দ হইতে বুঝা যাইবে যে পূর্ব্বে প্রধানত ইংরাজী শব্দের ব্যুৎপত্তি ও তাহার অর্থের উপর নির্ভর করিয়াই প্রতিশব্দ রচিত হইত। মণীন্দ্রবাবু এগুলিরও প্রতি মনোযোগ দিয়া ইংরাজীতে যেমন Dictionary of Scientific terms আছে, সেইরূপ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের এক এক বিভাগের এক একটি ক্ষুদ্রাকৃতি অভিধান প্রণয়ন করিলে বাংলায় বিজ্ঞান-লেখকের অত্যন্ত উপকার হয়। এবিষয়ে আমরাও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। *

নবপত্রিকাপ্রবেশ †

(দুর্গোৎসব)

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

নবপত্রিকাপ্রবেশ দুর্গোৎসবের প্রাথমিক ও প্রধান অঙ্গ। অন্য কোন দেব-দেবীপূজায় নবপত্রিকাপ্রবেশের আবশ্যক হয় না। এই নবপত্রিকাপ্রবেশের মর্ম্ম অবধারণ জন্য ইতিপূর্ব্বে যে ভাবে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, বিষয়টি পরিস্ফুটভাবে সাধারণের চক্ষে তেমন ভাবে ধরা হয় নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় "মৎস্যপুরাণোক্ত দুর্গাপূজাবিধি" প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাই আমরা অবলম্বন করিয়াছি। অনেকের মতে মৎস্যপুরাণোক্ত পদ্ধতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। দুর্গাপূজা সম্বন্ধে অন্যান্য পুরাণ-তন্ত্রোক্ত বিধি প্রচলিত থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ তত অধিক নহে। দুর্গোৎসবের পূর্ব্ব দিনে অর্থাৎ ষষ্ঠী তিথিতে সন্ধ্যায় বোধনীয় বিল্ববৃক্ষ সমীপে গিয়া বোধনের কার্য্য হইয়া থাকে, কখন কখন দিনদ্বয় পূর্ব্বেও হইয়া থাকে। দিনদ্বয় পূর্ব্বে বোধনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে "দিনদ্বয়াৎ পূর্ব্বং বোধনে কর্ত্তব্যে 'পরশ্বঃপ্রভৃতি-কর্ত্তব্য' ইত্যুল্লেখ্যং"; অন্যথা পূর্ব্বদিনে হইলে "শ্বঃপ্রভৃতি" এই বাক্যের উল্লেখ করিতে হয়। শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করিয়া—

ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ॥
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে দেবাস্ত্রেণ চ তাড়িতাঃ॥

বেতাল, পিশাচ, রাক্ষস, সরীসৃপ, দেবীর অস্ত্র দ্বারা তাড়িত হইয়া দূরে গমন করুক, এই বলিয়া উহা ছড়াইতে হয়। শ্লোকান্তরে আছে যে—

দেশাদ্ অস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥

তাহারা আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া (দূর হইতে) আমাদের পূজা নিরীক্ষণ করুক। মূল পূজা-সময়ে মধ্যে মধ্যে শ্বেতসর্ষপ বিকীরণের ব্যবস্থা আছে। সর্ষপের উগ্রগন্ধে সরীসৃপাদি পূজাচত্বর হইতে পলাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাক্ষসাদি বিতাড়নের সম্ভাবনা কোথায় তাহা বুঝা যায় না। বেতাল, পিশাচ ও রাক্ষস কেন তাঁহাদের লক্ষ্যীভূত তাহা অনিশ্চিত। পূজার মন্ত্রের ভিতরে অনেক স্থলে "ততো ভূতাপসারণং কুর্য্যাৎ" এই মন্ত্রের উল্লেখ আছে। ভূতপ্রেতাদি এই শ্বেতসর্ষপ বলি দ্বারা প্রসন্ন ও প্রসাধিত হয়, ইহাই ধারণা।

যাঁহাদের বাটীতে বহুদিন হইতে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে, তাঁহাদের বাটীর দালানে বা চণ্ডীমণ্ডপের অদূরে বিল্ববৃক্ষ রোপিত থাকে এবং ঐ বৃক্ষ শাখাপত্রে প্রকাণ্ড হইয়া যায়। যাঁহাদের ঐরূপ বৃক্ষ নাই তাঁহারা বিল্বশাখা লইয়া পূজার দালানের রোয়াকের উপরে গামলায় বা টবে উহা স্থাপন করেন, ঐ বিল্ববৃক্ষ বা শাখার আমন্ত্রণ-মন্ত্র এই—

ওঁ মেরু-মন্দার-কৈলাস-হিমবচ্ছিখরে গিরৌ।
জাতঃ শ্রীফল-বৃক্ষ ত্বমম্বিকায়াঃ সদাপ্রিয়ঃ॥
শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফল শ্রীনিকেতন।
নেতব্যোঽসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ॥

মোটামুটি অর্থ এই;—গিরিশিখরে তোমার জন্ম, তুমি অম্বিকা বা দুর্গার সদাপ্রিয়; আমি তোমাকে লইয়া যাইতেছি, তুমি চল; তুমি দুর্গার স্বরূপ।

পূর্ব্বের মন্ত্রে আছে ইহাগচ্ছ * * "ওঁবিল্ববৃক্ষায় নমঃ। ইতি পাদ্যাদিভি বিল্ববৃক্ষং পূজয়েৎ।"

পরে আছে

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলা গতিঃ।
অদ্য মে সফলং সর্ব্বং যস্মাৎ ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ॥

*　　　*　　　*

ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভূত বৃক্ষরাজ নমস্ত তে।

*　　　*　　　*

যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি।

অর্থাৎ অদ্য আমার জন্ম সফল, কেননা আমার গতি সফল; আমার আজ সবই সফল, কেন না তুমি শঙ্করপ্রিয়।

তাহার পরে বিল্ববৃক্ষে বা শাখায় পাদ্যাদি ও পঞ্চগব্য প্রদান করিয়া উহার স্তব করিতে হয়, এবং গন্ধপুষ্পাদি বৃক্ষকে নিবেদন করিয়া "ওঁ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ" এই মন্ত্রে উহার অর্চ্চনা করিতে হয় এবং ৭ কের সূত্র দ্বারা উহার

---

* "প্রকৃতি" হইতে।

† এই বিবরণ হইতে অনেক ইতিহাসঘটিত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তঃ সঃ।

কাণ্ডচতুষ্টয় বেষ্টন করিতে হয়। তাহার পরে নবপত্রিকা যোজনা করিতে হয়। ঐ নবপত্রিকা হইতেছে—

রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ।
অশোকো মানকশ্চৈব ধান্যাদি নবপত্রিকাঃ॥

এখানে রম্ভা অর্থে কদলী (পত্র সহিত কলাগাছ), কচ্চী অর্থে কচু (পত্র সমেত), হরিদ্রা অর্থে হলুদ গাছ (পত্র সমেত), জয়ন্তী, বিল্ব অর্থে বেলগাছ, দাড়িম লৌকিক ভাষায় ডালিম, অশোক, মানক অর্থে মানকচু (পত্র সমেত), ধান্য (অঙ্কুরোদ্গত পত্র সমেত) ধানগাছ, ইহাই নবপত্রিকা। তাহার পরে মৃন্ময়ীস্থানে লইয়া গিয়া নির্মঞ্ছনাদি (বরণাদি) করিয়া এবং গণপতি আদি নানা দেবতাকে পূজা করিয়া এবং ভূত-দৈত্য-পিশাচের উদ্দেশে মাষভক্ত-বলি (মাষকলাই মিশ্রিত ভক্ত বা ভাত, এখানে আতপ চাউল) প্রদান করিয়া গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করিবে। ইহাই সংক্ষেপে অধিবাস-বিধি।

তৎপরে সপ্তমী তিথিতে যজমান বিল্ববৃক্ষ সমীপে যাইয়া শাখাকে স্নান করাইয়া তীক্ষ্ণ কাটারি যোগে উহার শাখা ছেদন করেন। ছেদনের মন্ত্র হইতেছে ওঁ ছিন্দি ছিন্দি ফট্ ফট্ স্বাহা। তাহার পরে পুটাঞ্জলি পূর্ব্বক পাঠ করিতে হয় * *

নেতব্যোঽসি 'ময়া' গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ।

আমি তোমাকে লইয়া যাইতেছি, চল; আমি তোমাকে দুর্গাস্বরূপে পূজা করিব।

বিল্বশাখাং সমারুহ্য শ্রিয়ং রাজ্যং প্রযচ্ছ মে।

তুমি বিল্বশাখায় আরোহণ করিয়া আমাকে শ্রী ও রাজ্য প্রদান কর। তোমার শাখাচ্ছেদন জনিত যদি কষ্ট হইয়া থাকে,

ক্ষম্যতাং বিল্ববৃক্ষেশ বিল্ববৃক্ষ নমোঽস্তু তে।

হে বিল্ববৃক্ষেশ! আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গাপূজাং করোম্যহং।

আমি তোমার শাখা লইয়া দুর্গাপূজা করিব।

ওঁ চত্তিষ্ঠ বরদে দেবি সর্ব্বকল্যাণ-হেতবে।

হে সর্ব্বকল্যাণের কারণরূপা, তুমি উত্থান কর এবং আমাদের সকলের পূজা গ্রহণ কর।

তাহার পর ফলযুগলযুক্ত বিল্বশাখা গ্রহণ করিয়া নবপত্রিকার সহিত একত্রিত করিয়া আসনে স্থাপন করিবে।

তাহার পর জলপূর্ণ ঘটে নবপত্রিকার স্নানের ব্যবস্থা; এবং নবপত্রিকার প্রত্যেকের স্বরূপের বর্ণনা। কদলী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তুমি বিষ্ণুভক্তা পার্ব্বতী এবং তুমি রম্ভারূপধরা, তুমি সুরার্চ্চিত অর্থাৎ দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা। কচুর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তুমি স্থাবররূপা ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। তুমি দুর্গারূপে আমাকে বিজয় দান কর। হরিদ্রা, তুমি রুদ্ররূপা এবং সকলের প্রিয়; তুমি বৃক্ষরূপে আমাকে সর্ব্বশান্তি দান কর। জয়ন্তি! তুমি জগতের জয়ের জন্য জয়রূপে আমাকে জয়দান কর, বিল্বের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তুমি শ্রীফল ও শ্রীনিকেতন। দাড়িম তুমি মহাদেব-প্রিয়, তুমি বৃক্ষরূপে আমাকে সর্ব্বশান্তি দান কর। অশোক! শোকশান্তির জন্য তোমাকে স্নান করাইতেছি, আমাকে শোকশূন্য কর। মানকচু! তোমাকে সুরাসুর সকলেই মান্য করে, আমাকে মান দান কর। লক্ষ্মী তুমি ধান্যরূপা, সকলের প্রাণদাত্রী; তুমি আমার গৃহে স্থিরা হও।

ওঁ স্থিরা ভব সদা দুর্গে নবপত্রীসমাবৃতে।
সদা ত্বং পূজিতা দুর্গে স্থিরা ভব হরপ্রিয়া॥

হে নবপত্রীসমাবৃত দুর্গা, তুমি স্থির হইয়া থাক।

তাহার পরে অপরাজিতা লতায় সকলগুলিকে বেষ্টন করিয়া দিতে হয়। ইহার পরে ব্যাপক সংকল্পান্তর বিশেষ সংকল্প করিয়া সপ্তমী পূজা আরম্ভ করিবে।

এইখানেই নবপত্রিকা-প্রবেশ শেষ হইয়া গেল। নয়টির মধ্যে রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, মানকচু ও ধান্য—এই পাঁচ দফা ঔষধি; এবং জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব ও অশোক এই চারিটি বনস্পতি। এই নয়টিকে লইয়া নবপত্রিকা। অশোক ভিন্ন আর সবকয়টি আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য। অশোকপুষ্প দেখিতে সুন্দর এবং উহার পত্র ও ত্বক্ ঔষধের অঙ্গ। মানশব্দের সঙ্গে সম্মানের এবং অশোক-শব্দের সহিত শোকহীনতার যোগ আছে, তাই বুঝি নব-পত্রিকার সহিত ইহাদের মিলন। বৈদিক দেবতাতত্ত্বের ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা কিছু আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় ব্যবহারের বা চিত্তবিনোদনের বস্তু তৎসমুদয়ই দেবতাপদবাচ্য; এমনকি অক্ষক্রীড়ার অক্ষ, উদূখল, মুষল ও ওষধি পর্য্যন্ত বৈদিক দেবতার অন্তর্গত। উপনিষদের ভিতরে দেখা যায়, "যঃ ওষধিষু যঃ বনস্পতিষু" অর্থাৎ যিনি ওষধি বা বনস্পতি নহেন অথচ তাহাদের মধ্যে বিরাজমান, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। দুর্গাপূজার প্রকৃত রূপ জানিতে হইলে নবপত্রিকাপ্রবেশ-রহস্য আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। অনেকে বলিতে চান দুর্গোৎসবের ভিতরে আধ্যাত্মিক রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বা উহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা সম্ভবপর। আমরা তাহা স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত। ওষধি-বনস্পতির ভিতরে বৈদিক সময়ের মত ভগবদ্দর্শনের চেষ্টা ইহার অন্তর্নিহিত থাকিলেও পূজক বা গৃহস্বামী ইহাকে সে ভাবে বুঝিতে আদৌ চেষ্টা করেন না। রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র যে দুর্গাপূজার সূচনা করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐরূপ মন্ত্র

যে দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে দেখা যায়, তাহা মূল বাল্মীকীয় রামায়ণ হইতে সায় পায় না। উপরে নবপত্রিকাপ্রবেশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা নিতান্ত সংক্ষেপ, সকল মন্ত্রার্থ গ্রহণ করা হয় নাই বা করিবার আবশ্যক নাই। নবপত্রিকাপ্রবেশের মোটামুটি ব্যাপার বুঝাইবার জন্য আমাদের এই প্রয়াস। বিল্ববৃক্ষের সহিত দেবীর ঘনিষ্ঠতম যোগের ব্যাপার রহস্যময়। এই নবপত্রিকা প্রবেশ হইতে অন্তত এইটুকু বুঝা যায় যে, দুর্গার মূর্তিকল্পনা তখনও পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, উহা পরবর্তী সময়ে সংযোজিত। আর একটি কথা, নবপত্রিকা-প্রবেশে এই বিল্ববৃক্ষ বা বিল্বশাখাকে প্রাধান্য দান করা হইলেও এবং "পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ" এই কথার উল্লেখ থাকিলেও উহার মধ্যে একটি সমন্বয়ের ভাব রহিয়াছে। বিল্ববৃক্ষের সহিত আর আটটি ওষধি ও বনস্পতির সমাবেশ। হইতে পারে নবপত্রিকার প্রত্যেকটি বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক বিভিন্ন ভাবে দেবতারূপে পরিলক্ষিত হইত কিন্তু নবপত্রিকাপ্রবেশে প্রত্যেকটিকে মর্য্যাদা দান করিয়া সকলকে একীভূত করা হইয়াছে, কাহাকেও অবহেলা বা উপেক্ষা করা হয় নাই। তখনকার দিনে এই ভাবে প্রচলিত ধর্ম্মকে এক সার্ব্বভৌমিক আকার দান করা হইল; এবং পরস্পরের মিলনের পথ সুগম করা হইল, ইহাই আমাদের ধারণা। এই নবপত্রিকাপ্রবেশের ভিতরে আমরা প্রাচীন যুগের এক সময়ের ধর্ম্মের ও ধর্ম্মচিন্তার চিত্র দেখিতে পাই, যাহা বর্ত্তমান সময়ের ঠিক উপযোগী না হইলেও প্রাচীনত্ব হিসাবে মূল্যবান্।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

(শ্রীললিতমোহন দাস এম-এ)

[৩০এ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ সাধারণব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিবৃতির মর্ম্ম]

প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর
এই ভাবে দিন কাটুক আমার।

শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বলিখিত এই বাক্যটি তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন ঈশ্বরচরণে; আর তাঁহারই প্রীতি-প্রেরণায়, তাঁরই প্রিয় কার্য্যবোধে দেশের ও মানবের নানা ভাবে সেবা করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক; তিনি জীবনের এক নূতন আদর্শ প্রচার করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন; তিনি এদেশের বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্ত্তক; ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে প্রধান সহায়; সমাজসংস্কারে অগ্রণী; রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রধান আন্দোলনকারী; তিনি একাকী দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণে অধিক ব্রতী ছিলেন; কিন্তু সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল ব্রহ্মোপাসনা—'সেই এক' তিনি এক অদ্বিতীয় নিরাকার সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক পূজা নিজ জীবনে ও দেশে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন এবং ঈশ্বরপ্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই দেশের সর্ব্ববিধ মঙ্গলসাধনে ব্রতী হন। তাঁহারই আদর্শ অবলম্বন করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জীবন নিয়মিত করিলেন; এবং রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"—এই মহাবাক্যে প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য প্রচারক ও আচার্য্যগণও এই আদর্শ জীবনে ও দেশে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য্য শিবনাথও সেই আদর্শ জীবনে গ্রহণ করিলেন এবং প্রাণ ব্রহ্মচরণে রাখিয়া জীবন মন শক্তি অর্থ দিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন।

ভগবান এক-একটী জীবন অবলম্বন করিয়া এক একজনকে ডাকেন। কেহ সে ডাক শোনে, কেহ শোনে না। শিবনাথের পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁহার পিতা তাঁহার প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে বাধ্য করেন। কাজটা খুব অন্যায় হইতেছে বুঝিয়াও কঠোরপ্রকৃতি পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁর প্রাণে এই অন্যায় কার্য্যের জন্য তীব্র অনুশোচনা উপস্থিত হইল, কিছুতেই প্রাণে শান্তি পান না। তখন স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের উপদেশে ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে প্রাণে শান্তি আসিল। এই যে তিনি ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, আর জীবনে তাঁহাকে ছাড়িলেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থা জন্মিল, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কেবল তাহা নয়, ব্রহ্মের উপাসনাই যে মানবের একমাত্র সম্বল, ব্রাহ্মধর্ম্মই যে একমাত্র সত্যধর্ম্ম তাহা বুঝিতে পারিয়া আপনার সুখ, স্বার্থ, খ্যাতি ও যশ—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে, ঈশ্বরের নামের মহিমা প্রচারে ব্রতী হইলেন। চৈতন্যদেব যেমন বলিয়াছিলেন, "লোকের পায়ে ধরি ভজাইব হরি" আচার্য্য শিবনাথেরও জীবনের ব্রত হইল—মানবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া মধুর ব্রহ্মনাম প্রচার করিব। তিনি সাহিত্যসেবা, শিক্ষাদান, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক উন্নতি প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্যেই অল্পাধিক পরিমাণে লিপ্ত ছিলেন; ঈশ্বরের প্রীতি-প্রেরণায় তাঁরই প্রিয়কার্য্যবোধে দেশের কল্যাণকার্য্যে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রধান কাজ ছিল দেশে দেশে ব্রহ্মের নাম প্রচার করা।

তিনি দরিদ্র ছিলেন, ইচ্ছা করিলে ধন উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিতেন, দেশে

সমাজে মান-প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু সকল পায়ে ঠেলিয়া ঈশ্বরের নামপ্রচারে জীবন-মন অর্পণ করিলেন, দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিলেন।

(১) তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "শাস্ত্রী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষাকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তিনি হইতেন, কিন্তু ঈশ্বরের ডাক আসিল, সে বাণী তিনি লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি নিজেই কবিতায় লিখিয়াছেন:—

শোনরে শোনরে তাঁর বাণী
মধুর আহ্বান রে।

* * *

যে বাণী পরশ পেয়ে নরনারী আসে ধেয়ে
সঁপিবারে জীবন যৌবন।

তাই তিনিও ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া তাঁর নামপ্রচারে জীবন যৌবন অর্পণ করিলেন, দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিলেন। তাই তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

আয় তবে আয় মোর দরিদ্রতা,
ক্লীবর-শোষিণী পৈত্রিক দেবতা
আয় বজ্রধ্বনি আয় কালজয়ী
নরশক্র যারা আয় সবে তোরা
ঘের আসি চৌদিকে করিয়ে জনতা।

আবার লিখিয়াছেন—

আমি বড় দুঃখী তাহে দুঃখ নাই,
পরে সুখী করি, সুখী হতে চাই;
আপনি কাঁদিব কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি এই ভিক্ষা চাই।

তিনি কার্য্য ত্যাগ করিলেন, আর তিন মাস থাকিলে একটা বোনাস্ পেতেন, তাহার প্রলোভনও তাঁহাকে রাখিতে পারল না। পিতামাতা কত আশা করিয়াছিলেন, তাঁর নিজেরও সুখ হইত, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ পাইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন, ব্রহ্মের ডাকে সব ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইলেন, তাঁর নামপ্রচারে ব্রতী হইলেন।

(২) তিনি সুকবি ছিলেন; বাংলা সাহিত্যে অগ্রণী ছিলেন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেই যদি নিজের শক্তি নিয়োগ করিতেন, তবে অর্থও হইত, এবং দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বরের আহ্বানে সে অর্থ ও প্রতিপত্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিলেন।

(৩) তিনি বাল্যকাল হইতেই সমাজসংস্কারক ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অনুপ্রাণনা পাইয়া বিধবাবিবাহপ্রচলনে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁর বন্ধু ৺যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ দিয়া তাঁর পরিবারপ্রতিপালনের জন্য নিজের বৃত্তির টাকা ব্যয় করিয়াছেন, শারীরিক কত পরিশ্রম করিয়াছেন। জাতিভেদ দূর করিবার জন্য, নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা প্রদান জন্য, বাল্যবিবাহ রহিত করা, প্রভৃতি সমাজসংস্কার কার্য্যেই আজীবনই তিনি নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যদি সমগ্র হৃদয়-মন এই সমাজসংস্কারে কার্য্যেই দিতেন, তাহা হইলে কত প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন কিন্তু এসব কাজ তিনি আজীবন করিলেও প্রধান কাজ ছিল তাঁর ঈশ্বরের নাম প্রচার করা।

(৪) রাজনীতিক আন্দোলনেও তাঁর প্রাণের সহানুভূতি ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের সঙ্গে মিলিত হইয়া তিনি ভারতসভা (Indian Association) স্থাপন করেন; দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টায় তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করার পর রাজনীতিক আন্দোলনে তিনি বেশী যোগ দিতে পারিতেন না; তবুও তাঁর মনপ্রাণ সেদিকে ছিল। বঙ্গ-বিভাগজনিত বেদনায় পীড়িত হইয়া বঙ্গবাসী যখন "স্বদেশী আন্দোলন" আরম্ভ করিল, তখন সেই ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ বিভাগের দিনে তিনি দার্জ্জিলিং ছিলেন; সেখানে প্রতিবাদসভায় তিনি সভাপতির কাজ করেন। আর সেই ১৯০৮ সালে প্রীতিভাজন কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নয়জন রাজনৈতিক বিনা বিচারে ১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে নির্ব্বাসিত হন, তখন এই নির্ব্বাসনের প্রতিবাদসভাতে রাজনৈতিক নেতাদের ভিতরেও আর কাহাকেও সভাপতির কাজ করিতে পাওয়া গেল না! সুরেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি শাস্ত্রীমহাশয়কে ধরি, তিনিই গিয়া সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং সেই প্রতিবাদ সভার সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তখন লোক ভয়ে অস্থির; কিন্তু তিনি অকুতোভয়। তাঁর রাজনৈতিক মত ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি তখন —সেই বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময়—অসুস্থ হইয়া ডাঃ মোহিনীমোহন বসুর বাড়ীতে আসেন। তাঁহার রাজনৈতিক মত জানিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়। তিনি বলিলেন, শাসন কার্য্য তিন প্রকার হইতে পারে; (১) Benevolent Despotism শুভাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত একতন্ত্র শাসন; (২) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এখন যাহাকে বলা হয় Dominion status (৩) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—Complete Independence; এর প্রথম রকম এখন চলিতেছে উহা আমরা চাহি না। দ্বিতীয় রকম—ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র;

উহারা আমাদের দিবে না। সুতরাং আমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে। এই রাজনীতিক্ষেত্রে যদি তিনি থাকিতেন, তাঁর মত সুবক্তা, সুবিবেচক, নির্ভীক, ত্যাগী পুরুষ এক্ষেত্রে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে সম্মান পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নাম প্রচারে ব্রতী হইলেন।

তাঃ বলি জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেশের নানা প্রকার মঙ্গলকার্য্যে তিনি ব্রতী ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত ছিল—ঈশ্বরের নাম প্রচার; "লোকের পায়ে ধরি, ভজাইব হরি" "প্রাণ ব্রহ্ম পদে, হস্ত কার্য্যে তাঁর"—এই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এর জন্য সারাজীবন খাটিয়া গিয়াছেন; সমস্ত ধন সম্পদ যশঃ মান পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নাম সাধন ও দ্বারে দ্বারে প্রচারে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্ম। *

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আর্য্যজাতি।

ঋগ্বেদ সংহিতার পুরাতন অংশে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, আর্য্যেরা হিন্দুস্থানের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে—পঞ্জাব কাশ্মীর এবং পঞ্জাব ছাড়াইয়া কুভানদীর তীরে বসতি করিয়াছিল। এই সকল আড্ডা হইতে সরস্বতী নদী পার হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বভাগে হিন্দুস্থানের মধ্যে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত তাহাদিগের বিস্তার হইবার বিষয়, তাহারা স্তরে স্তরে চিহ্ন বৈদিক গ্রন্থের শেষ অংশসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ঐতিহাসিক পুরাণ হইতে এই কেতৃজাতির পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম এবং দক্ষিণাঞ্চলে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার জানিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই অসীম ভারতখণ্ড, যাহা তখন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং বলবান বন্যজাতির বাসস্থান ছিল, তাহাকে হিন্দুধর্ম্মে আনিতে কত শতাব্দী গত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, যে, উহার প্রথমাবস্থায় উহা এতটা প্রাচীন, যে তখন আর্য্য এবং পারসীক সব একত্র মেশামেশিরূপে বাস করিত। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর পাহাড়ীয়া যেমন এক জায়গায় বাস করিলেও আলাদা আলাদা দলে বাস করে তেমনি আর্য্যজাতি ও পারসীক প্রভৃতি জাতি একত্র থাকিলেও তাহাদের মধ্যে দলের প্রভেদ ছিল।

দেবতা।

আবার ঋগ্বেদের ভাব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যদিগের সতেজ ভাবটা প্রকৃতির সম্বন্ধে সহজ উচ্ছ্বাসে টাটকা টাটকা রকমে নবীনভাবে ছেলেমানুষী ভাবে বাহির হইতেছে। আর্য্যেরা প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ডরূপে দেবতা বলিয়া পূজা করিত, স্বতন্ত্র দেবতার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির আয়তন কল্পনা করিয়া সেই সেই আয়তনের মধ্যে তাহাদের বন্ধুত্ব এবং সাহায্য প্রার্থনা করিত। এই প্রকার পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতির প্রত্যেক আবির্ভাবকে (Phenomenon) অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতা জ্ঞান করিত। যত ধর্ম্ম মনুষ্যের মনে উদয় হইতে পারে হিন্দুধর্ম্মে সে সব হইয়া গিয়াছে;

প্রত্যেক প্রকৃতির আবির্ভাব যাহা প্রথমে কল্পনাতে অলৌকিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে যে যেখানে প্রকাশ পায়, সেই ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বা মণ্ডলে শ্রেণীবদ্ধ করা হইল এবং তাহাদিগের সকলের মধ্যে একটা সাদৃশ্য প্রকাশ পাইল। এইরূপে কতকগুলি দেবতা কল্পনা করিয়া লইলে তাহারা যেন আপনাপন এলাকায় প্রত্যেকে একাধিপত্য করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অধিকার মনুষ্যজীবনের ঘটনাসমূহে বিস্তার হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে আবার মনুষ্যের স্বরূপ ও অবয়বরাজিও দেবতাদিতে অর্পিত হইয়া পড়িল। স্বাভাবিক বলের প্রতিভূস্বরূপ এই সকল প্রকৃতিদেবতা অনেকগুলি হইলেও তাহাদিগের আবার পিতামাতা স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি কল্পিত হইয়া দেবতাদিগের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করিতে লাগিল। আবার এই সকলে দৈবশক্তি, ব্যক্তিগত সত্তা ও ক্রিয়া আরোপিত হইল। পরে যখন আলোচনার কাল আসিল, তখন ঐ বহুবিধ দেবতাদিগের মধ্যে, তাহাদের মোটামুটি ভাব অনুসারে, থাকবন্দি করিয়া একটা শৃঙ্খলা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। যেমন দ্যুলোকের দেবতা অন্তরীক্ষের দেবতা পৃথিবীর দেবতা সূর্য্য, ইন্দ্র ও অগ্নি ঐ ঐ স্থানের প্রধান প্রতিভূ ও শাসিতা বলিয়া গণিত হইল। এই তিন দেবতা ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেবতার উপরে পদ পাইল—অন্য দেবতারা যেন ইহাদিগের আশ্রিত ও ভৃত্যভাবে রহিল।

যখন একবার এই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পাকা হইয়া দাঁড়াইল, তখন আবার আলোচনা আন্দোলন ও এই তিনের আপেক্ষিক সম্বন্ধ (relative position) নির্ণয় করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রধান দেবতা যে ব্রহ্ম তাঁহাতে গিয়া একতা পাইল। তখন এই তিন আবার ব্রহ্মের সৃষ্ট ও ভৃত্য হইয়া দাঁড়াইল। অথবা এই তিনের যখন যাহাকে পূজা করিত তখন তাহাকেই সর্ব্বপ্রধান দেবত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিত। সূর্য্য দেবতাই যেন

---

* Weber's History of Indian Literature হইতে অনুবাদিত।

সর্ব্বপ্রথমে প্রধানত্ব পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন বোধ হয়। পারস্য-আর্য্যের মধ্যে সূর্য্যই অধিদেবতাতে স্থিতি করিতেছে। আর অবস্তের সমকালীন আমাদের ব্রাহ্মণেতেও সূর্য্যদেবতাকে সর্ব্বোচ্চ পদ দিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; সূর্য্যকে বলিয়াছে "প্রসবিতা দেবানাং।" গায়ত্রীতেও দেখিতে পাওয়া যায়—যদিও তাহার এখন ব্রাহ্ম অর্থ ঘটান হইয়াছে—যে সূর্য্য পৃথিবী দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষব্যাপী, যেহেতু সূর্য্য আপন কিরণ দ্বারা সকল লোক উজ্জ্বল করিতেছে, কিরণ দ্বারা সে সকল লোকে ব্যাপ্ত আছে। "তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি" 'সেই সবিতার কিনা জগৎপ্রসবিতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি যিনি আমাদিগকে ধী কিনা সদ্বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞাসকল প্রেরণ করিতেছেন।' যখন ধী'র কথা উঠিয়াছে তখন সময় অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এখনো সৌর বলিয়া এক মতাবলম্বী আছে, যাহারা সূর্য্যকে দেখিয়া প্রত্যহ নমস্কার করে। এক্ষণে সূর্য্যদেবতার অত আধিপত্য নাই। সূর্য্যদেবতা যেন ব্রহ্মারূপে কল্পিত হইয়াছে। পৃথিবীর এবং আকাশের দেবতারা, মনুষ্যের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ থাকাতে, ক্রমে প্রধান পদ অধিকার করিয়া লইল। নানা প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর রুদ্র অগ্নির স্থলাভিষিক্ত হইল, আর বিষ্ণু ইন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত হইল।

চতুর্ব্বেদ।

বেদ চার; ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, (যজুর্ব্বেদের দুই শাখা, কৃষ্ণ যজু আর শুক্ল যজু) এবং অথর্ব্ব বেদ। এই এক একটা বেদের আবার তিন তিনটা ভাগ:—সংহিতা ভাগ, ব্রাহ্মণ ভাগ এবং সূত্র। উপনিষদ বা আরণ্যক হইতেছে ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট, এইজন্য উপনিষদকে বেদান্ত বলে।

ঋগ্বেদ।

ঋক্ সংহিতা আর কিছু নয়, কেবল আর্য্যদিগের মেঠো গানের সংগ্রহ:—যে সকল গান পুরাতন বাসস্থান সিন্ধুনদীতীরে আর্য্যদিগের আপনাদের ও আপনাদের পশুসকলের ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া উষাময়ীকে আহ্বান করিতে ব্যবহৃত হইয়াছিল অথবা ইন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে গীত হইয়াছিল,—(যে ইন্দ্র বিদ্যুতের দ্বারা অন্ধকারের বলকে পরাহত করেন) এবং যে সকল গান যুদ্ধে রক্ষা করিবার জন্য ও অন্ন দান করিবার জন্য দেবতাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্যবাদে পরিপূর্ণ:—

ঋগ্বেদ প্রণেতা ঋষিবংশ অনুসারে ঋক্‌সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে।

সামবেদ।

সোমযাগ অর্থাৎ—যে যজ্ঞে দেবতাদিগকে সোম দান করা হইত—এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি অন্যান্য যজ্ঞে, যে সকল ঋক্ গীত হইত, সেই ঋক্‌গুলি যজ্ঞে যেমন পরে পরে ব্যবহার হইত, সামবেদে সেইরূপ আনুপূর্ব্বিক ধারাবাহিকরূপে সংগ্রহ করা আছে। সংহিতার অর্থই সংগ্রহ করা, যাহা ছড়ান ছিল তাহাই একত্র করা। সোমপানবিষয়ক যে সকল ঋক্ ঋগ্বেদে আছে, প্রায় সেই সকল ঋক গান-আকারে সামবেদে আছে। ছন্দটা হইল ঋগ্বেদের, গানটা হইল সামবেদের। সামসংহিতাস্থ ঋকে কিন্তু ব্যাকরণের পুরাণো রকম গঠন দেখিয়া সামের ঋক্‌সমূহকে ঋগ্বেদের ঋক্ অপেক্ষা পুরাণো এবং প্রাথমিক বোধ হয়।

যজুর্ব্বেদ।

সোমযাগ এবং অন্যান্য মেধে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত, সেই সকল মন্ত্র পরে পরে যেমন ব্যবহৃত হইত তাহারই আনুপূর্ব্বিক সংগ্রহ হইতেছে যজুর্ব্বেদসংহিতা। যজুর্ব্বেদ সংহিতাদ্বয় গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত। ইহার পদ্যভাগ প্রায় ঋগ্বেদে পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়। গান এবং সূক্তসকল (hymns) যখন মুখপরম্পরায় প্রথমে চলিয়া আসে তখন অবশ্য অনেকটা অদলবদল হইবারই সম্ভাবনা; যেহেতু লিখিয়া মন্ত্রাদি ঠিক রাখা সেই আদিম কালের পক্ষে একরূপ অসম্ভব—তাহা আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না। এমন কি, সংহিতার পরবর্ত্তি ব্রাহ্মণের সময়েও লেখা লিপিবদ্ধ হইত কি না সন্দেহ। তাহা হইলে ব্রাহ্মণের এত ভিন্ন শাখা হইত না এবং যে সকল মূলের ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যা আছে তাহারা পরস্পর এত বিভিন্ন হইত না।

অথর্ব্ববেদ।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের যে সময় বেশ আধিপত্য বিস্তার হইয়াছে সেই সময় অথর্ব্ব সংহিতার কাল মনে করিতে হইবে। আর আর বিষয়ে ইহা ঋক্ সংহিতারই সদৃশ এবং ইহাতে এই ব্রাহ্মণসময়কার পদ্য সংগ্রহ আছে। ইহার ভিতরের অনেক গান ঋগ্বেদের শেষ মণ্ডল দশম মণ্ডলে আছে—যে অংশটি ঋগ্বেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ। দেখিলে বোধ হয়, ঋগ্বেদ যে সময় সংগ্রহ করা হইয়াছিল সেই সময় এই গানগুলাকেও তাহার মধ্যে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু অথর্ব্ববেদে তাহাদের সংগ্রহ যেন স্বাভাবিক এবং সময়োচিত ভাষণ (utterance) বোধ হয়।

ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব বেদের ভাব বেশ ভিন্ন টের পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে একটী জীবন্ত স্বাভাবিক ভাবের উচ্ছ্বাস, প্রকৃতির প্রতি গাঢ় প্রেমের উচ্ছ্বাস স্ফূর্ত্তি পাইতেছে; অথর্ব্ববেদে আর্য্যেরা ভূতপ্রেতের ভয়ে (anxious dread of evil spirits) এবং তাহাদিগের যাদুর ভয়ে (their

magical powers) ভীত; ঋগ্বেদে তাহারা যেন স্বাধীন উদ্যমে পূর্ণ, কাহারো অধীনতা স্বীকার করিতেছে না; অথর্ব্ববেদে তাহারা যেন 'বামুন'দের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, কুসংস্কারশৃঙ্খলে যেন বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, স্বাধীনতার যেন স্ফূর্ত্তি নাই। কিন্তু অথর্ব্ব সংহিতাতেও এমন সকল সূক্ত রহিয়াছে যাহা অতি পুরাকালের বলিয়া বোধ হয়, বোধ হয় সে সকল সূক্ত আর্য্যদিগের ইতর লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল; আর ঋগ্বেদের গানসকল বোধ হয় আর্য্যদিগের প্রধান প্রধান বংশের সম্পত্তি ছিল। বোধ হয় অনেক যোঝাযুঝির পর তবে অথর্ব্ব ঋকসকল চতুর্থবেদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ঋক সাম যজুর ব্রাহ্মণের পুরাণো পুরাণো অংশে ইহার কোন উল্লেখ নাই। বোধ হয় ব্রাহ্মণের সমকালীন অথর্ব্ব ঋক্‌সকল সংগৃহীত হইয়াছিল তাই ব্রাহ্মণের অপেক্ষাকৃত শেষ অংশে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমে তিন বেদই বিখ্যাত ছিল, পরে চতুর্ব্বেদ হইল।

ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের সাধারণ ভাবটা এই:—যজ্ঞের গান ও মন্ত্রকে যজ্ঞক্রিয়ার সহিত সংলগ্ন করা, উহাদিগের মধ্যে যোগ স্থাপন করা। ইহা "ব্রাহ্মণ" করিয়াছে। এইজন্য ব্রাহ্মণে যজ্ঞের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ এক এক যজ্ঞে যেখানে যে গান যে ঋক্ যে মন্ত্র প্রয়োজন, সেইটী আনুপূর্ব্বিক ব্রাহ্মণে দেখান হইয়াছে —বৈদিক ভাষার অর্থবিন্যাস করা হইয়াছে। আর্য্যদিগের মধ্যে যে সকল প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে এবং পুরাণো পুরাণো উপাখ্যান যে সব প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণে সে সকল সংগৃহীত হইল, আর উহাতে সে সময়কার তত্ত্ববিষয়ক মতামত সকলও ব্যক্ত হইল। আর্য্যভাব ও আর্য্যসভ্যতা হইতে ব্রাহ্মণ অথবা হিন্দুভাব ও হিন্দুসভ্যতায় পরিবর্ত্তনের সময়টায় ব্রাহ্মণকল্পের আবির্ভাব; এমন কি বলিলেও হয় যে 'ব্রাহ্মণ'দ্বারা এই পরিবর্ত্তনটি ঘটিয়া উঠে। কতক ব্রাহ্মণ এই কল্পের আদিতে, কতক ব্রাহ্মণ এই কল্পের শেষে রচিত বলিয়া বোধ হয়।

বিশেষ বিশেষ প্রাজ্ঞ ঋষির মত যাহা মৌখিক প্রবাদরূপে প্রচলিত হইয়া এবং শিষ্য ও বংশপরম্পরায় বিস্তৃত হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল তাহা হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। যখন একই প্রবাদ নানা মুখে নানা আকার ধারণ করিতে লাগিল, তখন সেই নানারূপ প্রবাদকে পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিবার প্রয়োজন হইল। এই উদ্দেশে সময়ে সময়ে, নানা বিষয়ের নানা প্রকার মত যে স্থানে স্থানে প্রস্তুত হইয়াছিল, এক এক স্থানের পারগ ঋষিসকল সেই সেই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া, যে ঋষি হইতে যেরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে সব ধরিয়া দিতে লাগিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে যেগুলা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইল অথবা যেগুলা সে সময়কার ভাবকে অধিক পোষণ করিল, তাহারাই পাঠ্য হওয়াতে সেইগুলিই এখন পাওয়া যায় অন্যগুলি প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। মতামত সম্বন্ধীয় পুস্তকসকলও এইরূপ; যে মত জয়যুক্ত হইয়াছিল তাহাই বিরোধী অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী পুস্তকের পরিবর্ত্তে রহিয়া গিয়াছে। এইরূপে আমাদের কত পুস্তক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে বিষয়গত এই স্বতন্ত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়;—ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণে যখন যজ্ঞবিষয়ে বক্তব্য বলে তখন হোতার বা ঋকপাঠকের যাহা কর্ত্তব্য সেইটুকুই বলে। হোতার কর্ম্ম—যে যে ঋক যে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের উপযোগী সেই সেই ঋক বাছিয়া লইয়া সেই সেই বিশেষ যজ্ঞে ব্যবহার করা। সেই যজ্ঞে সেই সকল ঋকের ব্যবহার বিধিবদ্ধ হইত। সামবেদের ব্রাহ্মণে উদ্গাতা বা সামগায়কদিগের যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুরই সম্বাদ আছে। তেমনি যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে অধ্বর্য্যু বা কর্ম্মীদিগের কর্ত্তব্যটুকু বিবৃত আছে। ঋকের ব্রাহ্মণে যজ্ঞেতে যেমন পরম্পরায় ঋকের ব্যবহার, সেইরূপ আনুপূর্ব্বিক ভাবে আছে; ঋক সংহিতাতে যে পরম্পরা আছে তাহা ইহাতে নাই। কিন্তু সাম ও যজুর্ব্রাহ্মণে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ উভয়েতেই সমান পরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়, যেহেতু সাম ও যজুর্ব্বেদের সংহিতা যজ্ঞপ্রণালী অনুসারেই গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছিল। ঋগ্বেদের ঋক্ সকল সূক্তরচয়িতা ঋষি অনুসারেই সংহিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণের সাধারণ নাম হইতেছে শ্রুতি কিনা শোনা অর্থাৎ বিশেষ করিয়া শুনিবার বিষয় বা শিখিবার বিষয়। নামের দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ ইতর সাধারণ লোকদিগের জন্য নহে, কিন্তু তখনকার শিক্ষিতদিগের জন্য উন্নত ব্রাহ্মণদিগেরই জন্য। ব্রাহ্মণের মধ্যে যদিও শ্রুতিশব্দ আপনাতে প্রয়োগ করে নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী সূত্রে ব্রাহ্মণকে শ্রুতি বলিয়া বলিয়াছে।

সূত্র।

ব্রাহ্মণসাহিত্যের পরে সূত্র সাহিত্য আসিল। ব্রাহ্মণরূপ মূলপত্তন হইতেই ইহারা উত্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে যে পথ প্রদর্শিত হইল, সেই পথ ধরিয়া আরো ইহারা অগ্রসর হইল—প্রণালীকে তন্ন তন্ন করিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া দিয়া গেল। সেই জন্য ইহাকে

ব্রাহ্মণের বিবৃতি (supplement) বলিলেও বলা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণ যখন বহুবিস্তৃত হইল, বিষয় যখন মেলা হইয়া পড়িল যখন গ্রন্থ পড়িতে গিয়া কোনটাই আয়ত্ত হয় না, এক একটা বিষয় বহুবিস্তৃত ব্রাহ্মণের নানাস্থানে ছড়াইয়া থাকায় কোন একটা বিষয় আলোচনা করিতে গেলে যখন সমস্ত ব্রাহ্মণ না পড়িলে আর চলে না, যখন ইহাতে শিক্ষার বড় ব্যাঘাত হইতে লাগিল, তখন এক একটী বিষয় 'লাগউাট'রূপে আদ্যন্ত জানিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা সূত্রসাহিত্যের অবতারণা করিলেন। এক একটী বিষয় লইয়া যত বাহুল্য আন্দোলন হইয়াছিল কতকগুলা সূত্র করিয়া সবটা সাররূপে সংক্ষেপের মধ্যে একটুর মধ্যে গাঁথিয়া দিলেন। রাশীকৃত আন্দোলনকে যতটা সংক্ষেপে করা যাইতে পারে যাহাতে স্মরণের আয়ত্ত হইতে পারে এমন ভাবে সূত্র সব প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে যত দিন যাইতে লাগিল এবং সূত্রসাহিত্য ব্রাহ্মণভাগের উপর নির্ভর না করিয়া যত স্বতন্ত্র ভাবে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল এবং সূত্রের উপকারিতা যত হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল, তত সূত্রের উন্নতি সাধন হইয়া হইয়া এমনি ঠাসাভাবে ও সংক্ষেপে লিখিত হইতে লাগিল যে গুরূপদেশ ও টীকা ব্যতীত তাহা একেবারেই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। তখন সেই সূত্রগাঁথনি খুলিতে আবার রাশি রাশি পুস্তক তৈয়ারি করিতে হইয়াছিল। যে সূত্রগ্রন্থ যত পুরাণ তত বোধগম্য, যত আধুনিক, তত দুরূহ।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি।

কেন ?

রাগিণী সিন্ধু—তাল তেওরা।

দিলে না তো দিলে না প্রেম
তবে কেন—কেন দেখা দিলে
আঁধার রাতে আজি দুখীরে ?
তোমা লাগি বসি বসি, কত কত দীর্ঘ নিশি
আঁধার এই কুটীরে ;
দেখা দিয়ে গেলে চলি, আকুল প্রাণে কাঁদি ঘুরে।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হোল আঁখি দুটি মোর
অপেখিয়া আছি বসে আঁধার হবে ভোর
এত নিঠুর কেন হলে, ভাসাও কেন অশ্রুজলে ;
দেখা যদি বারেক দিলে
যেওনা যেওনা চলে।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I { ণা ণা -া | ধা ণা | পা ধা II মপা মা -া | জ্ঞা রা | সা ন্না I
দি লে • না • তো • দি • লে • না • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
IIII (পা পা -া | -া -া | -া -া)} I পা পা -া | না -া | র্সা -া I
• প্রে • • • • ম্ • প্রে ম্ ত • বে •

১´ ২ ৩ [ণা] ১´ ২ ৩
I না র্সা -া | না র্রা | র্সা_ধা I ণা পা ণা | ণা ধা | র্ণপা -া I
কে ন • কে • ন • দে খা • দি • লে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা র্সা -া । মা -া । পা ধা I না র্সা র্রা । না -না । র্সা র্সর্রা I
আঁ ধা র্ রা ॰ তে ॰ আ জি হু ॰ খী রে ॰ ॰

১´ ২ ৩
I র্সা র্সা -া । ণা ধা । পা ধা II
দি লে ॰ না ॰ তো ॰

১´ ২
[র্সা র্সা ণা ণা মা] ৩ ১´ ২ ৩
II { পা পা -া । ধা মা । পা ধা I না র্সা -া । নর্সর্রা না । র্সা -া I
তো মা ॰ লা ॰ গি ॰ ব সি ॰ ব॰॰ ॰ সি ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ [-া]
I র্সা র্সা না । র্সা র্রর্সা । র্রা -া I র্রা র্মা র্জ্ঞা । র্রা -া । র্সা র্রা } I
ক ত ॰ ক ॰ ত ॰ দী ॰ র্ঘ নি ॰ শি ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা র্সা না । র্সা -া । -া -া I র্রা র্সা ণা । ণা -া । -া -া I
আঁ ধা র্ এ ॰ ॰ ই কু টী ॰ রে ॰ ॰ ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ণা -ণা -া । ণা -া । ধণা -া I র্সা ণা -া । ধা -া । পা -া I
দে খা ॰ দি ॰ য়ে ॰ গে লে ॰ চ ॰ লি ॰

১ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I না না -া । না -া । না র্সা I র্সা র্সা র্রা । র্সনা -া । র্সাঃ র্সর্রঃ I
আ কু ল্ প্রা ॰ ণে ॰ কাঁ দি ॰ ঘু ॰ রে ॰

১ ২ ৩
I র্সা র্সা -া । ণা ধা । পা ধা II
দি লে ॰ না ॰ তো ॰

১ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II { মা মা -া । জ্ঞা রা । সা রা I রা মা জ্ঞা । রা -া । সা -া I
কেঁ দে ॰ কেঁ ॰ দে ॰ অ ॰ ন্ধ হো ॰ ল ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা র্সা না । র্সা -া । র্সর্রা র্সা I ণা -া -া । -া -া । -া -া I
আ খি ॰ দু ॰ টি মো ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ র্

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I ণা ণা -া । ণা -া । ধণা -া I র্সা ণা -া । ধা -া । পা মা I
অ লে ॰ খি ॰ য়ে ॰ আ ছি ॰ ব ॰ সে ॰

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা মা ণা। ণা ধা। পা মা I মপা -া -া। -া -া। -া -া } I
আঁ ধা র্ হ • বে • তো • • • • • র্

১ ২
[র্সা র্সা ণা ণা]
৩ ১´ ২ ৩
I { পা পা -া। ধা মা। পা ধা I না র্সা -া। র্রর্সা না। র্সা -া I
এ ত • নি • ঠু র্ কে ম • হ • • লে • ;

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ [-া]
I র্সা র্সা না। র্সা র্রর্সা। র্রা -া I র্রা র্মা র্জ্ঞা। র্রা -া। র্সা র্রা } I
আ সা ও কে • • ন • অ • শ্র জ • লে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা র্সা না। র্সা -া। র্সর্সা র্রা I র্সা র্সা ণা। ণা -া। ণা ধা I
দে খা • য • দি • • বা রে ক দি • লে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মা মণা ণা। ণা -া। র্সা ণা I -া ধা পা। পা পা। -া -াধ I
যে ও • না • যে ও • না • চ লে • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মপা মা -া। জ্ঞা রা। সা রা I মপা মা -া। জ্ঞা রা। সা রা I I I I
দি • লে • না • তো • দি লে • না • • •

পথের সন্ধান।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

ত্যাগানুক্রমের ঝড় অবসান হইয়া ক্রমে আকাশ নির্ম্মল, মেঘমুক্ত হইল। ত্যাগের প্রথম আস্বাদে গৌতম স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় নিরন্তর আনন্দে মগ্ন হইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সপ্তদিবস উত্তীর্ণ হইয়া গেল—আহার বিহারের চিন্তামাত্র তাঁহার মনে উদয় হইল না।

অষ্টম দিবসে তাঁহার বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল; স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া আম্রবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে এক তাপসাশ্রম দর্শন করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। এই আশ্রমনিবাসী তপাচার্য্যগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তপশ্চরণ করিতে তাঁহার অভিলাষ জন্মিল। তিনি আচার্য্যগণকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের মতে দুইটি প্রণালী আছে। এক প্রণালী অবলম্বন করিলে জাগতিক ঐশ্বর্য্যলাভ, এবং অপর প্রণালী দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। সিদ্ধার্থের নিকট এতদুভয়ই তুল্যজ্ঞান হইল। তিনি ভাবিলেন—"ইঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য মন্দ নহে, নীচ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইঁহারা উচ্চতর ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি তদনুষ্ঠিত যাবতীয় কঠোরতার ফলস্বরূপ এরূপ বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিবে যাহা লাভ করিলে সর্ব্বকামনার নির্ব্বাণ হয়। মনই শরীরকে চালিত করে, অতএব চিন্তাকে সংযত করিতে হইবে। আহার্য্যবিচার ও পূতসলিলে অবগাহন দ্বারা কোন ফল হয় না। জল, জল ব্যতীত অপর কিছুই নহে; পুণ্যাত্মার পুণ্যে অবগাহনই প্রকৃত তীর্থক্রিয়া।"

গৌতম আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। রাজগৃহে পৌঁছিয়া তিনি নগরপ্রান্তে পাণ্ডবশৈলে আপন আবাসস্থান স্থির করিলেন। ভিক্ষার্থে প্রতিদিন তাঁহাকে নগরে বাহির হইতে হইত। নগরবাসিগণ তাঁহার অপরূপ দেহকান্তি, দিব্য সৌম্য মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। যথাক্রমে পারিষদ্‌প্রমুখাৎ মগধরাজ এই অনন্যসাধারণ ভিক্ষুর সংবাদ অবগত হইলেন।

একদিন ভিক্ষার্থে বাহির হইলে প্রাসাদশিখর হইতে বিম্বিসার তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। অন্যান্য রাজগৃহবাসিগণের ন্যায় তাঁহারও মনে হইল বুঝি বা ইনি মনুষ্যবেশধারী কোন দেবতা। তিনি অমাত্যগণকে ভিক্ষুর অনুসরণ করিতে এবং তৎসম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। অমাত্যগণ ভিক্ষুর নিবাসস্থলের সংবাদ আনিলে, বিম্বিসার স্বয়ং তথায় মহাপুরুষ দর্শনে গমন করিলেন।

ভিক্ষুর পরিচয় পাইয়া, তিনি রাজপুত্রকে এই কঠোর জীবন হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। গুণমুগ্ধ রাজা গৌতমকে অৰ্দ্ধেক রাজ্য ভাগ করিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। গৌতম রাজঅনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া অনতিবিলম্বে রাজগৃহে লব্ধ জ্ঞান প্রচার করিতে আসিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া বিম্বিসার প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

বৈরাগ্যবান নবীন ভিক্ষু লোকসমাগম পছন্দ করিতেন না। এই স্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। তাপস আলার-কালামের * আশ্রমে গমন করিয়া তিনি কিছুকাল তদুপদেশে তপশ্চর্য্যায় নিরত রহিলেন। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে আলার-কালামের সিদ্ধান্ত গৌতমের মনঃপূত হইল না। অতঃপর তিনি আচার্য্য উদ্রকের † আশ্রমে গমন করিলেন। কিন্তু ইঁহার মতও তাঁহার মনঃপূত হইল না। নির্ব্বাণকাম গৌতম অবশেষে উরুবেলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

উরুবেল গ্রামে বহু সন্ন্যাসী যোগী সাধনাবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। এককালে এই গ্রাম সন্ন্যাসিগণের উপনিবেশস্বরূপ ছিল। তৎকালে নিয়ম ছিল কোন ত্যাগী ভ্রাতার মনে কোন কুচিন্তার উদ্রেক হওয়া মাত্রই তাহাকে নিকটস্থ নিরঞ্জনা নদীতে অবগাহন করিতে হইবে এবং নদীর তলদেশ হইতে প্রতিবারে এক এক মুষ্টি বালুকা স্বীয় ঝুলিতে পুরিয়া রাখিতে হইবে। পরে যখন সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের সাময়িক অধিবেশন বসিত, তখন অন্যায়কারী ভিক্ষুর সমস্ত কুচিন্তাদি প্রকাশ করিয়া বলিতে হইত এবং তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তক্রিয়ার তিনি যে যথারীতি অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি ঝুলির বালুকারাশি সকলের সম্মুখে নিক্ষেপ করিতেন। ধীরে ধীরে যখন গ্রামখানি বালুময় হইয়া উঠিল তখন ইহার নাম হইল উরুবেলা। ‡

সাধনার এই পুণ্যভূমে গৌতম তপস্যা করিতে মনস্থ করিলেন। প্রব্রজ্যা অবলম্বনের পর কৌণ্ডন্য * তাঁহার চারিজন সঙ্গীসহ নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া এই সময়ে এইস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। গৌতমের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। গৌতম পুর্ণোৎসাহে কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পাঁচজন সঙ্গী সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। নির্ব্বাণের ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা গৌতমকে দিন দিন উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিল। তিনি কঠোরতার মাত্রা ক্রমেই বর্দ্ধিত করিয়া চলিলেন। আহারের পরিমাণ কমাইতে কমাইতে ক্রমে কণামাত্রে আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গীগণ প্রত্যহই মনে করিতে লাগিলেন, 'আজই গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।' কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহার দেহকান্তি অন্তর্হিত হইয়া শীর্ণ দেহ শীর্ণতর হইতে লাগিল। তাঁহার সমুদয় বুদ্ধ-লক্ষণ অন্তর্হিত হইল। ক্রমে আর দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না। ধ্যানান্তে এক নিশার তৃতীয় যামে উঠিয়া দাঁড়াইতেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন। দেবগণ ভাবিলেন, গৌতমের দেহান্ত হইল। বহুক্ষণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার পর ধীরে ধীরে তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। গৌতম স্থির হইয়া বসিলেন, ভাবিলেন, 'অসার এই কঠোরতা। এইরূপে দেহক্ষয় করিলে নির্ব্বাণ লাভ হইবে না।' ভিক্ষাপাত্র হস্তে তিনি ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। নিয়মিত আহারাদি করায় ধীরে ধীরে তাঁহার অঙ্গকান্তি ফিরিয়া আসিল। গৌতমের পতন হইল ভাবিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে সঙ্গীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমাগত ষষ্ঠবৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া দেহক্ষয় মাত্রই সার হইল দেখিয়া গৌতম বড়ই মনস্তাপ পাইলেন। শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া তিনি এক একবার নিজের উপর নির্ম্মম হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আবার পরক্ষণেই শরীরকে দুঃসাধ্য নির্ব্বাণ-পদ লাভের উপযুক্ত করিতে যথাযোগ্য যত্ন লইতে লাগিলেন, কারণ বলহীনের সেই পদ লাভ অসম্ভব। শুক্লাচতুর্দ্দশী রাত্রের শেষভাগে গৌতম পর পর বহু স্বপ্ন দর্শন করিলেন। সকল স্বপ্নই শুভাগমনের ইঙ্গিত করিতেছে দেখিয়া তিনি পরম পুলকিত হইলেন।

এতদঞ্চলে সেনানি নামা জনৈক মান্য ও ধনশালী নাগরিক ছিলেন। রূপ-গুণ সম্পন্না সুজাতা তাঁহার একমাত্র কন্যা। কোন সময়ে সুজাতা মনোমত স্বামী এবং প্রথমেই পুত্র সন্তান লাভ করিলে নিকটস্থ বৃক্ষদেবতা সমীপে সহস্রমুদ্রা ব্যয়ে ভোগ দিবার মানত

* আড়ার কালাম। † রুদ্রক।

‡ উরু—বালুকা।

* গৌতমের নামকরণের দিনে যিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

করিয়াছিলেন। যথাসময়ে সুজাতার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সুজাতা বহু দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহ করিলেন। এক সহস্র গাভীর দুগ্ধ পাঁচশতকে, সেই পাঁচশতের দুগ্ধে আড়াইশতকে, সেই আড়াইশতের দুগ্ধ ১২৫টীকে এইরূপে (৬২, ৩২, ১৬) শেষ ষোলটি গাভীর দুগ্ধে আটটি গাভীকে পুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়—দুগ্ধমাত্রে পুষ্ট এই আটটি গাভীর শ্রেষ্ঠ দুগ্ধে তাঁহার মানত পূর্ণ করিবেন। বৈশাখী শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথির শেষরাত্রে সুজাতা স্বপ্ন দেখিলেন, পরদিবস তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।

নিশা শেষ হইতে না হইতেই সুজাতা শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মুখ আজ আনন্দোদ্ভাসিত, তাঁহার গতি আজ নৃত্যচপলা, তাঁহার বাণী আজ মধুক্ষরিণী। পাত্র হস্তে সুজাতা গোশালায় প্রবেশ করিলেন। গাভী দোহন করিতে হইল না—পাত্র যথাস্থানে স্থাপন করিবামাত্র তদুপরি দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ সুজাতা স্নানান্তে পট্টবেশ পরিধান করিয়া পায়সান্ন প্রস্তুত করিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। সুজাতা পাক চড়াইলেন। তাঁহাকে আর কিছুই করিতে হইল না—অলক্ষিতে থাকিয়া দেবগণ সমস্তই করিয়া দিলেন। সুজাতা অবাক হইয়া গেলেন। তিনি পরিচারিকা পূর্ণাকে পূত-পাদপের তলদেশ মার্জ্জনা করিতে আদেশ করিলেন।

এদিকে প্রভাত হইতেই আনন্দ-বিভোর গৌতম ঐ বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দেহ হইতে দিব্য জ্যোতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। আজ স্বতঃই অভীষ্ট সিদ্ধির কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইতেছে। সম্মার্জ্জনীহস্তে পূর্ণা আসিয়া এই দীপ্তিমান মহাপুরুষকে দেখিয়া নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। ক্ষণপরে আত্মস্থ হইয়া ছুটিয়া গিয়া সে সুজাতার নিকট এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের কথা বিবৃত করিল। উৎফুল্ল আবেগে সুজাতা পূর্ণাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তিনি পূর্ণাকে আপন দুহিতারূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে উপযুক্ত রত্নালঙ্কারে ভূষিতা করিলেন। স্বর্ণথালে পায়সান্ন মাথায় বহিয়া পূর্ণা ও সঙ্গিনীগণসহ সুজাতা লীলায়িতগতিতে বৃক্ষ-সমীপে অগ্রসর হইলেন। দূর হইতে ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষের অপরূপ রূপচ্ছটা দেখিয়া সুজাতার অন্তর অপূর্ব্ব ভাবাবেশে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সুজাতা সমীপস্থ হইবামাত্রই নিমীলিতনেত্র গৌতম আপন কমণ্ডলুর জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন; সুজাতা সুযোগ পাইয়া স্বর্ণথালি তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। গৌতম চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখাগতা সুজাতাকে দেখিতে পাইলেন।

আহারের সময় দেবতার সম্মুখে থাকিতে নাই। সুজাতা আপনাকে ধন্যা মনে করিয়া প্রস্থান করিলেন। গৌতম আসন পরিত্যাগ করিয়া নৈরঞ্জনায় অবগাহন করিলেন। পবিত্র ভিক্ষুবেশ পরিধান করিয়া তিনি শান্ত-সংযতভাবে পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিলেন। সুজাতা-প্রদত্ত পায়সান্ন ঊনপঞ্চাশৎ ভাগে বিভক্ত করিয়া একে একে সমস্ত ভাগই তিনি আহার করিলেন। ভাবী ঊনপঞ্চাশৎ দিবসের আহার হইয়া গেল। আহারান্তে বাসনা হইল, অদ্যই বুদ্ধত্ব লাভ হইবে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। 'যদি হয় তবে পাত্র স্রোতের বিপরীতগামী হইবে' মনে করিয়া তিনি স্বর্ণপাত্র নৈরঞ্জনাজলে নিক্ষেপ করিলেন। পাত্র স্রোতের প্রতিকূলে কিছুদূর গিয়া জলমগ্ন হইল। গৌতম পুলকিত হইলেন।

নিকটবর্ত্তী অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি এক শালবৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হইলেন। ক্রমে দ্বিপ্রহর অতীত হইল, বৈকাল আসিল, বৈকাল গিয়া সন্ধ্যা আগতপ্রায়; গৌতম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—বুদ্ধত্ব লাভ হইল না ভাবিয়া অস্থির-চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। শালবৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিকটস্থ এক বোধিদ্রুমতলে গমন করিলেন। হস্তে তাঁহার জনৈক ব্রাহ্মণপ্রদত্ত এক গুচ্ছ তৃণ। গৌতম উত্তরমুখী হইয়া বৃক্ষের দক্ষিণাংশে দাঁড়াইলেন। মনে হইল উত্তর দক্ষিণে ভূমি হেলিয়া পড়িয়াছে। বৃক্ষটিকে দক্ষিণে রাখিয়া তিনি যথাক্রমে পশ্চিমে ও উত্তরে গমন করিলেন। কিন্তু সকল দিকেই ভূমি অসমান মনে হইল। সর্ব্বশেষে পূর্ব্বদিকে গিয়া তিনি দেখিলেন, উহা সমভাবেই আছে। বুঝিলেন, পশ্চিমমুখী হইয়া বোধিবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে বসিয়া পূর্ব্বগামী বুদ্ধগণ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবগণ কর্ত্তৃক সুপরিষ্কৃত ঐ স্থানে তৃণগুচ্ছ আসনাকারে বিস্তৃত করিয়া গৌতম দৃঢ়-সংযত ভাবে উপবেশন করিলেন আর প্রতিজ্ঞা করিলেন—

> ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
> ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
> অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
> নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥*

> এ আসনে বসি' যদি শুকায় শরীর,
> ত্বক্, অস্থি, মাংস মোর হয়ে যায় লয়;
> তবু মন হেথা তবু রহিবেক স্থির,
> যাবৎ সম্বোধি রত্ন লাভ নাহি হয়।

মার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে বাধা দিতে না পারিলে জগতে তাঁহার প্রভাবের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। ভেরী ঘোষণায় তাঁহার যাবতীয় অনুচরবর্গ

* ললিতবিস্তর।

আসিয়া সমবেত হইল; বহুসহস্র সৈন্যসহ মার গৌতমকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বিরাট অভিযান দেখিয়া অসংখ্য দেবগণ গৌতমকে পরিত্যাগ করিয়া ভীত সন্ত্রস্তভাবে যে যে পথে পারিলেন পলায়ন করিলেন। কেহ কেহ গৌতমের পরাভব নিশ্চিত মনে করিয়া মনঃকষ্টে শয্যাগ্রহণ করিলেন। কেবল প্রবল-পরাক্রম (!) শক্র কৌতূহল নিবারণ করিতে না পারিয়া অন্তরাল হইতে ব্যাপার লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

শক্তিমান্ গৌতমকে সম্মুখ হইতে আক্রমণ নিরাপদ নহে মনে করিয়া মার পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ স্থির করিলেন। তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তিবলে প্রথমে একটি প্রবল ঘূর্ণীবাত্যা সৃষ্টি করিলেন। বাত্যার অবসানে, গৌতম নিশ্চয়ই কোন সুদূর দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন মনে করিয়া মার বৃক্ষতলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার বস্ত্রাংশও স্থানচ্যুত হয় নাই। মার বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। এইবারে তিনি ভীষণভাবে বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অবিশ্রাম বারিধারা গৌতমকে ভাসাইয়া লওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলও সিক্ত করিল না। মারের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইল। তিনি শিলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতপ্রমাণ শিলাখণ্ডগুলি গৌতমের পদতলে পুষ্পরূপে পতিত হইতে লাগিল। মার আর সহ্য করিতে না পারিয়া গৌতমকে ভস্ম করিবার জন্য জ্বলন্ত অঙ্গারবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তপ্ত অঙ্গারখণ্ডগুলি মণিমুক্তারূপে গৌতমের পদতলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আরও তিনটি উপায় পরীক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া মার অন্ধকার সাহায্যে গৌতমকে ভীত ও আত্মহারা করিতে প্রয়াস পাইলেন। চারিগুণ অন্ধকার গৌতমের অঙ্গজ্যোতির সম্মুখীন হইতে পারিল না। এবারে মারের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি সৈন্যগণকে প্রাণপণ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন এবং নিজে ঐরাবত গিরিমেখলা আরোহণ পূর্ব্বক গৌতমকে লক্ষ্য করিয়া ভীমবেগে আপনার চক্র ছাড়িলেন। চক্র ছত্রের আকার ধারণ করিয়া গৌতমের মস্তকোপরি ঝুলিতে লাগিল। সমস্তই বিফল হইল দেখিয়া তিনি গৌতমের সমীপস্থ হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গৌতমকে তাঁহার (মারের) আসন ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। বেস্মন্তর জন্মে ব্রাহ্মণ যখন প্রহার করিতে করিতে পুত্রকন্যাকে লইয়া যাইতেছিল, গৌতমের তখন তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল। প্রদত্ত দ্রব্য পুনর্গ্রহণাভিলাষের ত্রুটিফলে আজ মার গৌতমের সমীপস্থ হইতে পারিল। তথাপি গৌতম তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিলেন না।

"আমি পারমিতাগুণবলে ইহা অর্জন করিয়াছি। ইহা যে তোমার তাহার প্রমাণ কোথায়?"

মার আপন অনুচরবর্গকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'ইহারা আমার সাক্ষী'। অনুচরবর্গও সম্মতি জ্ঞাপন করিল। মার জিজ্ঞাসা করিলেন—

'তোমার সাক্ষী কে?'

'আমার সাক্ষী এই পৃথিবী'।

গৌতম পৃথিবীকে সাক্ষ্য দান করিতে আহ্বান করিলেন। দিগন্ত কম্পিত করিয়া পৃথিবী বলিলেন—হাঁ, 'আমি ইঁহার সাক্ষী'। সেই ভীষণ শব্দে ভীত ঐরাবত মারকে ভূপতিত করিয়া পলায়ন করিল। তাঁহার সমস্ত সৈন্যগণ যে যে পথে পারিল পলাইল। অন্তর্যাতনায় দগ্ধ হইয়া মার স্বগৃহে ফিরিয়া শয্যাশ্রয় করিলেন। মারের পরাজয়ে দেবগণের মধ্যে জয়কোলাহল উঠিল। মারকন্যা তৃষ্ণা, রতি ও রাগ সমস্ত অবগত হইয়া পিতাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা তিনজনে বহুসখিগণসহ অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া গৌতমকে সাধনচ্যুত করিতে চলিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত লাস্যলীলা, সমস্ত চাটুবাক্য ব্যর্থ হইল। ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া ব্যর্থতার গ্লানি বহিয়া তাঁহারা স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। *

রাত্রি সমাগত! প্রথম প্রহরে গৌতম 'পূর্ব্বনিবাস' জ্ঞান (জাতিস্মরত্ব) লাভ করিলেন। দ্বিতীয় প্রহরে তাঁহার দিব্যচক্ষু (সর্ব্বজ্ঞত্ব) লাভ হইল। তৃতীয় প্রহরে তিনি কার্য্যকারণ জ্ঞান (প্রতীত্যসমুৎপাদ) অধিগত করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। নির্ব্বাণ সুখ আস্বাদ মাত্র কোন ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার অপেক্ষা না রাখিয়াই তাঁহার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—

> অনেক জাতি সংসারং
> সন্ধাবিস্‌সম্ অনিব্বিসং।
> গহকারকং গবেসন্তো
> দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং॥

---

* মার রূপক মাত্র। মানসিক সমস্ত কুপ্রবৃত্তি মাররূপে কল্পিত হইয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, মার পশ্চাদ্দিক হইতে গৌতমকে আক্রমণ করিতে চাহিল—কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত মনের সম্মুখীন হইতে পারে না, মনকে অসতর্ক পাইলেই অলক্ষিতে তাহারা আক্রমণ করে। মার সর্ব্বদা সাধকের মনে ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। ফলতঃ সাধনাবস্থায় কুপ্রবৃত্তির আক্রমণ যেমন প্রবলভাবে অনুভূত হয়, আর কোন সময়ে মানব তাহার পরাক্রম তেমন ভাবে অনুভব করে না। কুপ্রবৃত্তির মূলোৎপাটন প্রয়াসী ব্যক্তিকে অসদ্বৃত্তিগুলিও অন্তিম শক্তিতে বাধা প্রদান করে। যে কর্ম্মফল বহুদিনে ভোগ করিতে হইত, তাহাকে মুহূর্ত্তমাত্রে খণ্ডিত করিতে যাইয়াই তাহার শক্তি এমন প্রবলভাবে অনুভূত হয়। কুপ্রবৃত্তির প্রবল শক্তি কাব্যাকারে ফুটাইয়া তুলিতেই, দেবগণের পলায়ন ইত্যাদি পরিকল্পিত হইয়াছে। অন্ধকার সাহায্যে আক্রমণের অর্থ সাধকমাত্রেই অবগত আছেন।

গহকারক ! দিট্ঠোহসি
পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা
গহকূটং বিসংখিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং
তণ্হানং খয়মজ্ঝগা ॥
দেহঘর নির্ম্মাতারে অন্বেষণ করি,
বার বার করিলাম জনম ধারণ ;
পরিভ্রম করিলাম অসংখ্য সংসার ;
কিন্তু হায় ! তবু তাঁর দেখা মিলিল না .
বিড়ম্বনা পুনঃপুনঃ জনম গ্রহণ !
এবারে চিনেছি তোমা ওগো গৃহকার !
পারিবেনা গৃহ আর করিতে নির্ম্মাণ ;
গৃহভিত্তি নির্ম্মাণের যত উপাদান
ভগ্ন, নষ্ট, বিসংস্কৃত করিয়াছি সব—
বীততৃষ্ণ চিত্ত লীন নির্ব্বাণ-সায়রে।

——

ম্যানচেষ্টার কলেজ এবং মীডভিল থিয়লজিকাল স্কুলের স্কলার্শিপ সম্বন্ধে পত্র। *

From

A. C. Banerji, Esq., I. E. S.,
M. A. (Cantab), M. Sc (Cal),
F. R. A. S (London)
Gyan Kutir, Katra,
A L L A H A B A D.
Dated 29th October, 1929.

To

The Editor, of
The Tattwa bodhini Patrika

Dear Sir,

Will you kindly publish the following set of questions in your esteemed paper ? I shall be much obliged if any of your readers, acquainted with true facts will kindly send his replies through the medium of your paper. I am sure every Brahmo is interested in this matter, especially as at the present moment there is such a dearth of Brahmo ministers and social workers that any privilege and facility afforded by liberal religious bodies in the West for the training of our men, should be readily availed of.

Youra faithfully,

[Q U E S T I O N S.]

(1) What has become of the Manchester College and the Meadville Theological School Scholarships, Candidates for which used to be selected by the Brahmo Samaj Committee ?

(2) Has any body been selected to receive the Scholarship since 1925 ? If not, why ?

(3 Notices of the offer of the Meadville Scholarship appeared for the last time in Brahmo Samaj papers during the latter half of 1926. Why was no one selected that year ? Why did not the notice reappear in the years following, if no candidate was selected in 1825 ?

(4) When was the last meeting of the Brahmo Samaj Committee held ? Were members representing all the three Samajes present on the occasion ? Were notices served on them in time so that they could attend the meeting ?

(5) Several Ttustees of the Meadville Theological School (including the President-Emeritus Dr. F. C. Southworth) visited India since 1926, Did the Brahmo Samaj Committee meet them and discuss the prospects of such scholarships ? If so, what was the result ? If not, who is responsible for not arranging any conference between the Meadville Trustees and the Brahmo Samaj Committee ?

(6) The Brahmo Samaj Committee among others had for its aim the bringing about of a friendly relation among the

* আমরা উপরোক্ত বিষয়ে শ্রীযুক্ত এস, সি, বানার্জ্জী মহোদয়ের সাহুর্দার পত্রখানি সাদরে প্রকাশ করিলাম। আগামী সংখ্যায় ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিব এবং তৎপরে এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। তঃ সঃ সম্পাদক।

different Samajes. Was anything done by the Committee to make a united celebration of the Centenary possible? If nothing was done, why was it not done?

ছাত্রজীবন।

(শ্রীরত্নমালা দেবী)

দিনে দিনে মাস পূর্ণ হইয়া থাকে। মাস হইতেই আবার বৎসর পূর্ণ হয়। বৎসর আবার যুগে পরিণত হইয়া থাকে। এই যুগব্যাপী অনন্ত কাল লইয়াই আমাদের জীবন।

যদি কেহ এই জীবনকে সুন্দররূপে সাধুভাবে সুগঠিত করিয়া তুলিতে চাহেন, তবে শিশুকাল হইতেই জীবনকে সাধুভাবে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। শিশুজীবনের প্রথম গঠনই মাতৃহস্তে ন্যস্ত। জননীর যত্নেই বালক পরিণত বয়সে চরিত্রবান উদার দয়ালু ও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। আমাদের দেশের রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা মনীষিগণ জননীর যত্নেই মহৎ হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই শিশুদিগের চরিত্র গঠন হওয়া আবশ্যক। শিশু ক্রমে বয়স্ক হইয়া যাহাতে পবিত্র ভাবে ছাত্রজীবন যাপন ও কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক ও পিতামাতার একান্ত লক্ষ্য রাখা উচিত। শুধু বিদ্যাশিক্ষায় বালকগণের চরিত্রগঠন হইতে পারে না। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহারা ছাত্রজীবনে সাধু ভাবে চলিতে পারে এবং পরিণত বয়সে মানবোচিত গুণে বিভূষিত হইয়া মনুষ্য নামের উপযুক্ত হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়। মানবের আয়ুষ্কাল অতি অল্প, তাহাও সুখ-দুঃখ অভাব-অশান্তি দুঃখ-দৈন্যে ভরা। এই সকল অভাব অশান্তি দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া ব্যর্থজীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই মানবধর্ম্ম। জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির রাখা দরকার। এই ছাত্রজীবন হইতেই শিক্ষার মধ্য দিয়াই তাহাদের চরিত্র গঠন হওয়া আবশ্যক।

ছাত্রজীবনে যাহাতে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষা হয় তাহা একান্ত কর্ত্তব্য। সর্ব্বজীবের প্রতি দয়াবান, সকলের প্রতি আত্মবৎ সহানুভূতি বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

ছাত্রগণের প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শয্যা হইতে উঠিয়া শৌচাদি সমাপন দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালন করিবে; এবং শরীর সুস্থ থাকিলে প্রাতঃস্নান করিবে। স্নানের সময় গামোছাখানি ভিজাইয়া উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জনা করিলে শরীরের ময়লা ও দূষিত ঘর্ম্মাদি নষ্ট হইয়া শরীর সবল ও সুস্থ রাখে। যদি শরীর সুস্থ থাকে তবে প্রত্যহ শীতল জলে স্নান করাই কর্ত্তব্য গাত্রে অধিকক্ষণ জলবসা ভাল নহে। স্নানান্তে সুধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দনা করা উচিত; কেন না প্রাতঃকালই ভগবদুপাসনার প্রশস্ত সময়। এই সময়ে মন শান্ত ও উদ্বেগশূন্য থাকে। যিনি আমাদের সুখের জন্য ভোগের জন্য এ সংসারে কত অপূর্ব্ব বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আমাদের স্নেহের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য পিতামাতা ভাইবন্ধুর স্নেহ-ভালবাসায় আমাদের জীবন সুখময় করিয়াছেন, সেই জগৎবরেণ্য পরমদেবের চরণে প্রতিদিন ভক্তিভরে প্রণাম করিবে।

যথাসময়ে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে গমন করিবে ও একাগ্রচিত্তে পাঠ অভ্যাস করিবে। আহারের সময় সংযতভাবে আহার করিবে। পবিত্র বিশুদ্ধ আহার্য্য ভোজন করিবে। আহারই মানবজীবনের প্রধান উপাদান। আহারীয় বস্তুগুলি যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, অন্ন ব্যঞ্জনগুলি সুপক্ক, সুস্বাদ ও লঘু হয়, এরূপ হওয়া প্রয়োজন। যে আহারে আয়ু বল ও স্বাস্থ্য আনয়ন করে সেইরূপ আহার করা কর্ত্তব্য। অধিক মৎস্য-মাংস আহার করা ভাল নয়। লোভের বশীভূত হইয়া গুরুভোজন করিবে না, গুরুভোজনে পীড়া হইয়া থাকে।

প্রত্যহ বিদ্যালয় হইতে আসিয়া সমস্ত দিনের পরিহিত ঘর্ম্মাদিদূষিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে ও গা মুছিয়া ফেলিবে এবং হস্ত-মুখ প্রক্ষালনান্তে জলযোগ করিয়া কিছুক্ষণ ক্রীড়া ও ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য।

অধিক রাত্রিজাগরণ ছাত্রদের পক্ষে উচিত নহে। রাত্রি ১০টার মধ্যেই শয়ন করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ আলস্যের বশীভূত হইবে না। যে সময়ের যে কাজ তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করা উচিত।

সত্যের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও সকল কার্য্যে সকল চিন্তায় ছাত্রদিগের সত্যনিষ্ঠ হওয়া কর্ত্তব্য। প্রতিদিন ছাত্রগণের কিছু কিছু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহা মনে রাখা উচিত। প্রত্যহ শয্যা হইতে উঠিয়া শৌচাদি সমাপন করিয়া মুখহাত ধুইয়া প্রাতঃকালে ভগবদুপাসনা ও তাঁহার ধ্যান, স্মরণ বা স্তুতি করা ছাত্রদের নিতান্ত কর্ত্তব্য, কেন না ধর্ম্মই মানবজীবনের মূলভিত্তি। বাল্যকাল হইতে বালকগণকে ধর্ম্মপথে চালিত করা কর্ত্তব্য। আজকাল ছেলেদের মনে প্রায়ই ধর্ম্মভাব বিকশিত হয় না। শিশুকাল হইতে যদি জননীগণ সন্তানগণের মনে ধর্ম্মভীরুতা জন্মাইয়া দেন, তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া নিশ্চয় ধার্ম্মিক হইয়া উঠে। কিন্তু বাল্য-

কালে যাহাদের মনে ধর্ম্মভীরুতা না জন্মে, পরিণত বয়সে তাহারা যথেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব হইয়া থাকে। এই জন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাদান কর্ত্তব্য।

সকল বিষয়ে নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে ছাত্রদের চরিত্রগঠন হইয়া থাকে। ছাত্রজীবনে শান্ত সংযত হইয়া থাকা প্রয়োজন। তাহাদের প্রথম জীবনের কর্ত্তব্য গুরুভক্তি ও গুরু বা শিক্ষকের আজ্ঞা পালন এবং পিতামাতার আজ্ঞা পালন ও তাঁহাদের সেবা। তৎপরে সংযম অভ্যাস। ছাত্রগণ ছাত্রজীবনে পবিত্র সরলহৃদয় দয়ালু অক্রোধী হইবে। সকলের সহিত মিষ্টব্যবহার করিবে, গুরুজনদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে এবং রাজভক্ত হইবে। আমরা যে রাজার রাজ্যে বাস করি, সেই রাজাই আমাদের ধন মান প্রাণ রক্ষা করেন। রাজাই প্রজার পিতৃতুল্য। শিক্ষকেরা এইরূপ রাজভক্তি বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দিবেন। আজকাল এল-এ, বি-এ পাশ করিলেও বেশীর ভাগ ছাত্রকে উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব দেখা যায়। তাহারা পিতামাতা ও গুরুজনের আজ্ঞা পালনে অপমান বোধ করে এবং তাহাদের অধিকাংশকে দাম্ভিক অহঙ্কারী ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি দেখা যায়। যাহাতে ছাত্রগণের ছাত্রজীবন আদর্শজীবনে পরিণত হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। যাহাতে তাহারা শান্ত সংযমী দয়ালু পরোপকারী হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণকর কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে তাহাই প্রার্থনীয়। ছাত্রজীবনে সত্য শৌচ সম দম আর্জ্জব সরলতা অহিংসা মৈত্রী এই সকল গুণ ছাত্রদিগের হৃদয়ে বিশেষ পরিস্ফুট করা উচিত।

ছাত্রেরা মনে রাখিবেন, ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্যপালনই তপস্যা। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে ছাত্রগণকে কিছুকাল গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। এমন কি দশম বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে পিতামাতা পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুগৃহে পাঠাইতেন। অন্ততঃ দশ বৎসরকাল ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ গুরুগৃহে বাস করিতেন, তৎকালে গুরু বা শিক্ষক শুধুই তাঁহাদের অধ্যয়ন বা পাঠ দিয়া নিরস্ত হইতেন না; যাহাতে ছাত্রদের চরিত্রগঠন হয়, যাহাতে তাহারা মানুষ হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, সেই দিকে তাঁহাদের অধিক লক্ষ্য থাকিত। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই সংসারে এম-এ বি-এ উপাধিধারী বিদ্বাননামে পরিচিত অনেকে আছেন। কিন্তু চরিত্রবান ও কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। ছাত্রগণকে বাল্যকাল হইতে কর্ত্তব্যপালন করিতে শিক্ষাদান করা সর্ব্বতোভাবেই উচিত। বালকগণ শুধু তোতাপাখীর ন্যায় পাঠ অভ্যাস করিলেই তাহাদের চরিত্রগঠন হইবে না; বাল্যকাল হইতেই ছাত্রগণ যাহাতে সত্যনিষ্ঠ, বিনীতস্বভাব, দয়ালু, পরোপকারী, সংযমী, মিতাচারী ও ধর্ম্মভীরু হয় এবং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরিত্রগঠন হয়, তাহাদের হৃদয়ে দয়া ভক্তি স্নেহ মৈত্রী প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হয়, সেইরূপ শিক্ষা দেওয়াই বিশেষভাবে কর্ত্তব্য।

ছাত্রজীবনে সংযমী হওয়া উচিত, সকল বিষয়েই ছাত্রগণ সংযত হইবেন। কখন সত্যের অপলাপ করিবে না, পিতামাতা ও গুরুজনদিগকে সেবা করিবে, সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবে, তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালন করিবে এবং আহারে বিহারে শয়নে ভোজনে সংযমী ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইবে। ছাত্রজীবন গঠনের জন্য যে গুণগুলির প্রয়োজন, সর্ব্বদা সেইগুলি ছাত্রদের অভ্যাস করিতে হইবে; কেন না অভ্যাসই যোগ। এই অভ্যাসযোগ শিক্ষার ফলে তাহাদের সদভ্যাসগুলি পালন করিতে করিতে ক্রমেই অভ্যাস হইয়া যাইবে। ছাত্রজীবনে সত্য, শৌচ, তপ, দম, আর্জ্জব, সরলতা, অহিংসা, অক্রূরতা, স্নেহ, দয়া, ভক্তি, পরোপকার প্রভৃতি গুণগুলি যাহাতে জীবনকে সুন্দর ভাবে গঠিত করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে তাহারা মানুষ হইয়া মনুষ্য নামের পরিচয় দিতে পারে, ইহাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য থাকা উচিত। শুধু বিদ্যা শিক্ষায় মানুষ, মানুষ হইতে পারে না। বিদ্যাশিক্ষায় প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিতে পারে, ধন মান সম্পদ লাভ করিতে পারে; কিন্তু চরিত্রের পূজা লাভ করিতে পারে না। সচরাচর আমরা দেখিতে পাই, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও মদ্যপায়ী চরিত্রহীন দাম্ভিক নিষ্ঠুর ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বিদ্বান এবং প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন; তথাপি চরিত্রকারণে তাঁহারা সংসারে সুখশান্তি লাভ করিতে পারেন না। মানব যদি পরিণত জীবনে সুখ, শান্তি, মান, যশ চাহেন তবে তাঁহার চরিত্রগঠন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই হেতু ছাত্রজীবন হইতেই ছাত্রগণ সংযতচিত্ত ও দয়ালু হইয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধন করিয়া নিজের ও অপরের দুঃখমোচনে যত্নবান হইবেন।

কুসংসর্গ ত্যাগ করিবেন। সংসর্গদোষেই মানবের অধঃপতন ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বদা সৎকথা আলোচনা করিবে, সদ্ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবে, সুরুচিপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিবে। ছাত্রজীবনে বিলাসব্যসনে থাকা অনুচিত। অনাড়ম্বর সাদাসিধা পোষাক পরিচ্ছদ পরা উচিত; এবং ছাত্রজীবনে গীতবাদ্য, মাল্য, গন্ধ ও বিলাসপ্রিয়তা অনুচিত। আমরা দেখিতে পাই মানব চরিত্রগুণে দেবত্বও লাভ করিতে পারে এবং চরিত্রদোষে নির্ম্মম পিশাচও হইয়া থাকে। তাহাতেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, জগৎ চরিত্রেরই পূজা করিয়া থাকে, শুধু অর্থের পূজা করে না। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রাচীন

কালেও এই নীতি ছিল যে ছাত্রগণ ছাত্রজীবনে যতকাল গুরুগৃহে বাস করিতেন, ততকালই তাঁহারা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। এই ব্রহ্মচর্য্যের বলেই ছাত্রগণের তেজ, বল, মেধা, পুষ্টি, কান্তি, স্মৃতি সব অক্ষুণ্ণ থাকিত। এখন আমরা দেখিতেছি ছাত্রগণের সেই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে তাহারা ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্ব্বল, রুগ্ন, স্মৃতি-মেধাহীন হইয়া পড়িয়াছেন; এবং ছাত্রজীবনের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া অনেকে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত ও বলহীন হইতেছেন। ছাত্রজীবনে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত। নৈতিক চরিত্রবলের মূলে যে ব্রহ্মচর্য্য-পালন, ছাত্রগণ যেন তাহা মনে রাখেন। যে শিক্ষায় তাহাদের চরিত্রগঠন হয়, যে শিক্ষায় তাহাদের জীবন আদর্শ-জীবনে পরিণত হয়, যে শিক্ষায় তাহাদের মনোবৃত্তি সুমার্জ্জিত হয়, যে শিক্ষায় তাহারা স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া পরার্থে জীবনমন উৎসর্গ করিতে পারে, তাহাদের সেই শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়। সংসারে এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন এবং প্রচুর অর্থোপার্জ্জনও করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় দয়া, ভক্তি, স্নেহ, মমতার পরিবর্ত্তে হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দোষে কলুষিত। তাঁহারা ইহজগতে শান্তি সুখলাভ করিতে পারেন না, পরলোকে তাঁহারা শান্তি প্রাপ্ত হয়েন না। এই কারণেই বাল্যকাল হইতেই বালকগণের যাহাতে চরিত্র গঠন হয় যাহাতে তাহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন হয় তাহারই চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যিনি এসংসারে আসিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করেন, তিনি তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে প্রকৃত মানুষ করিতে সক্ষম হয়েন। কিন্তু নিজেকে উন্নত করিতে না পারিলে অন্যকে উন্নত করা অসম্ভব। যিনি এজগতে আসিয়া মনুষ্যত্ব লাভ না করিলেন তাঁহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র।

নানা কথা।

ঈশ্বরের আশ্বাসবাণী—যে ঈশ্বর আছেন, যিনি ভাল বাসেন, মানুষ অন্তরে সেই ঈশ্বরের আশ্বাসবাণী শুনিতে চায়। যে বিষয় আমাদের বুদ্ধির অতীত, সেই বিষয় সম্বন্ধীয় তর্কবিতর্কের মধ্যে এই আশ্বাসবাণী শোনা যায় না। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে প্রত্যক্ষ নিভৃতালাপ হয় তাহারই ভিতর দিয়াই এই আশ্বাস পাওয়া যায়। প্রত্যেক মানব জীবনে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে, প্রার্থনার উত্তরে যে সাড়া পায়, যে বল পায়, যে সান্ত্বনা পায়; মুক্তাত্মা হৃদয়ে যে শান্তি লাভ করে; পরমাত্মার সহিত যোগসাধনের ফলে মানব তাঁহার সহিত যে সহধর্ম্মিতা লাভ করে এবং সেই সহধর্ম্মিতার ভিতর দিয়া যে স্বর্গীয় করুণাধারা অন্তরে অনুভব করে, তাহারই ভিতর দিয়া এই আশ্বাসবাণী শুনিতে পাওয়া যায়।

বিলাতে পরিচ্ছদ—বিলাতে পরিচ্ছদের ঢং মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা সকলেই জানেন। সম্প্রতি কাগজে দেখি, আগামী শীতের সময় দর্জ্জিদের ঘর থেকে মেয়েদের পোষাক নাকি বেশ একটু লম্বাটে হয়ে বেরোবে। সঙ্গে সঙ্গে লেখা আছে যে, মেয়েরা নাকি ইহার বিরোধী। এই শেষ অংশটুকু পড়ে মনে হয়, এই বিরোধটুকু যেন একটু got-up। আসল কথা, মেয়েদের শালীনতার অভাব দেখে দেখে সমাজ উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছে। দেখা যাক—শীতের সময় কি দাঁড়ায়। পরিবর্ত্তন হলে, আমরা বাঁচি, কারণ দাসমনোভাবের ফলে আমাদেরও দেশে নব্যবঙ্গের মহিলাদের মধ্যে প্রাচীন ভাবের শালীনতা রক্ষায় যত্ন আসা সম্ভব।

ইচ্ছা থাকিলেই পথ—বরিশালের গায়ক মুকুন্দ দাস কাশীপুর পল্লীতে একখানি বাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমি ইত্যাদি (প্রায় ২০।২২ হাজার টাকার সম্পত্তি) একটী মাতলাশ্রম খুলিবার জন্য দান করিয়াছেন। তিনি বলেন এইরূপ একটী আশ্রম খোলা তাঁহার দীর্ঘকালের সংকল্প ছিল। তাঁহার মত লোকের পক্ষে এই দান বড়ই মহনীয়। আমাদের মনে পড়ে, তিনি কলিকাতায় যখন "দাদাঠাকুর" অভিনয় করেছিলেন, তখন সমস্ত সহরে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল; তাঁহার অভিনয়ের গুণে শ্রোতৃবর্গের অনেকেরই হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। কেবল আমাদের দুঃখ হয় যে, যে রাজা রামমোহন রায়ের কল্যাণে আজ সমগ্র ভারত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও স্বাধীনতার পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই রামমোহন রায়ের স্মৃতি বজায় রাখিবার জন্য কাহারও অন্তরে তেমন সাড়া জাগিয়া উঠে না। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে যে স্মৃতিচিহ্ন দাঁড় করাইয়াছেন, তাহার জন্য তিনি আমাদের যথেষ্ট ধন্যবাদের পাত্র নিঃসন্দেহ। কিন্তু তথাপি আমাদের মনে হয়, যে আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপন উপলক্ষ্যে রাজা রামমোহনের মহত্ব বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রথমে সেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার ও তৎসংপৃক্তভাবে কোন আশ্রম প্রভৃতি সংস্থাপিত করিলে ধীরেন্দ্রবাবুর পরিশ্রম অধিকতর সার্থক হইত। আজ শতাব্দীর পরে জিজ্ঞাসার সময় এসেছে—বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে এমন কি কেহ নাই যিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযুক্তভাবে কোন প্রকার স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনে

ইচ্ছা করেন? যাঁহার ইচ্ছা থাকিবে, তিনি পত্রও দেখিতে পাইবেন।

পত্রিকাপরিচয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, তত্ত্ববোধিনীর গত ভাদ্র সংখ্যার প্রকাশিত শ্রীবাণীদেবীর "শিশুদের সঙ্গীতশিক্ষার প্রয়োজন" সুধী-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গত ১৩ই আশ্বিনের শিক্ষাসমাচারে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকার গত আশ্বিন সংখ্যা পাইয়া লিখিতেছেন:—

"আপনার গত ৫ই ও ৯ই ভাদ্রের উপদেশ পাঠ করিলাম। উপদেশগুলি সুন্দর হইয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আপনি যে আশা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমিও সেই আশাকে সম্বল করিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ফলাফল বিধাতার হাতে। আরও মিলনের প্রয়োজন। শত-বার্ষিকি সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ৯৯ বৎসরের পাজি-পুঁথি এক কথায় উড়ে যাবে এটা ঠিক নয়। নমস্কার, ইতি।"

INDUSTRY—August 1929—দুঃখের বিষয় তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় স্থানাভাব বশত গত দুই তিন মাস হস্তগত মাসিক পত্রিকাদির সমালোচনা করিতে পারি নাই; কিন্তু করা উচিত ভাবিয়া আবার উহাতে হস্তক্ষেপ করিলাম। আলোচ্য পত্রে "কৃতকার্য্যতার সোপান" মুখপ্রবন্ধটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বিষয়ে গুরুতর। সংক্ষেপে কৃতকার্য্য হইতে গেলে যে মনোভাব হওয়া দরকার তাহা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। "লজেঞ্জস" (lozenges) প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। যেরূপ কঠিন দিন-কাল পড়িয়াছে, আমাদের উপদেশ এই যে দশ-পাঁচ জনে মিলিত হইয়া দেশের লোক যৌথ কারবার খুলিয়া এই প্রকার শ্রমশিল্পে নামিয়া পড়ুন। "চর্ম্মসংস্কারপ্রণালী"র (Tanning Hides & skins) ২য় কিস্তি চলিতেছে। বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত হইলেও সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে। অল্প মূলধনে অনেকগুলি কারবারের কথা দেওয়া আছে। শুধু ইহারই জন্য সম্পাদক মহাশয়কে শতমুখে ধন্যবাদ জানাইতেছি। দেশের দুর্দ্দিনে আজ না হোক কাল দেশকে বাঁচাইবার পক্ষে এগুলি যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

গৃহস্থমঙ্গল—ভাদ্র, ১৩৩৬; টোটকা চিকিৎসার কতকগুলি সুন্দর ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় যদি এগুলি একটা গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে দেশবাসীর প্রকৃত উপকারে আসিবে। "পুনাং গাছ" সম্বন্ধে বাহির হইয়াছে। আমি কটকে অবস্থানকালে শুনিয়াছিলাম যে, কিছুকাল যাবৎ পুনাংএর তেল রংএর কার্য্যে ব্যবহারের জন্য আমেরিকায় প্রেরণ করিয়া অনেকে বিশেষ লাভবান হইয়াছেন। সেখানে উহা দীপ জ্বালাইবার কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত, রংএর কার্য্যে যে উহার সুচারু ব্যবহার হইতে পারে, তাহা ইতিপূর্ব্বে কেহই জানিত না। একজন সুপ্রসিদ্ধ হাকিম পুনাং তৈলের আর একটি মস্ত গুণ আমাকে বলিয়াছিলেন— সকালে বৈকালে উহা ৫ ফোঁটা করিয়া একটু কাশীর চিনির সহিত খাইলে নাকি কঠিন মেহ রোগও আরোগ্য হয়। আমি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। মনে হয়, ইহা মারাত্মক নহে; কারণ কটকে ছোট ছোট ছেলেপিলেকে পুনাং ফল চিবাইতে দেখিয়াছি। কবিরাজ শ্রীরজনীকান্ত বল মুন্সী কবিরত্ন "সর্পাঘাতে দেশবাসীর কর্ত্তব্য ও প্রাপ্ত ঔষধাদি" প্রবন্ধে অনেকগুলি দেশীয় ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। আমরাও অনেক রোগের অনেকগুলি ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছি, সেগুলিও যথাসম্ভব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিব ইচ্ছা করিতেছি। এই সংখ্যায় বিলাতী বেগুণ এবং হলুদ, এই দুইটির চাষের বিষয় দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা হা-চাকরী করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা এই দুইটী বিষয়ে হাত লাগাইলে নিশ্চয়ই উপকার পাইবেন। যদি সত্যই কেহ কৃষিকার্য্যে অবতীর্ণ হইতে চান, আমরা তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছি। সম্পাদক মহাশয়কে আমরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় একটী সৎকথা উপহার দিতেছি—

"আঁতে তিতো দাঁতে নুন।
ভাত খায় তিনকুন॥
চোখে জল কানে তেল।
বৈদ্য চায় ভেল ভেল॥"

মানসী ও মর্ম্মবাণী—কার্ত্তিক, ১৩৩৬ "পিতা" নামে ভূমিকা দিয়া রঙ্গলাল প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা অনেক বড়লোকের পিতাদের ছবি বাহির করিয়াছেন, এবিষয়ে তাঁহার অধ্যবসায় বড়ই প্রশংসার যোগ্য। তিনি যে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, কয়েক বৎসর বাদে উহার যথার্থ মূল্য বোঝা যাইবে।

INDUSTRY—September 1929—ফল-সংরক্ষণ (Fruit Preservation) প্রবন্ধে আনারস, আম প্রভৃতি বিলাতী ধরণে রক্ষা করিবার প্রণালী সহজভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই সঙ্গেই "জেলি" "জ্যাম" প্রভৃতি বিলাতী খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালীও দেখান হয়েছে। Malt vine-

ra প্রবন্ধটী যবের শিরকা প্রস্তুত সম্বন্ধীয় বটে, কিন্তু বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত। তারপর "কালী প্রস্তুত" প্রবন্ধটীতে দেশী ও বিলাতী কালী প্রস্তুতের প্রণালী বিস্তৃত করে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কারো কারো মতে কালী, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইতিপূর্ব্বেই খুব বেশী প্রচারিত হয়েছে। আমরা বলি, হোক না—যতই প্রচার হয় ততই ভাল। কে জানে কার হাতে কোন্ কাজটী খুলে যায়। Pottery Industryতে মৃৎশিল্প চীনামাটীর জিনিষ প্রস্তুত কালে যে সমস্ত যন্ত্র দরকার হয়, তার ছবি দেওয়া হয়েছে। গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য মূলগত যে আতর ও তৈল দরকার হয়, তাহার সচিত্র বর্ণনা যা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে জিনিসটা বেশ সুবোধ্য হয়েছে। গিল্টি করা সম্বন্ধেও একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। অল্প ধনে কারবারের কতকগুলি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। August সংখ্যায় সম্পাদক আশ্বাস দিয়াছিলেন যে অল্প ধনে কারবারের অনেক ইঙ্গিত September সংখ্যায় থাকবে, তাঁর সে আশ্বাস সার্থক হয়েছে। তিনি দেশবাসীকে স্বাধীন জীবিকার পথে চালাইবার জন্য যে প্রকার প্রয়াস পাইতেছেন, সেবিষয়ে সমালোচনাসূত্রেও আমরা তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিবার অবসর পেয়ে ধন্য হয়েছি।

শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ—শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৩৬—গোত্র ও প্রবরসম্বন্ধীয় তত্ত্ব বড়ই ঔৎসুক্যজনক এবং ইহার সমাধানে যথেষ্ট গবেষণা দরকার। লেখক বড়ই সংক্ষেপে প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। আমরা পণ্ডিতপ্রবর রাধাবল্লভ বাবুর নিকট এবিষয়ে আরও তথ্য লাভের আশা করি। কিন্তু তিনি প্রথমেই যে বিধান দিয়াছেন যে, সগোত্রে বিবাহ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ এবং স্বগোত্র বিবাহের সন্তান চণ্ডাল হইবে—তাহার সপক্ষে আমরা কোন প্রমাণ পাই নাই। মনুসংহিতায় উহা কেবলমাত্র "দ্বিজাতিগণের পক্ষে অপ্রশস্ত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ গ্রন্থকার" প্রবন্ধে যাহাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে, তাঁরা শকলেই যে শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ তাহার আর একটু প্রমাণ দিলে ভাল হইত, নচেৎ অস্বীকৃত হইবার সম্ভাবনা। সম্পাদক মহাশয় "নৃত্যাভিনয়ে হিন্দু মহিলা" প্রবন্ধে মহিলার নৃত্যাদির বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। তিনি যদি ইহার মূলে গিয়া থিয়েটার প্রভৃতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন, তবেই সুফল প্রসবের সম্ভাবনা। "লেবুর উপকার" প্রবন্ধে লেবুর অনেক গুণ বলা হয়েছে। কবিরাজী মতে লেবুর ব্যবহারে অনেক সুফল। আমার মনে পড়ে, রোমে একবার ম্যালেরিয়া কমিশন বসিয়াছিল; সেই কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, কুইনাইন ম্যালেরিয়ার প্রকৃত ঔষধ নহে, কিন্তু লেবুর রস, গরম জল ও স্বল্প লবণই উহার প্রকৃত ঔষধ।

সৌরভ—ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩৬—"মৃগয়া শিকার" প্রবন্ধটী মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধের "শিকারের স্বপক্ষে দুটো কথা" এই রকম কোন একটা নামকরণ হলেই ভাল হইত।

মাতৃমন্দির—কার্ত্তিক ১৩৩৬—"বাংলার মৃৎশিল্প" প্রবন্ধ মৃৎশিল্পী শ্রীনিতাই চরণ পালের অভিজ্ঞতার উপর লিখিত বলিয়া বড় সুন্দর হয়েছে। লেখক ঠিক বলেছেন—"দরিদ্র বিধবা ও নিরাশ্রয়ীদিগের ইহা একটী স্বাধীন জীবিকার অন্যতম পন্থা।" তিনি আরও বলেন যে ইহা দ্বারা দেশের অনেক পয়সা বাঁচানো যায়। ঠিক কথা। যদি কেহ আজকাল হগ মার্কেটে যান, তিনি দেখতে পাবেন সেখানে মাটির ঘোড়া বিক্রী হয়। আগে এই সমস্ত ঘোড়া বিলেত থেকে আসত—দাম প্রায় কুড়ি টাকা ছিল; এখন দেশী ঘোড়ার দাম ৫৲ থেকে ১০৲ টাকা। কিন্তু শুনেছি, এই ঘোড়াগুলো তৈরি করে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বেশী। অনেক দিন পরে শ্রীরত্নমালা দেবীর লিখিত কবি অক্ষয় বড়ালের "কনকাঞ্জলির" সমালোচনা পড়ে একটা অনুপম শান্তি পেলাম। অক্ষয় বড়ালের কবিতা এক সময়ে তরুণদের সাথী ছিল—এখন কেই বা তা পড়ে? যাক্ সমালোচনাটী বড়ই সংক্ষিপ্ত হয়েছে—অক্ষয় বাবুর কবিতার ভিতর যে একটা গভীর শান্তিধারা প্রবাহিত, সেটা ফুটিয়ে তুললে ভাল হইত। শ্রীমানকুমারী বসুর "অনুনয়" কবিতাটী বড় মিষ্ট লাগিল। সম্পাদক মহাশয় যে সকল বিলাতের পত্র প্রকাশ করছেন, এগুলি বেশ interesting, কিন্তু এগুলি তাঁর "বিলাত ভ্রমণের" পরিশিষ্টরূপে দিলে ভাল হইত। "পুরাতনী" প্রবন্ধে শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র দুইখানি প্রাচীন সংবাদপত্র সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। "সর্দ্দা বিল" প্রবন্ধে লেখক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় M-A, B-L, ঠিক বলেছেন—"যাহা আমাদের দেশের ও দশের কাজ, তাহা আমরা নিজেরা না করিয়া, কাপুরুষের মত শাসকসম্প্রদায়ের হাতে তুলিয়া দিতেছি।" * * * "আমরা কি চৈতন্যহীন যে, মনিব মহাশয়ের বেত্রাঘাত ও সবুট পদাঘাত পৃষ্ঠে না পড়িলে কার্য্য করিতে পারি না?" নিরপেক্ষ শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেই লেখকের সহিত একমত হইবেন নিঃসন্দেহ। মাতৃমন্দিরে যে "রন্ধনবিদ্যা" প্রবেশ করিতেছে, ইহা সুলক্ষণ।

হোমিপ্যাথিক পরিচারক—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা- সম্পাদক ডাঃ কে, কে, রায় এম-ডি (কালিফর্ণিয়া) এবং ডাঃ অজিতশঙ্কর দে এইচ, এম, বি। প্রাপ্তিস্থান—হোমিওপ্যাথি সার্ভিং সোসাইটী, ৫নং ভিক্টোরিয়া রোড; পোঃ বরাহনগর; কলিকাতা।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, এই পত্রখানি ৩য় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, হোমিওপ্যাথি ঔষধের গুণে অনেকস্থলে আশ্চর্য্য ফল দিয়াছে। মফঃস্বলে হোমিওপ্যাথি ঔষধের ন্যায় আরোগ্যসাধনে দ্বিতীয় সহায় আছে কি না সন্দেহ!

প্রথম প্রবন্ধ—বিশুচিকা বা কলেরা—বর্ত্তমান কিস্তিতে ইহার ইতিবৃত্ত সুবোধ্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—"শান্তির সন্ধান"—ইহাতে নাটকাকারে হোমিও ঔষধসমূহের গুণাবলী প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। গুণানুসারে ঔষধগুলির নামকরণ হইয়াছে। ঔষধাদির গুণব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা এই নাটুকে প্রণালীর পক্ষপাতী নহি। ইহাতে সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই বেশী আসে। "হোমিওপ্যাথিক রঙ্গরসে" গালাগালিতে ব্যবহার্য্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। "আদর্শ প্রশ্নোত্তরমালা"য় কোনায়াম ঔষধের ব্যবহার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্নোত্তর-ভাবে লিখিত বলিয়া আমরা মাথায় ঠিক ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয় Johnston প্রভৃতির প্রণালী অনুসারে theraputicsএর ব্যবস্থা করিলে সাধারণের বেশী সুবিধা হয়। হোমিওপ্যাথির প্রবর্ত্তক হ্যানিমানের "organon of medicine" এর অনুবাদ সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং করিতেছেন। ভাষা সুবোধ্য হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, কতদিনে যে শেষ হইবে তাহা বলা যায় না। "চিকিৎসা" প্রবন্ধে লেখক ডাঃ শ্রীকুঞ্জলাল সেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মর্ম্মকথা সুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের ডাঃ শ্রীরামেন্দ্রনাথ দাস এম, ডি, Retraction of penis (টোনা) রোগে Cuprum met. 6 এক ফোঁটা দিয়াই আশ্চর্য্য উপকার পাইয়াছেন। এই রোগে নাকি রোগী সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাই এই উপকারপ্রদ ঔষধ আমরাও পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম। "নির্দ্দেশক"এ সম্পাদক কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকের নির্দ্দিষ্ট ঔষধ ও তাহার প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম—

(১) রোগীর গাত্রের তাপ বর্ত্তমান অথচ right heart নিষ্ক্রিয় হইবার উপক্রম করিতেছে—তাহার জন্য Ammon carb ব্যবহার্য্য—G. Borick.

(২) স্ত্রীলোকের দুর্ণিবার বন্ধ্যা রোগে natrum carb—E. Wright

(৩) পারদের বিষম ঔষধগুলির মধ্যে, বিশেষত পারদের কুফল যখন ভীষণভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন Nitric Acidএর ব্যবহার বিবেচ্য—সি এম বোজার।

(৪) Injectionএর কুফলে অন্যান্য ঔষধের অপেক্ষা phosporusই সূচিত হয়। আর, হার্ণ।

(৫) পৌনঃপুনিক স্ফোটকের (recurrent boils) জন্য arnicaর বিষয় চিন্তা করিবে। এইচ সি ক্লার্ক

(৬) যখন perforated woundএর বাহ্যিক আকারের অনুপাতে টাটানি বা ব্যথা পুব বেশী থাকে, তখন Ledum অপেক্ষা Hyperiumএর বিষয় অধিক চিন্তা করিবে। জে, এইচ ক্লার্ক।

আমাদের মনে হয় সম্পাদক মহাশয় উপরোক্ত ঔষধের কত potency ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা জানাইলে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইত।

SCIENTIFIC INDIAN—Vol. I. no. I Editor J. Haldar M.sc. 22-1-1 Jeliatola Street, Calcutta, January 1929 annual subscription Rs 3.

ইহা বিজ্ঞানবিষয়ক একখানি ইংরাজী পত্রিকা। বাংলায় লিখিত হইলে আমরা বেশী সুখী হইতাম। কিন্তু আমরা যখন "বিলাতী ধরণে কাশি, ফরাসি ধরণে হাসি" তখন সম্পাদক মহাশয়কে দোষ দিই কেমন করিয়া? আজ ৬ই জুন, কিন্তু জানুয়ারী মাসের কাগজ—আজ পাইলাম। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পুরো নাম দেন নাই, কাজেই তাঁকে হালদার মহাশয় বলেই অভিহিত করিব। আমাদের অনুমান হয় "statesmen" কাগজের "notes and querries"এ যিনি নানা বিষয়ে উত্তর দিতেন, ইনিই তিনি। তাহা যদি হয়, তবে ইঁহার নানাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ আছে এবং এরূপ একখানি পত্রিকা চালাইবার অধিকার আছে বলা যায়। আজ-কালকার বাজারে চাকরীর অবস্থা যেরূপ, তাহাতে স্বাধীন জীবিকার অনুকূল একখানি trash কাগজ বাহির হইলেও তাহার মূল্য আছে। তবে হালদার মহাশয়কে আমাদের অনুরোধ, তিনি যেন দেশকে, শুধু কাগজে লিখিয়া নহে, কিন্তু হাতে-হেতেড়ে, স্বাধীনজীবিকার পথে অগ্রসর হইবার বিষয়ে সাহায্য করেন। আলোচ্য সংখ্যায় দেশগৌরব স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর সংক্ষিপ্ত ও সচিত্র জীবন বাহির হইয়াছে। Possibilities in Agricultural Industries বা কৃষিশিল্পের প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত এস, হালদার (পুরো নাম জানি না) কৃষি-অবলম্বনে কোন্ কোন্ শিল্প সহজসাধ্য হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইবার যদি ঐ এক-একটী বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন তো ভাল হয়। "কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞান", "শিল্পবিষয়ক উন্নতি"

প্রভৃতি টুকি-টাকি বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ আছে। "শিল্প-বিষয়ক formula"তে যে কয়েকটি formula দেওয়া আছে, তন্মধ্যে faded ফটোগ্রাফ পুনরুদ্ধার করিবার যে formula দেওয়া হইয়াছে, সেইটী কাজে আসিবে। বাক্যগুলি যে ভাবে লিখিত আমরা তাহাতে সুখী নই—দেশের ছেলেরা হাতে-হেতেড়ে কি ভাবে কি কাজ করিয়া লাভবান হইতে পারে, আমরা সেই সমস্ত বিষয় সহজ ভাবে লিখিত দেখিতে চাই। চিকিৎসার উপযুক্ত কয়েকটি recipes দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি দরিদ্রদের উপকারে আসিতে পারে। মাছের আঁশের সদ্ব্যবহার যাহা লেখা আছে, পরীক্ষা করিলে মন্দ হয় না।

জন্মভূমি—বৈশাখ ১৩৩৬—একটী সুন্দর সাধক সঙ্গীত দেওয়া হইয়াছে; আমরা তাহা উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রাখি। "স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের দুই-একটী ঘটনা" প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার প্রাণের সরল উদার ভাব সুব্যক্ত হইয়াছে। "শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীতত্ত্বে" লেখক শাস্ত্রীয় তত্ত্বনির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। অলক্ষ্মী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, পড়িলেই মনে হয়, ইহার ভিতর অলক্ষ্মী দূর করিবার অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে। এবিষয় কেহ গবেষণা করিলে মন্দ হয় না।

ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৩৬—প্রচ্ছদের মুখেই স্বর্গীয় ব্যারিষ্টারপ্রবর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া আছে। পুরাকালের অনেক স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কংগ্রেসের সূত্রপাত অবধি কত কথাই না মনে উদিত হইতেছে। কণ্ঠের সেই উদাত্ত স্বর এবং হৃদয়ের সেই মহানুভবতা। তখন কলিকাতা "বারের" এখনকার মত দুর্দ্দশা ছিল না—একটা প্রকৃত সম্মানের ভাব বজায় ছিল। "পূর্ব্বরাগ" চিত্রটী মন্দের ভাল। সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধ "গুহ্যাৎ গুহ্যতরং"—শ্রীঅরবিন্দ লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত। ইহা গীতার নবম অধ্যায় এবং বিশ্বরূপদর্শন অবলম্বনে ব্যাখ্যা। বিশেষ কিছুই নূতনত্ব দেখিতে পাইলাম না—পড়িলে মনে হয় যে ইংরাজী দার্শনিক তত্ত্বকে দেশীয় পোষাকে দাঁড় করানো হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অনুবাদটীও বেশ প্রাঞ্জল হয় নাই। "রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যের ভূমিকা" প্রবন্ধে লেখক সিদ্ধান্তে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যের অমরত্বলাভের কারণ করিয়াছেন তাঁহার "অরূপ রূপের, অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সন্ধানে যাত্রা এবং অন্তর-রহস্যের উদ্ঘাটন"। ইহা আংশিক কারণ হইলেও সম্পূর্ণ কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যক্ষেত্রে অমরত্বলাভের প্রধান কারণ আমাদের মনে হয় যে, তিনি যুগধর্ম্মকে বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া তাহার একটী মূর্ত্তি দান করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের এবং হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি নূতন ও পুরাতন সর্ব্ববিধ ভাবসমন্বয়ের একটী ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় সেই ধারাকে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে একটী মূর্ত্তি দিয়া বিকশিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পর যে কারণেই হৌক, সমগ্র দেশের মধ্যে হিন্দু ভাবের ধারা আসিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সেকালের যে সকল মনীষী উহা ধরিতে পারিয়া উহাকে মূর্ত্তিপ্রদানে বিকশিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের সাহিত্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্র অবধি সারা রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ঢঙ্গের যে ভাবধারা অক্ষুন্নভাবে আজ পর্য্যন্ত চলিয়াছে বলিলেও বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যাঁহারা সেই ভাবধারাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়া পরিপাক করিয়াছেন, অর্থাৎ উহাকে নিজ নিজ ভাব, চিন্তা ও কল্পনাবিমিশ্রিত সমস্ত জীবনে মিশাইয়া লইয়াছেন এবং ঐ প্রকার মিশাইয়া লইয়া উহাকে মূর্ত্তি দিয়া সম্যক প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য ও ভাবধারায় নিজ নাম ও কীর্ত্তি খোদিত রাখিতে পারিয়াছেন। প্রত্যক্ষই তো করিতেছি, League of Nations প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে পাশ্চাত্য ঢঙ্গের বিশ্বপ্রেমের বাণী চারিদিকে ছড়ানো হইতেছে—সে বাণী দরিদ্র পরাধীন দেশের নিকট যতই কেন অন্তঃসারশূন্য হোক না—সেই বাণীর অনুকূলে যাঁহারা দুটো কথা বলিয়া তাহাকে মূর্ত্তিদান করিতে পারিবেন, তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করিবেন, তো ধরা কথা। প্রবন্ধলেখক মহাশয় মনে হয় একটু বেশী রকম বিলাতী চশমার ভিতর দিয়া বিষয়টীর আলোচনা করিয়াছেন। "জুরিক থেকে মনট্রো" ভ্রমণবৃত্তান্তটি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। "ব্রতচারিণী" উপন্যাসের ১৯ ও ২০ পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে। এ উপন্যাসে সামাজিক চিত্রের বেশ একটা স্নিগ্ধ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এত বড় উপন্যাসের ধারা মনে রাখা বড়ই দুরূহ হয়। বর্ত্তমান প্রথামত এপ্রকার বড় উপন্যাসের প্রথমেই পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত অংশের একটা চুম্বক বা synopsis দিলে ভাল হয়। "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস" বড়ই সুন্দর। কিন্তু প্রবন্ধের প্রথমে রামপ্রসাদের যে সকল কবিতাকে হাস্যরসের মধ্যে ফেলিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, সেগুলিকে উহাতে না ফেলিয়া গম্ভীর ভক্তিরসের পর্য্যায়ে ফেলিলেই ভাল হইত। মধ্যে "ঈদের মিছিল" একটী

সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এরূপ পুরাতন চিত্রগুলিকে যতই প্রকাশ করা যায়, ততই আর্ট বা চারুকলার সহায়তা হইবে আশা করা যায়। "সিংহল-দ্বীপ" প্রবন্ধে কুমার মুনীন্দ্র দেব মহাশয় লিখিতেছেন যে, সিংহলেও তিব্বতের ন্যায় স্ত্রীলোকের বহুস্বামী লইবার প্রথা আছে। মনে প্রশ্ন আসে যে, (১) এই প্রথা কি পূর্ব্বে অনেক স্থানেই প্রচলিত ছিল? (২) যদি প্রচলিত ছিল, তবে উঠিয়া গেল কেন এবং তাহার ইতিহাস কি? (৩) তিব্বত হইতে এই প্রথা সিংহলাদি স্থানে অথবা সিংহল হইতে তিব্বতাদি স্থানে উহা প্রচলিত হওয়া সম্ভব? এবিষয়ের গবেষণা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক হইবে নিঃসন্দেহ। লেখক সিংহলে বিবাহপ্রথা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন—সুন্দর লাগিল। একস্থানে লিখিত আছে —বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্ব্বে "পাত্রের মাতা অন্দরে গিয়া কন্যাকে দৈহিক পরীক্ষা করেন"। এদেশেও তাহা ছিল—Eugeric theory সহজভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। রাণী শ্রীসুরুচিবালা চৌধুরাণীর "বন্ধু" গল্প পড়িয়া বড়ই ভয় হয়। আমাদের সমাজ কি তবে বিলাতী পশ্চিম ঢঙ্গে গড়িতে চলিয়াছে? "বিবিধপ্রসঙ্গে" "ঋগ্বেদে সভ্যতা" এবং সিউড়ির নিকটবর্ত্তী মল্লিকপুরের মহিলাকবি "স্বর্ণলতা"র বিবরণ সুন্দর লাগিল। "বৎসদেশ—কৌশাম্বী" তে কৌশাম্বী সম্বন্ধে ইতিহাস যতদূর সম্ভব ডাঃ বিমলাচরণ লাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতে পুরাবৃত্ত-লেখকদিগের ইহা বিশেষ সহায় হইবে।

THE MESSAGE—October 1929—আমরা অক্টোবরের Message পাইয়াছি। বলা বাহুল্য, এই পত্রখানি সদানন্দজী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয়ের হস্তে সুচারুরূপেই পরিচালিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রথমেই রাজা রামমোহন রায়ের সেই সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত "বিগতবিশেষং" ইংরাজী অনুবাদসহ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গানেই আমরা সর্ব্বপ্রথম "বিগতবিবাদং" শব্দটী স্পষ্ট উল্লিখিত দেখি। কাগজের এক বৎসর অতীত হইয়া দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছে এবং সেই উপলক্ষ্যে সদানন্দজী দেশবিদেশের সাধুগণের নিকট সাদর অভিনন্দন লাভ করিয়াছেন। আমরা যখন কাগজখানি পাই, তখন তত্ত্ববোধিনী ছাপা প্রায় শেষ হইয়াছিল। তাই আমরা আশ্বিন-সংখ্যায় আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতে পারি নাই। আমরা হইলাম সদানন্দের আত্মীয়, কাজেই আমাদের অপেক্ষা দেশবিদেশের অভিনন্দন অধিকতর মূল্যবান। যাই হোক, আমরাও সদানন্দজীকে এই কাগজ সুচারুরূপে পরিচালনের জন্য অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি এবং উহার দিন দিন উন্নতি হোক, এই আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অভিমতগুলি সময়োপযোগী হইয়াছে। রাজা রামমোহন সম্বন্ধে ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় উহা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই সংখ্যার সঙ্গে বাঁধাইয়া রাখিবার উপযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের একটী ফোটো-ব্লক দেওয়া হইয়াছে—সুন্দর ছাপা। "কৃষ্ণ ও খৃষ্ট"-বিষয়ক একটী কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ আছে। গীতা ও বাইবেলের অনেকস্থলে সাদৃশ্য দেখানো হইয়াছে। ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের স্মরণ হয়, পড়িয়াছিলাম, খৃষ্ট ভারতে আসিয়া ভারতের ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছিলেন। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয়ও তাঁহার গীতারহস্যে এবিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। পরিশিষ্টে "ভারতের মুক্তিফৌজ" নামক একটী প্রবন্ধ আছে—বড় সুন্দর। কিসে ভারতের প্রকৃত মুক্তি হইবে, তাহার কার্য্যপ্রণালীর একটা কাঠামো দেওয়া হইয়াছে। ইহা অবলম্বনে আমাদেরও এবিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এক কথায়, এই আলোচ্য সংখ্যা বিষয়সম্ভারে বড়ই গুরুভার। অল্প পরিসরের মধ্যে এতগুলি ভাল প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহা সদানন্দজীর কম গৌরবের বিষয় নয়।

গ্রন্থপরিচয়।

ভগবৎপ্রসঙ্গ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। ২২৭ পৃষ্ঠা—মূল্য ১৷০।

আলোচ্য গ্রন্থ অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; এই অধ্যায়গুলির মধ্য দিয়া গ্রন্থকার ব্রহ্ম ও জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির মধ্য দিয়া হিন্দুর পারলৌকিক তত্ত্বে উপনীত হইয়া উপসংহার করিয়াছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ে গ্রন্থকারের গবেষণা, সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি এবং সত্যনির্ণয়ে তীব্র ইচ্ছা সুপরিস্ফুট। কিন্তু এই সঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতও আলোচনা করিলে ভাল হইত। প্লেটোর Transmigration of soul এবং অলিভার লজের পারলৌকিক আলোচনাও পারলৌকিক তত্ত্বের মধ্যে স্থান পাওয়া উচিত ছিল মনে হয়। বিশেষত "ব্রহ্ম ও জগৎ" প্রবন্ধে হেগেলের Christian Trinityর ব্যাখ্যা উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি আরও স্ফুটতর হইত বলিয়া আমার বিশ্বাস। তারপর "গীতার কর্ম্মবাদ" প্রবন্ধে আচার্য্য শঙ্কর এবং আচার্য্য রামানুজ কর্ম্ম সম্বন্ধে কি ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্মকে মুক্তির পরিপন্থী বলিলেন

কেন, ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত হইলে সংশয় নিরসনে অধিকতর সুবিধা হইত। অদ্বৈতবাদ প্রবন্ধে Spinoza এবং Bradleyর মতবাদ আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক হইত বলিয়া মনে হয় না। মোটের উপর, পুস্তকখানিতে Comparative study বিশেষ স্থান পায় নাই। "বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধে সাংখ্য, বাইবেল ও মনুর সৃষ্টিতত্ত্ব পাশাপাশি ভাবে আলোচিত হইলে বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্বের বিশেষত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হইত।

"ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ" প্রবন্ধে তিনি যে ভাবে সত্য-নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা বড়ই প্রশংসার্হ। ব্রহ্ম যদি বাস্তবিক নির্গুণ হন তবে উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। আচার্য্য শঙ্কর নির্গুণ ব্রহ্মের অবতারণার পর পুনরায় গঙ্গার স্তব রচনা করেন কি প্রকারে? কাজেই তাঁহাকে inconsistent বলা অসঙ্গত হয় বলিয়া মনে হয় না।

মোটের উপর পুস্তকখানি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে এবং ইহার নামও সার্থক হইয়াছে; কারণ ভগবানের বিষয় লইয়াই ভক্তিপ্রবন্ধ রচিত। আশাকরি সাধারণ্যে ইহার বহুল প্রচার হইবে। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ

শোক-সংবাদ।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ বিগত ২১শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার প্রাতে ৭॥ ঘটিকায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে মহর্ষি-পরিবার হইতে একটি উজ্জ্বল রত্ন খসিয়া পড়িল। বিলাস একদিনের জন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ছোট ছোট গল্পরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সুধীন্দ্র-নাথ সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। সমগ্র পরিবারে তাঁহার ন্যায় নির্বিরোধ লোক ছিলেন কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্যিকগণের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি আপনার সরল স্বভাবের প্রভাবে সকলেরই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিতেন। সাহিত্যপরিষদের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। অনেক সময়ে দেখিয়াছি, শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সুধীন্দ্রবাবুর সহিত তাঁহার নীচের ঘরে মিষ্টালাপ করিতেছেন। সুধীন্দ্র-নাথের ছোট ছোট কবিতা তাঁহার সুমার্জ্জিত লেখনী-প্রসূত ও সুপাঠ্য। সুধীন্দ্রবাবু ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ৩০শে আষাঢ় তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার পারিবারিক জীবন মধুময় ছিল। তাঁহার অভাবে বন্ধুবান্ধবের শোকার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পরম মাতা পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে গ্রহণ করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই—দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বিগত ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার রাত্রি ১।। ঘটিকার সময় বহু লোককে কাঁদাইয়া তাঁহার সার্কুলার রোডস্থিত বাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তাত বৎসর হইয়াছিল। ধনের যে কি প্রকারে সদ্ব্যব-হার করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে মহারাজা যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা এদেশে কেন, জগতে বিরল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেহান্তের পরে যে বিপুল বিষয়-বৈভব তাঁহার হস্তগত হয়, তাহার আয় হইতে প্রায় এক কোটী টাকা তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বাস্থ্য প্রকৃতির গুণে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে 'অর্দ্ধবঙ্গেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। কত অনাথা কত অসহায় কত শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট হইতে কতরূপে সাহায্য লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। তিনি অনেক যুবকের বিলাতের সমস্ত ব্যয় নিজ হইতে বহন করিয়াছেন। সেই স্বদেশী যুগের প্রথম হইতে যে সমস্ত দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, মহারাজার দান তাহার অধিকাংশকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল। "একেনৈব ত্যাগেন অমৃতত্ব-মানশুঃ" উপনিষদের এই মন্ত্রের সার্থকতা তিনি আপন জীবনে প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। তিনি এখন অমৃতলোকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। সমগ্র দেশ তাঁহার জন্য হাহাকার করিতেছে, ইহাই তাঁহার পরিবারবর্গের পরম সান্ত্বনা।

৺যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী—দিনাজ-পুরের অন্তর্গত হরিপুর গ্রামের অন্যতর প্রাচীন জমিদার-বংশের জমিদার ৺ বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী গত ৯ই কার্ত্তিক শনিবার পরলোকগমন করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তিনি বড়ই সাধুপ্রকৃতি ও উদারহৃদয় ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব হইলেও আদি-ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। নবাব আলবর্দ্দি খাঁয়ের সময় অবধি ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা জমি-দার। তিনি নির্ম্মলচরিত্র ও সুপণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্ব-প্রকার জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বৃদ্ধা জননী, স্ত্রী, দুইটী উপযুক্ত পুত্র, একটী কন্যা এবং পৌত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার পরিবার-বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান পরলোকগত আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দান করুন।

নিবেদন।

শ্রীযুক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশ হইতে পারে নাই। সে কারণ ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

মাতৃ-মঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। পথের ধারে

পথের ধারে পড়িয়া ছিলাম—মা! আজও দেখ, পথের ধারে এক কোণে পড়িয়া আছি। ডাকিতেছি তো ডাকিতেইছি, কাঁদিতেইছি তো কাঁদিতেইছি—কে-ই বা তাহা শোনে! তুমি যাহাকে ছাড়, তাহার তো এই দশাই হয়—মরণ তো তাহাকে ছুঁইয়াই থাকে। শুনিতে তো পাই যে, চারিদিকে নাকি হাসিরাশি ছড়াইয়া আছে—চাঁদ হাসে, ফুল হাসে; নদী গান গায়, সাগরে সঙ্গীত ওঠে; কিন্তু জানি না, কেন, তোমার এই মরণ-ছোঁয়া ছেলের কাণে সে সঙ্গীতও পৌঁছায় না, আর তাহার প্রাণে সে হাসি, সে আনন্দ এতটুকু স্পর্শও করে না। আমি নিজের ব্যথায় নিজেই মরি। আমার এই রক্তধারা কে-ই বা মুছাইয়া দেয়,—আর প্রাণের ভিতর যে আগুন দিবানিশি হু-হু করিয়া জ্বলিতেছে কে-ই বা তাহাতে শান্তিজল ঢালিয়া সেই আগুন নিভাইয়া দেয়! মা আমার! তুমি একটুখানি আদর কর। যে ভালবাসা দিয়া তুমি আমাকে জগতে পাঠাইয়াছিলে, তাহার উপর তো আর দাবী করিতে পারি না। তাহারই একরত্তি দিয়া আমাকে আর একবার বুকে তুলিয়া লও—আমি ঐ একটুখানি স্নেহ পাইয়া মরিতে চাই। তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া না লও—ভাল, আমি এই আঁধার কোণে পড়িয়া থাকিব, তবু তোমার সন্তান হইয়া আমি অপর পাঁচজনের দুয়ারে দুয়ারে গিয়া সুখশান্তির ভিখারী হইতে পারিব না। জননী আমার! মনে রেখো, আমি তোমার হারাণো ছেলে ফিরিয়া আসিয়াছি। এ ছেলে আর কখনও তোমাকে ছাড়িয়া বিপথে যাইবে না। এই হারাণো ছেলেকে ফিরিয়া পাইয়াও যদি ইহাকে না লইতে চাও—লইও না। এই যে সমস্ত পথিক রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে আমার দিকে এক একবার করুণ দৃষ্টি ফেলিতেছে, এইটিই আমার প্রাণের অন্তস্তম প্রদেশ পর্য্যন্ত কুরিয়া দিতেছে। আমাকে এই রকম পথের ধারে এক কোণে ফেলিয়া রাখিয়াছ বলিয়া তোমার নামে যে নিষ্ঠুর মা বলিয়া নিন্দা রটিবে, সেইটাই আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট দিতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার চোখের জল শুকাইয়া যাইতেছে—একবার এসো মা—একবার এসো—আর তো পারি না। তোমার স্নেহ-প্রেমে একবার ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

৪। দায়ী কে?

জননী আমার! আমায় ছাড়িয়া তুমি কোন্ লোকে আছ, তাহা জানি না। তুমি যে লোকেই থাক, তুমিও আমাকে ছাড়িতে পার না, আমিও তোমাকে ছাড়িতে পারি না। আমায় যদি তুমি ছাড়িয়াই থাকিবে, তবে তুমি আমায় জন্ম দিলে কেন? আমায় জন্ম দিবার জন্য কখনও তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম বলিয়া তো মনে পড়ে না। আমি জানিতামই না যে এই পৃথিবীতে আমায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আমি যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি, তোমার প্রাণে ব্যথা ও আনন্দ দিবার অধিকার পাইয়াছি—মা! ঠিক বল, এ সমস্তের দায়ী কে? আমি তোমার আদেশের বিরুদ্ধে গিয়া তোমাকে যে বড় ব্যথা দিয়াছি, অনেক কষ্ট দিয়াছি, তাহা জানি। কিন্তু তাহাতে কেবল তোমারই প্রাণে কি ব্যথা দিয়াছি? তাহা নয়। তাহার ফলে আমি নিজে যে ব্যথা পাইয়াছি, সে ব্যথা যে আমরণ আমাকে বহিতে হইবে। তাহার জন্য আমি মর্ম্মে মর্ম্মে যে ব্যথা অনুভব করিতেছি, তাহার কি তুলনা আছে? তাহার তুলনা নাই—মা! তাহার তুলনা নাই। জননী আমার! তোমাকে ব্যথা দিবার এবং সেই সঙ্গে আমার নিজেকেও কশাঘাত করিবার যে অধিকার পাইয়াছি, তাহাতেই আমার সুখ, তাহাতেই আমার আনন্দ। এই অধিকারই আমায় বলিয়া দিতেছে—তুমিই আমার মা, আর আমি তোমারই সন্তান।

৫। মা—মা—

জননী আমার! মা আমার! একবার তোমায় প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিতে দাও। কি মধুর নাম—কি মধুর! ডাকিতে ডাকিতেই প্রাণটা কেমন শীতল হয়—সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়। তোমার স্নেহ-প্রেম, তোমার করুণা বর্ণনা করিতে গেলে বাক্য সরে না—মনের ভিতর কি-এক সুখের বেদনাই কেবল তোলপাড় খায়। তোমাকে আমি নিজেই সম্পূর্ণ বুঝি নাই, অপরকে বোঝাই কেমন করিয়া? তোমার কথা যখন বলিতে যাই, তখন কথা তো আর বাহির হয় না—সমস্ত কথা থামিয়া যায়; রসনা নিস্তব্ধ হয়, মন হাঁপাইয়া ওঠে। প্রাণের ব্যথা তখন চক্ষু হইতে গণ্ডদেশ বাহিয়া শতধারে অশ্রুর আকারে ঝরিতে থাকে। তখন জগতসংসার সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিছুই দেখিতে পাই না। তখন কেবল একটী মাত্র ইচ্ছা প্রাণের ভিতর জাগিয়া থাকে—তোমার বুকের মধ্যে মুখখানি লুকাইয়া কেবল অনাহত স্বরে মা মা বলিয়া ডাকি, আর ডাকিতে ডাকিতে সংসার হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাই—আমার নামটী তোমারই কাছে জাগিয়া থাক। মা! একবার তুমি আমাকে তোমায় শতবাহুতে আঁকড়াইয়া ধরিতে দাও, আর তোমার নয়নে নয়ন রাখিয়া প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিবার শক্তিসামর্থ্য আর অধিকার দাও।

আরাধনা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতং
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং ॥

যিনি আমাদের স্রষ্টা পাতা ও সর্ব্বসুখদাতা; যিনি আমাদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর; আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর ও মন, যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি ও বল, যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিতেছি; যিনি আমাদের শরীর মন ও আত্মাকে নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছেন; তিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি শান্ত মঙ্গল ও অদ্বিতীয়। তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।

তাঁহার সত্তাতে এই বিশ্বজগত পরিপূর্ণ। এই বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে তিনি স্বপ্রকাশ। সুদূর অতীতে তিনি যেমন ঋষিমুনিদিগের সম্মুখে স্বপ্রকাশ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে আমাদেরও নিকট তিনি সেইরূপ স্বপ্রকাশ। আমরা অন্তরে সুস্পষ্ট জানিতেছি যে, তিনি অনন্ত ভবিষ্যতেও এই বিশ্বচরাচরে স্বপ্রকাশ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত থাকবেন।

তিনি স্বয়ম্ভূ ও সর্ব্বব্যাপী। আমাদের আত্মা যেমন আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশ, প্রত্যেক অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, অথচ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, সেইরূপ সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এই বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, অথচ তিনি ইহার কোনও অংশই নহেন। সূর্য্য হইতে সূর্য্যরশ্মি যেমন

নিঃসৃত হয়, সেইরূপ তাঁহার ইচ্ছাতে তাঁহারই শক্তি হইতে এই বিশ্বজগত সৃষ্ট হইয়াছে—নিঃসৃত হইয়াছে। তিনি ইহার অকৃত কারণ। সৃষ্টির কারণ সৃষ্টির অতীত ইচ্ছাময় পরব্রহ্ম। তাঁহার আদি নাই, কারণ নাই; তাঁহার অন্তও নাই। তিনি অনাদ্যনন্ত ভূমা পরব্রহ্ম। তিনি নিরবয়ব। তিনি আত্মার অন্তরাত্মা থাকিয়া সর্ব্বকালে প্রাণীগণকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।

তিনি মনীষী—মনের নিয়ন্তা। তাঁহার জ্ঞানজ্যোতিতে অতীতের সহস্র সহস্র যুগের মানবাত্মা যেমন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, বর্ত্তমানেও তেমনি কোটী কোটী মানব নব নব জ্ঞানকণা লাভ করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও সহস্র লক্ষ যুগ ধরিয়া মানুষ তাঁহারই জ্ঞানকণা লাভ করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইবে। তাঁহার মঙ্গলবিধানে মনুষ্য নিজেকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিতে পারে। তাঁহার সে বিধানের প্রতি মনোযোগ না দিয়া, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিরূপ ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য ভুলিয়া, মানুষ যখনই প্রবৃত্তির দাস হয়, তখনই সে শাস্তি পাইয়া মঙ্গলের পথে ফিরিতে বাধ্য হয়।

যাঁহারা তাঁহার প্রদর্শিত জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হন, তাঁহারা তাঁহার মঙ্গলমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দসাগরে অবগাহন করেন এবং তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করেন। তখন তাঁহারা মৃত্যুর বিভীষিকায় ভীত হন না; তাঁহারা অমৃতস্বরূপের সংস্পর্শে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। আশ্চর্য্য তাঁহার করুণা! তাঁহার জ্ঞান দিয়া, তাঁহার প্রেম দিয়া তিনি ক্ষুদ্র মানব আমাদিগকে তাঁহার সহিত সমধর্ম্মী করিয়া দিয়াছেন—আমাদিগকে অমরধর্ম্মা করিয়াছেন।

যে সাধক তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার শান্ত রূপও প্রত্যক্ষ করেন—তিনি তাঁহার অন্তরের অন্তরে অবস্থিত "শান্তিসমুদ্র অতি গভীরে" ডুবিয়া গিয়া অপার শান্তি লাভ করেন। তিনি সেই দেবদেবের মঙ্গলভাবের পরিচয়, তাঁহার শিবস্বরূপের পরিচয়, তাঁহার মঙ্গল হস্তের ছাপ গাছের প্রতি পত্রে, পাখীর গানের প্রতি তানে, গ্রহনক্ষত্রের প্রেমপূর্ণ প্রতি চাহনিতে, প্রতি নিমেষের প্রত্যেক ঘটনায় মুদ্রিত দেখেন। আমরা যে সুখসম্পদ প্রভৃতিকে মঙ্গল মনে করি, তাহারও মধ্যে তিনি যেমন তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য নিহিত দেখেন; দুঃখবিপদ প্রভৃতি যাহাকে আমরা অমঙ্গল মনে করি, তাহারও মধ্যে তিনি তেমনই তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা লুক্কায়িত দেখেন।

জগতের প্রত্যেক ঘটনায়, প্রতি নিমেষে ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় বিকীর্ণ থাকিলেও আমরা অনেক সময়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার অবসর হেলায় হারাইয়া ফেলি। আমরা অনেক সময়ে মোহান্ধ নয়নে দেখিতে পাই না যে, বিশ্বজগতের প্রতি নিমেষের প্রত্যেক ঘটনা বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গল ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়া শত অমঙ্গলেরও পরিণামে আমরা মঙ্গলেরই রাজ্যে চলিয়াছি, শত নিরানন্দ ভেদ করিয়াও বিশ্বজগত আনন্দেরই স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে। এই যে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বজগত উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিতেছে, কত শত রবি চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র একসূত্রে বাঁধা পড়িতেছে, ওপারের সঙ্গে এপারের মহা প্রেমবন্ধন ঘটিতেছে, এসমস্তের ভিতর অধিকাংশ সময়েই আমরা ভগবানের মঙ্গল হস্তের পরিচয় দেখিতে ভুলিয়া যাই। কুতর্ক ছাড়িয়া দিলেই আমরা সহজেই অন্তরে উপলব্ধি করিব, নিঃসংশয়ে বলিতে পারিব যে, যিনি আমাদের স্রষ্টা, যিনি আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা, তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গলস্বরূপ—শিবং। তিনি অন্ধ শক্তি নন।

তিনি অদ্বিতীয়। আমাদের যিনি উপাস্য দেবতা, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই। তিনি অপ্রতিম। তিনি অদ্বিতীয় বলিয়াই কোথায় সূর্য্য আর কোথায় এই পৃথিবী, সর্ব্বত্রই একই নিয়ম কার্য্য করিতেছে। তিনি পূর্ণমঙ্গল। তিনি মৃত্যুর অতীত। সুতরাং মৃত্যুর সহচর পাপতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিরবদ্য নিরঞ্জন। এসো, আজ এই পবিত্র স্থানে শুভমুহূর্ত্তে আমরা অনন্যমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপে সমাধান করি।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার।

(সদানন্দ শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

ব্রাহ্মসমাজ—আমাদের আদরের ব্রাহ্মসমাজ—যে ক্রমশঃই অবসাদগ্রস্ত হইয়া চলিয়াছে, একথা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান নেতাগণ সম্পূর্ণ উদাসীন। এই অপ্রিয় সত্যটি হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াও তাঁহারা ইহাকে প্রকাশ করিতে সাহস করেন না, প্রতীকারের কথা ত দূরে থাকুক। এদিকে ব্যাধি ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। এখনও চিকিৎসার সময় আছে। কিন্তু বলে কে, আর করে কে?

আমি অনেক দিন হইতে এবিষয়ে সমাজের নেতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, বৎসর

বৎসর সমাজমন্দিরে কাতরকণ্ঠে ব্রাহ্মসাধারণের নিকট অনুনয় বিনয় করিতেছি, সমাজের কর্তৃপক্ষগণকে ইহার গুরুত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু হায়! কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না, কেহই আমার সহিত সহানুভূতি করিতে প্রস্তুত হইতেছেন না! সম্প্রতি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশা সঞ্চারিত হইল।

যে সকল কারণে ব্রাহ্মসমাজের পতন হইতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। "জানি না" বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে; সমাজের অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি একজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেহই ইহা প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে সাহসী নহেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ঘরের কথা বাহির হইয়া পড়িলে সমাজের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক অমঙ্গল হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি যে ব্যাধি চাপিয়া রাখিলে কি সমাজের মঙ্গল হইবে? এখন হইতে প্রতীকারের চেষ্টা না করিলে কি তাঁহারা সমাজকে অধিক দিন জীবিত রাখিতে পারিবেন?

ব্রাহ্ম-সমাজের জীবনীশক্তি সাধনা। এই সাধনার বলে মহর্ষিপ্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের ঋষিগণ ব্রাহ্ম-সমাজকে দেশের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু আজ—সে সাধনা কোথায়? এই সাধনার অভাবে ব্রাহ্ম সমাজের নৈতিক আদর্শ, যাহা একদিন শত শত শিক্ষিত যুবককে আকর্ষণ করিয়াছিল—আজ তাহা ক্ষীণ মলিন নিস্তেজ ও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় আজ সেই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ত্যাগ, কোথায় সেই ব্রাহ্মসমাজের উদারতা এবং ভ্রাতৃপ্রেম, কোথায় সেই ব্রাহ্মসমাজের সত্যনিষ্ঠতা, কোথায় সেই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ চরিত্রশুদ্ধি, কোথায় সেই ব্রাহ্মসমাজের সেই প্রবল স্বদেশপ্রীতি! ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে যে, যে সকল ব্রাহ্মেতর সম্প্রদায় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ সমাজকে মার্জ্জিত, সুসংস্কৃত এবং পুনর্গঠিত করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে প্রায় সকল বিষয়েই আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন; আর আমরা ক্রমে পিছাইয়া পড়িতেছি? ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী সাধনের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল [illegible] ভারতবর্ষের—কেবল ভারতবর্ষের কেন—সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হইবে। জগৎপ্রসবিতা পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস ছিল। সুতরাং তিনি ব্রহ্মের একত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কি ধর্ম্মসমস্যায়, কি সমাজসংস্কার কার্য্যে, কি জাতীয় জীবনগঠনে, সকল বিষয়েই এই মৈত্রীসাধনা তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। সকল সম্প্রদায়ের লোক যাহাতে অবিরোধে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং একান্ত প্রার্থনা ছিল। এই নিমিত্তই তিনি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টডিড সম্পূর্ণ উদার এবং অসাম্প্রদায়িকভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

কিন্তু হায়! এখন আমরা কি দেখিতেছি? আমরা ব্রাহ্মসমাজের আদি গুরু রাজা রামমোহনের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের মুষ্টিমেয় সভ্যগণের মধ্যে দলাদলি, মনোমালিন্য এবং বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতেছি। 'বিগত-বিবাদের' প্রেমময় রাজ্যে ঘোর বিবাদ উৎপন্ন করিতেছি! ইহাই যেন আজকাল আমাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এমন কি, আমরা এই শতবাৎসরিক শুভ উৎসব উপলক্ষেও আপনাদিগকে সংযত রাখিতে পারি নাই। যে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য সকল সম্প্রদায়ের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজের মিলন-মন্ত্রে সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করা, আজ সেই ব্রাহ্মসমাজ আপন সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পরে বিরোধ উপস্থিত করিয়া সমাজের যে কতদূর ক্ষতি করিতেছেন, তাহা ভাবিলে কাহার না প্রাণ ব্যথিত হয়; এরূপ স্থলে ব্রাহ্মসমাজের পতন যে অবশ্যম্ভাবী তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে?

বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্ম-সমাজকে পূর্ব্ব আদর্শে ফিরাইয়া আনিতে হইলে তিন শাখার সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। সকল শাখার সমবেত সাধনা-শক্তির উপরেই ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। সমাজের মধ্যে যাহা কিছু আবর্জ্জনা আসিয়া পড়িয়াছে তাহাকে দূর করিতে হইলে সকল শাখার সমবেত শক্তিপ্রয়োগ প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে তিনটি শাখা লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ। একের মানে অপরের মান, একের নিন্দায় অপরের নিন্দা, একের পতনে অপরের পতন অবশ্যম্ভাবী। যেমন শরীরের এক অংশে দুষ্ট ক্ষত হইলে অপর অংশেরও হানি করে, সেইরূপ একশাখার অবনতিতে অপর শাখারও অবনতি হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক শাখার পদস্খলন হইলে অপর শাখাও যে আহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এক শাখায় গ্লানি উপস্থিত হইলে উহা অপর শাখাতেও যে সংক্রামিত হইবে, ইহা অস্বীকার

করা যায় না। আমাদের নিকটে এবিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ বর্ত্তমান।

আমরা স্বীকার করি বা না করি, ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা যে ক্রমেই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছে, ইহা একটি প্রকৃত সত্য। ব্রাহ্মসমাজকে এই মুমূর্ষু অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য এখনও বিশেষ চেষ্টা না করিলে অচিরে রাজা রামমোহন প্রতিষ্ঠিত সাধনার এই বৃহৎ অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। এই নিমিত্ত আমি প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী ব্যক্তিকে এবিষয়ে একটু চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

আমার মতে যত শীঘ্র সম্ভব এজন্য ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার বিশিষ্ট সভ্যগণকে লইয়া একটি সংস্কার-সভা গঠিত করা আবশ্যক। এই সভায় যোগদান করিতে যাহাতে কাহারও আপত্তি না থাকিতে পারে সেজন্য একটি স্বতন্ত্র স্থানে ইহার বৈঠকের বন্দোবস্ত করা উচিত। আগামী মাঘোৎসবের সময় অনেক ব্রাহ্ম মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিবেন; সুতরাং মাঘোৎসবের একদিন এজন্য নির্দ্দিষ্ট করিলে বড় ভাল হয়। কি উপায়ে সমাজকে অবনতির স্রোত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, উক্ত সভায় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তৎপরে তদনুরূপ প্রচারকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নিজের সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা করা আবশ্যক। নিজেদের মধ্যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া অপরের সমাজের সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতে গেলে কোন সুফল হইবে না। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ সাধনা, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ নীতি, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ চরিত্র, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রেম ও মৈত্রীভাব,—প্রত্যেক ব্রাহ্ম নরনারীর হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিয়া দিতে হইবে; প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবারে ব্রহ্মনিষ্ঠার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মগৃহকে পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত করিতে হইবে। এবম্বিধ প্রকারে অতি অল্পদিন মধ্যে আবার আমাদের ব্রাহ্মসমাজ সকল দেশের আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিবে।

এই সকল কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অতি সুলভ মূল্যের একখানি অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মপত্রিকার আবশ্যক। এই পত্রিকার দ্বারা আমরা প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে প্রচারকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিব।*

—

* বন্ধুবর সদানন্দজী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার উদ্দেশ্যে তাঁহার যথাশক্তি কিপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন, আমরা "নানা কথায়" তাহা প্রকাশ করিলাম। ত০ প০ স০

জয়পরাজয়।

ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, লাভলোকসানে, জয়-পরাজয়ে মানুষের সমবুদ্ধি থাকা উচিত—এই প্রকার দ্বন্দ্বের কোনও একটীতে ঢলিয়া পড়া উচিত নয়। শত্রুগণের উপর জয়লাভ করিলাম, অতএব উন্মত্তের ন্যায় আমাকে নৃত্য করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; অথবা আমার পরাজয় হইল, অতএব আমাকে মুহ্যমান হইয়া কেবলই হাহুতাশ করিতে হইবে, এমনও কোনও কথা নাই। সমবুদ্ধি থাকাই যে জয়ের লক্ষণ ও কারণ তাহা অনেকের মনে আসে না। দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মধ্যে সমবুদ্ধি হইয়া থাকার ফলে যে দৃঢ়তা আসে, যে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য আসে, তাহাই তো আমাদিগকে জয়ের পথে না লইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় আধ্যাত্মিক রাজ্যেও অনেকেই পরাজয়ের আঘাত সহ্য করিতে পারে না। অধিকাংশ পরাজিত ব্যক্তি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। তাহারা পরাজয়ের কারণ সন্ধানে অগ্রসর হইতে চায় না। তাহাদের মনের সে বল নাই, সে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য নাই। রাজনৈতিক জগতেও যেমন অনেক "settled facts" বা অটল বলিয়া গৃহীত ঘটনাকেও unsettled বা টলিয়া যাইতে দেখি, তখন অধ্যাত্মরাজ্যেই বা সকল বিষয়ই অটল থাকিবে কেন? আমরা দেখি, অধ্যাত্মরাজ্য বিশেষ ভাবে উন্নতির রাজ্য—সেখানে অটল বা অচলায়তনরূপে পড়িয়া থাকিবার কোন কিছু থাকিতে পারে না।

যাহারা পরাজয়ের কারণে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে চায়, পরাজয়ের সহিত সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিতে চায়, আসলে তাহাদের চরিত্রবল বড়ই অল্প—চরিত্র বিষয়ে তাহাদিগকে "কোমরভাঙ্গা" বলা যাইতে পারে; তাহারা একটুতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহাদের বিচারশক্তিও বড়ই কম। তাহারা জীবনের প্রারম্ভে হাসিতে হাসিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় বটে, তখন সমস্ত জগৎই আনন্দের তরঙ্গে তরঙ্গিত দেখে; কিন্তু প্রথম হোঁচটেই তাহারা একবার যখন পড়িয়া যায়, তখন আর তাহা হইতে উঠিতে পারে না—তাহাদের সম্মুখের আনন্দের ছবি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়। প্রথম ঝড় খাইতে না খাইতেই তাহারা কূলকিনারা হারাইয়া ফেলে—দিশাহারা হইয়া পড়ে।

জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র যে দ্বন্দ্ববিবাদের ক্ষেত্র; বলিতে কি, দ্বন্দ্ববিবাদেই যে আমাদের জীবন নির্ভর করে, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অনেকেই সে কথা স্মরণ করে না। জগতে লাভ লোকসান না থাকিলে উত্থান পতন না থাকিলে জীবনের পরিচয় পাইতাম কোথায়?

এখানে আত্মরেপনার অবসর নাই, কাঁদিবার স্থান নাই। কাঁদ, পশ্চাতে পড়িয়া থাক—তোমার দিকে খুবই সম্ভব কেহই একবার ফিরিয়াও তাকাইবে না, বরঞ্চ তোমার বুকের উপর চড়িয়া অন্যেরা নিজেদের উন্নতির আশায় ছুটিয়া চলিবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ভগবানকে বলহীন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না—অধ্যাত্মরাজ্যের ইহা একটী মহান সত্য।

মনে রাখিতে হইবে যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি বা ভগবানের চরণে অগ্রসর হওয়া কেবল পুঁথিগত বিদ্যার উপরেও নির্ভর করে না বা মেধার উপরেও নির্ভর করে না বা কেবলমাত্র লোকাচার দেশাচার প্রভৃতি প্রতিপালনের উপরেও নির্ভর করে না। যে সাধক সত্যসত্য ভগবানকে প্রার্থনা করেন, যিনি টেঁক ধরিয়া বসেন যে, তিনি ভগবান ব্যতীত আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেন না, নচিকেতার ন্যায় যিনি ভগবানের জন্য সর্ব্বস্ব—জীবন পর্য্যন্ত পণ করিতে পারিবেন, তিনিই ভগবানকে নিশ্চয়ই লাভ করিবেন—নিশ্চয়ই লাভ করিবেন—নিশ্চয়ই লাভ করিবেন।

অধ্যাত্মরাজ্যে যিনি নেতৃত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে তিনি ক্ষণভঙ্গুর নন—একটুখানি প্রশংসাতেও তিনি মাতোয়ারা হন না, আর একটুখানি নিন্দাতেও তিনি অধীর হইয়া পড়েন না। প্রশংসার মাঝেও যেমন তাঁহাকে অটল—অচল থাকিতে হইবে, নিন্দার অগ্নিবর্ষণের মধ্যেও তাঁহাকে তেমনই অটল-অচল ধীর-স্থির থাকিতে হইবে। সত্য বলিয়া যাহা বুঝিবেন, তাহার সমর্থনের জন্য তাঁহাকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হইবে।

আধ্যাত্মরাজ্যে যে ব্যক্তি অগ্রসর হইতে চাহিবেন, তাঁহাকে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যাত্রীগণ ঐ পথ অনেক স্থলে পদাঙ্কিত করিলেও সকল স্থল পদাঙ্কিত করেন নাই, কারণ অনন্তস্বরূপ ভগবানের অনন্ত রাজ্যের প্রত্যেক স্থল কোন একজনের পক্ষে মাড়াইয়া চলা সম্ভব নহে। সুতরাং প্রত্যেক অমৃতধামযাত্রীর জন্য অজানা কিছু না কিছু স্থান থাকিবেই—সেইটুকু তাঁহাকে নিজের দেখিয়া শুনিয়া চলিতে হইবে। সেইটুকু অজানা পথে চলিবার সময়েই তাঁহাকে জানিতে হইবে যে উত্থান ও পতন অবশ্যম্ভাবী। উত্থান হইলেও গর্ব্বে অহঙ্কারে সেই একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না; পতন হইলেও নিরাশায় নিরানন্দে সেই একই স্থানে দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কাঁদিতে বসিলে চলিবে না। উত্থান পতনের ভিতর দিয়া, জয়পরাজয়ের ভিতর দিয়া আমাদিগকে আধ্যাত্মরাজ্যের শিখরদেশে উঠিতে হইবে, ভগবানের সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। জানিবে, উত্থানপতনই, জয়পরাজয়ই আমাদের উন্নতির সুপ্রশস্ত সোপান, আমাদের কল্যাণ লাভের অমোঘ উপায়।

পার্থিব ব্যাপারেও যেমন, আধ্যাত্মিক রাজ্যেও সেইরূপ—নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে প্রতিজ্ঞা করিয়া নামিতে হইবে যে, শত পরাজয়েও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিব না। জগতের সর্ব্বত্র, সমস্ত প্রকৃতিরাজ্যেই দ্বন্দবিবাদ বিচরণ করিতেছে। প্রকৃতি যে সীমাবদ্ধ, প্রকৃতির অণুপরমাণু যে সীমাবদ্ধ; কাজেই প্রকৃতিদ্বন্দ্ববিবাদের হাত কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না; সেখানে দ্বন্দ্বই হইল নিয়ম—শীত আছে, গরম আছে; উত্থান আছে, পতন আছে; সুখ আছে, দুঃখ আছে। কি জয়ে, কি পরাজয়ে, আমাদের যে অভিজ্ঞতা হইবে, সেই অভিজ্ঞতার বলে উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে, শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হওয়াই হইল বীরের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। বৈজ্ঞানিকের ন্যায় প্রত্যেক সাধক তাঁহার পতন বা পরাজয়কে তাঁহার সাধনপথের অন্যতর দীপ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। জীবনবেদে পরাজয়ের কারণগুলি পরিষ্কাররূপে লিখিয়া রাখিয়া, গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবার কালে সম্মুখে সেই প্রকার কোন কারণের আবির্ভাব দেখিলে তাহাকে পাশ কাটাইয়া চলিবেন। আমরা অধিকাংশ স্থলেই দেখি যে, অধিকাংশ সাধনেচ্ছু ব্যক্তি পরাজয়ের বিভীষিকাতেই জীবন্মৃত হইয়া পড়েন এবং গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন। বিভীষিকায় ভীত হইও না—নিদ্রা ও আলস্যে দিন কাটাইও না; উন্নতি ও মঙ্গল নিশ্চয়ই তোমার হস্তগত হইবে। "সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়।"

সঙ্ঘের অঙ্কুরোদ্গম।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা। * তাপস গৌতম আজ "বুদ্ধ" হইলেন—'সম্বোধি' লাভ করিয়া তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন। দেখিতে দেখিতে উনপঞ্চাশৎ দিবস কাটিয়া গেল, নবীন বুদ্ধ আহার নিদ্রাহীন; কেবল আনন্দ, আনন্দ—সমাধি সম্ভোগ। পঞ্চাশৎ দিবসে ধীরে ধীরে চিত্ত নিম্নতর স্তরে অবরোহণ করিল। তাঁহার কিঞ্চিৎ আহার্য্য গ্রহণের অভিলাষ জন্মিল।

এই সময় ত্রপুষ (তপুসস) ও ভল্লিক (ভল্লুক) নামক দুই বণিক্ ভ্রাতা বাণিজ্যোদ্দেশ্যে নিকটবর্ত্তী পথে উৎকল

---

* বৌদ্ধ মতে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধের জন্ম, গৃহত্যাগ ও সম্বোধিলাভ ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ ঐ তিথিকে মায়াদেবীর গর্ভসঞ্চার এবং বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের সহিতও সংযুক্ত করিয়াছেন।

হইতে মধ্যদেশে যাইতে ছিল। বুদ্ধকে আহার্য্য দান করিতে তাহাদের প্রতি দেবাদেশ হইল। দুই ভ্রাতা বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বহু উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী নিবেদন করিল। বুদ্ধ আহার্য্য গ্রহণ করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার শরণ লইল। যথাসময়ে তাহারা স্মারক চিহ্নস্বরূপ বুদ্ধের একগুচ্ছ কেশ লইয়া গম্য স্থানাভিমুখে গমন করিল।

বুদ্ধ ভাবিতে লাগিলেন, "নির্ব্বাণ লাভ করিলাম। কিন্তু জগতে লব্ধ সত্যের প্রচার হইবে কি? অল্পবুদ্ধি মর্ত্ত্য মানব এ গভীর সত্য বুঝিবে কি?" প্রচারকার্য্যের সফলতা বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে না পারিয়া তিনি সমাধিসাগরে ডুবিয়া নিয়ত নির্ব্বাণ-সুখ সম্ভোগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। তাঁহার এই সঙ্কল্পে ভীত হইয়া সহম্পতি ব্রহ্মা তৎসমীপে আবির্ভূত হইয়া করযোড়ে* এই সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতে মিনতি জানাইলেন। ব্রহ্মার কাতর অনুনয়ে তথাগতের অন্তরে করুণা সঞ্চার হইল। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি এই ধর্ম্মপ্রচারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে ইহা সহজে লোকের বোধগম্য হইবে, তাঁহার অন্তরে বিতর্ক উপস্থিত হইল। সহসা ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তী বোধিসত্ত্ব তথায় আবির্ভূত হইলেন। বোধিসত্ত্ব শ্রীবুদ্ধকে একটি অলঙ্কারমণ্ডিত চক্র প্রদর্শন করিলেন। শ্রীবুদ্ধ বুঝিলেন, গতিহীন ধর্ম্মচক্রকে গতি প্রদান করিতে হইবে, ইহাই বোধিসত্ত্ব-প্রদর্শিত ইঙ্গিতের অর্থ।

সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণের প্রত্যেকের অন্তরেই এইরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইয়া থাকে। যুগপ্রবর্ত্তক কালধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ প্রভাব অতিক্রম করিয়া সত্যারূঢ় হইয়া ভাবেন, মানবসাধারণ চিরাচরিত প্রথানুসারে আজিও নিশ্চিন্ত-চিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, সুপ্তির ঘোরে এখনও তাহারা লুপ্তচেতন—এই সুপ্তির জাল ছিন্ন করিয়া যুগবাণী তাহাদের মর্ম্মে প্রবেশ করিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? বুদ্ধের মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হইল, তিনি স্থির করিলেন সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিবেন,—অন্তর যাঁহার অমৃতালোকে উদ্ভাসিত বাহ্যজগতের সুখ-দুঃখে, সত্যাসত্যে তাঁহার কি আসে যায়? কিন্তু যে মহাপ্রাণ জগতের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া জগতেরই জন্য শিবত্বের অনুসন্ধানে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কেবলমাত্র আত্মমুক্তি লইয়া তিনি কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবেন? †

দ্বিধা অতিক্রম করিয়া তথাগত* কাহার নিকট নবলব্ধ জ্ঞান প্রথম প্রচার করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য আলারকালাম ও উদ্রকের কথা তাঁহার মনে পড়িল, কিন্তু ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন উভয়েরই দেহান্ত হইয়াছে। তাঁহারা জীবিত নাই জানিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। অতঃপর উরুবেলা গ্রামে যে পঞ্চজন তাপস তাঁহার ষট্‌বর্ষব্যাপী তপস্যার সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। ধ্যানস্থ হইয়া তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহারা তৎকালে বারাণসীধামে ঋষি-পত্তন-মৃগদাবে তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত আছেন। বুদ্ধ বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথে আজীবক উপকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উপকের ধারণা হইল এই তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষ নিশ্চয়ই কোন দেবতা। গৌতম-বুদ্ধ তাঁহার ভ্রম দূর করিয়া স্বপথে অগ্রসর হইলেন। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঋষি-পত্তনে উপনীত হইলেন।

পঞ্চ-ভিক্ষু দূর হইতেই গৌতমকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—'শ্রমণ গৌতম কঠোর তপশ্চর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া সহজ জীবনযাত্রার পথ অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহাকে আমরা অভ্যর্থনা করিব না, তবে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া একখানি বসিবার আসন দিব।' বুদ্ধ তাঁহাদের ভাব লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার স্নিগ্ধদৃষ্টির মোহনীয় আকর্ষণে কিন্তু ভিক্ষুগণ স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভ্রাতৃসম্বোধনে কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহাদের অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া বুদ্ধ কহিলেন—"ভিক্ষুগণ, এভাবে আর আমায় সম্বোধন করিও না। আমি এখন তথাগত। আমি তোমাদের নিকট এখনই এরূপ 'ধর্ম্ম' বিবৃত করিব, যাহাতে তোমরা এই জন্মেই পরমপদ লাভ

---

* নির্ব্বাণপ্রাপ্ত জীবমুক্ত পুরুষ দেবগণ অপেক্ষাও উন্নত—বৌদ্ধমতে তাঁহারাই ত্রিলোকে শ্রেষ্ঠ জীব।

† cf It is impossible to withdraw from the world, and associate with birds and beasts that have no affinity with us. With whom should I associate but with suffering men?—Confucius.

জগতের দুঃখ-তাপ হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রকেই ব্যস্ত করিয়া তুলে। মানবের ঔদাসীন্য-উপহাস তাঁহাকে কখনো কখনো কর্ম্মবিমুখ করিয়া তুলে বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সেই মানবের দুঃখেই তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন। বুদ্ধেরও ক্ষণকালের জন্য ধর্ম্মপ্রচারে অনিচ্ছা জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অন্তর্নিহিত কল্যাণেচ্ছা তাঁহাকে স্থির থাকিতে দেয় নাই। এই কল্যাণেচ্ছাই কবি কর্ত্তৃক ব্রহ্মারূপে এবং তৎকালীন সমাজের ধর্ম্মলাভের ব্যগ্রতাই বোধিসত্ত্বরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে

* যিনি তথাগত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়াছেন। অপর মতে যিনি 'তথা' অর্থাৎ সেইপ্রকারে অর্থাৎ পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণের পন্থানুযায়ী 'গত' অর্থাৎ বুদ্ধত্বে গমন করিয়াছেন। নিজের উল্লেখ কালে বুদ্ধ সর্ব্বদা এই নামই ব্যবহার করিতেন।

করিবে।" * বুদ্ধ সকলকে এই মহাসত্য ধারণাগে অবহিত হইতে অনুরোধ করিলেন। বুদ্ধের এই আহ্বান শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। সমগ্র বিশ্বচরাচর উৎকর্ণ হইয়া রহিল। বিমানে অদৃশ্য দেবগণের স্থানসঙ্কুলান কষ্টকর হইল। বুদ্ধ শান্ত সংযত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ, প্রব্রজিতের (সংসারত্যাগীর) দুইটি চরম পন্থা পরিহার্য্য। প্রথম—ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগ, বিশেষতঃ কামপরায়ণতা। ইহা অধার্ম্মিক, অলাভকর, হীন এবং সংসারীলোকেরই উপযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ—কষ্টদায়ক কঠোর তপশ্চর্য্যা। ইহাতেও বিশেষ লাভ নাই, কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না।

"ভিক্ষুগণ! একটি মধ্যপন্থা আছে, যাহাতে এই উভয় চরমই পরিহার করা চলে। তথাগত এই পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পন্থা সকলের নেত্র উন্মীলিত করিবে এবং সকলকে সত্যাসত্য ধারণার ক্ষমতা দিবে; এই পন্থা মনে শান্তিদান করিবে; সকলকে অন্তর্দৃষ্টি, দিব্যজ্ঞান দিয়া নির্ব্বাণরাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবে।

"এই মধ্যপন্থা কি?—অষ্টাঙ্গিক মার্গঃ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

"হে ভিক্ষুগণ, এখন দুঃখ সম্বন্ধে আর্য্যসত্য শ্রবণ কর। জন্ম দুঃখময়, জরা দুঃখময়; দুঃখময় রোগ, মৃত্যুও দুঃখময়। অপ্রিয়-মিলনে দুঃখ, প্রিয়বিচ্ছেদেও দুঃখ; কোন ইচ্ছার অপূরণ, সেও দুঃখময়। * * *

"ভিক্ষুগণ, দুঃখসমুদয় (উৎপত্তি) সম্বন্ধে আর্য্যসত্য এই:—অদম্য তৃষ্ণাই এই দুঃখের মূলে বিদ্যমান। এই তৃষ্ণাই মানবকে জন্ম জন্ম ঘুরাইয়া থাকে। তৃষ্ণাই মানবকে ইন্দ্রিয়ভোগের পথে লইয়া যায় এবং কখনও এখানে কখনও সেখানে আপন চরিতার্থতা খুঁজিয়া বেড়ায়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, নবজন্মের আশা, ইহজন্মে উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা—এ সকলেরই মূলে তৃষ্ণা।

"প্রিয় ভিক্ষুগণ, এইবারে দুঃখ-নিরোধ সম্বন্ধে আর্য্য সত্য শ্রবণ কর। তৃষ্ণার একান্ত নাশই দুঃখনিরোধ। তৃষ্ণাকে সর্ব্বথা পরিহার, তৃষ্ণার হস্ত হইতে মুক্তি, তৃষ্ণাকে কোনক্রমে প্রশ্রয় না দেওয়া—এইরূপেই দুঃখ নিরোধ হইতে পারে।

"সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব; সম্যগ্‌ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি—এই আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ-নিরোধের একমাত্র পন্থা।" *

উপদেশ শুনিতে শুনিতেই কৌণ্ডিন্য স্রোতাপত্তি ফল † লাভ করিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণের ঐ অবস্থা লাভ করিতে আরও চারিদিন সময় লাগিল। পঞ্চম দিবসে বুদ্ধ স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা ও রূপস্কন্ধাদির † অনাত্মতা প্রমাণ করিয়া এক জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণী প্রচার করিলেন। ফলে পাঁচজন ভিক্ষু একই দিনে অর্হৎ পদবী লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন।

বুদ্ধ তখন ঋষিপতনে অবস্থান করিতেছেন, ইতিমধ্যে যশ নামক জনৈক শ্রেষ্ঠীপুত্রর স্বপ্নে কতকগুলি স্ত্রীলোকের বীভৎসরূপ দেখিয়া সংসারে অশ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া মৃগদাবে বুদ্ধসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধিকারী বোধে বুদ্ধ তৎসমীপে 'ধর্ম্ম' ব্যাখ্যা করিলেন। যশও অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।

যশের চুয়ান্নজন বন্ধু তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া লইতে আসিলেন। কিন্তু যশের দিব্যকান্তি-যুক্ত মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা এককালে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহাদের আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে প্রবৃত্তি হইল না। তথাগতের ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহারাও সকলে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। এইভাবে অর্হৎসংখ্যা সঙ্ঘসমেত একষট্টি হইল—সঙ্ঘের অঙ্কুরোদ্ভব হইল।

যশের পিতাও ক্রমে বুদ্ধের রূপে গুণে আকৃষ্ট হইলেন। তিনিও আসিয়া বুদ্ধের শরণলাভের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। উপাসক (গৃহীভক্ত) শ্রেণীর জন্য বুদ্ধ ত্রিশরণ-মন্ত্র ‡ রচনা করিলেন। এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া যশের পিতা প্রথম বৌদ্ধ উপাসক হইলেন। ক্রমে যশের মাতা এবং পত্নীও এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া উপাসিকা সম্প্রদায়ের জন্মদান করিলেন।

তথাগত অতঃপর অনুচর শিষ্যগণকে একত্রিত করিয়া আদেশ করিলেন,—"হে ভিক্ষুগণ, দেশে দেশে গমন কর, "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" দিকে দিকে পরিভ্রমণ কর, অনুকম্পায় তোমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হউক; প্রত্যেকে বিভিন্ন দিকে গমন কর; ভাবে ভাষায় আনন্দদায়ক এই সঞ্জীবনী 'ধর্ম্ম'-প্রচারে জীবনপাত কর। সকলের সম্মুখে নিখুঁত পবিত্র জীবনের আদর্শ

---

* বুদ্ধের সহজ সরল ভাব এই কয়টি কথাতেই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবতাকে অবজ্ঞা করিয়া অনাবশ্যক বিনয়-নম্রতার আদবকায়দার আড়ম্বর তিনি পছন্দ করিতেন না। কাজেই প্রবর্ত্তি সাধকগণ যাহাতে 'তথাগত'কে 'ভ্রাতা' সম্বোধন না করেন, তৎপ্রতি তাহাদিগকে অবহিত করিয়া দিলেন।

* বুদ্ধের এই প্রথম উপদেশকে "ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্র" বলে। ভারতের যে ধর্ম্মচক্র কালবশে গতি হারাইয়া অচলভাবে দাঁড়াইয়াছিল, বুদ্ধ তাহাতে পুনঃ গতি দান করেন। সেইজন্য তাঁহার সে চেষ্টাকে 'ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন' বলে।

† পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

‡ অহং বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, অহং ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি অহং সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

ধর। নেত্রাবরণ প্রায় খসিয়া গিয়াছে, এমন মানব অনেক আছে ; পবিত্র 'ধর্ম্মের' সন্ধান তাহাদিগকে না দিলে তাহারা মুক্তি পাইবে না। তাহারা নিশ্চয়ই ইহা গ্রহণ করিবে। চল, ভিক্ষুগণ! আমিও প্রচারোদ্দেশ্যে উরুবেলা-সেনিয়গ্রামে যাইব।"

বুদ্ধ উরুবেলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে মার আবার তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিল। অনেক পথ হাঁটিয়া তিনি বিশ্রামার্থ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামে দ্বাত্রিংশজ্জন ভ্রাতা মগধরাজের অধীনে একযোগে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা ঠিক এই সময়ে এক পলায়িতা রক্ষিতার অনুসন্ধানে ঐ বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বুদ্ধকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধ কহিলেন, "অন্যকে অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে আপনার সন্ধান লওয়া উচিত নয় কি?" শান্ত যতির গুরুগম্ভীর বাণী ভ্রাতৃগণের অন্তস্তল স্পর্শ করিল। মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহারা বুদ্ধের শরণ প্রার্থনা করিলেন। তথাগতের উপদেশে তাঁহাদেরও অর্হত্ব লাভ হইল। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সদ্ধর্ম্মপ্রচারার্থে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উরুবেলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্ম।

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(২)

শ্রৌতসূত্র।

সূত্রসাহিত্য সর্ব্বতোভাবে যে ব্রাহ্মণের উপরেই রহিয়াছে তাহা নয়। ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞ সম্বন্ধেই বাহুল্যে উল্লেখ আছে। এই যাগযজ্ঞ ঘটিত যে সকল সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে বিশেষরূপে শ্রৌতসূত্র বলে, যেহেতু শ্রুতির উপরেই তাহার সমস্ত নির্ভর। শ্রৌতসূত্রের আর একটি নাম কল্পসূত্র। অন্যান্য সূত্রের নাম যদিও মূল শ্রুতিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহারা স্বতন্ত্র আলোচনার ফল।

গৃহ্যসূত্র

এই শ্রৌতসূত্রের পাশাপাশি আমরা আর এক শ্রেণীর আনুষ্ঠানিক (ritual) সূত্র দেখিতে পাই,—ইহাকে গৃহ্যসূত্র বলে। ইহাতে সব ঘরাও অনুষ্ঠানের বিষয় বিবৃত আছে। যেমন গর্ভাধান, জন্মেষ্টি, উপনয়ন, বিবাহ অন্ত্যেষ্টি, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল সামাজিক অনুষ্ঠান, ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইত। কল্পসূত্রে সেই সকলের উল্লেখ আছে। গৃহ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানটি পারিবারিক অনুষ্ঠান; ইহার দ্বারা প্রতি পরিবারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হইত। ইহা পরিবারের হিতোদ্দেশে করা হইল। আমাদের মধ্যে ত এখন গৃহ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান লইয়া পরিবারদিগের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন হয় না, উল্টা দলাদলি বাড়ে।

যেমন কল্পসূত্রের আর একটা নাম শ্রৌতসূত্র, তেমনি গৃহ্যসূত্রের নাম হইতেছে স্মার্ত্তসূত্র অর্থাৎ যে সূত্র স্মৃতির (কিনা স্মরণের) উপরে নির্ভর।

যজ্ঞ ও গৃহকর্ম্ম, শ্রুতি-স্মৃতি।

সামাজিক আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞের শিক্ষা গুরূপদেশের উপর নির্ভর করে। মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহাতে মহা আড়ম্বরের ভাবটা উদয় হয় যাগযজ্ঞের কার্য্যটাকে এমন করিয়া সম্পন্ন করা চাই। যাগযজ্ঞে দক্ষ বিশেষ বিশেষ ঋষি, যাঁহারা মনুষ্যের মনে ঐরূপ ভাব উৎপন্ন করিতে কুশল, তাঁহাদিগের আলোচনা ও উদ্ভাবনা (speculation and suggestion) দ্বারা যাগযজ্ঞসমুদয় পারিপাটি শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে লোকের মনে যজ্ঞের পবিত্র ভাব ও মহদ্ভাব আসে। যদিও যাগযজ্ঞ প্রথমে আর্য্যদিগের মধ্যে সাধারণ ভাব ছিল, কিন্তু পরে আড়ম্বর বেশী বেশী হওয়াতে উহা শিক্ষিত কতক লোকেরই আয়ত্তের বিষয় হইল, সুতরাং তাহাদের কাছ হইতে শুনিয়া শুনিয়া শিখিতে হইত। গৃহকর্ম্ম ত সেরূপ নয়, এটা যেন সকলেরই আয়ত্তাধীন। ইহা শৈশব হইতে আপনাদের গৃহ্য-অনুষ্ঠান দেখিতে দেখিতে স্মৃতিতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যাইত। ইহা শিখিবার জন্য কোন একটা উপায় অবলম্বন করিতে হইত না। দেখিতে দেখিতেই হইয়া যাইত, ইহা যেন গৃহস্থমাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি ছিল, ব্যবহার করিলেই হয়। ইহাতে শ্রুতি আবশ্যক নাই, কেবল স্মৃতি আবশ্যক। যাগযজ্ঞ যেমন অল্পসংখ্যক শিক্ষিতদিগের ধন, আচারব্যবহার তেমনি সাধারণ সম্পত্তি, সকলেরই পক্ষে সুগম।

তাই বলিয়া যে স্মৃতি অর্থাৎ আচারব্যবহারের কালক্রমে পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহা নয়। আর্য্যেরা যখন আদিমবাসীদিগকে বশে আনিয়া আপনাদিগের উপনিবেশ স্থাপনে রত হইল, তাহাদিগের হস্তে তখন এত কর্ম্ম হইল যে, তখন তাহাদের অন্য কিছু দেখিবার আর অবকাশ রহিল না; শত্রুদিগের হইতে আপনাদিগের অধিকার রক্ষা করিতেই তাহাদিগের সকল উদ্যম পর্য্যাপ্ত হইল। এইরূপে একে একে যখন সকল বাধা অতিক্রম করিল, তখন তাহারা জাগ্রত হইয়া দেখিল, যে আর এক প্রবলতর শত্রুর হস্তে তাহারা আপনারা হাত-পা-বাধা হইয়া পড়িয়াছে। অথবা তাহারা জাগ্রত হইতে আর পারিল

না। মানসিক চালনার হানি করিয়া তাহাদিগের শারীরিক বল-বীর্য্য এত পরিমাণে চালিত ও ব্যয়িত হইয়াছিল যে, তাহাদিগের মানসিক শক্তি (intellectual energy) একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিল। এই যে নূতন প্রবলতর শত্রু তাহার বিবরণ এই :--

ব্রাহ্মণের উৎপত্তি।

যে সকল গান দ্বারা আর্য্যেরা সিন্ধুনদী-তীরে আপনাদিগের পুরাতন বাসস্থানে প্রকৃতির মাহাত্ম্য পূজা করিত এবং সেই গানের সহিত যেরূপ বিধানে কর্ম্ম সম্পন্ন করিত, এই উভয়ই ক্রমে সেই সেই বংশে রহিয়া গেল---হয়ত যাহারা উহার রচয়িতা অথবা যে বংশে কুলপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল---সেই সেই পরিবারের মধ্যে সেই সব প্রবাদও প্রচলিত রহিল, যাহা দ্বারা ঐ সকল করণ-কারণ বুঝাইতে পারা যায়; তাহারা জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড উভয়েরই অধিকারী হইয়া রহিল। এখন বিদেশে স্বদেশের বার্ত্তা যাহা কিছু আনীত হয়, তাহাই শ্রদ্ধার ভাবে পূর্ণ, তাহাই আন্তরিক সমাদরে গৃহীত হয়। এইরূপে এই সকল গায়কবংশেরা পুরোহিত-বংশ হইয়া পড়িল; যত দিন যাইতে লাগিল, পূর্ব্বকার আবাসভূমি হইতে আর্য্যেরা যত দূরে প্রসৃত হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং বাহিরের লড়াই-হাঙ্গামায় যত তাহারা মত্ত হইয়া আপনাদিগের পুরাতন আচার-প্রথা ভুলিয়া যাইতে লাগিল, ততই তাহাদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইতে লাগিল। পুরাতন আচার পুরাতন পূজাপ্রণালী রক্ষা করা সকলেরই অত্যন্ত যত্নের ধন হইল। এবং অনন্য-কর্ম্মা হইয়া সেই সকল যাহারা রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল তাহারা সেই সকলের প্রতিভূস্বরূপ হইল এবং অবশেষে তাহারা দেবতাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ভূদেবতা হইল। রাজন্যেরা হইলেন ভূপতি, ব্রাহ্মণেরা হইলেন ভূদেবতা। তাহারা আপনাদিগের স্বাধিকারকে এমন দৃঢ়বদ্ধ করিল যে পুরোহিতসাধারণের কর্ত্তৃত্ব এমন কেহ কোথাও দেখে নাই আজও পর্যন্ত তাহা তেমনি অটলভাবে রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, হিন্দুস্থানের জলবায়ু লোকের মনকে শিথিলযত্ন করিয়া তুলে; তাহাও বটে, কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত টান ও শ্রদ্ধাভক্তি। যাহার নিকট হইতে সেই সকল ভাব পূর্ণ হয় তাহাকে তাহারা দেবতুল্য দেখে। পূর্ব্বে যেমন অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি হইতে উপকার পাইয়া তাহাদিগকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়াছিল, তেমনি বিদেশের কোলাহলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ স্বদেশের সম্বাদ পাইয়া এবং বাহিরের শারীরিক কার্য্যের মধ্যে আত্মা ও পরমাত্মার সম্বাদ পাইয়া কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধাভক্তিতে পূর্ণ হইয়া সম্বাদদাতাদিগকে দেবতানির্ব্বিশেষে মানিতে লাগিলেন। সম্বাদদাতাদিগকেও সম্বাদের বিষয় করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি।

ক্ষত্রিয়।

তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার বংশ, যাঁহারা প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের নায়ক ছিলেন, তাঁহারা ক্রমে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রাজ্যের রাজা হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন যুদ্ধ করা ইঁহাদিগের জীবনের কার্য্য (profession) হইয়া পড়িল, ইঁহারাই ক্ষত্রিয় জাতি হইলেন। ইহারা একদিকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া এবং গো সুবর্ণ প্রভৃতি ধন দান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের মহিমা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন; আর একদিকে কৃষকদিগকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া উপনিবেশকে পালন করিতে লাগিলেন।

বৈশ্য ও শূদ্র।

এই যে উপনিবেশের বাসিন্দা যাহারা চাষ-আবাদ ও আপন আপন ব্যবসায় করিতে লাগিল, তাহারাই বিশ কিনা বৈশ্যজাতি হইল; ইহারাই সাধারণ মানুষ হইল। রাজা ইহাদিগেরই রাজা, এই জন্য রাজাকে বিশপতি বা বিশাম্পতি বলিত। ইহারা আবার শূদ্রদিগকে ধরিয়া মুটে-মজুরগিরি করাইয়া লইত। এই তিন (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) হইল জেতৃজাতি। আর জিতজাতি আদিমবাসী দস্যুগণ অথবা যাহারা ব্রাহ্মণধর্ম্ম হইতে পরিচ্যুত হইয়া ব্রাত্য হইয়া পড়িল। যাহারা আদিমবাসীদিগের পরিণয়ে বদ্ধ হইয়া জেতৃজাতিতে কলঙ্ক আরোপ করিয়া পতিত হইল, তাহারাই বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি হইল, তাহারাই শূদ্র হইল। এখনকার দাস শব্দ বোধ হয় দস্যু শব্দের অপভ্রংশ হইয়াছে। ইহারা যে আদিমবাসীর বংশ তাহা মনে করিতে হইবে না। কিন্তু দাস-শব্দ এক চিহ্ন-স্বরূপ, যাহাতে তাহাদিগের শূদ্রতা ব্যক্ত হইতেছে। ইহাদিগের আকার-গঠনে ইহাদিগকে আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বঙ্গদেশে ঐরূপ কৌতুককর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। বালির দত্তেরা বড় স্বাধীন। যখন গৌড়দেশে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসেন তখন তাঁহাদিগের সঙ্গে সহায়রূপে পাঁচজন শূদ্রও আইসে। তন্মধ্যে অন্যেরা ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়া তাহারা উন্নত হইল, দত্তেরা ভৃত্যত্ব স্বীকার না করাতে উচ্চ কায়স্থ-স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইল।

এমন অনেক প্রবাদ আছে যে ক্ষত্রিয় রাজারা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণের আধিপত্যে বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের উপরে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন নাই।

স্মৃতি।

স্মৃতির প্রবাদ যখন পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতে আসিতে ক্রমেই পরিবর্ত্তন হইতে হইতে আর পুরাতন কিছুই থাকিল না, তখন তাহা গ্রন্থবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হইল। অবশ্য ইহা শ্রুতির অনেক পরে। কেননা শ্রুতিটা কঠিন ব্যাপার হইল। স্মৃতিটা অত শীঘ্র লোকের মন হইতে যাবার সম্ভাবনা ছিল না। স্মৃতি যে সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সময়ে যেন ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ আধিপত্য। কিন্তু গার্হস্থ্য আচার-পদ্ধতি (manners and customs) পূর্ব্বের মতই অনেকটা ছিল। ইহা দ্বারা পুরাকালের ভাব বেশ পাঠ করা যায়। এই সকলেতেই হিন্দুদিগের ব্যবহার-সাহিত্যের আদি অন্বেষণ করিতে হইবে। civil law দণ্ডনীতি এবং রাজনীতি এসব যেমন যেমন প্রয়োজন আসিতে পারে, বাহুল্যরূপে গ্রন্থবদ্ধ হইল। বেদের সময় দেখা যায় ভায়েরা সব একত্র থাকিত, কিন্তু ভায়েদের ছেলেরা স্বতন্ত্র কর্ত্তা হইল; সেই জন্য শত্রুর পর্য্যায় হইতেছে 'ভ্রাতৃব্য'। অর্থাৎ ভায়ে ভায়ে বেশ মিলিয়া মিশিয়া থাকিত, ভাইপো হইলেই বিষয় লইয়া টানাটানি পড়িত, খুড়া বা জ্যেঠার যেন সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিত না।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

জ্ঞানপদার্থের সহিত জড়পদার্থের সম্বন্ধের বিচার লইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। সাংখ্যমত হইল বৌদ্ধদিগের, বেদান্তমত হইল ব্রাহ্মণদিগের। এক হইল জড়প্রধান, দ্বিতীয় হইল পরমাত্মপ্রধান। অনাত্মবাদী কপিল মুনি সাংখ্যদর্শনের আবিষ্কারক; বৌদ্ধেরা তাঁহাকে আদি-বুদ্ধ বলেন; অর্থাৎ শাক্যমুনি সাংখ্যদর্শন অবলম্বন করিয়া আপনার মত প্রকাশ করেন। শাক্যমুনির ধর্ম্ম যে নিরীশ্বর ধর্ম্ম তাহা নয়, উহা সেশ্বর ধর্ম্ম; কিন্তু উহার দর্শন সাংখ্য হওয়াতে, তাঁহার ছাত্রেরা বৌদ্ধধর্ম্মকে ক্রমে নিরীশ্বর ধর্ম্ম করিয়া ফেলিলেন। যখন শাক্যমুনি আপনার ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ব্রাহ্মণধর্ম্মের মূল পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি পড়িল; যেহেতু ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য উৎপীড়িত শ্রেণী ইহাকে সহায় করিয়া ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য উদ্যুক্ত হইল। তখন হয়ত মানবগৃহ্যসূত্রের উপর নির্ভর করিয়া মনুসংহিতা প্রস্তুত হইয়াছিল। কপিলমুনির সাংখ্যদর্শনের পর বোধ হয় শাক্যমুনির অবতরণ। তাহার একটা কারণ এই, বৌদ্ধধর্ম্ম একটা দর্শনের উপর নির্ভর করে, যে, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রণেতাকে মুনি উপাধি দেয়। কপিল রচিত দর্শনকার, এবং আধুনিক সংস্কৃতে যদিও উঁহাকে মুনি বলে, কিন্তু বেদে এবং রামায়ণ প্রভৃতি পুরাতন সংস্কৃত-গ্রন্থে উঁহাকে ঋষি বলিয়াই বলিয়াছে; শাক্যকে কখনও ঋষি বলে নাই, কিন্তু মুনি বলিয়াছে।

রামায়ণ, মহাভারত ও বৌদ্ধধর্ম্ম।

রামায়ণ-মহাভারতের অনেক পরে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব। রামায়ণ-মহাভারতে ব্যাকরণ যতটা বদ্ধ হওয়া আবশ্যক, তাহা হয় নাই। মহাভারতে রহিয়াছে, জনমেজয় তক্ষশিলা জয় করিতে গিয়াছিলেন; সিকন্দরের সময় তক্ষশিলার 'তক্ষিলা'রূপ প্রাকৃত উচ্চারণ হইয়া পড়িয়াছে। নন্দবংশ প্রভৃতি আধুনিক কালের বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরই সমকালবর্ত্তী। কপিলঋষি যদি অযোধ্যার সগর রাজার সমকালীন হয়েন—যে কপিল ঋষির উল্লেখ বেদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে সে কপিল ঋষি বৌদ্ধধর্ম্মের কত পূর্ব্বে? বুদ্ধ অবতার কৃষ্ণাবতারের পরে। বৌদ্ধধর্ম্ম যে অবধি প্রচার হইয়াছে, সে কাল ইতিহাসের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণ মহাভারত ইতিহাসের দিকে আসিবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণধর্ম্মের সংস্কার।

যখন আত্মোৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, কেবল দেবদেবীর উপাসনা করিলেই মুক্তি, এই ভাব প্রবল ছিল; আপনাকে উন্নত করিবার দিকে লক্ষ্য ছিল না; ব্রাহ্মণেরা যখন ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়িল, তাহাদিগের আধিপত্য যখন তাহাদিগের জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া কেবল জাতিগত হইয়া দাঁড়াইল, তখনি বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মকাল। যখন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই এই নূতন ধর্ম্মের আরম্ভ বলিতে হইবে। তখন সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা চলে না, প্রাকৃততেই কথাবার্ত্তা চলে, আর শ্লোকাদি আধ-সংস্কৃত আধ-প্রাকৃত এইরূপ একপ্রকার গাথায় রচিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম-প্রসূত পুরাণ প্রভৃতির এবং বলিদানযুক্ত যাগযজ্ঞের বিপক্ষে ব্রাহ্মণজাতির প্রতিকূলে উত্থিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মের সংস্কাররূপে উদয় হইল; এইজন্য ইহা হৃদয়ের ভাবের উপর তত না দাঁড়াইয়া বুদ্ধির উপর দণ্ডায়মান হইল। ইহা দার্শনিক ধর্ম্ম হইল। এই ধর্ম্ম সাংখ্যমতের উপর দণ্ডায়মান থাকাতে, শেষে ইহা নিরীশ্বর ধর্ম্ম হইয়া পড়িল, কেবল কর্ম্মের ধর্ম্ম এবং আত্মোৎকর্ষের ধর্ম্ম হইল। সে ধর্ম্ম কতকাল টিকিতে পারে? ছোটলোকদিগের মধ্যে সেই ধর্ম্ম গিয়া পুনরায় পৌত্তলিক ধর্ম্ম হইয়া পড়িল; অনেক পৌত্তলিক ধর্ম্ম ছিল, তাহার মধ্যে ইহাও একটা বেশী হইল মাত্র। তবে ইহা দ্বারা এই উপকার হইল যে, ব্রাহ্মণেরা যে সুখে শয়ান ছিলেন তাহা ঘুচিয়া গেল। ব্রাহ্মণধর্ম্মে

আলোচনা ও স্বাভাবিক সংস্করণ হইতে আরম্ভ হইল অর্থাৎ বেদকে বজায় রাখিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই হিন্দুধর্ম্মের সংস্করণ হইতে লাগিল। সেই সংস্কারকদিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন শঙ্করাচার্য্য। তিনি বেদ-বেদান্ত লইয়া আপনার মতানুরূপ তাহাদের টীকা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের পর বৈদিক ধর্ম্মের তিনিই পুনরুদ্ধারকর্ত্তা বলিতে হইবে; উপনিষদ লইয়া রামমোহন রায় আমাদিগের দেশে সমুদয় নিদ্রিত লোককে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন।

দ্রৌপদীর বিবাহরহস্য।

(শ্রীবীরেশ্বর সেন)

মহাভারতের কথা সর্ব্বদাই অমৃতসমান। মহাভারতের যে কোন অংশ লইয়া যখনই আলোচনা হয়—সে আলোচনা বিরুদ্ধই হউক বা অনুকূল হউক, তাহা সর্ব্বদাই চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ এম এ, বি-এল, মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এইরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেজন্য তিনি পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার প্রথম আলোচনার বিষয় ছিল দুর্য্যোধনই কুরুরাজ্যের ন্যায়ানুমোদিত উত্তরাধিকারী ছিলেন, না যুধিষ্ঠিরই তাঁহার ধর্ম্মানুযায়ী উত্তরাধিকারী ছিলেন। এবং তিনি উত্তমরূপেই মহাভারত হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, দুর্য্যোধনই ধর্ম্ম এবং ন্যায়ানুসারে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। দুইএক জন সমালোচক ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিবাদের বিশেষ মৌলিকতা দেখা যায় না। একজন প্রতিবাদকারী অতি ক্ষুদ্র একখানি পত্র ইংরাজীতে লিখিয়া এইমাত্র জানাইতেছেন যে কৌটিল্য বলিয়াছেন যে "যুধিষ্ঠিরকে প্রকৃত দায়াদাধিকার প্রত্যর্পণ না করাতেই দুর্য্যোধন নিপাত লাভ করিয়াছিলেন।" এই প্রতিবাদকারী বাঙ্গলা পত্রিকাতে বাঙ্গলা-ভাষায় লিখিত আলোচনা সম্বন্ধে যে ইংরাজীতে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি যে কয়েকটা কথা লিখিয়াছেন তাহা বাংলায় অবশ্যই লিখিতে পারিতেন।* কিন্তু সে কথা যাউক। তিনি হয়ত ভাবিতেছেন যে, কৌটিল্যের উক্তিই সিংহমহাশয়ের আলোচনা সম্বন্ধে clincher অথবা চূড়ান্ত কথা। কিন্তু প্রতিবাদকারীর স্মরণ করা উচিত ছিল যে কৌটিল্য যাহা বলিয়াছেন ব্যাসও তাহাই বলিয়াছেন এবং সিংহমহাশয় সেই উক্তি খণ্ডন করিবার জন্যই স্বীয় আলোচনা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি সিংহমহাশয় মহাভারতেরই আর একটি বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া "দ্রৌপদী কি পাণ্ডবদিগের বিবাহিত ধর্ম্ম স্ত্রী" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে দ্রৌপদীর বিবাহ কেবল যুধিষ্ঠিরের সহিতই হইয়াছিল। এ সম্বন্ধেও বোধ হয় কেহই সিংহমহাশয়ের ভুল হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারিবেন না। তবে দ্রৌপদী অপর চারি পাণ্ডবের পত্নী হইলেন কিরূপে?

এই কথার বিচার করিতে হইলে কেবল মহাভারতে যাহা লিখিত আছে তাহার প্রতি নির্ভর করিলে চলিবে না। আমরা যদি তদতিরিক্ত আরও দুই-একটি ঐতিহাসিক এবং সর্ব্বজনবিদিত তথ্যের বিষয় স্মরণ করি তাহা হইলে কেবল মহাভারতের নহে, রামায়ণেরও দুই-একটা বিষয় আমাদের সমক্ষে স্পষ্টতর ভাবে উপলব্ধ হইবে।

প্রথমে এই দ্রৌপদীবিবাহের কথাই বলিব। পাণ্ডবপঞ্চকের জন্ম হইয়াছিল তিব্বতে বা হিমালয়েরই দক্ষিণসান্নিধ্যে। সে দেশে যে সকল সহোদরে মিলিয়া একটী নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে, ইহা একটী ঐতিহাসিক এবং সর্ব্বজনবিদিত তথ্য। এখনও এই প্রথা তিব্বতে এবং হিমালয়ের সানুতে প্রচলিত আছে। পাণ্ডবেরা সেই প্রদেশেই প্রসূত এবং যৌবন পর্য্যন্ত তথায় লালিতপালিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। দ্রুপদরাজ্য পাঞ্চাল হিমালয়েরই সানুদেশে; সুতরাং সেখানেও এখন না হোক পূর্ব্বকালে একাধিক ভ্রাতার একমাত্র নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার প্রথা ছিল বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পাণ্ডবেরা সেই প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়া সকলে মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দ্রুপদও তাহাতে বাধা দেন নাই, কেননা তাঁহার দেশেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহার বহু পরে যখন মহাভারত রচিত হয় তখন সেই কুপ্রথা হিন্দুদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু গ্রন্থকার এত বড় একটা রাজকুলের ঘটনা গোপন করিতে পারিলেন না। তাই কুন্তীর এবং ব্যাসের মুখ দিয়া তাহার বালকোচিত হেতুবাদ বা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। নতুবা কুন্তী পুত্রদিগকে ভিক্ষালব্ধ বস্তু সমান ভাগ করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা সকলে মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা বাতুলোচিত এবং অশ্রদ্ধেয় কথা। এখনও তিব্বতে বিবাহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই করিয়া থাকে; কিন্তু সেই নারী হইয়া থাকে সকল ভ্রাতারই পত্নী।*

---

* প্রতিবাদকারী যেহেতু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাঙ্গলা ও ইংরাজী উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ বাহির হয়। সম্ভবতঃ সেই কারণে ইংরাজীতে প্রতিবাদ লিখিতে দ্বিধা করেন নাই। তঃ পঃ সঃ

* ভারতবর্ষের শ্রাবণ-সংখ্যায় কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে সিংহল-দেশেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। এই সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্ত্তিক-সংখ্যায় পত্রিকাপরিচয় দ্রষ্টব্য। তঃ পঃ সঃ

মহাভারত একটা ঐতিহাসিক কাব্য। ইহাতে সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ হয় নাই, কিন্তু কার্য্যোচিত অনেক ঘটনার সংবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন তিনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়াই তাহা লিখিয়াছেন। তিনি যে বলিবেন যে, ধর্ম্ম পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন, ইহা মোটে বিস্ময়ের বিষয় নহে। বিবাদী পক্ষের তীক্ষ্ণবুদ্ধ ব্যবহারাজীব বাদীপক্ষের সাক্ষীকে কূট প্রশ্ন করিয়া এমন উত্তর বাহির করেন, যাহাতে বিবাদীর পক্ষই সমর্থিত হয়। সিংহ মহাশয় সেইরূপ পাণ্ডবপক্ষপাতী ব্যাসকে জেরা করিয়া তাঁহারই মহাভারত হইতে এই কথা বাহির করিয়া লইয়াছেন যে, কুরুরাজ্যের ন্যায্য অধিকার দুর্য্যোধনেরই ছিল।

এইরূপ অন্য ইতিহাসের সহিত রামায়ণ মিলাইয়া সমালোচনা করিলে এমন অনেক অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব সত্য বাহির হইয়া পড়ে, যাহা অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

প্রাণদণ্ড রহিত হওয়া উচিত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

"চক্ষুর জন্য চক্ষু এবং দন্তের জন্য দন্ত" (Eye for eye and tooth for tooth) এই একটি নিষ্ঠুরতম প্রথা মানবের অভিব্যক্তির সময় অবধি চলিয়া আসিতেছে বোধ হয়। বলা বাহুল্য ইহার উৎপত্তি মানবের হিংস্র পশুভাব হইতে। তুমি কুকুরের লেজে পা দাও সে তোমাকে কামড়াইবে—তোমার ভুল বশত তাহার লেজ মাড়াইয়াছ কিনা সে বিচার সে করিবে না। এইরূপে কত প্রকৃত নির্দ্দোষ লোক যে হিংস্র জীবজন্তু ও মানবের হাতে নিহত হইয়াছে, তাহা কে জানে? সেইরূপ উপরোক্ত হিংস্র মন্ত্রের কারণে কত নিরীহ মানবও হিংস্র মানবের হস্তে নিহত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? নিরীহ মানবের কথা বলিলাম এই জন্য যে, অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, বিচারবিভ্রাটের ফলে প্রকৃতই নিরীহ ও নির্দ্দোষ মানব কঠিন দণ্ড পায়, এমন কি তাহাকে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত বহন করিতে হয়। সকলেই জানেন যে খুন বা নরহত্যা করিলে ফাঁসিদণ্ড হয়। একটা খুন হইল; আসল খুনী হয় তো কোন প্রকারে পলায়ন করিল; হয় তো একজন নিরীহ ব্যক্তি খুনের জায়গায় দাঁড়াইয়াছিল, পুলিশ তাহাকেই খুনী ভাবিয়া চালান দিল। চালান দিবার পর পুলিশের জেদ চাপিয়া যায়, যাহাতে চালানী আসামীর দোষ প্রমাণিত হয়, কারণ প্রমাণ না করিলে পুলিশের বদনাম হয় এবং তজ্জন্য উপরওয়ালার কাছে বড়ই জোর ধমক পাইতে হয়। অনেক সময়ে পুলিশেরও দোষ থাকে না—অবস্থাঘটিত সাক্ষ্যের বলে নির্দ্দোষী আসামীরও দণ্ড না হইয়া যায় না।

বহুপূর্ব্বে একটী খুনী মকদ্দমার দৃষ্টান্ত দিতেছি। সকলেই জানেন স্পেশাল জুরীতে ৯জন করিয়া জুরী নির্ব্বাচিত হন। উক্ত মকদ্দমায় ৯জনের মধ্যে ৬জন দেশীয় ও ৩জন বিদেশীয় ছিলেন। ৫জন দেশীয় ও ১জন বিদেশীয় একমত হইলেন যে আসামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। শেষে আর একজন দেশীয় আসামীর দোষ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায় দেশীয় জুরবর্গ সকলে তাঁহাকে benefit of doubt দিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি তাঁহাদেরই দিকে মত দিলেন। কিন্তু একজন বিদেশীয়, যিনি হোমরা-চোমরা লোক ছিলেন—একটা সুপ্রসিদ্ধ কোম্পানীর বড় সাহেব ছিলেন—তিনি প্রাণদণ্ডের পক্ষে বড়ই জেদ ধরিলেন। দ্বিতীয় বিদেশীয়টী তাঁহারই অনুগত ব্যক্তি ছিলেন—তিনি জুরবর্গের আপোষে বিচারস্থলে দেশীয়গণের সহিত একমত প্রকাশ করিলেও রায় দিবার সময় উক্ত বিদেশীয়ের পক্ষেই রায় দিলেন। যাই হৌক, উক্ত আসামী ছাড়ান পাইল। কিছুকাল পরে উক্ত মোকদ্দমায় যিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি স্পষ্টই বলিতেন যে পুলিশের সাক্ষ্য বিশ্বাসের অযোগ্য ছিল। বিশ্বাসের যোগ্য বা অযোগ্য ছিল, তাহার বিচার এখানে করিতে চাহি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এক্ষেত্রে আমরা ধরিতে পারি যে, আসামী প্রকৃতই নির্দ্দোষী ছিল। এই নির্দ্দোষী আসামীর অবস্থাঘটিত সাক্ষ্যের বলে যদি প্রাণদণ্ড হইত তবে কি ঘোর পরিতাপের বিষয় হইত!

কিন্তু এসকল বিষয়ে পুলিশ একপ্রকার অসাড় হইয়া যায়—বিনা দোষে কাহার প্রাণদণ্ড হইল, অথবা দোষ প্রমাণের ফলে কাহার প্রাণদণ্ড হইল, সাধারণত দেখা যায় যে, সেদিকে পুলিশের নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ একটা লক্ষ্য থাকে না, উচ্চতন কর্ম্মচারীদিগের কতকটা থাকিলেও থাকিতে পারে। নিম্নতন কর্ম্মচারীদের প্রধান লক্ষ্য থাকে যে, কিসে তাহারা পদোন্নতি পায় আর পকেট ভর্ত্তি হয়—কাজেই তাহাদের চালানী আসামীর দণ্ড লাভ হইলেই হইল। কসাইদের প্রাণ যেমন ভেড়া ছাগল বধ করিতে কাঁদিতে ভুলিয়া যায়, পুলিশেরও প্রাণে ক্রমশ মানুষের প্রাণের উপর মায়ামমতা চলিয়া যায়। একবার কোন সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসকের সহিত কথালাপে, তাঁহারা অস্ত্রোপচারে এত উৎসুক কেন, জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, operationএর একটা বিষয় পাইলেই operation করিবার জন্য তাঁহাদের হাত

সুড়সুড় করে। ঠিক সেইরকম, খুনের সম্বাদ পাইলেই হইল—তখন পুলিশের প্রাণ তাহারই উপলক্ষ্যে একজন না একজনকে চালান দিতে ও সেই চালানী আসামীকে by hook or by crook চরম দণ্ডে দণ্ডিত করাইতে যেন নিষ্‌পিষ্‌ করিতে থাকে।

এখন নির্দ্দোষী হউক বা দোষী হৌক, ঐ প্রকারে যে কোন সূত্রে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বলেই হৌক বা অবস্থাঘটিত সাক্ষ্যের (circumstantial evidence) বলেই হৌক, চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহার ফল কি? তাহা আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে হয় যে, আইনের প্রয়োজন কি? বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল যুগে সাধারণত বলা হয় যে, আইনের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া—এমন শাস্তি দেওয়া, যাহার ফলে ভবিষ্যতে সে সেরূপ অপরাধ না করে, এবং তাহার অপরাধের বিষময় ফল দেখাইয়া অপর পাঁচজনকে সেরূপ অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করা। এখন যদি আইনের ইহাই উদ্দেশ্য হয়, তবে প্রাণদণ্ড কি তাহা সিদ্ধ হয়? আমাদের তো বোধ হয় তাহা হয় না। নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ড হইল—তাহার ফলে বিচার-বিভ্রাট দেখিয়া সেই নির্দ্দোষী ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব, যাহারা তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানে, তাহারা প্রকাশ্যে না হৌক, অন্তরে অন্তরে বিচারপদ্ধতিরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং অপর পাঁচজনকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি, একটা নির্দ্দোষী মানুষের প্রাণ তো যাহা যাইবার ছিল, তাহা তো গেল।

এই সেদিনকার আমেরিকায় স্যাক্কো ও ভেন্‌জেটির বিখ্যাত বিচারের বিষয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। ঐ মকর্দ্দমায় উক্ত আসামীদ্বয় শেষ পর্য্যন্ত নিজদিগকে নির্দ্দোষী বলেন। ঐ দেশেও ঐ বিচার লইয়া বিশেষ আন্দোলন হয় এবং অনেকেই আসামীদের প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবার উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু বিচারপতিগণ সংগৃহীত অবস্থাঘটিত প্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া আসামীদ্বয়ের প্রাণদণ্ডই বাহাল রাখিতে বাধ্য হন এবং যথাকালে আসামীদ্বয় প্রাণদণ্ড ভোগ করে। তাহাদের প্রাণদণ্ডের কিছুকাল পরে আরও প্রমাণাদি প্রকাশ হওয়ায় সকলেই একমত হন যে ঐ আসামীদ্বয় সত্যই নির্দ্দোষ ছিল। কিন্তু হায়! তৎপূর্ব্বেই তাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে নির্দ্দোষী দুইটী লোক অন্যায় বিচারের ফলে প্রাণ হারাইল। কি পরিতাপের কথা!

সুতরাং নির্দ্দোষীকে দণ্ড দিবার সম্ভাবনার দিক হইতে আলোচনা করিলে, প্রাণদণ্ডের কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। অপর দিকে প্রকৃত দোষী ছাড় পাইল—সে তাহার দলে নিজের ধরা না পড়ার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আরও পাঁচজনকে টানিতে লাগিল। কাজেই প্রাণদণ্ড সমর্থন তো করা যায়ই না, বরঞ্চ দেখা যাইতেছে যে, ইহার পরিণামে কুফলই হয়। উত্তরকালে যদি কখনও ঐ নির্দ্দোষী ব্যক্তির নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হয়, যদি প্রকৃত দোষী অনুতপ্ত হইয়া নিজের দোষ প্রমাণিত করে, তখন তো আর সেই নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়া অন্যায় বিচারকে কলঙ্কমুক্ত করিবার কোনই অবসর থাকে না, কারণ সে ইতিপূর্ব্বেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহার বিপরীতে যদি ঐ নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে কোনবিধ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত, তাহা হইলে সময়ে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হইলে তাহাকে মুক্তিদান করিয়া বিচারবিভ্রাটকে কলঙ্কমুক্ত করিবার একটা সম্ভাবনা থাকিত।

আবার, যদি প্রকৃত দোষীরও দোষ প্রমাণিত হইবার কারণে তাহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রকৃত পক্ষে অনুতাপের অবসর তো দেওয়া হয় না। বরঞ্চ সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহাকে অনুতাপের অবসর দেওয়া হইত; এবং অনেক স্থলে দেখাও গিয়াছে, কোন কারণে হত্যাকারী কারাদণ্ড ভোগ করিতে করিতে অনুতপ্ত হইয়া মুক্তিলাভের পরে সাধুভাবে দিন যাপন করিয়াছে।

অনেক সময়ে খুনাখুনি দৈবাৎ হইয়া পড়ে; অথচ ঠিক সেই দৈবাতের ভাব বা বিশেষ কারণে সহসা উত্তেজিত হইবার ভাব প্রভৃতি প্রমাণিত করিতে না পারিলে আসামীর ভাগ্যে প্রাণদণ্ডই লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত, এমন অনেক বিষয় আছে, যথা—রাজদ্রোহ প্রভৃতি—যাহার কারণে প্রাণদণ্ড কোন কারণেই দেওয়া উচিত নহে; বরঞ্চ তদ্বিপরীতে ঐ প্রকার অপরাধীদিগকে কারাদণ্ড দেওয়াই সঙ্গত—ইচ্ছা কর যদি অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দিতে, তবে দ্বীপান্তরবাসে দণ্ডিত কর। সেই শাস্তি পাইয়া সে সময়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে পরিবর্ত্তিত অন্তঃকরণ লইয়া রাজদ্রোহী হইবার পরিবর্ত্তে রাজভক্ত প্রজারূপে দাঁড়াইতে পারে। আমার এই প্রকার একটী দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে জোর করিয়া বলিতে পারি। একটী ছাত্র আমার পরিচিত ছিল। সহসা একদিন সে আমার নিকট আসিয়া অভিনয়ভঙ্গীতে হাতপা নাড়িয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিল—this bureaucratic government must go। আমি তাহাকে তাহার ছাত্রাবস্থায় ঐ প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া ঐ প্রকার বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিলাম। কয়েক

দিন পরেই শুনিলাম যে, সে ঐ প্রকার বক্তৃতার ফলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। কয়েক মাস পরে মুক্তিলাভ করিয়া আমার সঙ্গে সে দেখা করিয়া বলিল যে, জেলকর্তৃপক্ষ তাহার সহিত খুবই সদ্ব্যবহার করিয়াছে, এবং সে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মত ন্যায়পরায়ণ গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় নাই! তাহার প্রথম বা দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের সহিত কেহ একমত হইতে পারুন বা নাই পারুন, তাহা বিচারস্থলে আনার প্রয়োজন নাই। আমি দেখাইতে চাই, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে কারাদণ্ডের ফলে আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সিদ্ধ হয়; প্রাণদণ্ডে শুধু যে আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তাহা নহে, বরঞ্চ পরিণামে সেই উদ্দেশ্যের বিপরীত ফলও অনেক সময়ে ফলিবার সম্ভাবনা আসে।

আমাদের সর্ব্বশেষ কথা এই যে, যে মানুষ দুর্লভ জন্ম এই মানুষজন্ম লাভ করিয়াছে, তাহার জীবন যখন আমরা দিতে পারি না, তখন ঐখানেই তো ভগবানের ইচ্ছা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, মানুষের জীবন কোন সূত্রেই লইবারও অধিকার আমাদের নাই। শুধু মানুষ কেন, আমার মতে কোন জীবেরই প্রাণ হনন করিবার অধিকার আমাদের নাই। আত্মরক্ষা বা অন্য কোন বিশেষ কারণে অপরকে নিহত করিতে পারা যায় কি না, সে বৃহৎ সমস্যার নিরাকরণে উদ্যত হওয়ার এখানে অবসর নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে আইন হইতে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া উচিত। যাঁহারা উহাকে বর্ব্বর প্রথার নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা বড় মিথ্যা বলেন না। আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, এই প্রাণদণ্ড উঠাইয়া দিবার জন্য বিলাতে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কি কারণে তাহা বন্ধ হইল তাহা বলিতে পারি না। উদ্যোক্তাগণ ঐ অবস্থাঘটিত সাক্ষ্যে যে সর্ব্বদা প্রকৃত দোষী ধরা পড়ে না, বরঞ্চ অনেক সময়ে নির্দ্দোষী ব্যক্তিই দণ্ডিত হয়, তাহারই উপর খুবই ঝোঁক দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে বরঞ্চ শত দোষী ব্যক্তি মুক্তিলাভ করুক, তাহাতে তত ক্ষতি হইবে না, যত ক্ষতি হইবে একজন নির্দ্দোষীর প্রাণদণ্ডে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বিলাতে এবিষয়ে আবার আন্দোলন চলিতেছে। এই নিষ্ঠুর প্রথা যত শীঘ্র সভ্য সমাজ হইতে উঠিয়া যায়, ততই মঙ্গল, ততই সমাজ উন্নতির পথে শীঘ্র অগ্রসর হইবে।

THE
Message of Buddhist India.*

DHARMA ADITYA DHARMACHARYYA.

To day marks an epoch-making day in the world's history, because it was on this day, the Full Moon Day of Vaisakh that the greatest religious and social reformer, the noblest harbinger of worldpeace and human brotherhood appeared in this mortal world 2553 years ago. It was then a period of rank materialism, Brahminical sacerdotalism, caste bigotry, religious controversies. The priests and people were engrossed in offering animal sacrifices and were holding elaborate ceremonies in the name of religion. Religions controversies and belief in diverse systems of religion and philosophy were the order of the day. Caste had ceased to be a professional organisation; the Brahmins had begun to make it an air-tight department with limitations and restrictions over the economic and social affairs of public life. The priests and people had grown pantheistic and everything cosmic or phenomenal they attributed to the mercies of an imaginary god whom they had never seen. It was in such a period that Buddha appeared on earth in order to instil into the hearts of mankind the true original spirit of human brotherhood and spiritual culture. To-day we are assembled here to commemorate this holy, historic event connected with the Birth, Buddhahood and Nirvana of Lord Buddha.

It may be interesting to recall in a brief space of time the life and career of the Sakya prince, Prince Siddhartha, who determined to give his life and soul to the service of humanity, was born at the Lumbini Park, in modern Rummindiha lying within the State of Nepal. Born in the lap of luxury, in the royal family of the Sakyas, in the Ikshvaku solar dynasty, he was to have become the

* A speech of the Founder and Religious president delivered on the Buddha Day held by the Buddhist India Society on the Vaisakh eighth bright day, May 16th 1929 under the presidentship of Acharyya Sj. Kshitindra Nath Tagore.

heir-apparent of his father, King Suddhodana, who was reputed to be the ruler of the first known republic state of Kapilavastu in India. From boyhood he had a philosophical turn of mind and while meditating under the Jambu tree, he realised the utterly miserable state of this mortal life. Married at the ripe proper age of twenty to a beautiful princess Yasodhara, after passing through a test exhibition of his skill in all manly arts, such as archery, swordsmanship, before the general assembly of people and princes, he was furnished with royal accomodation in three royal mansions to spend their seasonal honeymoon there. The sight of Devadatta's killing of a swan inspired him to become the silent interpreter of the dumb millions who are slaughtered before the altar or in the butcher's workshop to satisfy the whims of the human beings who are engrossed in the quagmire of religious superstitions or selfish materialism. At the age of twenty nine, he saw the four purva nimittas or ominous signs which convinced him of the futility or transiency of material, mortal life, and found in the life of an active, self sacrificing monk the hopes of permanent contentment and happiness.

At the age of twenty-nine he renounced his parents, beloved wife, fresh-born child, royal possessions and the prospects of royal power, with the definite mission of seeking out a remedy for the inevitable ills of animal life. At the sacrifice of his own self, he boldly marched out at the dead of night to the Uruvilva forest near Gaya, cut off his hair with his own scimitar, put on the robes of a mendicant, underwent all sorts of penances for full six years, debated and discussed with the ascetics and sages of his time. Unable to find out the solution of life's problems, he gave up the extreme forms of ascetic life, he took food offered by the lady Sujata, walked off to the Bodhi or peepal tree at Buddha Gaya. He meditated and meditated, overcame all the visible and invisible temptations of life that the so-called Mara represented and discovered the path leading to the solution of life's problems. He had now become the Buddha, the Supremely Enlightened One, the Self enlightened Being. He found that it is ignorance and lust that led to the increase of Duhkha in the world and pointed out the need of understanding the law of Dependent causation and of following the Noble Eightfold Path.

Buddha did not remain content with the Path but laid down that Seela (noble activities), Samadhi (meditation) and Pragna (wisdom) form the three corner-stones of Buddhism-- of Nirvana or eternal peace and bliss. He repudiated the then imaginary notions about the idea of God, the soul etc. and gave a clear, convincing analytical view about Nirvana or Moksha which forms the summum bonum of human aspiration, or the goal of spiritual perfection of every human being.

He, the Buddha then determined to proclaim to all that would hear Him, the Path that He had chalked out for the good and welfare of mankind. It was in the Deer-Park Benares that He first preached or turned the wheel of the law to the five Brahmins ascetic and to all others. When sixty disciples had gathered, he sent them each to one direction or region saying "Go ye O monks! wander forth for the gain of the many, for the gain, good and welfare of the whole mankind. Proclaim ye, O monks! the doctrine, glorious, perfect and pure." Each of the sixty disciples went to different parts of India and outside, made known to the people there of the message of worldpeace, unity and brotherhood. Wide, principled and simple was his message which appealed to all who heard it and who became followers of this ideal, holy path.

At the age of thiry-five He began his sacred mission of proclaiming to the princes and people the doctrine of spiritual freedom and worldpeace, for full forty-five years. He went forth and travelled in all parts of India, preaching to the masses the gospel of a happy, enlightened life. He uplifted the degraded and the demoralised, gave consolation to the sick and the leper, reformed the evil class of people who had gone astray from the path of duty, purified the hearts of men and women who had fallen to the path of vices, removed the

doubts and misbeliefs of many a people who had been led astray by people of heterodox beliefs and dogmas.

Buddha did His utmost by able and convincing arguments, to do away with the later distinctions of caste that were created between man and man, gave a deathblow to the destructive belief of washing away sin by blood-sacrifices to the so-called angry gods or by a bath in the river Ganges, declared to the masses that they had their birth-right to understand the principles of Dharma which until then were denied to the people of lowprofessions, proclaimed the freedom of all to understand and realize the blessings of Dharma, denounced the dogmatic, unprincipled assertions of heretical teachers and gave a message of unity and freedom to all that were thirsty after spiritual knowledge.

Buddha was a rational thinker. He exhorted His followers not to believe anything merely because it is recorded in the Scriptures, or directed by certain priests or believers or because it is enjoined by some prophets or supernatural beings. He enjoined upon them the supreme advantages of rational and analytical reasoning over the vulgar, dogmatic, traditional assumptions.

Buddha is now regarded as the highest philosopher because He condemned all metaphysical speculations and imaginary suppositions and concentrated His whole attention to the practical solution of life's problems. He exhorted the audience to think of the problem ahead more than the problems imaginary or conjectural. Buddha was the greatest mystic, because by means of His supernormal visionary power based on different processes of contemplation, He had acquired the super-psychical power to understand the past, the present and the future. By samadhi or mystic contemplation He had vanquished many heretical teachers and pointed out the superior efficacy of samadhi and yoga.

With the quiet passing away of the Buddha at Kusinagar, modern Kasia, Sonkhpore the Malla's Grove, at the ripe age of eighty after 45 years of long ministry, comes to close the life and career of a prince saint or Rajarsi who cleared the dim vision of many a visionary, purified the hearts of many unpurified beings, led millions of people to the path of eternal and true salvation. *

রুষিয়া ও উড়িষ্যা।

(শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ বি-এল)

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "নানা-কথার" মধ্যে "রুষিয়া নামের উৎপত্তি" পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম।

রুষিয়া বা 'উড়িসা' দেশের দক্ষিণাঞ্চলে "ওডেসা" (Odesa) নামক একটি সহর এখনও আছে। উহা ঐরূপ অর্থব্যঞ্জক কি না, অথবা পত্রিকায় ব্যক্ত মতানুযায়ী পুরাকালে ওড্র বা উড়িষ্যাদেশীয় কোন রাজা বা তদ্দেশীয় জনগণের কোনও এক অংশ ভারতের বাহিরে যাইয়া উক্ত ওডেসাতেই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন কি না ও তাহা হইতেই ক্রমশঃ তদ্দেশের নাম 'উড়িসা' বা রুষিয়া হইয়াছে কি না? ইহার আলোচনা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ঐরূপ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

ভারতের একটি বহু পুরাতন মহাপথের পরিচয় জীবনে পাইয়াছি। উহা উত্তর-ভারত হইতে গঙ্গার ধার বাহিয়া তার পর পাটনা হইতে দক্ষিণ দিকে সাঁওতাল পরগণা, পরে বর্দ্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশের ধার দিয়া বাঁকুড়া, মানভূম জেলার মধ্য দিয়া উড়িষ্যায় প্রবেশপূর্ব্বক বর্ত্তমান পুরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐ পথ দিয়াই পাণ্ডবগণ হিড়িম্ব রাক্ষসের, পরে ভীমপুত্র ঘটোৎকচের রাক্ষসরাজ্যের অর্থাৎ বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণা বা দুমকা জেলার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত—চৈতন্যদেবের সহচর নিত্যানন্দ গোস্বামীর জন্মস্থান 'একচক্রা' গ্রামে আসিয়া কিছুকাল বসতি করিয়াছিলেন মনে হয়। পরে রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে দিগ্বিজয়কালে ভীম সম্ভবত ঐ পথ দিয়াই অগ্রসর হওতঃ তাম্রলিপ্ত বা বর্ত্তমান তমলুক (মতান্তরে বর্ত্তমান রাঢ়দেশ) জয় করিয়াছিলেন। নানা ঘটনায় কয়েকটি রাজবংশের সংস্রবে আসিয়া জানিয়াছি যে—পরে বহুকাল ঐ পথ দিয়াই উত্তর ভারতের অন্ততঃ রাজন্যবর্গ পুরীতীর্থে ও অন্যত্র যাতায়াত করিতেন। ঐ সকল রাজযাত্রীদলের মধ্যে কোন কোন রাজা রাজপুত্র বা রাজবংশীয় বা বীর পথপার্শ্বের নানা জনপদ জয় করিয়া ফেলিতেন এবং সেই নবলব্ধরাজ্যে তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ দলবল সহ রহিয়া যাইতেন;

---

* বুদ্ধসম্বন্ধীয় এই প্রবন্ধটী কলিকাতার অন্যতম মহাযানপন্থী বৌদ্ধগুরু কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম। লিখনভঙ্গী ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী। ত০ প০ স০

এমন কি, অনেক স্থলে তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান। উড়িষ্যাদেশীয় ময়ূরভঞ্জের রাজবংশের, মানভূম জেলার কাশীপুর বা পঞ্চকোট রাজবংশের, দুমকা জেলার পাথিয়া বা জামতাড়া রাজবংশের, মুঙ্গের জেলার গিধোর রাজবংশের, আরা জেলার মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজবংশ অর্থাৎ বর্ত্তমান ডুমরাওন রাজবংশের ইতিহাসালোচনায় ইহার সত্যতা প্রমাণ হইবে। অন্যান্য অনেক বংশাবলী হইতেও সম্ভবতঃ ইহা জানা যাইবে।

এইরূপ ভারত হইতে বাহিরে যাতায়াতের পথও ছিল, তাহা মহাভারতাদি পড়িলে জানা যায়; উহা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল দিয়া ছিল। সভ্যতাদির বাহক "পথ"। পৃথিবীর ইতিহাস যাঁহারা ভালরূপে জানেন, তাঁহারা উহার সন্ধান দিলে ভাল হয়। পথ ছিল—যাতায়াতও ছিল।

ঐ পথ দিয়াই কালযবন ভারতের বাহির হইতে সুবৃহৎ (কথিত হয় এক কোটি) সৈন্যদল সহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থ মথুরা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। অন্যান্য নানা জাতি ভারতীয় রাজশাসনে ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন; যযাতির বংশধরেরা তো ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নানা পাশ্চাত্য জনপদে গিয়া তত্তদ্দেশের রাজা হইয়াছিলেন, ইহা সকলেরই সুবিদিত। তাহা কতক কুরুক্ষেত্রে প্রকাশিত "ভারতের হারাধন" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, বাকী প্রবন্ধান্তরে দেখাইব।

"নানাকথায়" "রুষিয়া" শব্দ "উড়িষ্যা" হইতে, এই যে মত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সম্ভব; কিন্তু উহা যাচাই করিয়া প্রমাণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি আবশ্যক :—

(১) পৃথিবীর তথা রুষিয়ার ও ভারতাদি দেশের পুরাতন মানচিত্রাবলী।

(২) রুষিয়া ও উড়িষ্যার গ্রাম্যকথা (folktales)।

(৩) রুষিয়া ও উড়িষ্যাদেশের গ্রামসকলের ও ডাকঘরের নামের তালিকা।

(৪) রুষিয়া ও উড়িষ্যার পুরাতন ইতিহাস।

(৫) ভারতীয় পবিত্র গ্রন্থাদি (Sacred Books) মহাভারত, পুরাণ, স্মৃত্যাদি; এই সকল খুঁজিয়া দেখিতে হইবে উড়িষ্যার কেহ ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন বা গিয়াছিলেন কি না? এবং যাইলে ভারতের বাহিরে কোথায় তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন—রুষিয়াতে কি না?

উক্ত গ্রন্থসকল মধ্যে যে জগতের নানা জাতি ও দেশের অধুনা অজ্ঞাত পুরাতন ইতিহাসের মালমসলা পাইয়াছি, তাহা আধুনিক কালের আবিষ্কারাদির সহ মিলাইলে ঐ সকল মালমসলারই প্রামাণ্য দৃষ্ট হইবে। যথাসাধ্য খাটিয়াছি ও খাটিতেছি; কিন্তু তৎসকল ঠিক-মত প্রচার করা একার সাধ্য নহে। ঐজন্য একটি প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। দেশীয় কোন মহৎ ব্যক্তি এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন কি?

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি।

কীর্ত্তন দাদরা।

প্রভু করুণা কুরু কিঞ্চিত,
কৃপাভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করে এসেছি নাথ।
[দেখা পাব ব'লে—ত্রাণ পাব ব'লে—চরণ পাব ব'লে]
আমি পাপেতে তাপিত হ'য়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়া।
[ওহে পতিতপাবন]

প্রভু স্থান দাও তব চরণতলে,
আমায় ত্যজ না পাতকী বলে,
[ওহে অধমতারণ]

প্রভু কৃপাসিন্ধু, সিন্ধু তব নাম,
আমায় কৃপাবারি কর হে দান।
[ওহে কৃপাময়]

কথা ও সুর—চিরঞ্জীব শর্ম্মা (৺ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল)। স্বরলিপি—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

পমা ।। মা পা পা । -া পা মা । পা ধা পা । মা গা মা । { মা পা পা । -া সা সা ।
প্রভু ক রু ণা • কু রু কি ন্ চি ত্ প্র ভু { ক রু ণা • কৃ পা
ক রু ণা, • ব ড়

০ ১ ০ ১
সা রা রা। রা রা গা। মা পধা পা। মা গা মা।
ভি খা রী কা ত র কিং ০ ক রে না থ
আ শা ০ ক ০ রে এ সে ছি না ০ থ

০ ১ ০ ১ ০ ১
র্সা র্সা না। র্সা না ধা। পা পা ধা। ধা -া না। মা ধা পা। মা গা মা।
দে শা পা ব ব লে ব ড় আ শা ০ ০ — — — — — —
ত্রা ণ পা ব ব লে ব ড় আ শা ০ ০ — — — — — —
চ রণ পা ব ব লে ব ড় আ শা ক রে এ সে ছি না - থ

০ ১ ০ ১ ০
পধা ॥ না র্সা র্রা। র্গা র্রা র্সা। র্সা না ধা। না না না। র্সনা ধনা র্সনা।
আমি পা পে তে ০ ০ ০ তা - পি ত হ' য়ে এ— — —

১ ০ ১ ০ ১
ধপা পা পা। ধা ধা -া। ধা না র্সনধা। পা পা ধনধা। পা -া -া।
০০ আ ছি ত ব ০ দ্বা রে ০০০ দাঁ ড়া ০০০ ইয়া ০ ০

০ ১ ০ ১ ০
ক্ষা পা পা। -া র্সা র্সা। না র্সা র্সা। না ধা ধা। পা ধা ধা।
ক রু ণা ০ ও হে প তিত পা বন আ ছি ০ ত ব

১ ০ ১ ০ ১
ধা না র্সনধা। পা পা ধনধা। পা -া -া। ক্ষা পা -া। -া -া -া॥
দ্বা রে ০০০ দাঁ ড়া ই০০ য়া ০ ০ ক রু ণা ০ কু রু

০ ১ ০ ১ ০ ১
পধা ॥ না র্সা র্রা। র্গা র্রা র্সা। -া -া -া। -া র্সা র্সা। ধা না না। না র্সা -া।
প্রভু স্থা ন ০ দা ০ ও ০ ০ ০ ০ ত ব চ র ণ ত লে ০
প্রভু কৃ পা ০ সি ন্ ধু ০ ০ ০ ০ সি ন্ধু ত ব ০ না ০ ম

০ ১ ০ ১ ০ ১
ধনা ধনা র্সা। -া না ধপা। ধা ধা -া। ধা না পা। না ধা -া। পা -া -া।
— — — ০ আ মা য় তা ন ০ না ০ পা ত ০ কী ব ০ লে
— — — ০ আ মা য় কৃ পা ০ বা ০ রি ক র হে দা ০ ন

"[ওহে অধম তারণ]" "[ওহে কৃপাময়]" এই দুইটী আখর
"[ওহে পতিত পাবন]" এই আখরের ন্যায় গেয়।

নানা কথা।

দ্রৌপদীর বিবাহ—শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ দ্রৌপদীর বিবাহবিষয়ক যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে যে প্রকার আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে বুঝিতেছি উহা পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রবন্ধটী ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ বলিয়াই আমরা উহা প্রকাশ করিয়াছি এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়া এবিষয়ে যিনি যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিরপেক্ষ ভাবে তাহা প্রকাশ করিতেছি। জনৈক পাঠক কিন্তু এরূপ আলোচনার বিরুদ্ধে আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার পত্র পড়িয়া মনে হয় যে, তিনি মনে করেন যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কেবল ধর্ম্ম ও দর্শনের "তত্ত্বে" পরিপূর্ণ থাকা উচিত। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। তিনি যদি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অবধি পড়িয়া দেখেন তো দেখিবেন যে, ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি (কামভাবোদ্দীপক উপন্যাসাদি বিষয় ব্যতীত) সকল বিষয় সংগত ভাবে ও সংযত ভাষায় আলোচিত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতই, আমাদের জানা উচিত যে আমাদের দেশে ইতিহাস, ধর্ম্ম ও দর্শন এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ যে, উহার কোন একটীর আলোচনা স্থগিত রাখিলে অন্য দুইটীর প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। পত্রপ্রেরকের যুক্তিতে দেশের উপধর্ম্ম বিষয়ক (এমন কি ভৈরবী চক্র প্রভৃতি) কোনও কিছুরই আলোচনা সম্ভব হয় না। কিন্তু ইহা জানা কথা যে, পত্রিকার সেই আদিমকালে, যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার হাল ধরিয়াছিলেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই সকল বিষয় পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ফলে হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ প্রকার বিষয়সকল নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করায় দেশ কুসংস্কার হইতে অনেকাংশে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

তাঁহার দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহাতে দ্রৌপদীর নিন্দা করিয়া হিন্দুজাতির মনে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয় না যে, উদারপ্রাণ বিরাটহৃদয় হিন্দু জাতি এত সূক্ষ্মচর্ম্মী যে, মহাভারতের বা কোনও শাস্ত্রের কোনও বিষয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে তাহার আঘাতে মৃতপ্রায় হইবে। তাহা যদি হইত, তবে বেদব্যাস নিজের জন্মকথা এবং কুন্তী অহল্যা প্রভৃতির আচার ব্যবহারের কথা কোন অংশ না লুকাইয়া নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন না। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্যান্য পাণ্ডবের বিবাহিত পত্নী না হওয়া যদিবা প্রমাণিত হয়, তাহাতেও তাঁহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। আশ্চর্য্য এই যে, যে "পঞ্চ কন্যা" নিত্য স্মরণীয়, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ব্যবহারে গুরুতর দোষ উল্লিখিত দেখা যায়। কাজেই বুঝিতে হইবে, ঐ প্রকার ব্যবহার সত্ত্বেও অন্যান্য গুণের কারণে তাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। আমরা প্রেমানন্দ বাবুকে, দোষ সত্ত্বেও প্রাতঃস্মরণীয় হইবার কারণ বিষয়ে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছি এবং তিনিও সে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পত্রপ্রেরককে আমরা জোরের সঙ্গে বলিতে পারি যে, কাহারও (পৌরাণিক character হৌন বা জীবিত নরনারী হৌন) নিন্দা পত্রিকায় স্থান পাইবে না এবং Trustdeedএর বিরুদ্ধ কোন আলোচনাও প্রকাশিত হইবে না। তাঁহাকে এটুকুও বলিয়া রাখিতেছি যে বেদী হইতে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ এবং মাসিকপত্রে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা, উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ।

পর্দ্দার বিরুদ্ধে—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, শেষে বড়বাজারের মাড়োয়াড়ী মহিলাগণও অস্বাভাবিক পর্দ্দাপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। আমরা মঙ্গলজনক পর্দ্দা-প্রথার বিরোধী নহি, কিন্তু অমঙ্গলের নিদান অস্বাভাবিক পর্দ্দা-প্রথার বিরোধী। একবার গাজিপুরে যাই। সেখানে ষ্টীমারঘাট হইতে সহরের পথে পাড়িবার মধ্যস্থলে গঙ্গার চড়া সিকি মাইল আন্দাজ পার হইতে হয়। দেখিলাম, বাঙ্গালী মহিলাগণ এবং মাড়োয়াড়ি মহিলাগন সকলেই "ঘেরাটোপ" ওয়ালা পাল্কী চড়িয়া ঐটুকু পার হইতেছেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, উহা না করিলে নাকি সম্মান বজায় থাকে না। প্রথম প্রথম বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত মহিলারাই ঐ প্রথা প্রবর্ত্তন করেন; তখন তাঁহাদের দেখাদেখি অন্যান্য জাতির মহিলাগণও ঐ প্রথার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। "ঘেরাটোপ" কাহাকে বলে, তাহা হয় তো আজকালকার অনেকে জানেন না। বালিশের যেমন খোল বা ওয়াড় থাকে, ইহাও সেইরূপ সমগ্র পাল্কীর খোল বা ওয়াড়—যাহাতে উহার ভিতরের মহিলা বাহিরের কাহাকেও দেখিতে না পান, এবং বাহিরের কোনও লোক তাঁহাকে দেখিতে না পান। এখন হয় তো ইহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এবং দু-দণ্ড চাহিয়া দেখিবার বস্তু বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু সেকালে ইহাই প্রথা ছিল। আমরা দেখিয়াছি আমাদের বাড়ীর মহিলারা একেবারে সংলগ্ন পার্শ্ববর্ত্তী আত্মীয়ের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন এইরূপ ঘেরাটোপ পাল্কীর সাহায্যে এবং সঙ্গে দরওয়ান, চাকর ও দাসী—যেন মহিলা কোন্ সুদূর বিদেশে যাত্রা করিতেছেন।

এই প্রকার পর্দ্দা হইল অতিরিক্ত পর্দ্দা।—পর্দ্দার বাড়া-

বাড়ি। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভীষণ ভূমিকম্প হয়। আমরা ছেলে-মেয়ে সকলে বাড়ীর খোলা বাগানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর ছেলেরা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া খোলা জায়গায় দাঁড়াইলেন, কিন্তু মেয়েরা ঐ অতিরিক্ত পর্দ্দার প্রভাবে কেহই বাহির হইলেন না। আমরা বাল্যকালে যেরূপ পর্দ্দার ব্যবহার দেখিয়াছি, আজ-কালকার দুর্মূল্যতা প্রভৃতির দিনে তাহা অব্যাহত থাকিলে যক্ষ্মার প্রাবল্যে নিশ্চয়ই দেশের মেয়েরা এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও যে decimated হইয়া যাইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভগবানের বিধানেই প্রকৃতির নিয়মের ফলেই বর্ত্তমানে আত্মরক্ষার জন্য পর্দ্দার বিরুদ্ধে অভিযান চলিতেছে। আমরা অতিরিক্ত পর্দ্দারও পক্ষপাতী নহি, আর অতিরিক্ত বে-পর্দ্দারও সপক্ষ নহি। আমি 'আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা' গ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, বৈদিক কালে স্বাধীনতার সহিত পর্দ্দা-প্রথা বা অবরোধপ্রথার কিরূপ সামঞ্জস্যের সঙ্গে সংমিশ্রণ ছিল। আমরা সেইরূপ অবরোধ প্রথারই পক্ষপাতী। যাঁহারা ভদ্র ইংরাজ পরিবারে ঘনিষ্টভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারাই আমার এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইহাও ঠিক, পর্দ্দাপ্রথার অস্তিত্বের সময়ে যেভাবে সমাজের গতি চলিতেছিল সেভাবে চলিবে না—বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট অন্য কোন পথে চলিবে। কিন্তু তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই।

দীর্ঘায়ু পুরুষ—সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত আলারাম ১২৮ বৎসর বয়সে সিন্ধু—হায়দ্রাবাদে গত ২২শে নবেম্বরে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক হিসাবে অনেক দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার—দেবমন্দিরে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের প্রবেশাধিকার লইয়া চারিদিকে মহা কোলাহল উঠিয়াছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, এই অধিকার দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহা সামান্য হইলেও সফলতা লাভ করিতেছে। কিন্তু আজ যে অধিকার দেওয়া হইতেছে, কাল সুবিধা হইলেই তাহা কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ? এই অন্যায় প্রথার প্রতীকারের একমাত্র উপায় অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম অবলম্বন; এই সত্যধর্ম্মের নিকট উচ্চ-নীচ ভেদের কারণে অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির কথাই উঠিতে পারে না।

কাফিরিস্থান—আফগানস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলিলেও চলে। ইহার অধিবাসীরা সাধারণত কঠোর পরিশ্রমী ও দুর্দ্ধর্ষ। কাহারও নিকটে ইহারা সহজে মাথা নত করিতে চাহে না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কাবুলের আমীর ইহাদিগকে বশে আনেন। ইহাদিগকে অধীনে আনিবার পর ঐ প্রদেশে মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। কাফিরিগণও দলে দলে সভ্য হওয়ার মানসে ইসলামধর্ম্মে নাম লিখাইতে থাকে। এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সঙ্গে তাহাদের আচারব্যবহারেও অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। সম্প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ দেশে এক বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরণ করেন। অভিযাত্রীগণ বলেন যে কাফিরিদিগকে জাতি হিসাবে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—সিয়াপোষ এবং সফেদপোষ; গোত্র হিসাবে আরও অনেক ভাগ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক গোত্রই ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, তথাপি এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের ভাষা বুঝিতে পারে। ঐ সমস্ত ভাষারই জন্ম ভারতের "প্রাকৃত" হইতে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহারা পৌত্তলিক —মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে; অনেক গাছ ও জীবজন্তু তাহাদের চক্ষে পবিত্র। আচারব্যবহারে পৌরোহিত্য-প্রথা ও নৃত্যগীতের বাহুল্য সহজেই চক্ষে পড়ে। ইহাদের শারীরিক গঠন—ঋজু ও পাতলা, দৈর্ঘ্যে সাধারণত প্রায় সাড়ে পাঁচফুট। হাঁটিতে ক্লান্ত হয় না; পাহাড়ে উঠিতে ইহাদের সমকক্ষ কেহ নাই। পোষাক পরিচ্ছদে বহুকাল যাবৎ জঙ্গলীই ছিল, মাত্র দুই চার বৎসর তাহারা তুলার প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করিতেছে।

ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলা—নাঃ—ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলাকে জুয়াখেলা বলিবার অধিকার তোমারও নাই, আমারও নাই, কাহারও নাই। তুলার খেলা জুয়াখেলা; বৃষ্টির খেলা জুয়াখেলা; আর সব জিনিষেরই খেলা জুয়াখেলা; কেবল ঘোড়ার খেলা জুয়াখেলা হইতেই পারে না। কারণ, অন্যান্য জিনিষ লইয়া অন্তত এদেশে প্রধানত শুধু দেশীয় লোকদিগকেই খেলিতে দেখা যায়, কিন্তু ঘোড়দৌড়ের খেলা ধনী লোকেরাই, বিশেষত ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়েরাই প্রধানত খেলে। কাজেই আর সকল খেলায় ধরপাকড়ের জন্যই আইনকানুনের ব্যবস্থা হইল; কিন্তু ঘোড়দৌড়ের খেলা আইনের হাত হইতে বাঁচিয়া গেল। জুয়াখেলা মাত্রেই যে কি রকম নেশা চাপে এবং কি রকম সর্ব্বনাশ হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেরই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। একবার আমি খিদিরপুর হইতে ট্রামে ধর্ম্মতলায় আসিতেছিলাম। গাড়ী একেবারে লোকে বোঝাই—তাহার মধ্যে অনেকেই ঘোড়দৌড়ের ফেরত। তাহাদের মধ্যে একটী ১২।১৪ বৎসরের মাড়োয়াড়ি বালক ছিল। সে গাড়ীতে উঠিয়া অবধি পাগলের মত "এক রুপেয়াসে দশ রুপেয়া জিতা" বকিতে বকিতে দুই পা

দুই হাত তুলিয়া নাচিতে লাগিল। আমার এক হিন্দুস্থানী বন্ধু একবার ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলায় কুড়ি হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমটা তিনি লোভ সামলাইয়া ঐ খেলা হইতে কিছুকালের জন্য নিবৃত্ত হইলেন এবং বুদ্ধিমানের মত একটা কাপড়ের দোকান খুলিয়া বেশ দু-পয়সা লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ কিছুকাল পরে সঙ্গীদের পাল্লায় পড়িয়া আবার প্রলোভনে পড়িলেন এবং পুনরায় জুয়াখেলাতে নামিয়া প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা লোকসান দিলেন। পূর্ব্বকার লাভ কুড়ি হাজার তো গেলই; তাহার উপর দোকান হইতে পুঁজি ভাঙ্গিয়া দশ হাজার গুনোগার দিতে হইল। কাজেই মূল ধনের অভাবে দোকানও টলমল করিতেছে। কত দৃষ্টান্ত দিব? আর একটি পরিচিত মাড়োয়াড়ী তিন লক্ষ টাকা ঘোড়দৌড়ে পাইয়া ছয় মাসের মধ্যে ঘোড়দৌড়েই সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু মাড়োয়াড়ী প্রভৃতি ভারতের ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা গর্ব্ব করে যে, 'আমরা লোটা আর সোটা ও কম্বল অর্থাৎ একটা জলপাত্র, একখণ্ড যষ্টি ও একটা মুড়ি দিয়া শুইবার কম্বল লইয়া আসিয়াছি, যদি অদৃষ্ট মন্দ হয়, তবে তাহা লইয়াই দেশে ফিরিব; ইহার বেশী তো আর কিছু হইবেনা, তখন জুয়াখেলার দ্বারা টাকা রোজগার করিতে থামিব কেন? আমাদের বুকের পাটা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা অনেক মজবুত।' প্রকৃতই, আমাদের দেশ এখানে বলিয়া, আমাদের স্ত্রীপুত্রাদি সকলেই এখানে বলিয়া আমাদের বুকে অত জোর আসে না। আমার তো চক্ষে ভাসিতেছে—দুই তিন জন জমিদার ঘোড়দৌড়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইতে বসিয়াছে। অন্যান্য বিলাতী নেশা ও পাপের ন্যায় এই পাপও দেশের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে; এমন কি, আজকাল সভ্যতাভিমানী অনেক দেশীয় মহিলাও এই জুয়াখেলার পথে ভিড়িয়াছেন! হে ভগবান! কবে এই সকল পাপ হইতে দেশ মুক্তি লাভ করিবে?

গত ২১শে কার্ত্তিকের সঞ্জীবনীতে দেখি, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল পাশ হওয়ায় সহরের মধ্যে ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলার টিকিট বিক্রয়ের আড্ডা উঠিয়া যাইবে। সঞ্জীবনীর সঙ্গে আমরাও বলি যে, ইহা মন্দের ভাল বা ভালর সূত্রপাত। কিন্তু কথা এই যে, যে পরিমাণ টিকিট বিক্রয় হয়, তাহার কতটুকু সহরের মধ্যে হয়, আর কতটা ঘোড়দৌড়ের মাঠে হয়। সর্ব্ববিধ জুয়াখেলার পাপ সমূলে উৎপাটন করাই সমাজনীতির ন্যায় রাষ্ট্রনীতিরও কর্ত্তব্য। সমাজের দারিদ্র্যের কারণে অনেক দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোকও বিনা পরিশ্রমে হঠাৎ-নবাব হইবার জন্য অন্যান্য জুয়াখেলার জেলে যাইবার ভয়ে এই ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলাতেই ডুবিয়া যায়। সকলের জানা উচিত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার না করিলে টাকা লাভ করিলেও থাকে না।

ইহার উপর আজকাল একটা ফ্যাষন হইতেছে, ভাল প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাইতে হইবে, হয় বারাঙ্গনাপরিচালিত থিয়েটরে অভিনয় করাইয়া অথবা দিগ্বিদিক জ্ঞানরহিত হইয়া, অপরের ইষ্টানিষ্টের প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়া, মহিলানৃত্য করাইয়া অথবা Turf clubএর কর্ত্তৃপক্ষদের নিকটে ভিক্ষার ঝুলি পাতিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে! ইহার ফলে কি দুর্নীতিপরতা, অন্তত কি নীতিহীনতা যে দেশের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

বায়স্কোপ—২১শে কার্ত্তিকের সঞ্জীবনীতে দেখি, জেনেভার জাতিসঙ্ঘের সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে উক্ত সঙ্ঘের শিশুমঙ্গল কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, বালক-বালিকাদিগকে সিনেমা দেখিতে দেওয়া উচিত নহে। প্রকৃতই সিনেমাতে যে সকল প্রেম'চিত্র দেখানো হয়, এবং প্রেমচিত্রই বোধ হয় সিনেমায় শতকরা ৯০ ভাগের উপর, তাহার ফলে বালকবালিকাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বনাশের কিরূপ উপায় অঙ্কিত হয়, তাহা ঐ সকল প্রেমচিত্র না দেখিলে বোঝা যাইবে না। যাই হোক, দাসমনোভাবের কারণে আমরা যখন বিলাতী ফ্যাসনের দাস হইয়াছি, তখন আশা হয় এই বিলাতী জাতি-সঙ্ঘের অনুশাসনে আমাদের দেশের অনেকে তাঁহাদের ছেলেমেয়েদিগকে এখন অবধি সিনেমাতে লইয়া যাওয়া হইতে নিবৃত্ত হইবেন।

ভারতবাসীর দারিদ্র্য—কি উপহাসের কথা—ভারতের শ্রমজীবিদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য আবার রয়াল কমিশন বসাইতে হয়! চক্ষু থাকিলে পথে চলিতে চলিতেই পথিক দেখিতে পাইবে যে, ভারত-বাসীর দারিদ্র্য কত গভীর। মনে হয় পড়িয়াছিলাম যে, ভারতবাসীর গড়ে বাৎসরিক আয় ২০৲ টাকা অর্থাৎ মাসে প্রায় ১৸০ টাকা; সেই দুই টাকার ন্যূন আয়ে তাহাদের ৪।৫টী লোকের এক একটী পরিবার পুষিতে হয়। যাহাদের বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা না হয় বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানি যে, মফঃস্বলের প্রজাদের অনেকেই সাধারণত দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—গবর্ণমেণ্টের খাসমহলের প্রজারাও শতবিধ খাজনার ভয়ে নিষ্পিষ্ট হইয়া মৃত-প্রায় হইয়া থাকে। এই কারণেই উহাদিগকে যাঁহারা খাজনা কমাইবার আশ্বাস দেন, দুমুটো ভাত পেট ভরিয়া খাইতে দিবার আশ্বাস দেন, উহারা তাঁহা-দিগেরই গোলাম হইয়া যায়। ইহার উপর, দুর্ভিক্ষ

অজন্মা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতির একটা না একটা বৎসরের পর বৎসর তো লাগিয়াই আছে। উহারই মধ্যে বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির ভিতর কোন একটা বিশেষ ভাবে লাগিলেই তো হইয়া গেল—হাজার হাজার লোক দুর্ভিক্ষরাক্ষসের চরণে তাহার অনুচর মহামারী প্রভৃতির খাঁড়ার প্রহারে বলি প্রদত্ত হইবার পর, তবে আবার পূর্ব্বের সাম্যভাব কতকটা ফিরিয়া আসে। দুর্ভিক্ষে প্রজাগণের অবস্থা আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে—যুবক বালকেরা তো কোন প্রকারে শতচ্ছিদ্র বস্ত্র পরিয়া চলাফেরা করিতে পারে, কিন্তু যুবতী রমণীরা বস্ত্রাভাবে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ক্ষুধাশান্তির জন্য বিষাক্ত শাক কুড়াইতেছে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এমনও সম্বাদ কানে আসিয়াছিল যে, বস্ত্রাভাবে ভদ্রপরিবারের কোন কোন রমণী গৃহের বাহিরে আসিতে অক্ষম হইয়া নীরবে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অন্নবস্ত্রের অভাবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই তো আজ কয়েক দিন কুমিল্লার অঞ্চলে বন্যার ফলে দুর্ভিক্ষের কারণে অন্নাভাবে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত সুরু হইয়াছে।

গত ২১শে কার্ত্তিকের সঞ্জীবনীতে দেখিলাম, শ্রমজীবীদের অবস্থা দেখিবার জন্য বিলাতের নিযুক্ত রয়াল কমিশন দিল্লীতে দুইটী স্ত্রীলোক মজুরনী এবং একজন পুরুষ রাজমিস্ত্রীকে ডাকিয়া তাহাদের সংসারের বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে তাহারা বলে যে, তাহাদের প্রত্যেকেরই ২০০৲ ঋণ আছে, তজ্জন্য শতকরা ৩৭৷৷ টাকা হিসাবে সুদ দিতে হয়। তাহারা যাহা পায় তাহাতে কোন প্রকারে দিন গুজরাণ হয়। কমিশনের কোন সভ্য জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহারা দুধ ঘি খায় কি না। শ্রমজীবীরা বলে—দুধ ঘি খাইবার পয়সা তাহারা পাইবে কোথায়? স্ত্রীলোকেরা বলে, তাহারা প্রত্যেকে সাত আনা মজুরী পায়; তাহাদের সংসারের পাঁচটী প্রাণী—সাত আনায় পাঁচজনের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিতে হয়! দুঃখের বিষয়, এই সহজ তথ্য সন্ধানের জন্য ভারতে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া রয়াল কমিশন বসাইতে হইল। এত কমিটি কমিশন ইতিপূর্ব্বে বসিয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের তদন্তের ফলে দেশের অভাব এত সামান্য নিরাকৃত হইয়াছে যে, কমিটী কমিশনের উপর দেশবাসীর আস্থা বড়ই কমিয়া গিয়াছে। আসল কথা এই যে, ইংরেজ জাতি নিজেদের স্বার্থ অল্প-বিস্তর ত্যাগ করিয়া, দেশের খাজনার ভার কমাইয়া দিয়া, চাউল প্রভৃতি অপরিহার্য্য আহার্য্যের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেশবাসীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান স্থায়ীভাবে সুলভ করিয়া না দিলে আশঙ্কা হয়, দেশ জগতের ইতিহাসপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। অন্নবস্ত্র সুলভ কর, বৈপ্লবিক ভাব সঙ্গেই অন্তর্হিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, আমরা বিপ্লবপন্থার আদৌ পক্ষপাতী নহি। যে সেটেলমেণ্ট চলিতেছে, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্টের খাসমহলে বর্ত্তমান শতকরা প্রায় ৫০৲ টাকার উপর আরও ২৫৲ টাকা বৃদ্ধি হইতেছে এবং জমীদারী মহলেও সেসের নামে প্রকারান্তরে খাজনা বৃদ্ধি হইতেছে শোনা যায়। এই সেদিন সংবাদপত্রে পড়িলাম যে সুন্দরবন অঞ্চলে খাসমহলের খাজনা অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে। মানুষ মানুষ তো বটে—অতিরিক্ত চাপের প্রয়োগে মানুষের প্রাণ যখন ফাটিয়া বাহির হইবে, তখন তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখা নিতান্তই অসাধ্য হইবে।

হিন্দুর কর্ত্তব্য—এখনও যাঁহারা প্রতিপদে সমাজসংস্কারে ভয়ত্রস্ত হইয়া উঠেন, তাঁহাদিগকে আমরা দূরদর্শী বলিতে পারি না। অতীতের ধারার সহিত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যুগে যুগে যুগধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক জাতির মহাপুরুষের লক্ষণ। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের ও হিন্দুজাতিরও এই নীতি অনুসরণে অবিলম্বে সমাজসংস্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত—নতুবা হিন্দুজাতিকে, সুতরাং তাহার cultureকে রক্ষা করিবার কথা বলা বাতুলের প্রলাপ মাত্র। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই তো প্রতিদিন সংবাদপত্র খুলিলেই দেখিতে পাইবেন যে, কিরূপ দ্রুতগতিতে হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। বড়ই শুভক্ষণে কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "হিন্দুজাতি ধ্বংসোন্মুখ কি না" গ্রন্থে আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন।

সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীহট্টে একটী বক্তৃতায় ঠিক কথা বলিয়াছেন—"হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনকে আশ্চর্য্যরূপে নিজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারে।" ঠিক কথা; ইহার কারণ এই যে, হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র একমাত্র ভগবান, যিনি সকল দেশে সকল জাতিতে ও সর্ব্বকালে সমভাবে বিদ্যমান। কিন্তু হিন্দুসমাজ কালক্রমে আপনাকে অতিরিক্ত গণ্ডীবদ্ধ করিয়া কূপমণ্ডুকের মত বাস করিবার ফলে এই বিশাল বিরাট শক্তি হইতে বিচ্যুত হইতে চলিয়াছে। কোন ব্যক্তির পান হইতে চুনটী খসিল, বিশেষত যদি সে স্ত্রীলোক হয়, অমনি তাহাকে সমাজ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। বর্ত্তমানে বিশ্লেষণের বেলায় সমাজ বড়ই পটু, বড়ই active; কিন্তু আশ্লেষণের বেলায়, লোকসংগ্রহ করিয়া সমাজকে পুষ্ট করিবার বেলায়, সমাজ পেচকের ন্যায় নীরব ও গম্ভীর। এই সময়ে সমাজের এপ্রকার

ব্যবহার প্রকাশ পায়, যেন সমাজের ঐ কয়েকজন তথা-কথিত নেতার ন্যায় আর কেহই সমাজের মঙ্গল বুঝিতে পারেন না। কাজেই সমাজ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে।

এখানেও দাসমনোভাবের ক্রিয়া খুবই দেখা যায়। ঐ যে সাহেবেরা, বিশেষত মিসনরি সাহেবেরা কেতাবে বলিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাদের মতে non-mission-ery ধর্ম্ম অর্থাৎ আশ্লেষণপ্রধান না হইয়া বিশ্লেষণপ্রধান ধর্ম্ম; অতএব হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা ও হিন্দুসমাজের নেতারা রায় দিলেন, তোমরা সমাজের মধ্যে বাহির হইতে লোক লইতে পার না, কিন্তু কথায় কথায় পদে পদে ঘরের লোককে পর করিয়া বাহির করিয়া দিতে পার। অমনি পাদুকাবাহী আমরাও সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলাম—'তা বটেই তো, তা বটেই তো"; এবং সেইমত কাজ করিয়া সকল দিকে দুর্ব্বল হইয়া পাদুকাবাহীত্বের উপরে উঠিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিলাম। ইহার প্রতিকারের উপায় হইতেছে বিশ্লেষণের চেষ্টা কমাইয়া আশ্লেষণের শক্তি বৃদ্ধি করা। আদি ব্রাহ্মসমাজ এই নীতির অনুসরণচেষ্টার পথপ্রদর্শক। আদিসমাজই শুদ্ধিবিষয়ে সর্ব্বপ্রথম পথ দেখাইয়াছেন; আদিসমাজের তত্ত্বাবধানেই হিন্দুসমাজের সকল দিকে অনন্যপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক বক্তৃতা দেওয়ানো হইয়াছিল। এই যে বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক আইন হইল, আদি সমাজ এপ্রকার আইনের দ্বারা, বিশেষত বিদেশীদিগের সাহায্যে সমাজসংস্কারের চিরকাল বিরোধী হইলেও বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এবিষয়ে আমরা তর্কভূষণ মহাশয়কে সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি—"সামাজিক ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপে আপত্তির একটা যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে বিবাহপ্রথা অব্যাহত রাখার দাবীর পশ্চাতে কোনই যুক্তি নাই। সামাজিক সমস্যা সমাধানের ভার কতিপয় পণ্ডিতের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-মণ্ডলীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য, এবং পুরাকালেও তাহাই করা হইত।" যে দূরদর্শী নীতিদৃষ্টিতে ঋষিরা অষ্টপ্রকার বিবাহ এবং দ্বাদশপ্রকার পুত্রকে যেভাবেই হউক সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, সেই নীতি আমাদেরও অনুসরণ করা কর্ত্তব্য—অনাহারে অনশনে, পুষ্টির অভাবে সমাজকে মৃত্যুর পথে লইয়া গেলে কোনই লাভ নাই, বিপরীতে সমূহ ক্ষতি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র—সংবাদপত্রে দেখিয়া সুখী হইলাম যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ সম্বন্ধে নানা নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি ইংরাজীতে তাঁহার সমস্ত পরিশ্রমের ফল প্রকাশ করিয়া ইংরাজের সুবিধা করিতেছেন; বাঙ্গালীর তাহাতে বিশেষ উপকার হইল কি? বাংলাভাষা তাহাতে পুষ্টিলাভ কি করিল? তাঁহার বহু কৃতী ছাত্র থাকাতেও বাংলাভাষায় তাঁহার কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা না করায় আমাদের পরিতাপের সীমা নাই। বাংলা-ভাষায় কিছু প্রকাশ হইয়াছে কি না আমরা জানি না, অন্তত আমাদের দৃষ্টিতে এপর্য্যন্ত আসে নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নিকট এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের গবেষণার ফল ও কার্য্যবিবরণ বাংলা ভাষাতেও প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষাকে কিছু পুষ্ট করিয়া তুলুন। একথা বলিলে হইবে না যে, বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ নাই। আমরা তো তাই আরও চাই যে বাঙ্গালী বিজ্ঞান-বিৎদিগের চেষ্টায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের পরিভাষা দাঁড়াইয়া যাইবে। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি তত্ত্ববোধিনীতে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধসকল বাংলায় না লিখিতেন এবং যথাকালে সেগুলি গ্রন্থাকারে না প্রকাশ করিতেন, তবে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বঙ্গদেশে বিজ্ঞানচর্চ্চা আরও অনেক বৎসর পিছাইয়া পড়িত। পরিভাষা প্রস্তুত করিতে হইবে।

রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্ম—রাষ্ট্রনীতিতেও যে ধর্ম্মের শাসন আবশ্যক, ধর্ম্মের দ্বারা রাষ্ট্রনীতি নিয়মিত করা উচিত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাষ্ট্রসমূহের পতন ও বর্ত্তমানে ভারতের ইংরাজশাসন তাহার সাক্ষী। আমরা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের কথা এই আলোচনার আমলে আনিতে চাই না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সেই সুপ্রসিদ্ধ সিপাহিবিদ্রোহের পর যখন ভারতশাসন মহারাণী ভিক্টো-রিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে এক ঘোষণাপত্র জারি করেন। সেই ঘোষণাপত্রকে, বলিতে কি, তদানীন্তন ভারতবাসীরা সাম্য ও মৈত্রীর এক সুমহান দানপত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের সমান ব্যবহার, রাজকীয় উচ্চপদে জাতি-নির্ব্বিচারে ইংরাজ ও ভারতবাসীকে যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগের ব্যবস্থা, এবং আরও কত কি উচ্চদরের ধর্ম্মশাসিত রাষ্ট্রনীতির কথা উল্লিখিত ছিল। অধিকাংশ লোক, যাঁহারা আপনাদিগকে রাজনীতিতে সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের ধারণাই এই যে, রাজনীতির মূল মন্ত্রই হইতেছে প্রতারণা—পেটে থাকিবে এক কথা, মুখে বলিব আর এক কথা; মুখে বলিব এক কথা, কাজে করিব আর এক কথা। তাঁহারা তখন বুঝিতে পারেন না যে, পরকে প্রতারণার পরিণাম আত্মপ্রতারণা। ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়ে,

একথা তাঁহারা মনে আনিতেই চান না। মনকে স্তোক দিয়া রাখিতে চান যে, উপায় যাহাই অবলম্বিত হৌক না কেন, পরিণাম-ফল ভাল হইলেই হইল। তোমার অনিষ্ট করিয়া আমার ভাল হইবে, অথবা আমার অনিষ্ট করিয়া তোমার ভাল হইবে, সে সমস্ত বিচার করিবার অবসরই আসে না। তাঁহাদের প্রাণের কথা,—the end justifies the means। ধর্ম্মনীতি বলে তাহা ঠিক নয়—উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকিবে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল এবং তাহার সাধনে ধর্ম্ম্য উপায়সকলই অবলম্বন করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রকারের কূট রাজনীতিজ্ঞদিগের নানা কার্য্যের ফলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঐ ঘোষণাপত্র অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সে দিন এক সম্বাদ-পত্রে দেখিলাম যে, এক বড়লাট এক সরকারী পত্রে ঐ ঘোষণাপত্রের ফলে ভারতবাসীর অন্তরে সমুদিত আশাভরসা উপলক্ষ্য করিয়া লিখিতেছেন যে, "উহা-দিগকে স্পষ্ট নিষেধ করা এবং প্রতারণা করা, এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম সরল পথ আমাদের ধরিতে হইবে"। ইহাই তো, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, এই সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে, নচেৎ এমন চিঠি প্রকাশিত হইবার প্রয়োজন ও অবসরই আসিত না। যাই হৌক, মনে ও মুখে এবং মুখে ও কাজে ঘোরতর পার্থক্য না থাকিলে আজ বড়লাটের ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে বিশ্বাস করিব কি করিব না, এই প্রশ্ন উঠিতেই পারিত না; ভারতের রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মনীতির শাসন মানিয়া চলিলে আজ ১৫০ বৎসরের অধিক কালের আটেঘাটে বাঁধা শাসনের পরেও বিপ্লববাদ ভারতের ত্রিসীমানায় পদার্পণই করিতে পারিত না বলিয়া আমাদের নিঃসংশয় ধারণা। ভারতশাসনের এমন এক সময় আসিয়াছে, যখন ইহার রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম্মনীতির উপর নূতনভাবে গাঁথিয়া তোলা উচিত, ইহার শাসনকার্য্যের সমস্ত বিভাগ পেটে, মুখে, মনে ও কাজে এক করিয়া তোলা উচিত। এই ভাবে ভারতের ৩৩ কোটী প্রজার উপর ব্যবহার করিলে, কি বহিঃশত্রু কি অন্তঃশত্রু, ইংরাজদিগকে এদেশ হইতে হটাইবার কাহারও সাধ্য থাকিবে না। শাসননীতির পরিবর্ত্তন করিবার এমন সুযোগ হেলায় হারাণো উচিত নহে।

অসাম্প্রদায়িক-পত্র 'মেসেজ'—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার উদ্দেশ্যে সদানন্দ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয় যুক্ত-প্রদেশ গোরক্ষপুর নামক স্থানে একটি অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রায় ২৫০০৲ টাকা খরচ করিয়া প্রচারের সাহায্যার্থে একটি ছাপাখানাও খোলা হইয়াছে, এবং এখান হইতে 'মেসেজ' (Message) নামক একখানি ইংরাজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া দেশবিদেশে পাঠান হইতেছে। এই 'মেসেজ' পত্রিকার দ্বারা সকল ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাই কালীপ্রসন্ন বাবুর উদ্দেশ্য। যাহাতে ইহা প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজে এবং বহুতর ব্রাহ্ম-পরিবার মধ্যে স্থান পাইতে পারে তজ্জন্য ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক এক টাকা মাত্র রাখা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই অল্পকাল মধ্যে দেশ-বিদেশে যশ ও খ্যাতি লাভ করা সত্বেও অদ্যাবধি ইহা ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মসাধারণের যথোচিত সহানুভূতি লাভ করিতে পারিল না। ব্রাহ্মেতর সম্প্রদায় ইহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেও, যাঁহাদের জন্য ইহার আবির্ভাব তাঁহারা সদানন্দের এই নিঃস্বার্থ প্রচারকার্য্যে সহানুভূতি করিতে কুণ্ঠিত এবং পরাঙ্মুখ। ইহা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসা-হিসাবে পরিচালিত নহে। 'মেসেজ' কাহারও ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতে আইসে নাই। ইহা সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলার্থ উৎসর্গীকৃত এবং সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি। সকল ব্রাহ্মসম্প্রদায়েরই মুখপত্র আছে সত্য, কিন্তু সেগুলি আপনাপন সম্প্রদায়ের জন্য পরিচালিত, আপনাপন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আছে। কিন্তু মেসেজ সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক পত্র। ইহাতে সকল ব্রাহ্মসমাজেরই মতামত প্রকাশ করিয়া সকলের মধ্যে সৌহার্দ্দ ও মৈত্রী স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের মতানুযায়ী গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়া সাধারণের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব বিশেষভাবে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাতে যে আশাতীত শুভফল ফলিতেছে, তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে। আমাদের বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে অতি অল্প দিন মধ্যেই ইহা ব্রাহ্মসমাজে এক নবযুগ আনয়ন করিতে পারিবে।

লর্ড আরউইনের ঘোষণাপত্র।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' একটী ধর্ম্মসমাজের মুখপত্র। কাজেই যে সকল বিষয়ের উপর ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃষ্ট হয়, যথা নীতি, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি, সেই সকল বিষয়ই ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগও আলোচিত হয়, কারণ ইহাও পত্রিকা-প্রকাশের অন্যতর উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রনীতি যে পত্রিকার গণ্ডির বহির্ভূত, তাহা নহে। ধর্ম্ম অর্থে প্রকৃতপক্ষে যাহা মানবকে ও মানবসমাজকে ধারণপোষণ করে; যাহার ফলে মানবসমাজ উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়, তাহাই ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য,

সুনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনীতিও মানবসমাজকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর করিতে পারে; সুতরাং রাষ্ট্রনীতিও পত্রিকায় আলোচনার অবিষয় নহে। তথাপি আমরা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি যে, নানা কারণে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক মতামত প্রকাশ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে, ধর্ম্মনীতির মূল তত্ত্ব ধরিয়া একথা আমরা বলিতে বাধ্য যে, সকল দেশের সকল জাতিরই রাষ্ট্রনীতির চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত— সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল। কিন্তু এই পথে চলিতে গেলে কি প্রকার উপায় অবলম্বন করা উচিত, কোন্ পন্থা ধরিতে হইবে, সোপানের পর সোপান ধরিয়া উঠিতে হইবে অথবা একেবারেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উপায় ধরা হইবে, ধীরপন্থী হইতে হইবে অথবা বীরপন্থী বা বিপ্লবপন্থী হইতে হইবে, এ সকল বিষয় আমরা রাষ্ট্রনীতিতে অভিজ্ঞদিগের হস্তে মীমংসা করিয়া স্থির করিবার ভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। কেবল লর্ড আরউইনের ঘোষণাপত্র দেশের স্বাধীনতালাভের পথে একটা সুপ্রশস্ত সোপান বলিয়া ঘোষিত ও গৃহীত হইয়াছে। আমরাও যখন এই দেশের এক অংশ, তখন সে বিষয়ে কিছুই না বলিয়া সম্পূর্ণ নীরব থাকা সঙ্গত মনে করি না। এতদিন উহা লইয়া মহা বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল, আমরা সে বাদবিতণ্ডায় নামিতে ইচ্ছা না করিয়া চুপ করিয়া ছিলাম। এখন দ্বন্দ্ববিবাদের spirit অনেকটা থামিয়া গিয়াছে। এবং সম্প্রতি স্বনামধন্য ব্যারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী Statesman কাগজে এ বিষয়ে একটী সুন্দর নিরপেক্ষ পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন,—আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে ঘোষণাপত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত করাইতেছি।

TO THE EDITOR OF THE "STATESMAN."

SIR—I shall try to review briefly the constitutional significance of the Viceroy's recent pronouncement without any political passion or prejudice and purely from a constitutional point of view. The party controversy that has been raised in England and in less degree in this country for political purposes has to a great extent served to cloud the real issues in the minds of the lay public and it may serve some useful purpose to clarify the same.

The declaration of the Viceroy so far as it relates to the attainment of Dominion Status by India is in no sense a new declaration of policy. The Declaration of August 1917 and the preamble to the Government of India Act of 1919 admits of no other interpretation from the constitutional point of view. It is said that Sir Malcolm Hailey in his speech in the Legislative Assembly on the 8th of February 1924 in connection with Mr. Rangachariar's resolution for expediting the appointment of a Royal Commission for securing to India full self-governing Dominion Status gave a different interpretation to the Declaration of 1917. No donbt Sir Malcolm Hailey suggested that the term responsible government did not necessarily imply "full Dominion status." But he at the same time referred to the Royal Warrant of Instructions which stated "thus will India be fitted to take her place among the other Dominions." He admitted also that "it may be that full Dominion Self-Government is the logical outcome of responsible government, nay, it may be the inevitavle and historical development of responsible government, but it is further and a final step." Thus it will be seen that he did not question that the implication of the Declaration of 1917 was Dominion Status for India. It has to be remembered that he was then Lord Reading's Home Member and must have said so with his concurrence.

The Royal Warrant of Instructions to the Governor-General assigns to India a place amongst the Dominions. Sir Malcolm Hailey refers to it and Lord Irwin says that his Instrument of Instructions expressly says so. In this connection I may point out that what is understood in constitutional law by Dominion Status is nowhere stated or provided for in the Statutes relating to the constitution of Canada, New Zealand or even Australia or south Africa but has to be gathered from the Instruments of Instructions that have been issued from time to time to the respective Governors General.

It was proclaimed to the world at the

conclusion of the Treaty of Versailles in 1919 that Self-Government had been conferred on India and that she should be a signatory to the Treaty like the other Dominions and Lord Sinha signed it as her plenipotentiary. It was on a similar representation that India was made an original member of the Assembly of the League of Nations. Since 1919 Indian representatives have been summoned to the Imperial Conference which purports to assign a place to India amongst the Dominions. Both Sir Malcolm Hailey and Lord Reading have overlooked these facts.

I think that by the declarations, proclamations and pronouncements Britain is pledged to assign Dominion Status to India. So Lord Parmoor is absolutely correct in saying that Lord Irwin with the concurience of the present Government reaffirmed that pledge and Mr. Wedgewood Benn in maintaining that he has but reaffirmed Mr. Montagu's policy. Mr. Baldwin also states that the grant of responsible Government means equality with other States in the Empire. He says "nobody dreamt of Self-Governing India without Self-Governing States."

Sir Malcolm Hailey next proceeded to point out the difficulties that stood in the way of our attainment of the Dominion status. These were, he said, principly (1) that India is not yet in a position to organise her self-defence; (2) that India shall have to reconcile her communal differences; (3) that she will have to adjust the Dominion status for India to the existing relationship between British India and the states under Indian rulers.

It is not my purpose to solve the problems. But it is admitted on all hands that these problems will have to be solved in laying the foundation and in the course of the consolidation of a Commonwealth for India. The Nehru Report is not merely a reply to the challenge of Lord Birkenhead but also to Lord Reading's policy as interpreted by Sir Malcolm Hailey.

The Congress suggested a Round Table Conference for framing a suitable constitution for India.

The Viceroy has now announced that the result of his mission to England has been that the Prime Minister, the Secretary of state and the British Cabinet with the concurrence of the President of the statutory Royal Commission have agreed, that after the reports of the Commission and the Central Committee have been published and considered, a conferance would be called "in which His Majesty's Government should meet representatives, both of British India and of the states, for the purpose of seeking the greatest possible measure of agreement for final proposal which it would later be the duty of His Majesty's Government to submit to Parliament." This is the more important part of the Viceroy's pronouncement. Not a word of dissent has been uttered regarding it by either the commission or any political party in England. Should the Conference be of a representative character and should it be able to arrive at a reasonably common measure of agreement the present Government is pledged to submit to Parliament and the Parliamenet will, surely, give statutory effect to such an agreed constitution as it did in the case of Canada and Australia.—Yours, etc.,

J. CHAUDHURI.

STATESMAN 13. 11. 29

Ballygunge, Nov. 9.

পত্রিকাপরিচয়।

অর্চ্চনা—অগ্রহায়ণ ১৩২৬—"তরু দত্তের যুগ" প্রবন্ধটী আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। কুমারী তরু দত্তের সময়ের ভাব বেশ একটু ফুটাইয়াছে। "সংগ্রহ ও সংকলনে" আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা হইতে "স্বাস্থ্য-বিধি" উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। দেশীয় ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার উপর যতই প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল।

গৃহস্থমঙ্গল—কার্ত্তিক ১৩৩৬—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত "মনুষ্যত্বের বিকাশে প্রকৃত শিক্ষা" উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। প্রকৃত শিক্ষাবিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। "টোটকা চিকিৎসা"য়

অনেকগুলি পরীক্ষিত ভাল ঔষধের সংগ্রহ দেওয়া হইয়াছে। "নিউমোনিয়ার শুশ্রূষা শিক্ষা"র বক্তব্য বিষয় খুব সহজবোধ্য করিয়া লেখা হইয়াছে। নিউমোনিয়া রোগে বুকে পিটে পেঁয়াজের পুল্টিস বড় উপকারী—ডবল নিউমোনিয়া সারিতে দেখিয়াছি। আমাকে ইহা একজন হাকিম বলিয়াছিলেন। "গরুর খাদ্য" প্রবন্ধে দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য লিখিয়া গৃহস্থের বড়ই উপকার করিয়াছেন। আমরা পরীক্ষা করিব মনে করিতেছি। "চট্টগ্রাম বন্দরের শিল্পে" কয়েকটী শিল্প প্রচলিত আছে বলা হইয়াছে। কথা হইতেছে, এখনও আমাদের দেশের ধনীরা ব্যবসায়ে নামিতে চান না, মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র লোকেরাই চান। কাজেই, দরিদ্রগণ বিনা পয়সায় কোন্ ব্যবসায়ে নামিতে পারেন এবং কি ভাবে নামিলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহাই একটু বিস্তৃত ভাবে লিখিলে দেশের উপকার হইতে পারে। "আবর্জ্জনার ব্যবহার" বড়ই সুন্দর লাগিল। লেখকের পরামর্শমত দেশের লোকেরা কি আবর্জ্জনার সদ্ব্যবহার করিতে উদ্যোক্ত হইবেন? "বেকার সমস্যার চাষ" প্রবন্ধে চাষ অলসের কাজ নয়, ফাঁকির কাজ নয়, মূর্খের কাজ নয়, বলা হইয়াছে; ইহা সত্য কথা, খুব সত্য কথা। আমরা চাই যে একরাশ গল্পে ভরা কাগজের বদলে গৃহস্থমঙ্গলের মত কাগজ পল্লীবাসীমাত্রেরই হস্তগত হউক।

ব্যবসা ও বাণিজ্য—কার্ত্তিক ১৩৩৬—"রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত প্রণালী" এবং "নারিকেলের কাতা প্রস্তুতের ব্যবসায়" প্রবন্ধ দুইটী ধারাবাহিক চলিতেছে; দুইটিই সহজ ভাবে সুবোধ্য ভাষায় লেখা হইতেছে। উদ্যোগী পুরুষ ইহা দেখিয়া ব্যবসায়ে নামিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। "বিবিধ প্রসঙ্গে" "সমাজে শুভলক্ষণ" পরিচ্ছেদে মেদিনীপুরের কোন লেডি ডাক্তার (বিধবা রমণী) সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণের মেলামেশা উপলক্ষ্য করিয়া সম্বাদপত্রে এক পত্র কে একজন প্রকাশ করিয়াছিলেন। কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়া কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি বলিতে পারি না। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক ব্রণসন্ধানী মক্ষিকার ন্যায় লোকের দোষই খুঁজিয়া বেড়ায়; অনেক সময় দোষ না থাকিলেও দোষ create করে। Miss Mayoর নাম দিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী drain inspector; এই সকল দোষসন্ধানী তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া মনে হয় না। এই ব্যবসায় অতি ঘৃণিত কাপুরুষের ব্যবসায়। "স্বচ্ছ সাবান" সুলিখিত। বর্ত্তমানে যাঁহারা এই সকল ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা একটু সঙ্ঘবদ্ধ হইলে ভাল হয় মনে করি। "পল্লীপশুর ক্ষতরোগ" গৃহস্থের বড়ই কাজে আসিবে। "কয়লার খনির অবস্থা" আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আমরা শুধু দীর্ঘ নিশ্বাসই ফেলিব—দুর্ব্বলস্য বলং রোদনং। "বেল" প্রবন্ধে বেলের গুণাগুণ লিখিত হইয়াছে। বেল আগে ইংরাজদের মধ্যে চলিত ছিল না। Bengal Chemical হইতে বেলের সার প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে থাকিলে, শুনিয়াছি, বেল supplementary British Pharmacopeaতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এখন বিলাতী "বেলের জ্যাম" আমরা দোকানে চলিতে দেখিয়াছি। দেশের লোকেরা কি তাহাতে হাত দিতে পারেন না? আমাদের দেশের দোষ এই যে, প্রথম প্রথম আমরা সযত্নে জিনিস তৈরী করি, কিন্তু পরে আমরা সেরকম মনোযোগ দিই না, কাজেই standard নামিয়া যায়। বিলাতী জিনিসের standard একই থাকে, কারণ যত্নে সমস্ত প্রস্তুত হয়। এই দিকে দেশীয় manufacturersদিগের দৃষ্টি থাকিলে ভাল হয়।

বর্ত্তমানে দেশের অনেক পত্রিকাই সুপরিচালিত হইতেছে। যতদূর সাধ্য সেই সকল পত্রিকায় ভাল বিষয় কি আছে, জানাইবার উদ্দেশ্যেই আমরা এই detailed সমালোচনা করি—আশাকরি ইহাতে পাঠকদের জানিবার সুবিধা হয় যে, কোন্ কাগজে কি ভাল বিষয় বাহির হইতেছে।

হোমিওপ্যাথিক পরিচারক—অক্টোবর ও নবেম্বর ১৯২৯—অন্ত্রাবরোধ সম্বন্ধে আমি হোমিওপ্যাথির সফলতা সম্বন্ধে দৃঢ় সাক্ষ্য দিতে পারি। আমার এক নিকট-আত্মীয়ার শিশু কন্যা পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে অন্ত্রাবরোধ উপস্থিত হয়। তাহার যন্ত্রণা কি ভীষণ, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে উপলব্ধি হইতে পারে না। প্রথমেই আমরা ব্যস্ত হইয়া অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইলাম। ডাক্তারগণ বলিলেন, অবিলম্বে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হোক, নতুবা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রাণসংশয়। তখন আমরা আশা ছাড়িয়া দিয়া সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাক্তার অমরনাথ মুখার্জ্জি মহাশয়কে ডাকাইয়া চিকিৎসা করাইলাম। তাঁহার সুচিকিৎসার গুণে শিশু আরোগ্যলাভ করিল। এই রোগের চিকিৎসায় ঔষধ খাওয়াইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ঘি যথেষ্ট মালিস করা হইয়াছিল, তাহারও বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলাম। "বিসূচিকা" প্রবন্ধে লেখক ডাঃ শরচ্চন্দ্র ঘোষ একস্থানে লিখিতেছেন "ভোগ্য ও পানীয় দ্রব্যের সহিত রোগবীজাণু উদরস্থ হইলেই এই রোগ জন্মে"। আমরা তখন ছাত্র। তখন সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম বলিয়া

৺সুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর

মনে হয় যে, বোম্বাই হাসপাতালের অন্যতর চিকিৎসক ডাঃ হাফকিন এই কথার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য এক কলেরা রোগীর মল ইচ্ছাপূর্ব্বক উদরস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফলে তিনি ঐ রোগে পড়েন নাই। লেখক এবিষয়ে গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ভাল করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার ফল প্রকাশ করিলে সুখী হই। এই প্রকার অনুসন্ধানই বিশেষজ্ঞদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এই রোগ নিবারণ করিতে গেলে পল্লীবাসীদের শিক্ষা আবশ্যক। কোন পল্লীতে কলেরা হইলে গৃহাদি পরিষ্কার করা প্রভৃতি উপায়ে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা দূরে থাক, কেবল ওলাবিবির পূজা দিবারই মহা ধুম পড়িয়া যায়। "আদর্শ প্রশ্নোত্তরমালা"র আকারে সাইলিসিয়ার প্রয়োগ ব্যক্ত করিলে পাঠকদের মাথায় ঠিক বসিয়া যায় কি না বলিতে পারি না। আমাদের মনে হয় Key to Therapeutics যেভাবে লেখা হয়, সেইভাবে এরূপ বিষয় লিখিত হইলে বেশী সহজবোধ্য হইতে পারে। "নবপ্রসূত শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসা" সম্পূর্ণ হইলে পল্লীবাসীর বিশেষ উপকারে আসিবে। "সম্পাদকীয় বিচারশক্তির পরবর্ত্তী অধ্যায়" দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম। আমি দোষাদোষ বিচার করিতেছি না। প্রাণে বড় ব্যথা পাই যখন দেখি, আমাদের দেশবাসীরা বিবাদকলহে, এমন কি চিকিৎসার professional ক্ষেত্রেও এতটুকুও বিবাদকলহে প্রবৃত্ত হন। আমাদের মতে "সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" মন্ত্র গ্রহণ করিলে সত্য নিজের শক্তিতেই প্রকাশ পাইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব—১লা অগ্রহায়ণ ১৩৩৬—"মধুরস্বভাব কেশবচন্দ্র" প্রবন্ধে লেখক কেশবচন্দ্রের মধুর স্বভাবের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আমাদের বাড়ীতে আমরা বাল্যাবধি তাঁহার মধুর স্বভাবের অনেক কথা শুনিয়া আসিয়াছি।

সুধীন্দ্রনাথের পরলোকগমনে

(শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

(শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সৌম্য-মূর্ত্তি সুধীন্দ্রনাথ আর ইহজগতে নাই। যাঁর সঙ্গে শৈশব থেকে মনের মিল, যাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেম, তিনি সহসা আজ আমাদের ছেড়ে কেমন সহজে ইহলোকের ঝঞ্ঝা থেকে অবসর নিলেন। খুব অল্প বয়স থেকে ভাইদের মধ্যে তাঁর হৃদয় আমার অন্তরকে আকর্ষণ করেছিল। শৈশবে এক ক্লাসে আমরা উভয়ে পড়তেম—আমাদের প্রথম হাতেখড়ি হয় বিদ্যাসাগর ইস্কুলের এ, বি, সির ক্লাসে।

তার পরে ইস্কুলের দিক দিয়ে ধরিতে গেলে আমরা দুজনে দুই পৃথক লাইনে চলে গেলাম—তিনি রহিলেন Metropolitanকে ধ'রে, আর আমি সংস্কৃত কলেজে চলে এলাম। কিন্তু শৈশবের সেই প্রথম টান আমাদের জীবন থেকে কখনও বিলুপ্ত হয় নি।

বাল্যকালের একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে। 'বাগান-খেলা' আমাদের একটা প্রধান সখের খেলা ছিল। বাড়ীর ভিতরের বাগানে এক একটা plot বা অংশ নিয়ে বাড়ীর যত ছেলেদের বাগান-খেলা হ'ত। সুধীদাদাতে ও আমাতে বাগানের একটা প্লট নিয়ে একসঙ্গে বাগান করেছিলেম। আমাদের সঙ্গে যোগে ছিলেন বিজয় কাকা। সে বাগানে আমরা নিজেরাই মালী, আবার নিজেরাই engineer বা রাজমিস্ত্রী যাই বল। বাগানে একটা ছোটখাটো দোতালা বাড়ীও করেছিলেম আমরা। সেই বাগানে যেদিন বাটী হয়, সেদিন আমাদের কি আনন্দ !

শৈশবের খেলাধুলা অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক বয়সে গতি ফিরিয়ে দেয়; আমাদেরও তাই হয়েছিল। ষোল-সতের বৎসর বয়স থেকে আমাদের বাড়ীর ছেলেদের অধিকাংশেরই মাথা সাহিত্যচর্চ্চার দিকে ধাবিত হয়েছিল। সেই সময় থেকে মাসিক-পত্রে লেখা ও মাসিক-পত্র বাহির করা একটা জীবনের উচ্চ আশা ছিল। এই সময়ে সুধীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে ও উদ্যোগে যোড়াসাঁকোর বাড়ী থেকে 'সাধনা' নাম্নী পত্রিকাখানি বাহির হয়। যোড়াসাঁকোর চিরপালিতা 'ভারতী' তখন স্বর্ণপিসিমার হাতে পড়ে' অন্য জায়গা থেকে প্রকাশ হ'ত।

'সাধনা' পত্রিকা বাহির হবার প্রায় সমসাময়িক কাল থেকে আমাদের বাড়ীতে 'ভাই-বোন সমিতি', 'সুহৃদসমিতি' প্রভৃতি কয়েকটী সমিতি চলতে লেগেছিল। এই সব সমিতির প্রধানতঃ চালক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।

এক-এক জন লোকের এক-এক রকমের বিশেষত্ব থাকে। সুধীন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল জন-প্রিয়তায়। যে তাঁর সঙ্গে একবার মিলত, সে তাঁর বন্ধু না হ'য়ে যেত না। তাঁর আলাপের মিষ্টতায়, তাঁর নম্রতায় ও মিশুক ভাবটীতে সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে যেতো। সে সময়ে এমন কোন বড়লোক ছিলেন না, যিনি সুধীবাবুর আলাপ-পরিচয়ে মুগ্ধ না হ'তেন।

এস্থলে সুধীন্দ্রের আরো কয়েকটী গুণের কথা না বলে' থাকতে পারিনে। ভগবানের প্রতি এরূপ একনিষ্ঠতা অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। ভগবানের

প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের বলে তিনি সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত সহজে সহ্য করতেন; বাহির হ'তে দেখলে তাঁর মনের ভাব কেহ ধরতেই পারতো না।

তাঁহার পিতা আধুনিক বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ দর্শন আলোচনায় চিরজীবন অতিবাহিত করে' গেছেন। দার্শনিকেরা যেমন হ'য়ে থাকেন, সংসারে ছেলেপিলেরা যে কে কোথায় কি ভাবে আছে, কে কি কষ্ট ভোগ করছে, কি উপায়ে তাহা দূর করা যেতে পারে—সে ভাবই তাঁর মনে স্থান পেত না। সেই কারণে সুধীন্দ্রনাথকে তাঁর জীবনে অনেক সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তাহা মুখ ফুটে কখনও কাহাকে বলেন নি—চিরদিন মনের কথা মনেই চেপে রেখেছিলেন।

পরকে আঘাত দিতে সুধীন্দ্রনাথের এত কষ্ট হ'ত যে, সেই কারণে তিনি ওকালতী করা ছেড়ে দিয়েছিলেন;—তিনি বলতেন যে, "পরকে কষ্ট দিয়ে ওকালতীর দ্বারা টাকা নেওয়া আমার চলবে না।" এই কারণেই নিজেদের জমীদারীর ভার অন্যের উপর অর্পণ করে দিয়েছিলেন; প্রজাদের কাছ থেকে বলপূর্ব্বক খাজনা আদায় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

ছেলেদের প্রতি তাঁর ভালবাসা উৎস-ধারার মত স্বতই প্রবাহিত হ'ত; সেই কারণে বাড়ীর ছোট ছেলেরা তাঁকে সকলেই ভাল বাসত—সকলের আগে ছেলেরা সুধীদাদার কাছে যেতে চাইত।

মোটামুটি তাঁর অহংরোগ ছিল না বল্লেই হয়। গুরু নানক বলেছেন—

"নানক হঁওমে রোগ বুরে"

অর্থাৎ "অহংরোগ সকল রোগের চেয়ে খারাপ।" এই কারণে সুধীন্দ্র পাগলদের অত ভাল বাসতেন; পাগল যারা, তাদের ভিতরে অহং বলে' কোন পদার্থ নেই।

'সাধনা'র সম্পাদক ব্যতীত সাহিত্যজগতে সুধীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বড় কম নয়। তাঁর কবিতা ও গল্পগুলি কুসুমের মত মনোরম ও সৌরভে পূর্ণ। যে তাঁর গল্প পড়েছে, সে তাঁর প্রশংসা না করে' যায় নাই।

জীবনের শেষ ভাগে তিনি মেলামেশা বা সাহিত্য থেকে যেন অবসর লয়ে' নির্জ্জনতা অবলম্বন করেছিলেন, কতকটা যেন সন্ন্যাস অবলম্বনের মত। ইচ্ছা করলে সাহিত্যজগৎকে তিনি আরো অনেক সামগ্রী দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন বোধ হয়।

ভগবানের ইচ্ছাই সর্ব্বময়; তিনি যাঁকে যে ভাবে লয়ে' যান—যার চক্র যে ভাবে ঘুরিয়ে দেন, সে সেই ভাবেই চলে। আমরা কি?—কিছুই নয়—তিনিই সব। তাঁকে ভগবান যখন নিয়েছেন, আমাদের তাতে হাত কি? ভাল করে' তাঁকে ধর—তিনিই শোক তাপ সব দূর করবেন। জীবনের অন্তিম কালে মৃত্যুসময়ের যে জ্বালাযন্ত্রণা, ভগবানের মধুহস্তে তাহা প্রশমিত হবে—বায়ু জল প্রভৃতি প্রকৃতির সকলই মধুময় হবে।

এসো আমরা সকলে সমবেত হ'য়ে আজ মৃত আত্মার কল্যাণার্থ ভগবানের মধু নাম স্মরণ করি—তাঁর মধুর নামগানে আমাদের সকল দুঃখযন্ত্রণা শোকতাপ দূর হবে।

"ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।"

পত্র*।

এ সি ব্যানার্জী আই ই এস্
এম এ (ক্যানট্যাব্) এম্ এস্ সি (কলিকাতা)
এফ্ আর এ এস্ (লণ্ডন)
জ্ঞান কুটীর—এলাহাবাদ

তাং ২৯এ অক্টোবর, সন্ ১৯২৯ সাল।

মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্র:—

শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আপনি কি আপনার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি মুদ্রিত করিবেন? পাঠকবর্গের মধ্যে এই প্রশ্নগুলির সত্যাসত্য সম্বন্ধে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের যে কেহ আপনার পত্রিকায় ঐগুলির উত্তর দিলে আমি বিশেষ বাধিত হইব। ইহা সুনিশ্চিত যে প্রত্যেক ব্রাহ্মই এই বিষয় জানিতে ইচ্ছুক বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও কর্ম্মীর যেরূপ অভাব তাহাতে আমাদের সমাজস্থ ব্যক্তির শিক্ষার জন্য পাশ্চাত্য দেশীয় উদারনৈতিক ধর্ম্মসংঘগুলির দ্বারা যে সুখসুবিধা প্রদত্ত হয় তাহা প্রকাশ করিয়া শীঘ্রই আমাদের ঐ সুবিধা লাভ করা উচিত।

প্রশ্নগুলি।

১। মীডভিল থিওলজিকাল স্কলার্শিপের প্রার্থী হিসাবে ব্রাহ্মসমাজ-কমিটী যে যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত করিতেন, সেই স্কলার্শিপ ও ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজের সংবাদ কি? ঐগুলি কি এখনও চলিতেছে?

২। ১৯২৫ সাল হইতে ঐ স্কলার্শিপের প্রার্থী হিসাবে কেহ কি আজ পর্য্যন্ত মনোনীত হইয়াছেন? যদি না হইয়া থাকেন, তবে কি কারণে হন নাই?

৩। ১৯২৬ সালের ব্রাহ্মসমাজ-পত্রিকার শেষ কয়েক সংখ্যায় সেই শেষবার মীডভিলবৃত্তি প্রদানের বিজ্ঞাপন বাহির হয়। সেই বৎসর কাহাকেও মনোনীত

---

* গত সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরাজী পত্রের মর্ম্মানুবাদ।

করা হয় নাই কেন? ১৯২৫ সালে যদি কোন প্রার্থী নির্ব্বাচিত নাই হইয়া থাকে, তবে পরের কোন বৎসরেই আর ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই কেন?

৪। ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর শেষ সভা কোন্ তারিখে হইয়াছিল? সেই উপলক্ষে তিন সমাজের সভাগণই কি উপস্থিত ছিলেন? যাহাতে তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে কি ঠিক সময়ে জানান হইয়াছিল?

৫। প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস, ডাক্তার এফ সি সাউথওয়ার্ড প্রমুখ মীডভিল স্কুলের ট্রাষ্টিগণ (trustees) ১৯২৬ সাল হইতে ভারতপরিভ্রমণ করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মসমাজ কমিটী কি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইরূপ বৃত্তির অনুষ্ঠানপত্রাদির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন? যদি নাই করিয়া থাকেন তবে মীডভিল ট্রাষ্টিদিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজ-কমিটীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা না করার জন্য দায়ী কে?

৬। ব্রাহ্মসমাজ-কমিটীর অপর কার্য্যাবলীর মধ্যে বিভিন্ন সমাজের ভিতর সখ্যতা স্থাপন করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য ... ...। শতবার্ষিক উৎসব যাহাতে মিলিতভাবে সম্ভব হয় তাহার জন্য কমিটী কি কিছু করিয়াছিলেন? যদি কিছু নাই করা হইয়া থাকে তবে কি কারণে ইহা করা হয় নাই?

THE ALL-INDIA THEISTIC CONFERENCE.

Lahore, December 1, 1929.

The thirty-first session of the All-India Theistic Conference will be held at Lahore on the 29th December 1929 and the following days according to the programme given herewith. Ramananda Chatterji Esqr. M. A., Editor of *the Modern Review* has been elected President and we expect many prominent members of the Brahma and Prarthana Samajes will take part in the proceedings. Besides there will be a *Convention of Religions* to which distinguished representatives of various religious have been invited to speak on "the Place of Religion in the National Life." A number of Theistic leaders will also deliver addresses on the message of Theism. There will be devotional meetings, and discussion on vital problems of the Brahma and Prarthana Samajes and how they can organize themselves more effectively for the moral, spiritual and social regenaration of India, and for the service of humanity and promote the brotherhood of man. An appeal was sent to all the Theistsc organisations in India to send delegates, and to halp the Conference by money. The response is encouraging, but unless all the Samajes and organisations lend their active support it will be difficult to make the Conference a success. We therefore earnestly appeal to all the Brahma and Prarthana Samajes, and to the friends of liberal religion for their support in every possible way.

The delegates will have to pay a delegation fee of Rs. 2/-each, and Rs. 1/- will be charged per day as diet money for an adult, anb 8 as. for a child under 12 years. An early intimation about the number of delegates and nature of accommodation required will greatly facilitate arrengements. Lahore will be veay cold during the Chrismas Week, so the visitors will do well to come with sufficient quantity of warm clothing, quilts and blankets.

Office: Noor Cottage,
McLeod Road,
Lahore.

RAGHUNATH SAHAI, *Chairman*
U. N. BALL, *Secretary,*
(Mrs.) P. BALL. *Treasurer.*

Programme.

Thursday the 26th December, 1929

9 A. M. Opening service in the Brahma Mandir.
10 A. M. Subjects Committee.
2-30 P. M. *Convention of Religions* in Lajpat Nagar.

Friday, the 27th Dec, 1929

9 A. M. Divine service.
9 30 A.M. Conference Meeting.
5 P. M. Addresses by the Chairman of the Reception Committee and the President.

Saturday, the 28th Dec. 1929

9 A. M. Divine service.
9 30 A M. Conference Meeting.
5 P. M. Addresses by distinguished persons on the message of Thesm (Brahma Dharma).

Sunday, the 29th Dec, 1929

9 A. M. Divine service in English in the Brahma Mandir.
10 A. M. Conference Meeting.
5 P. M. Divine service in Hindi in the Brahma Mandir.

গার্হস্থ্যসংবাদ।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১লা অগ্রহায়ণ রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকার সময় ৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীমান স্বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক আদিব্রাহ্ম-সমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথভবনে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ঋতেন্দ্রবাবু শ্রাদ্ধসভায় সুধীন্দ্রনাথের জীবনী সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত রচনা পাঠ করেন। উহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। শ্রীইন্দিরা দেবী কয়েকটী সময়োচিত সঙ্গীত করেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, এবং সর্ব্বশেষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

চতুর্থাহ শ্রাদ্ধ—গত ১০ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ঘটিকায় ৺অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চতুর্থী-ক্রিয়া তদীয়া কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীকণিকা দেবী পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথভবনে যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনাপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২০শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ঘটিকার সময় ৺অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীমান অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-ভবনে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শয্যাসনাদি ষোড়শদ্রব্য দানানন্তর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় উপদেশাদি প্রদান করেন। শ্রাদ্ধের আদি অন্তে ও মধ্যে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুগম্ভীর কণ্ঠে তিনটী ব্রহ্মকীর্ত্তন করিয়া সভার উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আনন্দদান করিয়াছিলেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল এবং সর্ব্বশেষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

শোক-সংবাদ।

৺অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্বর্গীয় ৺দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র অরুণেন্দ্রনাথ বিগত ১০ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার প্রাতে ৮॥ ঘটিকায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুসময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ একে একে মহর্ষিপরিবার হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই অরুণেন্দ্রনাথের এই আকস্মিক মৃত্যু। অরুণেন্দ্রনাথ নিরীহপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র অজীন্দ্রনাথকে রাখিয়া গিয়াছেন। পরম পিতা তাঁহার উদারক্রোড়ে পরলোকগত আত্মাকে স্থান দান করুন ইহাই আমাদের কাতর প্রার্থনা।

স্বর্গীয় পণ্ডিত শঙ্করনাথ—গত ২৮শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা প্রায় ৬ ঘটিকার সময় স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শঙ্করনাথ তাঁহার ভবানীপুরের ৬৫নং শম্ভুনাথ পাণ্ডিত-ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যু-কালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। আবাল্যই ইনি একেশ্বরবাদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। যৌবনে ইনি স্বামী দয়ানন্দের ভাবধারার সহিত যুক্ত হইয়া বঙ্গ-দেশে আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু তাহারই সেবায় প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে পণ্ডিত শঙ্করনাথ বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনাপূর্ব্বক তাহার ফলস্বরূপ ইংরাজী বাংলা ও হিন্দীভাষায় অনেকগুলি সুচিন্তিত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত শঙ্করনাথের ন্যায় এমন উদারহৃদয় সাহসী ও সরলভাষী লোক এযুগে বড় অল্প দেখা যায়। তাঁহার সহিত আমাদের বহুদিনের সৌহার্দ্দ। কোন শুভ কার্য্যে চিরদিনই তাঁহার অকপট সাহায্য ও সহায়তা লাভ করিয়া আসিয়াছি। আজ তাঁহার মত বন্ধুকে হারাইয়া সত্যই আমাদিগকে অনেকখানি অসহায় মনে করিতেছি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহার অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধে ভূষিত হইয়াছে। ভগবান তাঁহার পুণ্যময় উন্নত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় দান এবং শোকার্ত্ত সন্তান শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য পরিজনগণের অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

মাতৃ-মঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬। আবার কবে ?

জননী আমার! মনে পড়ে, ছেলে বেলায় ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর ছোট ছোট ঢেউয়ের মত একটী একটী করিয়া কত আশা কত বাসনা প্রাণের উপকূলে আসিয়া লাগিত আর সরিয়া যাইত। আর মনে পড়ে, সেই সমস্ত আশা ও বাসনা তোমাকে না জানাইলে প্রাণ তৃপ্তি লাভ করিত না। তোমার কোলেতে মাথা রাখিয়া সেই সমস্ত আশা-বাসনা কত আবোল-তাবোল ভাষায় তোমাকে জানাইতাম। সে সমস্ত শুনিবার লোক তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ ছিল না। আমার প্রাণের সেই সমস্ত ছোট ছোট আশা-ভরসার কথা, ছোট ছোট দুঃখবেদনার কথা আধ আধ ভাষায় বলা শুনিতে তুমিও বড় ভাল বাসিতে। আমার প্রাণের সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশাভরসার কথা শুনিয়া, সফল হৌক বলিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া কতই না আশীর্ব্বাদ করিতে। আবার, আমার দুঃখবেদনার কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে তোমার স্নেহ হস্ত বুলাইয়া কি আশ্চর্য্য যাদুমন্ত্রে সেই সমস্ত ব্যথা নিমেষের মধ্যে নিঃশেষে দূর করিতে। তুমি আমার মুখের উপর তোমার কি যে করুণ স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে, আর আমিও তোমার মুখের দিকে কি যে আশ্চর্য্য নয়নে চাহিতাম, তাহা জানি না; জানিলেও বলিতে পারি না। আজ সংসারচক্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া আমার প্রাণ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—কবে আবার বালকের মত, শিশুর মত তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িব, আর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটার যে সমস্ত বিষম আঘাত লাগিয়াছে, তাহা দেখাইব—কবে আবার সর্ব্বাঙ্গে তোমার বেদনানাশন স্নেহ-হস্তের স্পর্শসুখ অনুভব করিব ?

৭। নিবেদন।

জননী আমার! জীবনের সন্ধ্যাকালে তো আসিয়া পৌঁছয়াছি। এই সন্ধ্যাকালে আজ অনেক দিন যাবৎ তোমাকে প্রাণ ভরিয়া শতকণ্ঠে মা—মা বলিয়া বারবার ডাকিবার ইচ্ছা হইতেছে। এই আঁধার ঘরে আমার সঙ্গী কেহ নাই—সঙ্গী একমাত্র তুমি—তুমি আর আমি—সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—প্রকৃতি সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। এই নিঝুম প্রকৃতির সুষুপ্তির স্পর্শে আমারও প্রাণের সমস্ত বাসনা, সকল আশানিরাশা, সমস্ত

সুখদুঃখের দ্বন্দ্ববিবাদ, বৃথা তরঙ্গকোলাহল থামিয়া গিয়াছে। তোমার চরণে আমি আমার মনপ্রাণ সমস্তই নিবেদন করিয়া দিলাম। তুমি যে আমার কি রকম মা, কাহাকেই বা তাহা বোঝাই? তুমি আমার মা—ইহা ব্যতীত আর তো কিছুই আমার বলিবার নাই—আর কিছুই আমি জানি না। একবার তোমায় প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতে দাও। আমি জানি—আমি তোমার বড়ই দুষ্ট সন্তান; কিন্তু আমি তোমার সন্তান তো বটে। আমি খেলা করিতে করিতে তোমার বিনা আদেশেই তোমা হইতে কত না দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। স্বীকার করি, আমার খুবই অপরাধ হইয়াছে; কিন্তু মা আমার! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি আমাকে এত দিন না দেখিয়া কেমন করিয়া স্থির ছিলে?

৮। ক্ষমাপ্রার্থী।

মা আমার! তোমার হারা ছেলে তাহার শত অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া তোমার চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কত দিন—কত দীর্ঘ দিন, তোমা হইতে সরিয়া গিয়া কত অপরাধই না করিয়াছি। শাস্তিও তাহার জন্য যথেষ্ট ভোগ করিয়াছি। একবার তুমি চাহিয়া দেখ—দেহের কোথাও আর বাকী নাই—সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দেহ ছিঁড়িয়া গিয়া রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। মা! হারা সন্তানকে পাইয়া তোমার আনন্দ হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু হারা মাকে পাইয়া আমি তো আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছি। বারেকের জন্য, মুহূর্ত্তের জন্য একবার আমাকে কোলে তুলিয়া লও। তোমায় ছাড়িয়া আর আমি মুহূর্ত্তের জন্যও সরিয়া থাকিব না—আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। আর আমি কিছুই চাহি না—কেবল তোমার চরণ প্রাণের মধ্যে বুকের মাঝে ধরিয়া রাখিতে চাই। জননী! এবার যদি তোমা হইতে দৈবক্রমেও দূরে সরিয়া পড়ি, তবে কঠোর শাস্তি দিও; শাস্তি দিও, কিন্তু তোমার চরণতলে ফিরাইয়া আনিও। তোমার নিকট যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, সে সমস্ত যখন স্মৃতিপথে জাগিয়া ওঠে, তখন আমাতে আর আমি থাকি না। তখন দুঃখশোক বিষাদনিরানন্দ উদ্বেলিত হইয়া মনপ্রাণের দুইকূল ছাপাইয়া উঠিয়া তোমার চরণে আছড়াইয়া পড়ে। যেমন অপরাধ করিয়াছি, তেমনি মা, প্রাণ ভরিয়া অশ্রুধারায় তোমার চরণ ধুইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছি। আমার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া আর বেশী শাস্তি দিও না। তোমার উপেক্ষাদৃষ্টি আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমাকে কোলে তুলিয়া লও—উপেক্ষাদৃষ্টিতে আমাকে দগ্ধ করিও না।

আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী।

[গত ৩০ সেপ্টেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে বিবৃত]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শিবনাথ বাবুর স্মৃতিসভা উপলক্ষে যখন নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম, তখনই আমি শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সেই সভায় উপস্থিত হইব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম। সেই সভায় আমাকে যে কিছু বলিতে হইবে তাহা আমি ভাবি নাই, কারণ নিমন্ত্রণপত্রে দেখি যে শাস্ত্রী মহাশয়ের গুণকীর্ত্তনের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরই নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে বক্তারূপে স্থির করা হইয়াছে। অবশেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি—ডাঃ হেমচন্দ্র সরকার আমার গৃহে আসিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিসভায় কিছু বলিবার জন্য আমাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। আমি অবশ্য উপস্থিত বক্তা নই বলিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম। কিন্তু তিনি নাছোড়বন্দা—আমাকে কিছুতেই অব্যাহতি দিলেন না। অগত্যা উপস্থিতমতে যাহা আমার প্রাণে আসে, তাহাই বলিতে আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম।

আমার স্বীকার করিবার অন্যতর বিশেষ কারণ এই যে, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইতে চাই যে, আচার্য্য শিবনাথ শুধু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোক ছিলেন না। আমি অন্তত আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি যে, তিনি সমগ্র ব্রাহ্মসমাজেরই লোক ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগঠনকালে, হইতে পারে যে, তাঁহার অন্তরে সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁহার জীবনের শেষাশেষি তিনি সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। একবার ব্রাহ্মসমাজের দলাদলি লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার কথালাপ হইতেছিল। আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। সে সময়ে 'নব্যভারত'-পত্রে সাধারণসমাজের বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল। ঐ পত্রের সম্পাদক শ্রদ্ধা-

ভাজন দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সাধারণসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী পৃথক সঙ্ঘ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া মহর্ষি শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন—'তোমাদের মধ্যে তো দেখিতেছি, পঞ্চাশটা দল হইতে চলিল'; তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন—'পঞ্চাশটা দল কেন, চৌষট্টিটা দল হইতে চলিয়াছে'। তখন আমি সবেমাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়া মহর্ষির অনুমতিক্রমে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। সুতরাং আমি ঔৎসুক্য সহকারেই মহর্ষির সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের কথালাপ শুনিতেছিলাম। সেই কথালাপ শুনিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে, শাস্ত্রী মহাশয় নিজেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা পছন্দ করিতেন না।

তিনি অক্লান্তকর্ম্মা ছিলেন। আমার সহিত যে অবধি তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়াছিল, সে অবধি তো তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দেখিলাম না। তিনি ব্রাহ্মদিগকে সর্ব্বদাই বলিতেন—কাজ করিতে হইবে, কাজ করিতে হইবে। তাঁহার কর্ম্মশীলতার সর্ব্বপ্রথম পরিচয় পাই বাল্যকালে—আমার বয়স তখন ৬ বৎসর মাত্র। আমি তখন সংস্কৃত কলেজের নিম্ন শ্রেণীতে পড়ি। শিক্ষকগণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত 'সমদর্শী' কাগজ নিয়মিতরূপে কিনিয়া আনিয়া আমাদিগকে শুনাইতেন যে তাহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল প্রবন্ধ ধরিয়াই বলিতে গেলে শিবনাথ বাবুর সহিত প্রথম পরিচিত হই। ঐ সমদর্শী পত্রে তখন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন দলের শিবনাথ বাবুর নেতৃত্বে সংগ্রামের বিষয়ে প্রবন্ধসকল অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশিত হইতেছিল। সেই সকল প্রবন্ধ শুনিয়া শিবনাথ বাবু যে কিপ্রকার শক্ত সাংগ্রামিক (tough fighter) ছিলেন, তাহা অস্ফুটভাবে আমার অন্তরে প্রতিভাত হইয়াছিল।

তাঁহার কর্ম্মশীলতার অলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। কেশবচন্দ্রের সহিত মতভেদের কারণে স্বমতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে কয়েকজন স্বাধীনচেতা বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক সমাজ সংস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, আচার্য্য শিবনাথ তাঁহাদেরই অন্যতর অগ্রণী। শিবনাথ শাস্ত্রীর সাহায্য না পাইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যত শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তত শীঘ্র কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। বোধ হয়, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আচার্য্য শিবনাথের অক্ষয় কীর্ত্তি। শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণসমাজের প্রাণ ছিলেন। তিনি ইহাকে শুধু প্রতিষ্ঠিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু ইহাকে শক্তিমান করিবার জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মসমাজ কিরূপে প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারে; ব্রাহ্মগণ কিরূপে নামেমাত্র ব্রাহ্ম না হইয়া প্রকৃত ব্রহ্মোপাসকের উপযুক্ত পরব্রহ্মে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনরূপ উপাসনার পথে আপনাদিগকে পরিচালিত করিতে অভ্যস্ত হইতে পারেন; কিরূপে ব্রাহ্মেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পরস্পরকে সত্যধর্ম্ম সাধনে অগ্রসর হইবার পথে সাহায্য করিতে পারেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিণত বয়সে ইহাই বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। আমি জানি, সাধনাশ্রম স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে তিনি এই বিষয়ের চিন্তায় সর্ব্বদাই কিরূপ নিমগ্ন থাকিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকটে এবিষয়ে তাঁহাকে কয়েকবার আশীর্ব্বাদ ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে শুনিয়াছি। তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার ফলেই এই সাধনাশ্রমের জন্ম। উৎসবের সময় এই সাধনাশ্রমকে আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ দেখিয়া আমি অনেকবার কত-না আনন্দ লাভ করিয়াছি।

শাস্ত্রী মহাশয়ের যে শিক্ষা দীক্ষা ছিল, তাহাতে ইচ্ছা করিলে তিনি স্বচ্ছন্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইতে পারিতেন। সেকালে তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিও সহজেই ঐ পদ লাভ করিতেন। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইলেই গবর্ণমেণ্টের চাকরী পাইবার প্রচুর সম্ভাবনা হইত। আচার্য্য শিবনাথ তো এম্-এ শ্রেণীতে সংস্কৃতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী পাওয়া কত সহজ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তিনি সেরূপ কোন চাকরীর প্রার্থী হন নাই। তিনি ভগবানের আহ্বান অন্তরে শুনিয়াছিলেন, এবং সেই আহ্বানেরই উত্তরে সাড়া দিয়া ভগবানেরই অধীনে কর্ম্ম করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন।

কেবল কতকগুলি বড় বড় কার্য্যেই যে তাঁহার মহাপুরুষত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা নহে। বড় বড় কাজে বড় বড় চেষ্টা আসা অনেকেরই পক্ষে স্বাভাবিক। দেশের যখন বড় বিপদ; দেশের ঘাড়ে চাপিয়া বিদেশীরা যখন দলে দলে আসিয়া রক্তশোষণের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করে, তখন নেপোলিয়নের মত লোকের আত্মশক্তি প্রকাশ করিয়া মহাপুরুষের আসন গ্রহণ করা কিছু আশ্চর্য্য নহে। রুষিয়ার মত দেশে সম্রাট যখন পদে পদে প্রজাদের স্বাধীনতা নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করেন; পদে পদে লোকের স্বাধীন চিন্তার নিশ্বাস রোধ করিয়া তাহাকে উৎপাটিত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পান, তখন

তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহার মন্ত্রগুরুকে হত্যা করিয়া বা সেই চেষ্টায় নিজের জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়া লোকদৃষ্টিতে মহাপুরুষরূপে দাঁড়ানো বড় বেশী কঠিন নহে। কিন্তু প্রকৃত মহাপুরুষত্ব প্রকাশ পায় মানুষের ছোটখাটো কাজে—যেখানে লোকের দৃষ্টি পড়ে না; যেখানে লোকের হাততালি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষের মহাপুরুষত্ব প্রকাশ পায় আত্মার সেই বীরত্বে—যে বীরত্বের বলে তিনি ভুলভ্রান্তি স্বীকার করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার শতবিধ কার্য্যের জন্য মহাপুরুষের আসন গ্রহণের অধিকারী হইতে পারেন এবং হইয়াছিলেন। কিন্তু আমার অন্তরে তাঁহার জন্য মহাপুরুষের আসন তখনই বিছাইয়া দিই, যখন দেখি যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ যখন অপবাদ দিলেন যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিলেও তদুপযোগী কার্য্য করেন না, তখন তিনি নিন্দা বা প্রশংসার প্রতি দৃকপাত না করিয়া, স্বাভাবিক বিনয়গুণে সে দোষ স্বীকার করিয়া আপনাকে "সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমহজ্জনা-মনস্তাপবিশিষ্ট" বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। সেইরূপ শাস্ত্রী মহাশয়েরও অনেক ছোট ছোট কাজে তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম। পার্কষ্ট্রীটে মহর্ষির অবস্থানকালে শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে যে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়াছিলেন, তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। ইহা জানা কথা যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পদানুসরণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের উপাসনাপ্রণালী হইতে বৈদিক বা অন্যান্য শাস্ত্রের সংস্কৃত মন্ত্রের ব্যবহার নির্বাসিত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের নানাস্থানে পর্য্যটনের ফলে বুঝিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত মন্ত্র সম্পূর্ণ বর্জ্জন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অন্যতর গুরুতর পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার পরলোক গমনের পূর্ব্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হইত। দেখা হইলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়েই নানা কথালাপ হইত; এবং কথা পড়িলেই তিনি প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেন—"ক্ষিতীন্দ্রবাবু, আমরা সংস্কৃত ছাড়িয়া দিয়া কি যে ভুল করিয়াছি, এখন তাহা বুঝিতেছি'। আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট সাধারণব্রাহ্মসমাজের নেতা আচার্য্য শিবনাথের নির্ভীকভাবে ভুল স্বীকারেই আমি তাঁহার মহাপ্রাণতা উপলব্ধি করিতাম।

ধর্ম্ম—প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে তিনি অন্তরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আচার্য্য শিবনাথ হৃদয়ের এই নির্ভীকতার পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে কৌস্তুভমণির মত অন্তরে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মন্ত্র পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যোগসাধনে তাঁহার অচল আস্থা ছিল। তিনি এই যোগসাধনমূলক উপাসনায় তরুণ ব্রাহ্মদিগের অনাস্থায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরিবারে তিনি এই বিধান বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, প্রাতে উপাসনা না করিয়া কেহই জলস্পর্শ করিবে না।

প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা করিবার সার্থকতা বিষয়ে একদিন তিনি কথায়-কথায় মহর্ষিকে একটী সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন। 'অনেকে বলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রার্থনা প্রভৃতির যথাযুক্ত সাড়া পান না এবং সেই কারণে উপাসনার প্রকৃত কোন মূল্য আছে বলিয়া ভাবিতে পারেন না। কিন্তু সেটী ভুল। সকল সময়েই যে আমরা ভগবানকে ডাকার মত ডাকিতে পারি তাহা নহে, সুতরাং সকল সময়েই যে ভগবানের নিকট হইতে আমাদের প্রার্থনার সাড়া পাওয়া যাইবে, এমন আশা করাও যায় না। প্রার্থনা করিতে-করিতে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধনমূলক উপাসনায় অভ্যস্ত হইলে যথাসময়ে আত্মাতে যে সাড়া পাওয়া যাইবে; তাঁহার প্রেমের যে বন্যায় আত্মার ঊষরভূমি ভাসিয়া যাইবে সেই এক সাড়াতেই, সেই এক বন্যাতেই সমস্ত জীবন উর্ব্বর হইয়া উঠিবে, শস্যশ্যামল হইয়া উঠিবে, ধন্য হইবে।' ইহারই অনুকূলে শাস্ত্রী মহাশয় একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিলেন। 'পাশ্চমাঞ্চলে অনেক নদীপথ আছে; সেগুলি গ্রীষ্মকালে জলশূন্য অবস্থায় কেবল বালুচররূপে দেখা যায়। সেগুলি গ্রীষ্মকালে জলে পূর্ণ থাকে না বলিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রস্বামী কৃষকেরা যদি সেগুলিকে সমান করিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রের সহিত একসমান করিয়া লয়, তবে তাহার ফল হইবে ঐ কৃষকদেরই সর্ব্বনাশ—যথাসময়ে বর্ষাকালে যখন পর্ব্বত হইতে খরবেগে জলস্রোত নামিয়া আসিবে, তখন সে স্রোত বাহির হইবার উপযুক্ত পথ না পাইয়া সমস্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া বহিয়া যাইবে এবং তাহার পরিণামে ক্ষেত্রগুলি বালিতে ভরিয়া গিয়া অনুর্ব্বর হইয়া পড়িবে; কিন্তু সেই স্রোত বাহির হইবার পথ অব্যাহত থাকিলে যথাসময়ে তাহা জলে ভরিয়া উঠিত, এবং সেই জল লইয়া কৃষকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রের উন্নতিসাধনে সক্ষম হইত।' মহর্ষি শাস্ত্রীমহাশয়ের এই কথা ও দৃষ্টান্ত শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই স্থলে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ যোগমূলক উপাসনার সফলতা বিষয়ে একটা গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। পূজ্যপাদ জ্যেঠামহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের বিলাত যাত্রার পূর্ব্ব রাত্রে পূজ্যপাদ পিতামহদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গৃহে উপাসনা করেন। সেই উপাসনায় তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য যেমন নিয়মিত অন্ন আহার করা আবশ্যক, সেইরূপ উপাসনাকে আত্মার অন্ন জানিয়া প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিতে কখনই বিরত হইবে না।' আমি সত্যেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছি যে, সেই উপদেশ তিনি অন্তরে ধারণ করিয়া একটী দিনও উপাসনা করিতে বিরত হন নাই; তাহার ফলে তিনি বিলাতের শতবিধ প্রলোভনের হস্ত হইতে নিজের চরিত্রকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা জানি, মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে যখন অজ্ঞান হওয়ায় নিতান্তই অক্ষম হইয়া পড়িলেন তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা করিয়া আসিয়াছিলেন।

আজকাল তরুণসমাজের অনেকেই, ব্রাহ্ম বা অব্রাহ্ম, উপাসনার সার্থকতা স্বীকার করা তো দূরের কথা, জীবনের কোনও বিভাগেই ধর্ম্মের সম্পর্ক রাখার ঔচিত্যই স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা স্বীকার করুন বা নাই করুন, আসলে তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিলাতী ভাবে নিতান্তই ডুবিয়া গিয়াছে; তাই তাঁহারা দাসভাবে অনুভাবিত হইয়া বিলাতী ফ্যাষনের বশবর্ত্তী হইয়া ঢাকঢোল-পিটুনিওয়ালা বিলাতী সম্প্রদায়বিশেষের শতচর্ব্বিত উক্তির উদ্গার করিয়া প্রকাশ করিতে চান যে, তাঁহারা এক নবতর মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং দেশের মঙ্গলের জন্য তাহা প্রচার করিতে যত্নবান হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের মহা ভুল। জীবনের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক রাখা উচিত নয়; এই তত্ত্ব সম্প্রতি রুষিয়া তুরস্ক প্রভৃতি কয়েকটী দেশে পরীক্ষাধীন আছে—তাহার ফলাফল ও পরিণাম এখনও জানা গিয়াছে বলা যায় না। এই অবস্থায় আমরা ঐ অজ্ঞাতপরিণাম তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতে পারি না। বরঞ্চ বিষ্ণুশর্ম্মার কথিত ও বহুলপরীক্ষিত সত্য হিতোপদেশ অনুসারে এইপ্রকার আশ্রয় গ্রহণ করা ভয়াবহ বলিয়াই মনে করি।

আর, ঐসকল দেশের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান-বিষয়ক ক্রিয়াকলাপ আমরা যতটুক সম্বাদপত্রে পড়িয়াছি, তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, ঐ অভিযান প্রকৃত সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে নহে, কিন্তু প্রচলিত সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্মসমূহেরই বিরুদ্ধে। যে ধর্ম্ম দেশে গুরুবাদ, পুরোহিতপ্রাধান্য স্থাপিত করিয়া দেশকে অন্তঃসারশূন্য করিতে বসে; যে ধর্ম্ম দেশের অন্তরে স্বভাবত পচ আনয়নের বিষয়ে এবং তাহার অপরিহার্য্য পরিণাম পরাধীনতার পঙ্কিল স্রোত দেশের সর্ব্বত্র আনয়নের বিষয়ে সহায়তা করে; এবং যে ধর্ম্মের পরিণামে জাতি শতবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত না হইয়া যাইতে পারে না, ঐ সকল দেশ সেই সমস্ত সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্মেরই বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা জানা কথা যে, রুষিয়াতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হইতে প্রসূত অতিরিক্ত গুরুবাদই তাহার সম্রাট-পরিবারকে পরাধীনতার চাপে চাপিয়া নিহত করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ধর্ম্মের নামে তুরস্কের সুলতানের অস্বাভাবিক প্রধান্যের ফলে দেশে যে দুর্নীতিমূলক অনাচারের স্রোত চলিয়াছিল এবং পরাধীনতা সমগ্র দেশকে যে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহারই প্রতিবাদকল্পে বর্ত্তমান তুরস্কপতি ঐ ধর্ম্মের মধ্য হইতে উপধর্ম্মের আগাছা বিনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

প্রকৃত সত্যধর্ম্ম মানবের অন্তরের বস্তু। বাহিরের শত চাপেও তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া নির্ম্মূল করিবার ক্ষমতা কাহারও আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। হয়তো কিছুকালের জন্য তাহা অপ্রকাশিত থাকিতে পারে; কিন্তু দুইদিন, দশদিন, দুই বৎসর দশ বৎসর বাদে তাহা শত কঠিন বাঁধন ভেদ করিয়াও ফুটিয়া উঠিবে। এই সত্যধর্ম্মের পরিণামে পরাধীনতা আসিতে পারে না, ইহার মূল প্রাণই হইল স্বাধীনতা। ইহার মূল মন্ত্র হইল—মূল বিষয়ে ঐক্য, অবান্তর বিষয়ে পার্থক্যের সম্ভাবনা এবং সকল বিষয়ে উদার দৃষ্টি—Unity in essentials, differece in nonessentials and charity in all।

আমরা যদি সেই মহাপুরুষ আচার্য্য শিবনাথের দৃষ্টান্তে আমাদের জীবনকে উন্নতির পথে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করি, তবেই তাঁহার স্মৃতিসভা সার্থক হইবে। তাঁহার পথে চলিতে গেলে আমাদেরও বীরের ন্যায় সত্যধর্ম্মকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া অন্তরে ধরিয়া রাখিতে হইবে, এবং উপাসনাকে প্রাণের ভিতর একনিষ্ঠ হৃদয়ে বরণ করিতে হইবে।

সকলেই গেছে এগিয়ে।

ভয়রোঁ।

(শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সকলেই চলে গেছে
কতদূরে এগিয়ে—
যেতে হবে সারা পথ,
ভগ্ন মোর মনোরথ
পড়ে আছে না গিয়ে;

রিপুদল আসি চোর
বাঁধি মোরে, মায়া-ডোর
ধরে' আছে বাগিয়ে।
বন্ধন মোচন কর
হে প্রভু করুণাকর!
ভিক্ষা আজি মাগি এ—
দয়ার সাগর যদি
কেন কষ্ট নিরবধি
বল গো কি লাগিয়ে?
যাতনায় পড়ে' থাকি—
প্রভু বলে' সদা ডাকি
সারা-রাতি জাগিয়ে;
ক্ষমা কর সব দোষ
নিতি তব নাম যশ
গাহিবে অভাগী এ।

পারশিক শিল্প

(ডাঃ শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য্য আই ই এস, এম-এ, পি এইচ ডি, ডি-লিট)

সংখ্যায় নগণ্য হইলেও পার্শীরা ধন-সম্পদ, বিদ্যা-বুদ্ধি, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ভারতবহির্ভূত শিখ, রাজপুত, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক জাতি এক্ষণে সর্ব্ববিষয়ে ভারতীয় হইয়াছে। কিন্তু পার্শীরা এখনো নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পারস্যে পার্শীদের সংখ্যা দশ হাজারের বেশী নহে। ভারতে তাহারা প্রথমে সঞ্জন নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তারপর ক্রমশঃ সুরাট, নবসারী ব্রোচ ও কাম্বেতে বাস করিতে আরম্ভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহারা বেশীরভাগ বোম্বাইতে স্থায়ী হইয়া পড়ে। আপাততঃ তাহাদের সংখ্যা প্রায় এক লাখ। তাহাদের ধর্ম্ম নানা নামে পরিচিত। অনুশাসন হিসাবে ইহা দ্বৈত; সৃষ্টিকর্ত্তার নাম অনুসারে ইহাকে মজ্‌দা বলে; পুরোহিতদের সাধারণ নামে ইহা মগী; প্রবর্ত্তকের নামে ইহা জোরষ্ট্রা; এবং প্রত্যক্ষ উপাস্য দেবতার নামে ইহা অগ্নির উপাসনা। ইহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থের নাম জিন্দ আবেস্তা। বস্তুতঃ আদিম নাম আবেস্তাই। জিন্দের অর্থ টীকা বা ভাষ্য, আর আবেস্তার অর্থ অনুশাসন বা আইন। এই গ্রন্থ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বেন্দিদাদ, বিস্‌পেরাদ ও যস্ন নামক তিন অংশ। বেন্দিদাদে ধার্ম্মিক অনুশাসন ও পৌরাণিক গল্প আছে। সকলে একত্র হইয়া বার বার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যাজ্ঞ বা অগ্নির উপাসনার বিধি বিস্পেরাদে দেখিতে পাওয়া যায়। যস্ন নামক অংশেও এরূপ বিধি আছে; কিন্তু এই অংশের বিশেষত্ব ইহার গাথা নামক পঞ্চ মন্ত্রে। এই অংশের সহিত সামগানের সামঞ্জস্য আছে। দ্বিতীয় ভাগের নাম খোর্দ্দা বা ক্ষুদ্র আবেস্তা। ইহাতে ছোট ছোট উপাসনার মন্ত্র আছে, যাহা কেবল পুরোহিতেরাই নহে, সকল পার্শীরাই দিন, মাস বা বৎসরের কোন বিশেষ তিথিতে অগ্নি প্রভৃতি ভৌমিক দেবতার সম্মুখে আবৃত্তি করে। এই সকল উপাসনাও নানা অংশে ও নামে পরিচিত, যথা পঞ্চগা, ত্রিংশ সিরোদা, ত্রি-আফ্রিগাণ ও যড়ন্যায়ী।

প্রাচীন ঐতিহাসিক হেরোডটাসের মতে (১,১২১) পার্শীদের দেবমূর্ত্তি, মন্দির বা উপাসনার বেদী প্রভৃতি কিছুই ছিল না। ইহার কারণ তাহারা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করে না। সেজন্য মন্দিরাদি নির্ম্মাণ তাহারা মূর্খতার কার্য্য বলিয়া মনে করে। শৈলশিখরে জিউস্ বা দ্যোস্ নামে অসীম আকাশের উপাসনা করাই তাহাদের বিধি। একটা প্রবাদ আছে যে পারশিক সম্রাট জরাক্সস্ আথেন্স নগরীর মন্দিরসমূহ জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। রিপবলিক (৩, ৯, ১৪) ও লেগিবস (২, ১০, ২৬) নামক গ্রন্থে সিসেরো ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে ভগবানকে মন্দিরের ভিতর সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার মূর্খতার জন্য শাস্তি দেওয়ার অভিপ্রায়েই জরাক্সস্ গ্রীসীয় মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন। হেরোডটাস্ কিন্তু অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সম্রাট দরিয়াস্ গৌমাতা কর্ত্তৃক বিনষ্ট "মন্দির"সমূহ পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যে অর্থে এইস্থলে 'মন্দির' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা কাহারো মতে 'অয়দন' বা সংস্কৃত 'আয়তন' শব্দের ঠিক অনুবাদ নহে, কেননা 'অয়দন' শব্দের মৌলিক অর্থ 'পবিত্র' বা 'উপাসনা'র স্থান মাত্র।

মন্দিরের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না তাহা সত্য। কিন্তু অগ্নির উপাসনার জন্য শৈলশিখরে বেদীর অনুরূপ স্থান ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কেননা উপাসনা-ভাবাপন্ন সম্রাট দারিয়াসের মূর্ত্তি শৈল-সমাধিগাত্রে ছিল। অন্য এক সম্রাটের এরূপ একটি মূর্ত্তি অলিকসুন্দরের পরবর্ত্তী যুগের এক মুদ্রাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। ডিউলফয় সুসা নামক রাজধানীর সমতল ভূমিতে ধ্বংসাবশিষ্ট গৃহের বর্ণনায় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈনদের মন্দিরের অনুরূপ কিছুই বুঝায় না। তাহা আতেশ-গা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই আতেশ-গা শৈলশিখরস্থ তিনটি

শৃঙ্গ-বিশিষ্ট বেদীর সমষ্টি। ইহার সহিত অবরোহণের জন্য স্তম্ভযুক্ত সোপানশ্রেণী নির্ম্মিত হইত। পার্শিপলির নানা হর্ম্ম্যের প্রাচীরস্থ ছবিতে ও পারস্যের সর্ব্বত্র এরূপ আতেশ-গার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত।

মন্দিরের অবর্ত্তমানে দেবদেবীর মূর্ত্তি পারস্যে থাকিতেই পারে না। বস্তুতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে য়োকাম্ অনিহিতের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া বেরোসস্ যে সাক্ষ্য দিয়াছেন পারস্যে তাহার কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। নেন্দিদাদ সদাতে মূর্ত্তির যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই অনিহিতের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের একমাত্র প্রমাণ হইতে পারে। রাজপ্রাসাদের অলঙ্করণ রূপেও কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্লুটারক্ রচিত অলিকসুন্দরের জীবনীতে (অঃ ৩৭) দেখিতে পাওয়া যায় যে অলিকসুন্দর যখন বিজয়ীরূপে পারস্যের প্রাচীন রাজধানীতে প্রবেশ করেন তাঁহার সৈন্যেরা সম্রাট জরাক্সসারের মূর্ত্তি পদচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক পেরট প্রভৃতির মতে জরাক্সসের মূর্ত্তির কোনই সম্ভাবনা ছিল না। পক্ষান্তরে আসেরিয়া ও পার্শীপলী প্রভৃতির ন্যায় এই স্থলেও জরাক্সসের ছবিই ছিল, মূর্ত্তি নয়। পাসর গদিতে বিধ্বংস প্রাপ্ত সাইরসের মূর্ত্তিই পারস্যের আদিম মূর্ত্তির একমাত্র চিহ্ন। সম্রাটদের ন্যায় সৈনিক, পরিচারক ও সিংহ প্রভৃতির ছবিতেও দেখিতে পাওয়া যায় পারশিক শিল্পীদের নৈপুণ্য মোটেই ছিল না। যুদ্ধ প্রভৃতি চিত্রেও ছবির আড়ষ্ট ভাব সর্ব্বত্র চিত্রকরের ত্রুটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীনকালে মন্দিরশিল্প ও স্মৃতিসৌধের পরেই শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী প্রাচীর প্রাকার প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ গ্রাম, নগর ও দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা শিল্পীর প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু আলিফসুন্দর যখন পারস্য আক্রমণ করেন তখন সে দেশে কোনরূপ প্রাচীরাবদ্ধ নগর নগরী ছিল না। একবতানা বা সুসা প্রভৃতির চারিদিকেও প্রাচীর দেখা যায় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় প্রাচীন কালেও পারস্যের নগর-নগরী সুশৃঙ্খলভাবে রাখা হইত। স্থূল প্রাচীরাবদ্ধ দুর্গের ভিতরে সম্রাটেরা নিরাপদে নিজেরাও থাকিতে পারিতেন আর ধনরত্নও রক্ষা করিতে পারিতেন। ব্যাবিলোন ও আসিরিয়ার অনুকরণে নির্ম্মিত স্মুর্গা নামক নগরীর বর্ণনা হইতে পারশিক দুর্গের সম্যক নমুনা পাওয়া যাইতে পারে। ইহার বর্ণনায় ডিউলফয় বলিয়াছেন যে ইহার চারিদিকে প্রথমতঃ জলপূর্ণ গভীর ও বিস্তৃত পরিখা ছিল। সৌর ও দ্বিবার্ত্ত প্রাচীরের সহিত ইহার সংযোগ ছিল। প্রথম বা বাহিরের প্রাচীর তেইশ মিটর প্রশস্ত ও বাইশ মিটর উচ্চ এবং কর্কশ ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল। ভিতরের প্রাচীর প্রায় পনেরো মিটর প্রশস্ত ও চারি মিটর গভীর এবং কাঁচা ইটের দ্বারা নির্ম্মিত। এই দুই প্রাচীরের মধ্যেই প্রধান প্রধান হর্ম্ম্যসমূহ নির্ম্মিত হইত।

বাস্তুশিল্পের মধ্যে কোন কোন রাজহর্ম্ম্যের আংশিক বৃত্তান্ত মাত্র পাওয়া যায়। সাধারণ বাসগৃহের কোনরূপ ধ্বংসাবশেষ বা বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পারশিক রাজপ্রাসাদ ঐতিহাসিকেরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, যথা,—খোলা সভাগৃহ, প্রাচীরাবদ্ধ দরবার গৃহ, ও খাসমহল বা বাসোপযোগী প্রাসাদ। একবাতানা সুসা ও পার্শিপলিস প্রভৃতি রাজধানীতেই যে কেবল রাজ-প্রাসাদ ছিল তাহা নয়। শীত-গ্রীষ্মের আতিশয্য নিবারণের জন্য সম্রাটগণ যেখানে যেখানে বৎসরের কয়েকমাস বাস করিতেন সে সকল স্থলেও রাজহর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করা হইত। পালিক্লিটাসের বর্ণনা অনুসারে (ষ্ট্রাবো. ১৫, ৩, ২১) সুসার শৈলশিখরে প্রত্যেক পারশিক সম্রাটই নিজেদের ব্যবহারের জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদ, ধনাগার ও সভাগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এই কথার যাথার্থ্য সন্দেহ করেন। পার্শিপলীর ন্যায় সুসাতেও মনোরম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদ ছিল তাহা সত্য। কিন্তু সুসাতেও সে সকল হর্ম্ম্যের কোনরূপ চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। ইংরাজ ও ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই পর্য্যন্ত সুসার ভূস্তর হইতে ধ্বংসাবশেষের টুকরা ব্যতীত আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

ষ্ট্রাবো (১৫, ৩; ৩, ৭, ৮) ও য়্যারিয়নের (৩; ১৫; ৩; ১০) বর্ণনা অনুসারে সম্রাট সাইরাস্ অস্তি-অগকে পরাজিত করিয়া পাসারগদী নামক রাজধানীতে অনেক প্রাসাদ ও ধনাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা গ্রীসীয়দের পারস্য আক্রমণের সময়েও বর্ত্তমান ছিল। এই সকল সৌধের ধ্বংসাবশেষ মিখেদ-ই-মুরঘাব্ নামক গ্রামে প্রোথিত আছে এরূপ অনুমান করা হয়। আন্দাজ করিয়া তাহাদের যে সকল নক্সা করা হইয়াছে, সে সকল হইতে তাহাদের আকৃতির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রথমতঃ চারিটি স্তম্ভযুক্ত মুখভদ্র বা পৈঠা। ইহার দুই দিকে প্রকোষ্ঠ। তৎপরে এক প্রকাণ্ড শালা বা সভাগৃহ। ইহাকে দুই সারি স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা চারিখণ্ডে ভাগ করা হইয়াছে। এই সকল স্তম্ভের দ্বারাই ছাদ রক্ষিত। কিন্তু স্তম্ভগুলি পার্শিপলী বা সুসার স্তম্ভের ন্যায় বড় নহে। ইহাদের প্রাচীরও জামবিদের তক্তের বেদীর প্রাচীরের ন্যায় গভীর নহে। এই রাজধানীর

'ক্ষুদ্র প্রাসাদ' ও সোলোমনের তক্তের এমন কিছুই নাই, যাহা হইতে সে সকল হর্ম্ম্যের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

পার্শিপলী নামক সুবিখ্যাত রাজধানীর যে যে জায়গায় সম্রাটগণ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই সকল স্থানে আপাততঃ গণ্ডগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বেনামী হর্ম্ম্যগুলির ধ্বংসাবশেষ শোচনীয় অবস্থাপন্ন। রাজ-স্বাক্ষরযুক্ত চারি সম্রাটের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নেহাৎ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। এই চারি প্রকার হর্ম্ম্যের মধ্যে কোন দুইটাই একরূপ নহে। তারপর রাজসভা এবং বাসোপযোগী গৃহ ও প্রকোষ্ঠ প্রভৃতির পদবিন্যাস বা নক্সা ও পরিমাপের সাদৃশ্য বা মিল দেখিতে পাওয়া যায় না।

পার্শিপলীর উদ্ধারপ্রাপ্ত হর্ম্ম্যরাজির মধ্যে একটি বেদী নামে পরিচিত। ইহাতে সম্রাট দারিয়াসের স্বাক্ষর ও শিলালিপি আছে। ইহার সীমা এক প্রদক্ষিণরথ্যা বা গাড়ীর রাস্তা দ্বারা প্রদর্শিত। এই রাস্তা দক্ষিণ মুখের সমতলভূমি হইতে ক্রমশঃ বেদীর উপর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। তারপর এই রাস্তা হর্ম্ম্যের পশ্চাৎ ভাগ দিয়া পাহাড়ের প্রথম ধাপ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অবশেষে পূর্ব্বমুখো হইয়া শিখরস্থ সমতলে গিয়া শেষ হইয়াছে, যেখানে দুইটী সমাধিক্ষেত্র। এই শিখরস্থ সমতলভূমি এক বিখ্যাত সোপানশ্রেণীর সহিত সংযুক্ত। কিন্তু এই শ্রেণীতে একশত এগারটির বেশী সিঁড়ি নাই।

এই বেদী উপর-নীচ হিসাবে চারি সমতল স্তরে বিভক্ত—সর্ব্ব নিম্নস্তর অপরিসর ও নগণ্য। ইহাতে কোনরূপ হর্ম্ম্য কখনও নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় স্তর সমগ্র বেদীর তিন-চতুর্থাংশ স্থান ব্যাপিয়া নির্ম্মিত। ইহার উপরেই প্রোপিলি ও শতস্তম্ভ সভাগৃহ প্রভৃতি প্রধান হর্ম্ম্যরাজী নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রায় তিন মিটর উপরিস্থিত তৃতীয় স্তরেই জরক্সসের চিত্তাকর্ষক প্রাসাদ ও হিপস্টাইল নামক সভাগৃহ এবং দরিয়াসের সুবিখ্যাত প্রাসাদ ছিল। অবশেষে চতুর্থ স্তরের অগ্নিকোণে কোনরূপ এক হর্ম্ম্য ছিল যাহা এক্ষণে আর চিনিতে পারা যায় না।

প্রোপিলী ও হিপস্টাইল নামক সভাগৃহে সম্রাট জরাক্সসের স্বাক্ষর আছে। প্রোপিলীর প্রায় কিছুই বর্ত্তমান নাই। হিপস্টাইল সভাগৃহেরও অধিষ্ঠান ও তদুপরিস্থ স্তম্ভসমূহের মধ্যে তিনটির মাত্র মধ্যভাগ বা বপু দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যে নক্সা করিয়াছেন তাহা হইতে ইহার পূর্ব্ব অবস্থার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। বাহাত্তর স্তম্ভের দ্বারা পরিবেষ্টিত সভাগৃহই ইহার প্রধান সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহার মেজেতে ছত্রিশটি স্তম্ভের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটি চতুরস্র প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ যাহার প্রত্যেক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে তেতাল্লিশ মিটর। ইহার সংলগ্ন আর একটি হর্ম্ম্যের গর্ভের মাত্র দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্যের প্রাচীন হর্ম্ম্যাবলীর মধ্যে এই হিপস্টাইলকে সম্রাজ্ঞী বলা হয় অনেক কারণ বশতঃ। প্রথমতঃ ইহার সোপানশ্রেণী বিস্ময়কর ও বিচিত্র অলঙ্করণে ভূষিত। দ্বিতীয়তঃ ইহার অসাধারণ উচ্চতা। তৃতীয়তঃ ইহার চিত্তাকর্ষক চারি সারি স্তম্ভশ্রেণী। অবশেষে ইহার সুবিস্তীর্ণতা। ইহার অন্তরস্থ জমি উনবিংশ ফেরোয়া নামক মিশরের রাজবংশের সুবিখ্যাত পরিষদ্ গৃহের জমি অপেক্ষা বেশী। সাকল্যে ইহার জমির মাপ প্রায় সাড়ে সাত হাজার বর্গ মিটর।

শত স্তম্ভযুক্ত সুবিখ্যাত সভাগৃহে কোন সম্রাটের স্বাক্ষর নাই। ইহা হিপস্টাইলের পরিবর্দ্ধিত আকার। ইহা এক সমান্তরাল ক্ষেত্র। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ইহার প্রশস্ততা প্রায় ছিয়াত্তর মিটর, এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে দৈর্ঘ্য প্রায় বিরনব্বই মিটর। এক এক সারিতে আটটি, এরূপ দুই সারি স্তম্ভ ইহার প্রত্যেক পার্শ্বেই ছিল। উত্তরদিকে মুখ। ইহার সহিত আরও অনেক প্রকোষ্ঠের সংযোগ ছিল। সমস্ত জমি এক-এক সারিতে দশটি, এরূপ দশশ্রেণী স্তম্ভ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সুরম্য হর্ম্ম্যের প্রায় কিছুই বর্ত্তমান নাই।

পারশিক বাস্তু-শিল্পের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত রাজপ্রাসাদ সকলও একতলাই ছিল, দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতির কোনরূপ সম্ভাবনাই প্রাচীন পারস্যে ছিল না। ফারগুসনের ভুল ধারণা পেরট (পারশিক শিল্প ৩২০, ৩৪১) প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হাস্যাস্পদ মনে করেন। পারস্যের আধুনিক প্রাসাদ ও বাসগৃহসমূহও এক তলাই।

পারস্যের শিল্পসম্পদ কখনও গ্রীস, রোম, মিশর, চীনদেশ বা ভারতবর্ষের শিল্পের সহিত আদৌ তুলনার বিষয় ছিল না। বস্তুতঃ কয়েকটি রাজপ্রাসাদ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কিছুই প্রাচীন পারস্যে নির্ম্মিতই হয় নাই।

কুসংস্কারের প্রভাব।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দেশ-বিদেশে কুসংস্কারের যে কি প্রকারে উৎপত্তি হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে, অনেক সময়ে তাহার কোনই খোঁজ পাওয়া যায় না—কালের গর্ভে তাহার মূল কারণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু মানবসমাজের উপর এখনও কুসংস্কারের যথেষ্ট প্রভাব যে দেখা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সন্ধান করিলে এখনও অনেকগুলি কুসংস্কারের মূল কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পুরীতে জগন্নাথদেবের রথের তলে লোকে আত্মহত্যা করিত। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ইহার মূলে অতিরিক্ত অসংগত ভক্তি। পূর্ব্বে স্পেনদেশে, বাড়ীঘরের আবর্জ্জনা বাড়ীর সম্মুখস্থ সদর রাস্তার ধারে পুরুষ-পরম্পরায় স্তূপাকারে রাখার রীতি ছিল। কেহ কেহ তখন ভয়ে তাহা স্পর্শ করিত না। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ঐ আবর্জ্জনার স্তূপের উপর গৃহের অপদেবতা বসিয়া থাকেন। তাহাদের ভয় ছিল যে, ঐ আসন বিচলিত করিলে অপদেবতার কোপানলে গৃহস্থের ভয়ঙ্কর অকল্যাণ ঘটিবে। বলা বাহুল্য, ইহার মূলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ঐ আবর্জ্জনাস্তূপকে নাড়া-চাড়া দিলে তাহার গন্ধ ও বিষ যে গৃহে ছড়াইয়া পড়িয়া অকল্যাণ আনয়ন করিত, ইহা নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট পরীক্ষিত সত্য ছিল।

আমাদের দেশে সন্তানলাভের উদ্দেশ্যে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন কুসংস্কারের ভীষণ দৃষ্টান্ত। ইহার মূল কোথায় জানি না। যদি কোন তথাকথিত শাস্ত্রের এই অসংগত বিধান হয়, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের কিন্তু এটাকে স্বার্থসিদ্ধির কল্পনামূলক নিছক কুসংস্কার বলিয়া মনে হয়।

আফ্রিকার অনেক দেশে বর্ব্বর জাতিদের মধ্যে সংস্কার আছে যে, বিশেষ লক্ষণযুক্ত নরমাংস অথবা তিথিবিশেষে নরমাংস ভোজন করিলে পরম সুখে চির স্বর্গবাস হয়। এই কুসংস্কারের কারণে ইউরোপীয়গণের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও নরমাংস ভক্ষণের রীতি ঐ সকল জাতির মধ্য হইতে নির্মূল হইয়া উঠিয়া যাইতেছে না। এই রীতির পরিণামে অনেকস্থলে পিতা স্বীয় সন্তানেরও মাংস খাইতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এই কুসংস্কারের মূল স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে বিষম শত্রুতা। তিথিবিশেষে নরমাংস ভক্ষণের মূলে বোধ হয় কোন সুদূর অতীতে সেই দিনে কোন যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকিবে।

আমাদের দেশে কুসংস্কারের প্রভাবের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। বৃহস্পতির বারবেলায় যাওয়া। কি কুক্ষণেই খনার নাম দিয়া এই প্রবচনটী প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল—"যদি পাও রাজ্য দেশ, তবু না যাও বৃহস্পতির শেষ"। এই প্রবাদে তো দেখছি, "দেশ" শব্দের সঙ্গে "শেষ" শব্দের বেশ মিল খাইয়াছে। জানি না, সেই মিলের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে কথাটী সমস্ত হিন্দু জাতির মধ্যে কি না জানি না, কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রাণের খুব গভীর স্তরে শিকড় নামাইয়া বসিয়া আছে। প্রকৃতই অনেক স্থলে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, এই কুসংস্কারে প্রকৃত বিশ্বাসী অনেকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বৃহস্পতির বারবেলায় বাটীর বাহিরে যাইতে স্বীকার করেন নাই। বিশ্বাসী-দিগের মনোভাব দেখাইবার জন্য একটী গল্প বলি। একদিন বৃহস্পতিবার না জানিয়া আমার দুইটী আত্মীয় এই কলিকাতা সহরে বাজার করিতে বাহির হইলেন। তখন শরৎকাল—ভাদ্রমাস। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের ফিরিবার মুখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং বড় রকমের একপসলা বৃষ্টি নামিল। তাঁহারা যখন তাঁহাদের বাড়ী হইতে দুই মিনিটের পথ দূরে, তখন রাস্তায় একহাঁটু জল। কাজেই সেইটুকু পথ আসিতেও তাঁহারা ঠিকা গাড়ীর আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। বাড়ী ফিরিয়া তাঁহারা এমন গুরুতর (!) বিপদের কারণ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা বৃহস্পতিবার বার-বেলাতেই বাহির হওয়ায় এই বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই যে দেশীয়-বিদেশীয় শত সহস্র লক্ষ লোক প্রয়োজন বশত বৃহস্পতিবার বারবেলায় চলাফেরা করিতেছে—কয়জন তাহাদের মধ্যে খানাখন্দে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে? বাঙ্গালী হিন্দুরা শুধু বৃহস্পতিবার বারবেলায় অন্য কোথাও যাওয়া দূরে থাক, সারা বৃহস্পতিবার কোন শুভকর্ম্মেই সহজে নামিতে চায় না!

এই প্রকার শনির শেষ, দিক্‌শূল, ত্র্যহস্পর্শ, হাঁচি টিকটিকি, জাতিবিশেষের মুখদর্শনে যাত্রায় বাধা ইত্যাদি কতবিধ কুসংস্কার যে এদেশে চলিত আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমার এক বন্ধু আমার সম্মুখেই তাঁহার এক উচ্চতম কর্ম্মচারীকে কি এক কার্য্যের উদ্দেশ্যে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে তিনি তাঁহার মনিবকে জানাইলেন যে, এখন শনির শেষ, সুতরাং এখন গেলে তিনি যে কোন কর্ম্ম করিতে বলিবেন, তাহা নিষ্ফল হইবে, সুতরাং তিনি (কর্ম্মচারী) আগামী কল্য সকালেই যাইবেন! এ প্রকার কুসংস্কারের অধীনতা স্বীকার করিবার ফলে আমরা যে কিরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছি ও যাইতেছি, ইহা তাহারই অন্যতর প্রমাণ। তরুণ যুবক—উৎসাহে উদ্যমে

পরিপূর্ণ; কিন্তু যখনই এই প্রকার কুসংস্কারের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হন, তখনই, বিষহর প্রস্তরের নিকট সর্প যেমন নিস্তেজ ভাবে মাথা অবনত করে, সেই যুবকও যেন কেমন একরকম নিস্তেজ হইয়া পড়ে। যুবকেরই বা দোষ দিই কি প্রকারে? বাড়ীতে বাপ-মা হইতে আরম্ভ করিয়া দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলেই যে সর্ব্বদাই ঐ সকল কুসংস্কার মাথায় বসাইয়া দিবার জন্য হাতুড়ি লইয়া বসিয়া আছে! এই সকল কুসংস্কারের বোঝা মাথায় লইয়া আমরা স্বাধীনতাসংগ্রামে অগ্রসর হইব কি প্রকারে, তাহাই ভাবিয়া মরি।

আমার একজন বন্ধু সম্মুখে যোগিনী থাকিতে যাত্রা যে কিছুতেই করা উচিত নহে, তাহা তাঁহার জীবনে অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। আমি সম্মুখে তর্ক করিয়া তাঁহার ঐ কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলাম; তাঁহার পশ্চাতে, বলিতে কি, অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি যোগিনীভীত হইয়া উঠিলাম—কোথাও যাইতে হইবে, প্রথমেই দেখিতাম, যোগিনী কোন্ দিকে। একদিন মনের দৃঢ়তা আনিয়া পঞ্জিকা দেখা ছাড়িয়া দিলাম—প্রাণের উপরে যে কুসংস্কারের বট শিকড় নামাইতেছিল, তাহার শিকড় নামান বন্ধ হইয়া গেল, আমিও বাঁচিলাম।

এই কুসংস্কারের বিভীষিকা অনেকটা ভূতের ভয়ের অনুরূপ। আমরা বাল্যকালে নর্ম্যাল স্কুলে পড়িতে যাইতাম। সেখানে সহপাঠীরা, এমন কি শিক্ষকেরাও ভূতের ভয় দেখাইতেন। সেইখানেই প্রথম শিক্ষা করি যে, ভূতের পা উল্টাদিকে এবং দেবদারু গাছে তাহার বাসা। রামনাম জপিতে থাকিলে তবে ভূত পলায়ন করে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বাড়ীর একধারে একটা দেবদারু গাছ ছিল। সন্ধ্যার পর সেখানে যাইতে গেলে প্রাণ হাতে করিয়া রামনাম জপিতে জপিতেই যাইতাম। সম্ভবত তাহারই ফলে আজ পর্য্যন্ত ভূত আমার ঘাড় ভাঙ্গিতে সাহস করে নাই। আমার পিতৃদেব নিজেও অস্থিবিদ্যা (anatomy) অধ্যয়ন করিতেন এবং আমাদিগকেও বাল্যাবধিই তাহা পড়াইতেন। তাহার জন্য একটা স্ত্রীলোকের কঙ্কাল আমাদের পাঠগৃহে টাঙ্গানো ছিল। এক পার্শ্বে একটা ভাঙ্গা piano ছিল। আমাদের পাঠান্তে সেই ঘরে একজন চাকর শয়ন করিত। সে ভূতের ভয়ে আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইত—যেন মুড়ি দিয়া শুইলে ভূত আর তার ঘাড় ভাঙ্গিতে সাহস করিবে না! সে মাঝে মাঝে প্রায়ই আমাদিগকে বলিত যে, ভূত আসিয়া রাত্রে piano বাজায়। আমরাও ভয়ে সে ঘরে সন্ধ্যার পর সহজে যাইতাম না। অবশেষে কি কারণে সে ঘরে বাধ্য হইয়া গিয়াছিলাম—দেখি, pianoর ভিতর দিয়া এক ইন্দুর বাহির হইয়া আসিল এবং বাহির হইবার কালে pianoর যে যে পরদার উপর দিয়া চলিয়া গেল, সেই সেই পরদা বাজিয়া উঠিল। ভূতের piano বাজাইবার রহস্য ভেদ হইল এবং আমারও ভূতের ভয় বিদূরিত হইল। সেকালে মিটিমিটি প্রদীপ এবং সার্সির ময়লা কাচে সেই প্রদীপের আলোর প্রতিফলন, সর্ব্বোপরি সঙ্গী ও চাকরদাসীর নিকটে শ্রুত ভূতের গল্প এই বিভীষিকা আনয়নে বিশেষ সহায়তা করিত। কিন্তু এখন ইলেকট্রিক আলো সহজে আলাইবার সুবিধা এই বিভীষিকা দূর করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

মঘা-অশ্লেষায় যাত্রানিষেধের কথা কোন্ হিন্দু না জানে? এক সাহেবের মঘা মাথায় করিয়া বাহির হইবার ফলে প্রাণসংশয়ের গল্প বহুল প্রচলিত আছে। একবার আমার কন্যাকে বিদেশ হইতে সত্বর আনা আবশ্যক হইল। আমি দেখিলাম যে, সেদিন অশ্লেষা। অশ্লেষায় যাত্রার ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য এ বিষয়ে কাহাকেও একটী কথাও না বলিয়া আমার কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিলাম। আমার মনও যে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ছিল তাহাও বলিতে পারি না। অবশেষে যখন কর্ম্মচারী কন্যাকে নির্ব্বিঘ্নে আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন তাহাকে মহা আস্ফালনের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাল অশ্লেষায় তুমি যাত্রা করিয়াও তো আজ নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পড়িয়াছ?" তখন সে উত্তর দিল—"মঘা কি অশ্লেষা না জানিয়া গেলে কোনই বিঘ্ন হয় না"! এই দুই নক্ষত্রে যাত্রা পঞ্জিকার লেখা ব্যতীত কেন যে নিষিদ্ধ, তাহার কোন কারণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৩ সংখ্যা এখনও ইউরোপে অশুভসূচক বলিয়া ধরা হয়। ইহারও মূল অজ্ঞাত। যাই হৌক, এই কুসংস্কারের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য আমেরিকায় একটী সভা হইয়াছে বলিয়া সম্বাদপত্রে পড়িয়াছিলাম স্মরণ হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, এক টেবিলে ১৩ জন আহার করিলে তাহাদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই সেই বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু পরলোকগত লর্ড রবার্টস্ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে ১২ জন বন্ধুর সঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে বৎসর মৃত্যুমুখে তো পড়েনই নাই; প্রত্যুত তাঁহারা সকলেই পাঁচ বৎসর বাদে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহে যুদ্ধও করিয়াছিলেন। সে বৎসরও তাঁহাদের মধ্যে কেহই মরেন নাই; প্রত্যুত তাহার ছয় বৎসর বাদে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ ১৩ জনই এক টেবিলে ভোজন করিয়াছিলেন।

বিলাতে আর একটী কুসংস্কার বড়ই প্রবল। লবণ

তুলিতে গিয়া যদি দৈবাৎ চামচ হইতে ছড়াইয়া পড়ে, তবে ভোজনটেবিলে সমাগত ব্যক্তিগণ বড়ই অমঙ্গলের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠেন। বিলাতী ধরণের আহারাদি টেবিলের উপর চাদর পাতিয়া হয়, ইহা সকলেই জানেন। সেই চাদরের উপর লবণ বিক্ষিপ্ত হইলে চাদরখানি নষ্ট হইতে পারে, ইহা ব্যতীত এই কুসংস্কারের আর কোন মুল কারণ তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশেও লবণ সম্বন্ধে একটী কুসংস্কার আছে। একজনের পাতে যে লবণ দেওয়া হয়, তাহা হইতে যদি সে তাহার একটুখানি গ্রহণ করে, তবে সে লবণ হইতে তাহার পুত্রকন্যা কেহই আর কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না, গ্রহণ করিলে প্রথম গ্রহীতার আয়ুক্ষয় হইবে। এই কুসংস্কারের মূল কি জানি না।

এদেশে বেলগাছ ও তুলসী গাছ, উভয়ই পবিত্র—একটী শিবের সহিত সংপৃক্ত, অপরটী বিষ্ণুর সহিত সংপৃক্ত। বেলগাছের পাতা শিবের মস্তকে চড়ানো হয়, এবং তুলসীপত্র বিষ্ণুর পূজায় নিবেদিত হয়। কিন্তু বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্যের বাসা থাকে বলিয়া ভয় দেখানো হয়, তুলসীগাছে তেমন কোনই বিভীষিকার কারণ আছে শোনা যায় না। আমার তো মনে হয় বেলগাছের কাঁটাই এই কুসংস্কারে মূল। রাত্রে বেলগাছের নিকটে কোন সূত্রে গেলে তাহার কাঁটায় দেহখানি ক্ষত-বিক্ষত হইলে যে ব্রহ্মদৈত্যের নখরাঘাতের তীব্র আস্বাদ পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তুলসীতলায় গেলে সেরূপ আঘাত পাইবার কোনই আশঙ্কা নাই—তুলসীগাছ অহিংসা মন্ত্রের প্রতিনিধি।

আমাদের দেশে ধোপার নাম করিলে নাকি ভোজনে বিশেষ ব্যাঘাত পড়ে। একস্থানে খাইতে বসিয়াছি—সেখানে কথায় কথায় দৈবাৎ ধোপার নাম করিলাম। গৃহকর্তা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—"ঐ যাঃ, আপনি যখন ধোপার নাম করিলেন, তখন ভোজনে ব্যাঘাত ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা"। বলা বাহুল্য যে ভোজনে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে নাই। যতদূর জানি, আজ অনেক বৎসর হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার সে কুসংস্কার আজ পর্য্যন্ত তাঁহার মন হইতে দূর হয় নাই। ধোপারা নোংরা কাপড় কাচে, ইহাই এই কুসংস্কারের মূল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলে "ধোপা"র বদলে "রজক" বা "কাপড়-কাচা" ইত্যাদি প্রতিশব্দ ব্যবহার করিলে নাকি কোনই দোষ আসে না—এ ভাব আসিল কিপ্রকারে? এই প্রশ্নের সমাধান তত্ত্বসন্ধানীদিগের গবেষণার জন্য রাখিয়া দিলাম।

দেশ-বিদেশে যতপ্রকার কুসংস্কার আছে, একত্র সংগ্রহ করিলে মন্দ হয় না। আমাদের দেশের লোকেরা কুসংস্কার, ভয় প্রভৃতির এত ভারী বোঝা মাথায় বহন করিয়া চলিতেছে যে, তাহাদের পক্ষে উন্নতির পথে, স্বাধীনতার পথে, মঙ্গলের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অধিবাসীরাও যে এই প্রকার বোঝা বহন করে না তাহা নহে—কিন্তু তাহা এদেশের মত এত ভারী নয় বলিয়া তাহারা ছুটিতে সক্ষম হইতেছে। আসল কথা এই যে, কুসংস্কার তোমাকে যতই অধিকার করিবে; বৃথা বিভীষিকায় তুমি যতই আঁতকাইয়া উঠিবে, ততই তুমি স্বভাবতঃ সকল মঙ্গলের নিদান, স্বাধীনতার উৎস ভগবান হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। সমস্ত কুসংস্কার বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখ এবং কুসংস্কারকে কুসংস্কার জানিয়া নির্ভীক হৃদয়ে পরিত্যাগ কর এবং নির্ভয় হও।

THE

Message of Buddhist India.

(2)

(DHARMA ADITYA DHARMACHARYYA).

The end of this first universal teacher's life meant a fresh impetus to the noble mission which He had entrusted to His disciples. The three, four or five Buddhist Councils held at Rajagriha, Vaisali and other places, gave a difinite shape to His teachings which crystallised into the Tri-pitakas or the Three Baskets. The Pitakas were later on translated into ninety-six languages in ninety-six countries, thus showing the greatest extension of the doctrine. Lately these have been translated into many more languages both in Asia and Europe.

Buddhism was the predominant religion in India in the time of emperors Asoka, Kanishka, till the reign of the last emperor Harshavardhana or Siladitya II in whose time Hiouen Tsang the prince of Chinese pilgrims came to India in the seventh century A. D. After this Buddhism remained prevalent in various provinces. Recent researches show that Buddhism existed in Bengal upto the sixteenth century A. D. It is the advent of western iconoclasts who dealt destruction to the glories of Aryan culture in many parts of India, and the North-West. But the recent ar-

chaeological researches and explorations have brought to light the wide prevalance of Buddhism in India, Afghanistan, and Turkestan. Asoka's stone pillars and stupas extending from Nepal to Mysore prove the wide imperial policy of the Buddhist emperor to spread Dharma or spiritual culture.

The Buddhist universities of Nalanda, Vikramasila, Odantapuri and other places testify to the promotion of Buddhist and allied culture in India. The system of education developed in these institutions may be traced in an almost identical manner in the universities or monastic institutions of Sera, Dhebung, Gaden and Tashilumpo in Tibet even now.

Buddhist culture included all arts and crafts that gave an impetus to the promotion of Buddhism in all its aspects and ramifications and crystallized into what may now be called Buddhist civilization. Medical science, surgery, arts and crafts, and all useful subjects formed the carriculum of Buddhist studies. Chemistry formed an essential part of the Buddhist Tantras which came into prominence in Mahayana Buddhist countries after their introduction particularly from the Buddhist universities of Vikramasila and Odantapuri in Bengal.

Buddhist monks have played a prominent part in the cultural conquest of the world. Since Buddha inaugurated the unique system of sending His disciples to preach in as many directions, Buddhism was introduced into different regions of Asia by Buddhist monks who, selfsacrificing and highly inspired as they were, went to China, Mongolia, Manchuria, Koria, Siam Annam, Tibet, Nepal, Java, Japan, and the Malay Archipelago. The latest discovery has led to the fact that one thousad years before the discovery of America by Columbus, a Buddhist priest from Kabul had gone to China whence he went to Mexico, set up Buddhist temples and started a mission. The recent problem ahead is to identify Buddhism with Maya civilization about which researches are still in a state of progress.

The departure of Santaraksita, the first Buddhist Missionary and of Dipankara from Bengal to Tibet, of Bodhidharma to China from South India, of Mahendra and Sanghamittra to Ceylon, of the Indian monks to Burma, Nepal and other countries give a glorious vision of the part that Buddhist India played in expanding the all enlightening, all-fraternizing culture of Lord Buddha.

So on this momentous occasion connected with the Advent, Buddha-hood, and Decease of Lord Buddha, the message of Buddhist India has some element of truth behind it. The Buddha Day celebration is not a new innovation in the modern history of Buddhism in India. From the records of Hiouen Tsang we learn that upto the seventh century A. D. the Buddha Day was celebrated by princes and people of India and thousands of people used to gather at all the sacred places connected with His life and Teachings. Although the Buddha Day appears to have stopped for some centuries owing to economic chaos and the persecutions that Buddhism underwent, it was observed in all Buddhist countries outside India. The Nepalese, where the descendants of the Sakyas are still predominant in number, called it Vaisakha Swan-ya or Flower Festival, Burma called the month Kason, the Sinhalese called the month Wesak, the Japanese called it Hana Matsuri or Flower Festival, the Tibetans called the Vaisakh month Sakya-dawa. Similarly Buddha Day is observed in all other Buddhist countries according to their national chronology. It is not strange to hear that the Hindus have been holding the Full Moon Day in Kashmere even now. Various societies and organisations have begun to hold it. It appears that about 1891 Rai Sarat Chandra Das Bahadur and the Anagarika Dharmapala introduced this festival in Calcutta itself. Since then various Buddhist societies have been regularly holding the celebration. On behalf of the Nepalese Buddhists resident at Calcutta, who have recently inaugaurated the Buddhist India society, we have decided to hold it on a small scale.

The Message of Buddhist India to the people of India is one of exhortation to

them to understand the oneness of life, superior efficacy of spiritual brotherhood, importance of intercommunal goodwill and unity, strenous self sacrifice in the cause of peace and freedom of India.

Her message to the Buddhist institutions and individuals in India is peace and goodwill and the exhortation for mutual co-operation and understanding the principle of unity as the basis of national strength. This has been lately possible through the all-India Buddhist conference which I have been able to organize.

To the Buddhist countries her message is keen sympathy in their strenuous struggle for spiritual revival and the promotion of spiritual culture. The time is fast nearing for the fruition of the goodwill in the shape of an All-World Buddhist Congress to be held not later than 1932.

To the Buddhists in the west, Buddhist India sends her cordial message of goodwill and fraternity, her assurance of mutual co-operation and sympathy in the endeavour of Western scholars and inquirers to understand Truth in its altruistic aspects. She sends her heart-felt greetings to the trans-atlantic brethren who have taken vigorous measures to understand the mystic or supernormal stages of Buddhist Dhyana.

May all living beings be happy!

আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্ম।

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৩)

ব্যাকরণের সূত্রপাত।

যেমন স্মৃতির উপর দণ্ডায়মান হইয়া গৃহ্যসূত্র ব্রাহ্মণ হইতে স্বতন্ত্র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণের সঙ্গে উহার অল্পই যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি দেখিবে ভাষাবিষয়ক সূত্রসকলও স্বতন্ত্র পত্তনের উপর দণ্ডায়মান। যজ্ঞের মন্ত্র ও গানের যেটুকু সম্বন্ধ তাহাই ব্রাহ্মণে আছে। ব্যাকরণের সূত্রসকল মূলে ব্রাহ্মণের উপরেই নির্ভর করে বটে কিন্তু তারপরে উহা স্বতন্ত্র প্রণালীতে চলিয়া আসিয়াছে। প্রথমে অবশ্য যাগযজ্ঞের সঙ্গে দেবতাদিগকে কিরূপে আহ্বান করিতে হয়, কখন্ কি করিতে হয় তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে ঐ সকল প্রার্থনাসূচক কৃতজ্ঞতাসূচক মন্ত্র যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে, যাহাতে অন্য কিছু না উহার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তাহার উপায় বিহিত হইতে লাগিল। সেইজন্য প্রথমে ছড়ান ঋক্‌গুলা সংহিত করিবার আবশ্যক হইল। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকলের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও পাঠ ঠিক করিতে হইল। এবং তৃতীয়তঃ সেই সকল কাহার দ্বারা রচিত, কি উপলক্ষে রচিত, তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু প্রবাদ সব গ্রন্থবদ্ধ হইল। প্রথম এই সকল রক্ষা করিবার প্রতিই দৃষ্টি গিয়াছিল। পরে অনেক দিন অতীত হইলে যখন বৈদিক ভাষা মৃতপ্রায় হইয়া সংস্কৃত ভাষা বিকাশোন্মুখ হইতে লাগিল, তখন ক্রমে বেদের অর্থ বোধগম্য হওয়া দুরূহ হইতে লাগিল—যত শীঘ্র সাধারণের হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য তাহার অনেক পরে হইয়াছিল—তখনি উহার অর্থকে নিরাপদ এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা পড়িয়া গেল। এই জন্য যাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে দক্ষ, তাঁহারা সব শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—কেবল যে অর্থ বিষয়ে, তাহা নয়; উপাসনা, যাগযজ্ঞের প্রণালী, বেদের অর্থ, তাৎপর্য্য ও দর্শন এ সকল বিষয়েই আলোচনা চলিতে লাগিল। মেয়েরা পর্য্যন্ত এই আলোচনায় যোগ দিলেন। ব্রাহ্মণেরা যে অন্য জাতির নিকটে সম্মানের পদ রক্ষা করিতে পারিলেন তাহার কারণও ইহাই। যত যেখানকার উচ্চভাবের গ্রন্থ দেখিতে পাইবে সবই ব্রাহ্মণদিগের রচিত; কাযে কাযেই কৃতজ্ঞতা ভক্তি সেই শ্রেণীর উপরে গেল। অন্য সকলে বিষয় মত্ত, তাঁহারাই কেবল পরমার্থচিন্তনে রত। ক্ষত্রিয় রাজারাও এই সকল অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। মন যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে ব্রাহ্মণেরা তত উচ্চে উঠিতে ত্রুটি করেন নাই। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত উৎসাহে পূর্ণ হইয়া যে সকল প্রশ্ন ও মত ব্যক্ত করিয়া আপনাদিগের মতের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে পুরুষেরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল; তাহার মধ্যে গার্গীর কথা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ।

এই আলোচনার স্রোতের সময় ভাষাবিষয়ক গবেষণাও বিশেষ উন্নতিসোপানে আরূঢ় হইয়াছিল। বেদের যত শাখা হইয়া পড়িয়াছিল সকল শাখাগুলিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থবদ্ধ করা হইল! আর তাহাদের পাঠনা-প্রণালী এমনি বিধিবদ্ধ করিয়া দিল, যে, তাহার আর নড়চড় হইবার যো নাই। এক এক বেদের এক এক প্রতিশাখ্য করা হইল, তাহাতে সেই সেই বেদের যত রকম শাখা হইয়াছিল সব ধরা হইল। তাহাতে শব্দের উচ্চারণভেদ, উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদ, সন্ধি ইত্যাদি বিষয়সকল বিশেষরূপে বর্ণিত আছে; গুরুর নিকট ছাত্রের শিক্ষার সময়ে যেরূপে রকম রকম করিয়া

পাড়তে হয় তাহাও বর্ণিত আছে। কি যত্নের সহিত যে তাঁহারা বেদকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা ইহার দ্বারা বেশ টের পাওয়া যায়।

বৈদিক ছন্দ ও দেবতা।

বেদের ছন্দপ্রণালী জানিবার জন্যও সূত্রে তাহার বিবরণ রহিয়াছে; তাহার নাম নিদানসূত্র। ঋগ্বেদের আধুনিক ঋকের ভিতরেও কতক কতক ছন্দের নাম আছে। আর প্রতি বেদের অনুক্রমণী আছে, তাহাতে প্রতি সূক্তের রচয়িতা ঋষির, ছন্দের ও উদ্দেশ্য দেবতার নাম বর্ণিত আছে। অনুক্রমণী বোধ হয় সূত্রের পরে রচিত হইয়াছিল—এমন কোন সময়, যখন প্রতি সংহিতার মূল এখন যেরূপ দেখিতে পাই সেইরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং অভ্যাসের সুগমার্থে বড় বড় এবং ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। ক্ষুদ্রতম ভাগ শিষ্যদিগের এক একবারের পাঠ হইত।

বৈদিক প্রবাদ ও গাথা ইতিহাসপুরাণের মূল।

সূক্তরচয়িতাদিগের সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল কেহ কেহ সেই সকল প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ করিলেন; যেমন শৌনকের বৃহদ্দেবতা। ইহা ঋকসংহিতাকে মূল অবলম্বন করিয়া, কেবল দেবতাকে উপলক্ষ করিয়া কোন্ ঋক্ প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই ঋক্ সম্বন্ধে যত রকম প্রবাদ আছে, তাহাই সব বর্ণন করিয়াছে। অবশ্য এই সকল প্রবাদের যেগুলা খুব পুরাণো প্রবাদ তাহা ব্রাহ্মণেতেই আছে; যেমন শুনঃশেফ ঋষির প্রবাদ। বিশেষ বিশেষ পূজাপ্রণালীর প্রবর্ত্তক ঋষিদিগের প্রবাদসকলও ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। এই সকল বিষয়ে ব্রাহ্মণ অনেক সময়ে গাথার উপর নির্দ্দেশ করে, যাহা ইতর লোকদিগের মধ্যে শ্রুতিপরম্পরায় প্রচলিত ছিল। এই সকল গাথা বোধ হয় ইতিহাস-পুরাণের মূল। মহাভারতের মধ্যে দুটা একটা গাথা দেখিতে পাওয়া যায়। শৌনকের বৃহদ্দেবতা যাস্কের নিরুক্তির উপরেই সম্যক অধিষ্ঠিত।

নিঘণ্টু।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে দেবগণের স্তোত্র প্রভৃতির অর্থনির্ণয়ে তখন প্রবৃত্তি হইল, যখন বেদের অর্থ দুরূহ হইয়া পড়িল। ইতর সাধারণের নিকট যত শীঘ্র দুরূহ হইয়াছিল ব্রাহ্মণদিগের নিকট কিছু তত শীঘ্র হয় নাই। যাহা হউক বৈদিক ভাষা তখন অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। অতএব সেই দুরবগম্য স্তোত্রসকল বোধগম্য করিবার জন্য প্রথম উপায় হইল; বেদের যত একার্থবাচক শব্দ তাহাদিগকে সংগ্রহ করা, আর যে শব্দ একেবারে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে তাহাদের অর্থ স্বতন্ত্ররূপে উপদেশ দেওয়া। এইরূপ অভিধানের নাম দিল নিঘণ্টু, অর্থাৎ যত শব্দ আছে সবটা নির্ঘণ্ট করিয়া দিল—সবটা তন্ন তন্ন করিয়া বাহির করিয়া দিল। কোন কোন পণ্ডিত বলেন সবটা নিঃশেষে গাঁথিয়া দিল, এই জন্য 'নিগ্রন্থ'র অপভ্রংশ 'নিঘণ্টু' হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় আমাদিগের নির্ঘণ্ট কথা প্রচলিত আছে। নিঘণ্ট রচয়িতাকে নৈঘণ্টুক বলে। বেদের নিঘণ্টু পঞ্চাধ্যায়ী পুস্তক। ইহার প্রথম তিন অধ্যায়ে সমনামশব্দ, চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেষ দুরূহ বৈদিক শব্দ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে ইন্দ্র মিত্র বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবগণের পর্য্যায় নির্দ্দেশ আছে।

নিরুক্তি।

এই নিঘণ্টুকে সহজ করিবার জন্য, প্রকাশ করিবার জন্য, আবার যাস্ক উহার নিরুক্তি প্রকাশ করিলেন। নিরুক্তি কিনা খুলে বলা—যাহা কিছু বলিবার আছে স্পষ্ট করিয়া ভাঙ্গিয়া বলা। ইহা প্রথমে দ্বাদশ-অধ্যায় ছিল, পরে আর দুই অধ্যায় উহাতে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বেদাঙ্গ।

এই নিরুক্তকে বেদাঙ্গের মধ্যে ধরা হয়। বেদাঙ্গ হইতেছে ছয়টা—"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তশ্ছন্দো জ্যোতিষমিতি"। শিক্ষা হইতেছে বৈদিক সন্ধির নিয়মাদি, কল্প হইতেছে ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা, ব্যাকরণ হইতেছে বাক্যের উৎপত্তি ও নিয়মকে তন্ন তন্ন করিয়া ব্যাকরণ করিয়া ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা, ছন্দ হইতেছে বৈদিক পদ্যের নিয়ম স্থির করা, নিরুক্ত হইতেছে বৈদিক শব্দের বিবরণাদি, জ্যোতিষ বৈদিক ক্রিয়ার কাল নিরূপণ করার ব্যবস্থা। এই ষড়ঙ্গ না জানিলে বেদজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গতা সম্পন্ন হয় না। নিরুক্ত, শিক্ষা, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই শ্রেণীর গ্রন্থমধ্যে বৈদিক সময়ের এক একটী করিয়া চারিটী গ্রন্থ পাওয়া যায়, আর সকল গ্রন্থ লোপ হইয়া গিয়াছে। এই জন্য এই চারিটী বিশেষ গ্রন্থকেই আধুনিকেরা বেদের চারি অঙ্গ বলে। পূর্ব্বে ঐ ঐ শ্রেণীর পুস্তক সকলকে বেদাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত; যেমন ব্যাকরণ। পাণিনির ব্যাকরণকেই যে ব্যাকরণ বলে তাহা নয়, ঐ শ্রেণীর পুস্তকমাত্রকেই ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণের উৎপত্তি।

যাস্কের নিরুক্তিতে আমরা ব্যাকরণের সাধারণ আভাস পাই। প্রতিশাখ্যেতে বেদসংহিতার প্রত্যেক সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে, তাহা হইতে ক্রমে সন্ধির সাধারণ নিয়ম উঠিল—তাহা হইতে ক্রমে আবার ভাষার অন্য অন্য অঙ্গে দৃষ্টি গেল।—যেমন বিভক্তি

প্রত্যয় ধাতু রচনাপ্রণালী প্রভৃতি। যাস্ক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক বৈয়াকরণের বিশেষরূপে নামও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আবার সাধারণরূপে বৈয়াকরণ বা নৈরুক্ত এইরূপও বলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, সে সময়ে শব্দজ্ঞানের খুব চর্চ্চা চলিয়াছিল। কৌষীতকী ব্রাহ্মণের এক স্থান পাঠ করিয়া বেশ বোধ হয়, যে, সে সময়ে হিন্দুস্থানের উত্তরেও বাগবেষণা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত চলিয়াছিল।

পাণিনি।

সেই হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, ব্যাকরণশাস্ত্রের জনকস্বরূপ পাণিনিরও জন্মস্থান। এখন যাস্ককে যদি বৈদিক যুগের শেষ সময়ের ধরিতে হয়, তবে পাণিনির কালকে তাহার বহুপরবর্ত্তী বলিয়া ধরিতে হইবে। যাস্কের সময়ে বাক্যের অনুরূপ শব্দ দ্বারা ব্যাকরণের কথা সকল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, পাণিনির সময়ে অঙ্কের চিহ্নের ন্যায় করিয়া অর্থাৎ সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সেই সব শব্দকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। উহা হইতে ইহাতে আসিতে অনেক কালের আলোচনার আবশ্যক বোধ হয়। পাণিনি নিজেই সেই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন অবলম্বন করিয়া যখন তাঁহার ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, তখন পাণিনির পূর্ব্বেই ঐ সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রচলিত ছিল জানিতে হইবে। তিনি উহার আবিষ্কার করেন নাই, কিন্তু ঐ প্রণালীকে পরিপক্করূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন—যাহা ব্যাকরণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

দর্শন।

ব্রাহ্মণের সমকালে এবং পরে তত্বজ্ঞানের আলোচনা অত্যন্ত উন্নতভাব ধারণ করিয়াছিল। এমন কি ব্যাকরণ ও দর্শনশাস্ত্রে হিন্দুমন নিপুণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে তত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয় অনেক সূক্ত পাওয়া যায়, যাহাতে করিয়া মূল কারণ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা প্রকাশ পায়, যাহাতে করিয়া জানা যাইতেছে, যে ঐ সকল আলোচনা তাহার অনেককাল পূর্ব্ব হইতে আন্দোলিত হইয়া আসিতেছে।

ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সেই খুব পূর্ব্বকালে যখন তত্বজ্ঞানের আলোচনাটা একবার বেশ জ্বলিয়া উঠিল, তখন নানা প্রকার মত, বিশেষতঃ সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক মত প্রবর্ত্তিত হইল। যে সমস্যা (problem) সর্ব্বাপেক্ষা গূঢ় ও কঠিন তাহাই তাহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের হইল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণেই ঐ বিষয়ের এক বা ততোধিক বিবরণ বিবৃত আছে। অনেক গ্রন্থে সৃষ্টিসম্বন্ধে নানা প্রকার মতের অবতারণা আছে, তন্মধ্যে একটা প্রধান মতভেদ স্বভাবত এই দাঁড়াইল, যে, আদি কারণ কে? প্রকৃতি কি পুরুষ—অর্থাৎ জড় কি জ্ঞান? শেষোক্ত মতটাই জয়লাভ করিল, এই জন্য ব্রাহ্মণে এই মতটাই একচেটিয়ারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিপরীত মতটাও যদিও তত সমাদৃত হয় নাই, কিন্তু তথাপি রহিয়া গেল। কালে সেই মত যখন অনুষ্ঠানে পরিণত হইতে আরম্ভ করিল, তখন তাহা বৌদ্ধধর্ম্মে পরিণত হইল।

ষড়্দর্শন।

বৈদিক কালে দর্শনশাস্ত্র প্রণালীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় নাই, পরে যেমন ষড়্দর্শন প্রণালীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উপনিষদে অসম্বদ্ধ মত ও আলোচনা দৃষ্ট হয়। যদিও সেই সকল আলোচনাকে বিশুদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ করিবার রীতি দেখা যায়, তথাপি ঐ সকল অনুসন্ধানের পরিসর অতি পরিমিত। আরণ্যক উপনিষদে প্রণালীবদ্ধ করিবার ও বিস্তার করিবার ভাব অপেক্ষাকৃত বেশী। যে উপনিষদ স্বতন্ত্র দণ্ডায়মান, তাহাতে আরও বেশী। আর, যে উপনিষৎ অথর্ব্ববেদের তাহাতে দার্শনিক প্রণালী সম্যকরূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু আসল যে দর্শনশাস্ত্র, যাহাকে ষড়্দর্শনসূত্র বলে, তাহা যে, ইহার অনেক পরে, তাহা নিম্নলিখিত কারণে বেশ প্রমাণিত হইতেছে। প্রথমত যে সকল ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সে সকলেতেও ষড়্দর্শন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নাম উল্লেখ নাই, যদিও থাকে তাহা অন্য সম্বন্ধে, দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে নয়। দ্বিতীয়ত, ষড়্দর্শনের ভিতর যে সকল ঋষিদিগের উল্লেখ আছে, তাহাদিগের সঙ্গে, শেষাশেষি মাত্র কল্পসূত্র সকলে যে সকল ঋষির নাম করা হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে, আংশিক ঐক্য আছে। তৃতীয়ত সমস্ত ষড়্দর্শন অবিভাগে, সংহিতা ব্রাহ্মণ উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থসমূহকে সমগ্ররূপে একবেদ বলিয়া বলে এবং নির্দ্দেশ করিবার (reference) সময় আমাদিগের নিকট যে সকল উপনিষদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া প্রতীত হয় এমন কি অথর্ব্ববেদের উপনিষৎ সকলকে নির্দ্দেশ করে। আর রচনাপ্রণালীও এমনি অল্পের মধ্যে বহুজ্ঞাপক, আর এত সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা (technicel terms)—যদিও ব্যাকরণের ন্যায় অতদূর অগ্রসর হয় নাই, তথাপি এমন স্পষ্ট ব্যঞ্জক (precision) এবং আদ্যন্তসুন্দর, যে, উহা অনেক পূর্ব্ব হইতে বিশেষরূপে অভ্যাসের বিষয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এইজন্য ইহা বৈদিক কালের পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

জ্যোতিষ।

বৈদিক সাহিত্যের বিষয় বলিতে গেলে জ্যোতিষ ও বৈদ্যশাস্ত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ না বলিয়া শেষ করা যায়

না। যদিও তদানীন্তন কালের এই দুই বিষয়সম্বন্ধীয় স্বতন্ত্র পুস্তক ইদানীন্তন প্রচার নাই। কিন্তু সে সময় ইহার খুব চর্চ্চা ছিল। উভয়ই কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন হইতে প্রথম উচ্ছ্বাস (impulse) প্রাপ্ত হইয়াছিল। কল্পে কল্পে যজ্ঞানুষ্ঠানের কাল নির্ণয়ার্থে, প্রাতঃ ও সন্ধ্যার হোমের জন্য, দর্শপৌর্ণমাসীর জন্য এবং তিন ঋতুর প্রারম্ভে হোমযাগের জন্য, নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক হইত, যদিও তাহা অত্যন্ত সামান্য মাত্র ছিল। বাজসনেয়ি সংহিতাতে এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে নক্ষত্রদর্শকদিগের বিষয় এবং জ্যোতির্বিদ্যার কথা বিশেষ করিয়া বলা আছে। আর চন্দ্রের অষ্টাবিংশ অবস্থানের বিষয় খুব পূর্ব্বে অবগত ছিল। তৈত্তিরিয় সংহিতাতে তাহাদের আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ আছে। যে পরম্পরায় তাহাদের উল্লেখ আছে, সে পরম্পরা ২৭৮০ হইতে ১৮২০ খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্বে থাকিতে পারে; তাহা হইলে তৈত্তিরীয় সংহিতা সেই সময়ের হইবার সম্ভাবনা। —সংহিতা না হউক সেই সকল শ্রুতি। তাহা এখনকার তিন চারি হাজার বৎসরের পূর্ব্বে। জ্যোতি নামক গ্রন্থে যে নক্ষত্রপরম্পরা আছে, তাহা হইতেছে ভরণীশ্রেণী, তাহাতে ১৮২০—৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব বৎসর পাইতেছি; আর আর বিষয়ে বড় একটা উন্নতি দেখিতে পাই না। চন্দ্রের গতি আলোচনা করিতেন, কতকগুলা ধ্রুব তারা, সৌর-অয়ন (solstice), ইহাই কেবল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ।

শারীর সংস্থান তাঁহাদিগের জানিতে হইত, কারণ যজ্ঞে যে সকল পশুবলি হইত, তাহাদিগের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিতে হইত এবং ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে বাটিয়া দিতে হইত। পাশব শরীর-সংস্থান তাঁহাদিগের বিশিষ্টরূপে জানা ছিল, কারণ যখন দেখা যাইতেছে পশুদেহের প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র সংজ্ঞা ছিল।

ভৈষজ্যবিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায় অথর্ব্ববেদে রোগের উপর এবং আরোগ্যকারী উদ্ভিদের উপর প্রশংসাসূচক ঋক্ প্রচারিত আছে, আর বড় কিছু পাওয় যায় না। *

প্রচারক্ষেত্র।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

কুরু-পাঞ্চাল দেশে বুদ্ধের আবির্ভাব-কালেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আধিপত্য কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। উহার পশ্চিমে মথুরা অঞ্চলে বাসুদেবপ্রচারিত ভাগবত ধর্ম্মই সমধিক বলবান। ঐ অঞ্চলের পূর্ব্বসীমা হইতে অঙ্গরাজ্য পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড আজীবক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ স্ব স্ব প্রচার-ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিলেন।

বুদ্ধের প্রচারক্ষেত্র কোশল হইতে অঙ্গ এবং কপিলবস্তু হইতে অবন্তিরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। * তৎকালে এই অঞ্চলের প্রধান রাজ্য ছিল, মগধ, কোশল, লিচ্ছবি, বৎস এবং অবন্তি। † এই পাঁচটি ব্যতীত, শাক্য, কোলিয়, মল্ল প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাজ্যও বিদ্যমান ছিল।

বুদ্ধের সাধনক্ষেত্র মগধের তৎকালীন অধিপতি রাজা বিম্বিসার ছিলেন গুণগ্রাহী রাজা। অগ্নিপূজক কশ্যপ, জৈনধর্ম্মব্যাখ্যাতা মহাবীর স্বামী প্রভৃতি সকল জ্ঞানাচার্য্য-গণই তৎকর্ত্তৃক সমাদৃত হন। বুদ্ধের সহিত মিলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি মহাবীর স্বামীরই মতানুসরণ করিতেন। তাঁহার রাজধানী রাজগৃহই বুদ্ধের প্রধান লীলাস্থলরূপে বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে বহু বিভিন্ন মতাবলম্বী সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজক-সম্প্রদায় বাস করিতেন।

কোশল-রাজ্যে বিম্বিসারের সমসময়ে প্রবল প্রতাপ প্রসেনজিৎ সিংহাসনাধিরূঢ়। ধর্ম্মে ও আচারে কোশলান্ ও শাক্যগণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কোশল এই সময়ে বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের প্রধান মিলন-ক্ষেত্র। সকল প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তাই রাজধানী শ্রাবস্তী-নগরে স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পান। জড়বাদী অজিতকেশকম্বল, সপ্তশাশ্বতবাদী ককুদকাত্যায়ন, আজীবক মস্কর গোশাল (মজ্ঝলি গোশাল), ভাগ্যবাদী পূরণকশ্যপ, অজ্ঞেয়বাদী সঞ্জয় বেলাস্থিপুত্র (সঞ্জয় বেলট্‌ঠি পুত্ত) এবং জৈনমতাধিনেতা মহাবীর স্বামী এই ষট্‌তীর্থিক তখন শ্রাবস্তী নগরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তবে জৈনধর্ম্মই সমধিক বলবান্। অন্যান্য তীর্থিকগণের মধ্যে একমাত্র আজীবক মজ্ঝলি গোশালই মহাবীরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ। আদর্শ নৃপতি প্রসেনজিৎ কাহারো প্রতি বৈরাভাব পোষণ করেন না। কালের ধারা অনুযায়ী তিনিও নূতন নূতন মতবাদের মূল্য নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা সমুৎসুক।

লিচ্ছবীয় শাসনযন্ত্র গণতান্ত্রিক। বৈশালী ইহার রাজধানী। অষ্টরাজবংশের অধীন অষ্টবিভাগের সমবায়ে এই গণতান্ত্রিক রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অষ্ট-

---

* 'Weber's History of Indian Literature' অবলম্বনে প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বের রচনা।

* অযোধ্যা হইতে ভাগলপুর এবং নেপালপ্রান্ত হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত।

† মগধ—দক্ষিণ বিহার; কোশল—অযোধ্যা; লিচ্ছবি রাজ্য—উত্তর বিহার; বৎস—বুঁধেলখণ্ড (এলাহবাদ পর্য্যন্ত); অবন্তি—মালব এবং মধ্য প্রদেশের কিয়দংশ।

কুলের মধ্যে লিচ্ছবি, বিদেহী বজ্জি ও জ্ঞাতৃকগণই সমধিক প্রসিদ্ধ। জৈনধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বর্দ্ধমান মহাবীর এই জ্ঞাতৃকবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় সমগ্র লিচ্ছবিরাজ্য ইতিপূর্ব্বে জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক (?) পার্শ্বনাথস্বামীর মত গ্রহণ করিয়াছিল। মহাবীর কালবশে জীর্ণ জৈনধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিলেন। বুদ্ধ যখন প্রচার আরম্ভ করিলেন তখন লিচ্ছবি, মগধ ও কোশলরাজ্যে মহাবীরের অনুশাসনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান।

বৎস-(বংশ) রাজ্যের রাজা এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ উদয়ন। অবন্তি-রাজকুমারী বাসবদত্তার সহিত তাঁহার বিচিত্র প্রেমসম্বন্ধ ও পরিণয়কাহিনী চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। * উদয়ন উচ্ছৃঙ্খল, যথেচ্ছাচারী। কোশাম বা কৌশম্বী নগর † তাঁহার রাজধানী।

প্রতাপশালী রাজা মহাসেন চণ্ডপ্রদ্যোত এই সময়ে অবন্তি-রাজ্যের অধীশ্বর। অত্যাচারী পরপীড়ক এই চণ্ডরাজের ভয়ে পাশাপাশি রাজ্যসমূহ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। উদয়নের পৌরুষ-অর্জ্জিত পত্নী বাসবদত্তা ইঁহারই দুহিতা। উজ্জয়িনী নগরী অবন্তিরাজ্যের রাজধানী।

শাক্যরাজ্য কপিলবস্তু হিমালয়মূলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ‡ ইহার শাসনপ্রণালী গণতান্ত্রিক। শাসন-সংসদের অধিনায়ককে "রাজা" বলা হয়। বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদনই এই সময়ে কপিলবস্তুর রাজা।

কোলিয় কপিলবস্তুরই অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। শাক্য ও কোলিয়গণ সমজাতীয়। শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের পত্নী মহামায়াও মহাপ্রজাপতি কোলিয়রাজ অনুশাক্যের কন্যা। অনুশাক্যের পুত্র সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধরাই গৌতমের পরিণীতা ভার্য্যা। §

মল্লরাজ্যও গণতান্ত্রিক। ‖ কুশীনগর এই মল্ল-রাজ্যেরই প্রধান নগর।

এতদঞ্চলে এই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও বহু গণতান্ত্রিক রাজ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। নানা ধর্ম্ম, নানা মতবাদের লীলাক্ষেত্র বলিয়া এই অঞ্চলের লোকজন পরিবর্ত্তন-বিরোধী নয়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও এইভাগে যথেষ্ট আধিপত্য। বহু যজ্ঞাচারী ব্রাহ্মণের এই অঞ্চলে বাস। কিন্তু উপনিষদ আন্দোলনই সমধিক প্রবল। ইতিপূর্ব্বে বিদেহ-রাজ্য (জনকের রাজ্য) এই আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। * ফলতঃ এই উপনিষদ আন্দোলনই এতদ্দেশের বিভিন্ন মতবাদ ও মতবাদীর জন্ম দিয়াছে। বৈদিক ও অবৈদিক সমস্ত দলের সহিতই বুদ্ধের শক্তি পরীক্ষা করিতে হইল—সসৈন্যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

এইস্থানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। তৎকালে এতদঞ্চলে সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল জৈনধর্ম্ম ও আজীবক ধর্ম্ম। ইহা সত্ত্বেও তথাগত-প্রচারিত ধর্ম্মও অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করিল। এই তিন ধর্ম্মই "অহিংসাবাদী"। প্রাচ্য দেশে এই সময়ে অহিংসাবাদের এত সমাদরের কারণ ছিল। মগধ, কোশল, অবন্তি ও বৎসদেশের রাজগণের মধ্যে এই সময়ে স্বরাষ্ট্রবিস্তারের একটি প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। বুদ্ধাবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই কাশী ও বিদেহ, অঙ্গ ও বৎস, এবং অঙ্গ ও মগধ প্রভৃতি দেশের নৃপতিগণের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়া আসিতেছিল। বুদ্ধের প্রচারারম্ভের পূর্ব্বেই কাশী ও অঙ্গরাজ্য রাজ্যবিস্তারের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়া যথাক্রমে কোশল ও মগধের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপশালী রাজগণের পররাষ্ট্রাধিকারে লোলুপ তৃষ্ণা প্রাচ্যভূভাগকে নিরন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়া রাখিয়া দেশময় অনাবিল রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিয়াছিল। এই সময়ে "অহিংসধর্ম্মের" সমাদর মনোবিজ্ঞানসম্মত। গোশাল, মহাবীর ও বুদ্ধের বাণী লোকমনের ক্লান্ত ভাবকে ভাষা দান করিয়া জনপ্রিয় হইল বটে, কিন্তু তাহা রক্তস্রোত বন্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। বুদ্ধের জীবনকালেই মগধ ও কোশল এবং মগধ ও লিচ্ছবি দেশের মধ্যে বিরাট যুদ্ধযজ্ঞ চলিতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই লোক-সংহারী পশুযজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ—কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, মগধরাজ অজাতশত্রু (বিম্বিসারের পুত্র) ও লিচ্ছবিগণ—সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং জৈনধর্ম্মও স্বীকার করিতেন। এই বিগ্রহ থামিতে না থামিতেই আমরা দেখিতে পাই কোশলরাজের পুত্র বিড়ূড়ভ (বিরুধক) কর্তৃক শাক্যবংশের ধ্বংস। রাজ্য-লোভী রাজগণ সম্বন্ধে যাহাই সত্য হউক না কেন, তখনকার জনসাধারণের মনে নিশ্চয়ই এই অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়ার ভাব জাগিয়াছিল। আজীবক ও জৈনধর্ম্ম যখন এই কারণে প্রবল সমাদর লাভ করিয়াছে, বুদ্ধও তাঁহার মার্জ্জিত ও সুসংহত ধর্ম্মবাদ লইয়া ঠিক এই সময়েই ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন।

---

* সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে ইহা একটি সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা। স্বপ্ন-বাসবদত্তা ইত্যাদি এই কাহিনী অবলম্বনেই লিখিত। পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের আধুনিক নাটিকা 'জয়শ্রী'ও (বঙ্গভাষায়) এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি।

† এলাহাবাদের সন্নিকটে।

‡ নেপালের তরাই অঞ্চলে শাক্যরাজ্য অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের জন্মস্থানে নির্ম্মিত মহারাজ অশোকের রুম্মিনদি (লুম্বিনী) লিপি এই স্থানেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

§ সুপ্রবুদ্ধ অনুশাক্যের পুত্র কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে।

‖ গোরক্ষপুর অঞ্চল।

* বৃহদারণ্যক দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালী কবি ও বিদেশী সমালোচক।

(শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ বি-এল)

রামশর্ম্মা ও দত্তকবি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল বাঙ্গালী কবি ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নবকৃষ্ণ ঘোষ সর্ব্বপ্রধান বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। নবকৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার সমসাময়িক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের নিকট 'রামশর্ম্মা' নামে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কাব্য-গ্রন্থের সম্পাদক ও সংক্ষিপ্ত জীবনী-লেখক শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় বলেন,—রামশর্ম্মার প্রবন্ধাদি ইংলিশম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান, রইস ও রায়ত, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ সাদরে গ্রহণ করিতেন। রামশর্ম্মার রচিত কবিতাবলীর বিশদভাবে সমালোচনা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ১৯১৯ সালে দেবেন্দ্র বাবু কবির রচনাবলী একত্রিত করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে ইংরাজী কাব্যশিল্পে রামশর্ম্মার নৈপুণ্য সম্বন্ধে আংশিকভাবে আলোচনাই আশা করা যায়। মিঃ ডান্ (Mr. Theodore Douglas Dunn) "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় রামশর্ম্মার কবিতার যে সমালোচনা বাহির করেন, তাহার মূল্য সেইজন্য সমধিক নহে। এই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমালোচক একাধিক স্থানে ইংরাজী কবিতারচয়িতা বাঙ্গালী কবিদিগের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের রচিত অধিকাংশ কবিতায় ভারতবাসীর হৃদয়স্পন্দন অনুভূত হয় না। অথচ, এই সকল কবির মধ্যে যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদের রচনায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য অসংখ্যবার কীর্ত্তিত হইয়াছে। "Their work is limited in conception and contributes little to the understanding of the Indian mind"—অধ্যাপক টম্‌সনের (Prof Thomson) সমালোচনাও অনেকটা এই সুরে বাঁধা। এমন কি, তিনি রবীন্দ্রনাথেরও কাব্যে পাশ্চাত্য ভাবের ভেজাল আছে, একথা বলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

বিদেশীর পক্ষে অনেক সময়ে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর রচিত কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। এতদ্ব্যতীত, স্বজাতি ও স্বশ্রেণীর কবিবিশেষ যদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হন, তাহা হইলেও অনেক সময়ে দেখা যায় যে, সহৃদয়তার অভাবে সমালোচক কবির রচিত কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবের মর্ম্ম সম্পূর্ণ বিপরীত দিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন ও ইহার ফলে সমালোচনা-ক্ষেত্রে বিসদৃশ অভিমতই জন্মলাভ করে। বিদেশী সমালোচক সেইজন্য হিন্দু কবির যথার্থ হৃদয়ভাব অনেকস্থলে আদৌ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, যেস্থলে কতকটা পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, সেস্থলে সমালোচকের মনস্তত্ত্ব তাঁহার নিজের যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমালোচকের নিজের মতের সহিত কবির আদর্শের যতটুকু ঐক্য আছে ততটুকু ছাড়া তাঁহার সমালোচনা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। জাতি ধর্ম্ম ও দেশভেদে একই কবির সমালোচনা বিভিন্ন অভিমত প্রসব করিয়াছে দেখা যায়। তরুদত্তের ন্যায় রামশর্ম্মার আদর্শ সম্বন্ধেও সেইজন্য সমালোচকগণ অল্পবিস্তর ভ্রমের বশীভূত হইয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু গ্লাসগো (Glassgow) হইতে প্রকাশিত "সেণ্ট এণ্ড্রু" (Saint Andrew) নামে ধর্ম্ম ও সমাজোন্নতিমূলক পত্রিকায় ১৯০৩ সালে রামশর্ম্মার কাব্য সম্বন্ধে প্রকাশিত সমালোচনা কবির রচিত কাব্য-গ্রন্থের প্রস্তাবনাতে সন্নিবেশিত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সহৃদয় বিদেশী সমালোচক হিন্দু কবির আদর্শসম্বন্ধে প্রশংসা ও তাঁহার কাব্য-শিল্পের যথার্থ ব্যাখ্যা অকপটে লিপিবদ্ধ করিতে পারেন। উক্ত সমালোচনায় রামশর্ম্মাকে "লাইট্ অব্ আসিয়া"র (Light of Asia) কবি এড্‌উইন্ আর্‌নল্ডের (Edwin Arnold) সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

রামশর্ম্মা "শিবরাত্রি" ও "ভগবতী-গীতা" ব্যতীত "রাজকুমারী লীলার স্বয়ম্বর" ও "দক্ষযজ্ঞের" নামে দুইটী উৎকৃষ্ট ও দীর্ঘ ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। "শেষদিন" (The Last Day)—আর একটী উল্লেখযোগ্য উৎকৃষ্ট দীর্ঘায়তন ইংরাজী কবিতা। রামশর্ম্মার যশ তাঁহার জীবনকালে অসংখ্য রাজনৈতিক কবিতার ভিতর দিয়া দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলেও ধর্ম্মসমাজ ও নৈতিক জগত সম্বন্ধে এই নিষ্ঠাবান হিন্দুর রচিত ইংরাজী কবিতায় যে আমরা ভারতীয় আদর্শের রীতিমত পরিচয় পাই তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। রামশর্ম্মা স্বরচিত বিস্তর ইংরাজী কবিতার মারফৎ তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালী ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণকে সততা ও ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সদুপদেশ দান করিতে কোনও সময়ে বিরত ছিলেন না। ইংরাজী ভাষার হিন্দু কবিগণের মধ্যে কেবল এক রায় বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্ত ব্যতীত অপর কোনও হিন্দু কবি রামশর্ম্মার সমকক্ষ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ইংরাজী ভাষার এই দুইজন বাঙ্গালী কবির রচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য আদর্শজাত প্রভাব আমরা সর্ব্বত্র অনুভব করি সত্য, কিন্তু তাঁহারা পাশ্চাত্য

আদর্শকে আদৌ গোলামের মত অনুসরণ বা অনুকরণ করেন নাই, তাহার তীব্র আলোকে একালের হিন্দু ও হিন্দুস্থানীর দুরবস্থা কবিতার পর কবিতার ভিতর দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন মাত্র। রায় বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্তের রচিত ও তিন সর্গে সমাপ্ত সুবিখ্যাত ইংরাজী কাব্য "সুমেরুর স্বপ্ন" (A Vision of Sumeru) আগাগোড়া পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। কবিকে বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এস্থলে "সুমেরুর স্বপ্নে"র আখ্যান-বস্তু সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

সুমেরুর শিখরে ব্রহ্মার আলয়ে যেদিন সৃষ্টিকর্ত্তা অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পবনদেবকে বলিলেন, "যাও, দেবগণকে এখানে ডাকিয়া আন", সেদিন তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দেবী সরস্বতীও ভীতা হইয়াছিলেন। পবনদেব কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ও স্বর্গে অনতিবিলম্বে গমন করিয়া শিব, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে ব্রহ্মার আদেশে সুমেরুতে উপস্থিত হইতে বলিলেন। দেবগণ ব্রহ্মার সমীপে আগমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"পৃথিবী হইতে পূজা ও দেবগণের প্রীত্যর্থে বলি আমরা পাইতেছি না কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।" শিব ব্রহ্মার কথা শুনিয়া বলিলেন,—"কাশী ও কামরূপে ত তাঁহার পূজা নিত্য হইতেছে।" কালী, লক্ষ্মী ও উমা প্রত্যেকেই বলিলেন যে, তাঁহাদের পূজা সম্বন্ধে নরলোকের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নাই। বিষ্ণু কহিলেন,—"পুরীধামে তাঁহার পূজা নিয়মিতরূপে হইতেছে।" ব্রহ্মা দেবতাদের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আমি বিপদের আশঙ্কা করি, মর্ত্ত্যের অধিবাসীরা বোধ হয় আমাদের শত্রু বিদেশী দেবগণকে ভজনা করিতেছে।"

"At other shrines they kneel,
Perchance to gods of foreign birth,
Some alien enemy."

শিব ব্রহ্মার কথা শুনিয়া বিদ্রূপ সহকারে বলিলেন, "আমাদের পূজা সকলেই করিয়া থাকে। আপনাকে কেহ পূজা করে না, আর সেইজন্য ঈর্ষান্বিত হইয়া আপনি এই সকল বৃথা বাক্য শুনাইতেছেন।" প্রজাপতি তখন ক্রোধকে দমন করিয়া বলিলেন,—"থাম, থাম, তোমার মত কলহপ্রিয়, চরিত্রহীন দেবতা কেহ নাই। আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনকর্ত্তা, আমিই এই সীমাহীন জগতের একমাত্র অধীশ্বর। দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির সাহায্যেও তুমি আমার শাসন উপেক্ষা করিতে অক্ষম। এইরূপে দেবগণের মধ্যে ধ্বংসকারী যুদ্ধের সূচনা হইতেছে দেখিয়া গণেশ ব্রহ্মা ও শিবকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—"সূর্য্য, চন্দ্র ও তারাগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হউক, তাঁহারা মর্ত্ত্যের সঠিক সংবাদ দিতে পারিবেন।" সাক্ষীগণ একে একে আসিয়া বলিলেন যে, বিদেশী দেবতারা মর্ত্ত্যে পূজা পাইতেছেন ও মানবগণ প্রাচীন দেবতাদিগের সম্বন্ধে এমন অকথ্য মিথ্যা রটনা করিতেছে যে, পুরাকালে অসুরেরাও সেরূপ করিতে সাহসী হইত না। ব্রহ্মা তখন দেবগণকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন। শিব তখন আসল ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া পৃথিবীকে সেই মুহূর্ত্তে ধ্বংস করিবার প্রস্তাব করিলেন। বিষ্ণু শিবকে শান্ত হইতে বলিলেন, এবং শেষে ব্রহ্মার উপদেশমত মরুৎ সুমেরু হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ করিলেন। পবনদেব যতক্ষণ না মর্ত্ত্যলোক হইতে সংবাদ আনয়ন করেন ততক্ষণ দেবতারা আমোদ-আহ্লাদে রত রহিলেন।

প্রথম সর্গে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া কবির কল্পনা নিশাযোগে পবনদেবের সহিত মর্ত্ত্যে আগমন পূর্ব্বক কৈলাস, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী প্রভৃতির শোভা দর্শন করিয়া হিমালয়ের এক গুহায় ভৈরবীর সহিত মিলিত হইল। ভৈরবী পবনদেবকে তাহার জীবনের গোপনীয় কথা শুনাইল। তাহার পাপজীবনের কাহিনী খুলিয়া বলিয়া পবনদেবকে জানাইল যে, কেন সে ভৈরবী সাজিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভৈরবী বলিল,—কিছুদিন হইতে এখানে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। বদ্রীনাথ, গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থে যাত্রীর সংখ্যা কমিল কেন? মানুষ কি নিষ্পাপ হইয়াছে? দেবতারা কি শক্তিহীন হইয়াছেন? ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছগণের আগমনে লোকে দেবগণের প্রতি ভক্তিশূন্য হইয়াছে। তাহারা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ক্রশ পূজা করিতেছে, কিংবা বর্ব্বরতার পরিচায়ক নানা প্রকার কুসংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া প্রাচীনতম সত্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া নৃশংসতার দাস হইয়াছে। আপনি যদি হরিদ্বারের পথে ভারতের সমতল প্রদেশে গমন করেন, তাহা হইলে সেখানে দেখিবেন যে, মন্দিরের আশে পাশে চতুর্দ্দিকে বিশ্বাসঘাতকেরা দেবতা ও মানুষকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ব্রাহ্মণগণ সেখানে দর্প সহকারে ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিলেও নির্লজ্জভাবে স্বধর্ম্মত্যাগী অনাচারী হিন্দুর দান গ্রহণ করে, দণ্ডী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া ভণ্ডগণ পঞ্চ-মকারের সেবা করে।

অতঃপর পবনদেব পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া অসংখ্য তীর্থস্থান দর্শন করিলেন। কিন্তু সকল স্থানেই ভগবানের নাম ও মাহাত্ম্যের ভীষণ চীৎকার-শব্দে

ব্যথিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, দেবতারা এই প্রকার মৌখিক পূজা চাহেন না। ইহা ত পূজা নহে, এরূপ পূজা না হয়,—তাহাও শ্রেয়! ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে গমন করিয়া পবনদেব দেখিলেন, এক ব্যক্তি ভক্তিভরে রুদ্ধস্বরে নির্জ্জনে জানুর উপর ভর করিয়া প্রার্থনা করিতেছে। প্রার্থনার শেষ শ্লোকে পবনদেব শুনিলেন,—

শিবপূজা করে তারা শক্তি লভিবারে,
বিষ্ণুপূজে ধন-আশে! শত উপচারে;
আমি ত চাহি না ধন, চাহি না শকতি,
যীশু প্রতি থাকে যেন অচলা-ভকতি।

পবনদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই যীশু কে? ব্রহ্মার সহস্র নামের তালিকায় ত এ নাম নাই! অতঃপর পবনদেব মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল ও যমুনার তটে বিস্তর মন্দির দর্শন করিলেন। এই প্রদেশেও তিনি মুক্তিকামী এক যুবককে ক্রুশের প্রভাবে যমরাজার তাড়না হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে শুনিলেন। পবনদেব মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

মুক্তিদাতা হয় যদি ক্রুশ কাষ্ঠময়,
তবে ত সে একমনে পূজিছে নিশ্চয়।
পারি যদি সুপ্ত হৃদি জাগাতে এখনি—
শুনিবে যুবক যেই সঙ্গীতের ধ্বনি;
পশিবে মরমে তার পবিত্র বারতা—
যমুনা শুনাবে কত পুণ্যময় কথা!

যুবক প্রার্থনা শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পবনদেব তখন প্রয়াগ ও কাশীর দিকে যাত্রা করিলেন। সেখানে তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে আন্তরিকতার অভাব দেখিলেন।

অতঃপর পবনদেব যখন সুমেরুতে ফিরিয়া যাইবেন, এইরূপ মনে করিতেছেন, সেই সময়ে একটি বালকের মুখে ভগবানের নাম শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভগবানের নাম কি?" বালক বলিল, "যীশু বা জিহোভা।" "যীশু কোথায় থাকেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে বালক বলিল, "কোথায় তিনি নাই? সমুদ্রের তরঙ্গে, সূর্য্যরশ্মিতে, পদ্মপুষ্পে, নদীগর্ভে, বাতাসে, মানব-হৃদয়ে, সর্ব্বত্র তিনি আছেন। কখনও তিনি দূরে নাই।" পবনদেব জিজ্ঞাসিলেন, "কবে ও কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?" বালক বলিল, "যিনি সীমাবদ্ধ নহেন, তাঁহার আবার জন্মগ্রহণের স্থান ও সময় আছে নাকি?" এই কথা বলিয়া বালক পবনদেবকে যীশুখৃষ্টের জন্ম-বৃত্তান্ত ও মৃত্যুর ঘটনা শুনাইল। তারপরে মরুৎ কামরূপ গোমতী, গণ্ডক, গৌড় প্রভৃতি বহুস্থান ও নদনদী পরিদর্শন করিলেন। উড়িষ্যায় তিনি খৃষ্টভক্তগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সু-উচ্চ ভজনালয় দেখিলেন বটে, কিন্তু সেখানে কোনও দেবমূর্ত্তি তিনি দেখিতে পাইলেন না। ভক্তেরা যীশুর নামোচ্চারণ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই পবনদেব সুমেরুর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৃতীয় সর্গে কবির কল্পনা আবার পাঠককে সুমেরুর শিখরপ্রদেশে লইয়া যায়। দেবগণের সভায় পবনদেব উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পৃথিবীতে ব্রহ্মার কোন-ও মন্দির নাই। ভারতবর্ষে শিব, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও উমাকে লোকে পূজা করে বটে, কিন্তু সে পূজার কোনই মূল্য নাই, পূজার ভণ্ডামি মাত্র দেখিলাম। মন্দিরে, মঠে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নিরাপদ নহে। মানুষ ভক্তিশূন্য হৃদয়ে কেবল ধন, মান, যশ চাহিতেছে। সুবৃহৎ মন্দির-সকল সেই পাপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে যেভাবে পূজা হইত তাহার চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উপাসনার মত যদি কিছু লক্ষিত হয়, শক্রর অধিকৃত দেশে যীশুর নামে উৎসর্গীকৃত গির্জ্জায় তাহা দেখা যায়। মর্ত্ত্যের সর্ব্বত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে যীশুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতেছে। দেবতাদের পতনের কারণ যীশু। আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি ইহার প্রতীকার করিতাম। এক্ষণে আপনারা মন্ত্রণা করিয়া স্থির করুন কি কর্ত্তব্য। দেবতারা একে একে নিজেদের শক্তিমত্তার প্রশংসা করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিতে চাহিলেন। ব্রহ্মার নেতৃত্বে সুমেরু হইতে দেবতাদের অভিযান বহির্গত হইয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত উড়িষ্যার সমুদ্রবিধৌত কূলে যখন তাঁহারা পবনদেবপ্রদর্শিত যীশুর ভজনালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা সেই শান্তিময় নির্জ্জন স্থানের পবিত্রতা অনুভব করিয়া যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "তুলাদণ্ডে আপনাদের লঘুত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে, আপনাদের সাম্রাজ্য ও শাসনের অবসান হইয়াছে। বিশ্বের আত্মা যখন আদিকালে শূন্যময়তাকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, তখন তাঁহার-ই আদেশে প্রকৃতি ও আপনারা মানবজগৎকে শাসন করিবার জন্য জন্মলাভ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু আপনারা সৃষ্টিকর্ত্তাকে উপেক্ষা করিয়া নিজেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন,—আপনাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর বিশ্বনিয়ন্তার আদেশে আপনা-দিগকে নরকে অবস্থান করিতে হইবে।" বঙ্গভঙ্গে দত্তকবি বলিলেন "দেবতাদের দিন শেষ হইয়াছে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' জীবনদেবতা এক্ষণে ভারতবর্ষের উপর আদি ঊষার আলোক ঢালিয়া যুগ-যুগান্তরের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিতেছেন। ইহা-ই আমার এই কাব্যের অন্তর্নিহিত নীতি-কথা।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' নিম্নলিখিত আকারে গৃহীত হইয়াছে :—

১। (১) এই আইনের নাম হইবে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের 'শিশু বিবাহ-নিরোধক আইন।'

(২) এই আইন সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে, ব্রিটিশ বেলুচি স্থানে এবং সাঁওতাল পরগণায় প্রবর্ত্তিত হইবে।

(৩) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১লা তারিখ হইতে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। এই আইনের মূল বিষয়ের বা কোন কথার বিরোধী না হইলে এই আইনে—

(ক) শিশু শব্দের অর্থে পুরুষের বেলায় আঠার বৎসরের নিম্নবয়স্ককে এবং নারীর বেলায় চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্কাকে বুঝাইবে।

(খ) যাহাদের বিবাহ হইবে তাহাদের মধ্যে কেহ শিশু থাকিলে সে বিবাহ 'শিশুবিবাহ' বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) 'বিবাহের পক্ষ' বলিতে যাহাদের বিবাহ হইবে তাহাদিগকে বুঝাইবে।

(ঘ) 'নাবালক' বলিতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আঠার বৎসরের নিম্নবয়স্কদিগকে বুঝাইবে।

৩। আঠারো বৎসরের অধিক এবং একুশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক যে কোন পুরুষ শিশুবিবাহ করিবে, সে এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবে।

৪। একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন পুরুষ শিশুবিবাহ করিলে একমাস পর্য্যন্ত অশ্রম কারাদণ্ড অথবা একহাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবে।

৫। যে কেহ কোন শিশুবিবাহ নিষ্পন্ন করিবে, পরিচালনা করিবে অথবা তত্ত্বাবধান করিবে, তাহার প্রতি একমাস পর্য্যন্ত অশ্রম কারাদণ্ড, একহাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে। যদি সে প্রমাণ করিতে পারে যে, এই বিবাহ শিশুবিবাহ নহে এরূপ বিশ্বাস করিবার তাহার কারণ ছিল, তবে সে দণ্ডিত হইবে না।

৬। (১) যে ক্ষেত্রে কোন নাবালক শিশুবিবাহ করিবে, সে ক্ষেত্রে সেই নাবালকের পিতা, অভিভাবক অথবা আইনতঃ বা বে-আইনী ভাবে রক্ষক কোন ব্যক্তি যদি সেই বিবাহে উৎসাহ দেয়, অথবা সেই বিবাহে অনুমতি দেয়, অথবা গাফিলতি বশতঃ সেই বিবাহ বন্ধ করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহার প্রতি একমাস পর্য্যন্ত অশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে—

প্রকাশ থাকে যে, কোন নারীই কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইবে না।

(২) এই ধারার বিহিত উদ্দেশ্যে যে ক্ষেত্রে নাবালক শিশুবিবাহ করিবে, সে ক্ষেত্রে নাবালকের রক্ষক যদি বিপরীত প্রমাণ না দিতে পারে, তবে ধরিয়া লওয়া হইবে যে, সে গাফিলতি বশতঃই এই বিবাহ বন্ধ করিতে পারে নাই।

৭। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের 'জেনারেল ক্লজেস এক্টে'র ২৫ ধারায় অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৬৪ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনের ৩ ধারা অনুসারে কোন আদালত কোন অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার সময় এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন না যে, অর্থদণ্ডের টাকা আদায় না হইলে অপরাধীর কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

৮। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৯০ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, কোন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন আদালত এই আইনের কোন অপরাধের মামলা গ্রহণ করিতে অথবা বিচার করিতে পারিবেন না।

৯। যে বিবাহ সম্পর্কে অপরাধ হইবে সেই বিবাহের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কেহ কোন অভিযোগ না করিলে কোন আদালত এই আইনের অপরাধের মামলা করিতে পারিবেন না।

১০। এই আইনানুসারে কোন আদালত যদি কোন মামলা গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২০৩ ধারা অনুসারে নালিশ ডিসমিস না করেন, তবে উক্ত কার্য্যবিধির ২০২ ধারা অনুসারে সেই আদালত স্বয়ং এই অভিযোগের তদন্ত করিবেন, অথবা সেই আদালতের অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে তদন্তের আদেশ দিবেন।

১১। (১) অভিযোগকারীর জবানবন্দী গ্রহণের পর আসামীকে হাজির হইবার সমন দিবার পূর্ব্বে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২৫০ ধারা অনুসারে যদি অভিযোগকারীকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, সেজন্য মুচলেকাসহ বা মুচলেকা-বিহীন একশত টাকার জামীন লিখিয়া দিতে হইবে। যদি আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এই জামীন না দেওয়া হয়, তবে নালিশ ডিসমিস হইবে। আদালত ইচ্ছা করিলে এই জামীন না লইতেও পারিবেন, সেক্ষেত্রে জামীন না লওয়ার কারণ লিখিয়া রাখিতে হইবে।

(২) এই ধারা অনুসারে যে জামীন লওয়া হইবে, তাহা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধির অনুসারে গৃহীত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উক্ত কার্য্যবিধির ৪২ ধারা প্রযুক্ত হইবে।

আইনের উদ্দেশ্য

আইনটির উদ্দেশ্য বর্ণনায় শ্রীযুক্ত শারদা বলেন :—

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীর রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর সমগ্র ভারতবর্ষে এক বৎসর বয়সের কম বয়স্কা ৬১২টি, পাঁচ বৎসরের কম বয়স্কা ২০২৩টি, দশ বৎসরের কম বয়স্কা ৯৭৮৫৭টি এবং পনের বৎসরের কম বয়স্কা ৩৩২০২৮টি হিন্দু বিধবা ছিল। হিন্দুর আচার ও প্রথার ফলে এই সমস্ত শিশু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে না, ইহাই দুঃখের কথা। পৃথিবীর সভ্য কি অসভ্য অন্য কোন দেশেই এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখা যায় না। সামাজিক রীতির এই সমস্ত অসহায়া নিপীড়িতাদিগকে উদ্ধারার্থ আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। এই সামাজিক রীতির আবশ্যকতা পুরাকালে যাহাই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে যে উহা কালোপযোগী নহে, বরং অনেক অনিষ্ট এবং ক্ষতির কারণ হইতেছে, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

আনন্দবাজার—৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।

কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

(ডাঃ শ্রীব্রজবল্লভ সাহা এম-বি, পি-এইচ. ডি)

সুইডেন দেশে রাজার ঝিয়ারি নাম তাঁর ইউজিনি,
নিরমিলা এক আতুরনিবাস বেচি' আভরণ-মণি।
কতনা রোগের মসীঢালা দেহে ফিরিল বিমল বিভা
নিশি দিশি সেথা লভিয়া দরদী মায়ের মতন সেবা।
একদিন সেই দেবীর সকাশে বিদায় লইতে আসি'
রোগী একজন আনত আননে রহিল নীরবে ভাষি'।
ভাবের আবেগে কথা না জুয়ায় ঝরঝর্ আঁখি ঝুরে,
দেবী কহে এ যে ভূতলে অতুল মণি এল মোর ফিরে।
খনির মণিতে শোভিত এদেহ যাহা হয়ে যাবে মাটি
হৃদয়-সায়র-মথিত রতনে ভূষণ মিলিল খাঁটি।

নানা কথা

পর্দ্দা ও মুসলমান সমাজ—গত ১ নবেম্বরে এলাহাবাদে মুসলমান মহিলাদিগের এক সভা হইয়াছিল। সভা হইয়াছিল মাননীয় জষ্টিশ সুলেমানের গৃহে এবং সভানেত্রী হইয়াছিলেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডভোকেট সেখ আবদুল্লা মহাশয়ের পত্নী। সভানেত্রী সেই সভায় মুসলমান মহিলাদের মনোগত ভাবপ্রকাশে নির্ভীকতার প্রয়োজন বলিয়া বলিলেন যে, প্রকৃত ইসলামধর্ম্মবিহিত পর্দ্দার তিনি বিরোধী নন; কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতে প্রচলিত পর্দ্দাপ্রথা উক্ত ইসলামী পর্দ্দাপ্রথা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলামী পর্দ্দার বিধানে ইংরাজ ও মার্কিণ রমণীসমাজে প্রচলিত পদ্ধতির মত মুসলমান স্ত্রীলোকদের অপরিচিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে ইচ্ছামত স্বাধীন ভাবে মেলামেশা নিষিদ্ধ। কোরাণের আদেশ অনুসারে মহিলাদের বাহিরে যাইবার সময় অবগুণ্ঠিত হওয়া উচিত, কিন্তু তাঁহাদিগের ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাকা সমর্থন করে না। হিন্দু মহিলাদিগের সম্বন্ধে আমরাও অনেকটা ঐ কথা বলি। তাঁহারা যদি বৈদিক সময়াবধি প্রচলিত স্বাধীনতার সঙ্গে অবরোধ প্রথা অবলম্বন করেন, তবে বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকদিগের দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহারের সমস্যা অনেকটা সহজে নিরাকৃত হইতে পারে এবং নারীধর্ষণের প্রতীকারেরও সহজ ব্যবস্থা হইতে পারে।

অশ্লীল সাহিত্য—সেদিন ৫।১২।২৯এর ষ্টেটসম্যান কাগজে দেখি, লক্ষ্নৌ হইতে প্রকাশিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুখ্য বাংলা মাসিক-পত্র "উত্তরায়" সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ পত্রে একটী অশ্লীল কবিতা প্রকাশ করিবার জন্য ২৫৲ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি কবিতাটী জরিমানার যোগ্য অশ্লীল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন! হে ভগবান! তোমার সুরক্ষিত এই পুণ্যভূমিতে এসমস্ত কি হইতে চলিয়াছে? তুমি রক্ষা কর—তুমি রক্ষা কর; তোমার রোষদীপ্ত রুদ্রদৃষ্টি সম্বরণ কর। দেশের তথাকথিত অগ্রগামী দল যে কি পর্য্যন্ত নিলজ্জ বেহায়া হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহারই অন্যতর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একবার একটা মকদ্দমায় জুরীতে ছিলাম। সেই মকদ্দমায় একজন ১৮।১৯ বৎসরের একটী ছেলে সাক্ষী ছিল। ছেলেটী সম্ভ্রান্ত ঘরের। সে যখন কাঠগড়ায় উঠিল, তখনই তো তাহার দুই গাল বহিয়া পানের পিক গড়াইতেছিল এবং সে নিতান্তই নিলজ্জ ও বেপরোয়া ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। তারপর জেরায় সে যখন নিজের দুশ্চরিত্রতার কথা অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিল, আমরা তো তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমার অন্তরে দুঃখ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। সুরেশ বাবুরও এই কার্য্যে বর্ত্তমান তরুণসমাজের মতিগতি উপলব্ধি করিয়া আমাদের হৃদয় তো ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই "উত্তরা" কাগজেই একটী ভয়াবহ অশ্লীল উপন্যাস বাহির হইতেছিল—তাহার একঅংশ "শনিবারের চিঠি"তে উদ্ধৃত দেখিয়াছিলাম। আমি জোরের সঙ্গে বলিতে পারি, সে উপন্যাস স্বামীস্ত্রীতে একসঙ্গে পাঠ করাও অসম্ভব। সেই উপন্যাস যাঁহার হৃদয় ও লেখনী হইতে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাঁহার সংসারে বেশী দিন থাকিয়া বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন ও দেশবাসীর অন্তর কলুষিত করিবার জন্য অশ্লীলতার কালকূট

পরিবেশন করিবার পরিবর্তে গভীর অরণ্যে অজ্ঞাতবাস করা শ্রেয়।

নিখিল ভারতীয় বৌদ্ধ মহাসভা—প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে তথাগত বুদ্ধদেব নিজ সাধনার বলে মানবহৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। কালের প্রভাবে তাঁহার উপদেশ সকল নানা সম্প্রদায়ে নানা বিকৃত আকারে দেখা দিতেছে। বর্ত্তমানে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সাধন উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মাদিত্য ধর্ম্মাচার্য্য "নিখিল ভারতীয় বৌদ্ধমহাসভা" স্থাপন করিয়াছেন। এই সভার উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ধর্ম্মাচার্য্য মহাশয় এই সভার একটী বিশেষ উৎসবের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার কার্য্যে সফলতা কামনা করি।

বিলাতের দারিদ্র্য—বিলাতেও তবে দারিদ্র্য আছে! আমরা তো জানিতাম, জগতের মধ্যে দরিদ্রতম দেশ সোনার ভারত—যে ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীর গড়ে বাৎসরিক আয় ২০৲ টাকা; কিন্তু সম্প্রতি কাগজে দেখি যে, বিলাতের পার্লামেন্টের সভ্যও দরিদ্র হইবার অধিকার পাইয়াছেন! পার্লামেন্টে সম্প্রতি এক যুবক সভ্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, প্রাতরাশের পরে তাঁহার উদরে আর অন্ন পড়ে নাই। তিনি মাসে ৪০০।৫০০ টাকা যাহা পান, তাহাতে তাঁহার খরচ কুলায় না, কাজেই এই প্রতিনিধি একাহারে থাকিবার চেষ্টা করিতেছেন! তবে, বিলাত তো আর তোমাদের দগ্ধ ভারতবর্ষ নহে। মাসে ৪০০।৫০০ টাকাতেও যখন কুলায় না জানা গেল, তখনই জনৈক মহিলা সভ্য প্রস্তাব করিলেন যে প্রত্যেক সভ্যকে ৫০ পাউণ্ড (প্রায় ৭০০৲) জলপানী হিসাবে দেওয়া হউক! বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্যের মাপকাঠি বিভিন্ন। আমাদের দেশে অনাহারে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক না মরিলে দারিদ্র্যই বল বা দুর্ভিক্ষই বল, কিছুই ধরা যাইতে পারে না।

ইংরাজ-সৈন্য ও বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রী—সংবাদপত্রে দেখি যে, কয়েকজন ইংরাজসৈন্য মজঃফরপুরের এক বালিকাবিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রীর প্রতি বর্ব্বরোচিত ব্যবহারে উদ্যত হইয়াছিল (আনন্দবাজার ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬)। এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এইরূপ ঘটনাসমূহেরই ফলে কত রাজ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে, কেবল ইংরাজসৈন্য কেন, চারিদিকে যে প্রকার নারীধর্ষণের উৎপাত আসিয়া জুটিয়াছে, তাহাতে আমাদের মনে হয়, দেশের প্রতি পল্লীর বালক ও যুবকের এবং প্রত্যেক বালিকার লাঠিখেলা, যুযুৎসু, ছোরাখেলা প্রভৃতি আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা করা উচিত। আমরা যতদূর প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শ্রীলতা বজায় রাখিয়াও এই সকল শিক্ষা করা চলে। এখানে শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না, কারণ প্রথমত এই সকল শিক্ষার বিরুদ্ধে শাস্ত্রে কোন নিষেধ-বিধি দেখি নাই; কাজেই এ সকল শিক্ষা করা বা শিক্ষা না করা স্থান ও কালের প্রয়োজনমত কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য ধরিতে হইবে—বিশেষত যখন আমরা বৈদিক কাল অবধি সে দিন পর্য্যন্ত দেখি যে, ভারতরমণীগণের মধ্যে অশ্বচালনা প্রভৃতি নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল না। দ্বিতীয়ত, বর্ত্তমানে নারীধর্ষণ যেরূপ প্রবলভাবে চলিতেছে, ভারতের সমগ্র ইতিহাসে এমন প্রবলভাবে নারীধর্ষণ চলিতে দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ।

দীর্ঘজীবী পুরুষ—গত ৪।৮।৩৬এ জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত বাউরা-নিবাসী জয়নারায়ণ হাড়ি ১৩০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছে। তাহার বিধবা স্ত্রীর বয়স ১০৬ বৎসর। উক্ত হাড়ি মৃত্যুর ৭।৮ দিন পূর্ব্বেও দুই তিন মাইল পদব্রজে চলিয়া ভিক্ষা অর্জ্জন করিয়াছে। (হিতবাদী ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।)

৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রপিতামহ ৺রামজয় ন্যায়ালঙ্কার ১০৩ বৎসর জীবিত ছিলেন, (তাঁহার আত্ম-চরিত দেখ)।

ফেরিওয়ালা ম্যাজিষ্ট্রেট—শ্রীযুক্ত জে, বুখ, বিচারক (J. P.) কাউন্সিলর, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ব্যান-ডক (হাট্স্ বেঙ্কের ডেপুটি চেয়ারম্যান তাঁহার অবসর সময়ে ঠেলাগাড়ীতে জিনিষ লইয়া বিক্রয় করিতেছেন। তাহার ছবি গত ১৫, ১২, ২৯এর ষ্টেটসম্যান কাগজে দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, ইংরাজ জাতি কেন বড় হইয়াছে। তাহারা বোঝে যে, there is dignihy in labour—যে প্রকার হোক পরিশ্রমের একটা মর্য্যাদা আছে। সেদিন একটা গল্প শুনিলাম—একদিন এণ্ড্রু ইয়ুল কোম্পানীর বড় সাহেব সার ডেভিড ইয়ুল একবার তাঁহার বড় বাবুর সঙ্গে কথা-কহিতেছেন, ইতিমধ্যে এক কুলি মুখে কয়লার কালী মাখিয়া, ময়লা কাপড় পড়িয়া কি কথা বলিতে সেখানে উপস্থিত হইল। কথা প্রসঙ্গে ইয়ুল সাহেব বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এই কুলিকে আলিঙ্গন করিতে পার?" বড় বাবু একটু কিন্তু-কিন্তু করিতে লাগিলেন। "আমি পারি", বলিয়াই কুলিকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলেন। এইরূপ সহৃদয়তার

কারণে এণ্ড্রুইয়ুল কোম্পানী, পি:এণ্ড ও কোম্পানী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কোম্পানী বড় হইতে পারিয়াছে। আমি কোন কথা প্রসঙ্গে ভক্তিভাজন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটেও ঐ কথা শুনিয়াছিলাম—there is dignity in labour। ভারতবাসী যেদিন এই কথাটী প্রাণের মধ্যে ধরিতে পারিবেন সেইদিন স্বরাজ হস্তগত হইতে বিলম্ব হইবে না।

নারী-হরণের প্রতীকার—সম্প্রতি জষ্টিস কষ্টেলো একটী নারীহরণের মামলার রায়ে বলিয়াছেন—"একথা ভাল রকমই বুঝাইয়া দিতে হইবে, যদি এরকম আর এভাবে (নারীহরণ) অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, তবে ইহা দমন করিবার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে, এমন কি, অপরাধীকে এজন্য যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে"। আনন্দবাজার পত্রিকার ন্যায় (৪ঠা পৌষ ১৩৩৬) আমরাও এই উক্তি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। যদি এই বিষয়ের কয়েকজন অপরাধীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসে দণ্ডিত করা হয়, তবে নারীহরণের অত্যাচার অবিলম্বে থামিয়া যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ রাজত্বেরও জয়জকার হইবে। এই সকল নারীহরণ দেশের সর্ব্বত্র যে কিরূপ আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছে, তাহা বলিবার নয়। সেই সঙ্গে আমরা সংবাদপত্র সম্পাদক এবং সাহিত্যিকগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি, যুবকগণের অন্তরে যাহাতে কামানল ইন্ধন প্রাপ্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করুন। লোকের কামানল প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত হইলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। তোমরা একদিকে নারীহরণের বিরুদ্ধে লেখনী ধরিবে অপরদিকে অমুক থিয়েটারে অমুক অভিনেত্রী অভিনয়ের দ্বারা দর্শকগণের মনমুগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া যুবকদিগকে থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে যাইতে প্রলুব্ধ করিবে—তাহা হইলে যুবকেরা যদি কামানলে উন্মত্ত হইয়া নারীহরণে প্রবৃত্ত হয়, তখন দোষ দিব কাহাকে? দেশের যে রকম অবস্থা পড়িয়াছে, তাহাতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশে অর্থোপার্জ্জনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিধ বিলাসব্যসনের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হউন—জননী মাতৃভূমির অশ্রু সহজেই মুছিয়া যাইবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত কষ্টেলোর উক্তি ভারতের সকল সম্প্রদায়ের বিবেচক ব্যক্তিগণ একবাক্যে সমর্থন করিবেন নিঃসন্দেহ।

—

পত্রিকাপরিচয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগৃহীত 'মহদ্বাণী' গত ১৮ অগ্রহায়ণের 'শিক্ষাসমাচারে' উদ্ধৃত হইয়াছে। যুবক ও বালকদিগের অন্তরে একটা সাধুভাব, একটা প্রকৃত জাগরণ আনিবার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাহাতে দেশবাসীর সহায়তা লাভ করিলে আমাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে। দেশ-নেতৃগণের দৃষ্টি এবিষয়ে পড়িতেছে দেখিলেও আমাদের আনন্দ হয়।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, শ্রীমতী বাণী দেবীর "শিশুশিক্ষা সঙ্ঘাতের প্রয়োজন" পৌষসংখ্যার মাতৃমন্দিরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেখিলে সুখী হইব।

যুবক—আশ্বিন-কার্ত্তিক—১৩৩৬—"সমস্যা ও সমাধান" প্রবন্ধটী বড়ই ভাল লাগিল—সময়োপযোগী হইয়াছে।

বঙ্গলক্ষ্মী—অগ্রহায়ণ ১৩৩৬—আমরা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে এই পত্রিকা ৫ম বর্ষে পড়িল। বুঝা যাইতেছে, এরূপ একটী মাসিক-পত্রের প্রয়োজন আছে। মুখবন্ধ স্বরূপে "সত্যের ডাক" প্রবন্ধটী বড় ভাল লাগিল। ইহাতে বর্ত্তমানে ইউরোপীয়দিগের স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে এদেশবাসীর অনেক ভুল ধারণা কাটানো হইয়াছে। লেখক ঠিক বলিয়াছেন—"উন্মত্ত স্বাধীনতা সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়"। "অনেক হাল্কাবুদ্ধির লোক মনে করেন মেয়েদের একা ঘোরাটাই তবে (ইউরোপীয় মেয়েদের অনুকরণে) বুঝি উন্নতির পরাকাষ্ঠা।" প্রবন্ধটী প্রত্যেক গৃহে প্রচার করা উচিত। "যুগ পরিবর্ত্তনে নারীর স্থান" প্রবন্ধে শ্রীমতী শকুন্তলা রাও লিখিয়াছেন—"ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কিম্বা মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে ভারতনারীর অবস্থা শোচনীয় ছিল। নারী যে একটী মানুষ, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিবার যে শক্তি আছে, সংসারের বিষয় বা নিজ জীবনের বিষয় ভাবিবার মত তার যে বুদ্ধি আছে, এমন কথা ধারণারও বাহিরে ছিল"। এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। এটা গতানুগতিক কথা, এবং বলিতে কি, ইহা তথাকথিত বিলাতী ঐতিহাসিক-দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। আমরা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি যে, এদেশের সমাজে নারীকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইত এবং তাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব প্রবল ছিল বলিয়াই আজও হিন্দুধর্ম্ম ও আর্য্য-শিক্ষা পাইয়া আমরা ধন্য হইতেছি।

—

গার্হস্থ্য সংবাদ।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ—গত ২২শে পৌষ বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ সার্দ্ধ ১০ ঘটিকায় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বার্ষিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষে তদীয় পুত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বালিগঞ্জের বাসভবনে একটী পারিবারিক উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথের পুষ্পার্চ্চিত মর্ম্মর-মূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় পরলোকগত আত্মার উন্নতিকামনায় উপাসনা পাঠ ও প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীইন্দিরা দেবী সময়োপযোগী কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়াছিলেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ১২ই পৌষ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় ৺যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ভাস্করনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে তাঁহাদের শিবপুরের বাসবাটীতে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শয্যাসনাদি ষোড়শ দ্রব্য ও অন্ন-জল-বস্ত্র প্রভৃতি দানানন্তর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা পূর্ব্বক শ্রাদ্ধের উপযোগী উপদেশাদি প্রদান করেন। সভায় নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইয়াছিল; এবং সর্ব্বশেষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল!

জন্মদিবস—গত ১৭ই পৌষ বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০॥০ ঘটিকায় শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস উপলক্ষে ক্ষিতীন্দ্র-ভবনে একটী পারিবারিক উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের উপাসনা, উপদেশ ও প্রার্থনান্তে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ দেবভাষায় আশীর্ব্বচন দ্বারা শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রকে অভিনন্দিত করেন।

নামকরণ—শ্রীঅমলেন্দু বিশ্বাস মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে গত ২৮শে পৌষ রবিবার সায়ংকালে তাঁহাদের শ্যামবাজারের বাসভবনে একটী পারিবারিক উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ বেদী গ্রহণপূর্ব্বক উপাসনা ও উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন এবং পুত্রের শুভেন্দু বিশ্বাস নাম দিয়াছেন। ভগবান নবকুমারকে কল্যাণে ও শ্রী-সৌন্দর্য্যে বিভূষিত ও বিবর্দ্ধিত করুন।

শোকসংবাদ।

৺যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চতুর্থ জামাতা যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত ২রা পৌষ মঙ্গলবার ব্রহ্মমুহূর্ত্তে পৃষ্ঠব্রণরোগে তাঁহার শিবপুরের বাসবাটীতে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৭১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে ও রায়পুর চীফ্ কমিশনার কোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। কিন্তু কর্ণরোগে আক্রান্ত হওয়ায় অবশেষে উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন; এবং প্রথমে আলবার্ট কলেজের অধ্যক্ষ ও পরে হাবড়া জেলা স্কুলে প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। শেষে বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইনি কখনই সাংসারিক বিপদে বা দুঃখ-কষ্টে মুহ্যমান হন নাই। পাঁচ বৎসর হইল ইনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইয়াছিলেন। ইঁহার শোকার্ত্ত পুত্রকন্যা ও পত্নী-পরিজনদিগকে এই গভীর শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় দান করুন।

৺দেবকুমার রায় চৌধুরী—গত ২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার বরিশাল লাখুটিয়ার জমিদার স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ভবানীপুরের ১৮নং ল্যান্সডাউন রোডস্থিত বাসভবনে অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫২ বৎসর হইয়াছিল। পত্নী ও জ্যেষ্ঠকন্যার বিয়োগশোকে বৎসর-দুই হইতে ইঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তাহারই ফলে হৃদ্রোগে ইঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পৌত্র ৺দ্বীপেন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল। ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি বলিয়া বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবানের স্নেহাশ্রয় লাভ করিয়া ইঁহার শোকাহত আত্মা শান্তিলাভ করুক।

সংবাদ।

শ্রীমতী বাণী দেবীর উপাধি লাভ—গত ১৩ই পৌষ শনিবার মধ্যাহ্নে কলেজ স্কোয়ারের বৌদ্ধমন্দিরের সভাগৃহে 'নিখিল ভারত-বৌদ্ধ-সভা'র তত্ত্বাবধানে ডাক্তার নলিনাক্ষ দত্ত (M.A., B.L., P.R.S. Ph. D.) মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত-বৌদ্ধসাহিত্য-

সভা'র প্রাথমিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার কারণে এই সভা হইতে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীবাণী দেবীকে উক্ত দিবস সমাগত সভাবৃন্দের সানন্দ সম্মতিতে এবং সভাপতি মহাশয়ের সম্মতিক্রমে "সঙ্গীত-ভারতী (Doctor of Indian Music)" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। কল্যাণীয়া বাণী দেবীর এই যোগ্য সম্মানলাভে আমরা সানন্দে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাদিবস—প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষাদিবস উপলক্ষে গত ৭ই পৌষ রবিবার প্রাতঃকালে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের উপাসকগণ উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির ঘুরিয়া মহর্ষিভবনের পারিবারিক উপাসনামণ্ডপে (দালানে) সমাগত হইয়া সেখানে যথারীতি উপাসনা ও প্রার্থনান্তে সকলে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের ভবনে (৫।১বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন) সমবেত হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে আত্মজীবনী হইতে পাঠ, প্রসঙ্গ ও আলোচনায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধারা অনুসরণ করিয়া উভয়ত্রই 'মিষ্টিমুখের' ব্যবস্থা হইয়াছিল।

উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ—উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে গত ৯ই পৌষ সমগ্র দিনব্যাপী উৎসবের বৈকালিক উপাসনার ভার অর্পিত হইয়াছিল আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশ চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের উপর। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকায় তিনি বেদীগ্রহণ পূর্ব্বক যথারীতি উপদেশ ও উপাসনাদি করিয়াছিলেন। ভক্তিমতী মহিলারা কয়েকটী সঙ্গীত করিয়া সমবেত উপাসকগণের অন্তঃকরণ মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজ।—গত ১৩ই ১৫ই ও ১৫ই পৌষ ধরিয়া দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীরামপুর-ব্রাহ্মসমাজের অষ্টষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৩ই পৌষ শনিবার সায়ংকাল ৭ ঘটিকায় ২০ নং সেনেপাড়া লেনে পুরাতন সমাজবাটীতে ভক্তিমান লাহিড়ীপরিবারের ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীমান পরেশ নাথ ও শ্রীমান সারনাথের আহ্বানে তাঁহাদের বিদ্যুদালোকিত ও সুসজ্জিত পুরাতন সমাজগৃহে উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ই পৌষ রবিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ৺তারিণীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রগণের আহ্বানে তাঁহাদের পুরাতন বাজারের বাসভবনে সমগ্র দিবসব্যাপী উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। উষা-কীর্ত্তনান্তর ৭॥০ ঘটিকায় প্রাতরুপাসনা আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণে ভগবৎপ্রসঙ্গ এবং সায়ং ৬ ঘটিকায় সান্ধ্য উপাসনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৫ই পৌষ সোমবার অপরাহ্ণে ১নং বেনেপাড়া লেনে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের গৃহে বালকবালিকা-সম্মিলনান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়। এই উপলক্ষ্যে আদি-ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, সুকবি শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল প্রভৃতি কলিকাতা হইতে তথায় গমন করিয়া উপদেশ, উপাসনা ও সঙ্গীতাদির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমনোরমা দেবী শ্রীপ্রভাত কুমারী দেবী প্রভৃতি ভক্তিমতী মহিলারাও ভাবময় সঙ্গীত দ্বারা সমবেত উপাসকগণের অন্তঃকরণ মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

নিখিল ভারতীয় বৌদ্ধ-সম্মিলন—গত ১০ই, ১১ই ও ১২ই পৌষ ধরিয়া দিবসত্রয়ব্যাপী 'নিখিল ভারতীয় বৌদ্ধসম্মিলনের' দ্বিতীয় অধিবেশন ৪এ, কলেজ-স্কোয়ারের সুসজ্জিত বৌদ্ধবিহারে মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থ এই ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়া যে সাধনাবলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তথাগত হইয়াছিলেন, অধুনা জগৎ তাহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে না পারিলেও উহার আলোচনা আন্দোলন ও অভিনন্দনের দ্বারাও অশেষ কল্যাণ লাভ করিবে নিঃসন্দেহ। এই উদ্দেশ্যেই গত বৎসর হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত ধর্ম্মাদিত্য ধর্ম্মাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা নগরীতে এই উৎসবের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে উপাসনা উপদেশ ও বক্তৃতাদির এবং পালি, সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গলা প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় আবৃত্তি, আলোচনা ও সঙ্গীতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা বুদ্ধদেবের মহন্মন্ত্র শিক্ষাপ্রচারের বিচিত্র আয়োজন হইয়াছিল।

মহাজন দিবস—গত ২৫শে পৌষ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মহাত্মাগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য একটী সভা আহূত হইয়াছিল। আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ এই সভায় "পুরুষ-তর্পণ" নামে একটী সুন্দর নিবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। উহা আগামী সংখ্যায় পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

——

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462.

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০৩৮ | ১৮৫১ শক মাঘ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

মাঘোৎসবসংখ্যা।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে সম্পাদক— চলিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

মাঘোৎসবে উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের নামে, জননীর আহ্বানে আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। এই উৎসবের প্রারম্ভে হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই প্রণিপাত কর।

আমাদিগের সম্মুখে মাঘোৎসব উপস্থিত। যে মাঘোৎসবে দেবতারাও মঙ্গলশঙ্খ নিনাদিত করেন; যে মাঘোৎসবে দেবমানব একহৃদয়ে পরব্রহ্মের জয়কীর্ত্তনে উদ্যত হয়েন, আমাদের সেই প্রিয়তম মাঘোৎসব সম্মুখে উপস্থিত। আমি জানি না যে, কি বলিয়া, কোন্ ভাষায়, সেই মাঘোৎসব উপলক্ষে সমাগত সাধুসজ্জন ও বন্ধুবান্ধবের হৃদয়মন উদ্বোধিত করিয়া তুলিব, অগ্নিময় করিয়া তুলিব; ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না যে, কি প্রকারে তাঁহাদের গভীরতম অন্তস্তল স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলিব; তাঁহাদের প্রাণে তড়িৎশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারিব।

আমার নিজের শক্তি নাই বটে, কিন্তু যিনি অকিঞ্চনগুরু, তাঁহার সে শক্তি আছে। যাঁহার শাসনে অগণিত সূর্য্যচন্দ্র, অগণিত গ্রহতারকা সম্মুখের এই সীমাহীন দিশাহীন গগনপ্রাঙ্গণে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে এবং নিত্যনিয়ত জীবন ও মৃত্যুর পথে পরিভ্রমণ করিতেছে; যাঁহার শাসনে অহোরাত্র-ঋতু-সম্বৎসরসকল যথানিয়মে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে, তাঁহার সে শক্তি আছে। সূর্য্যচন্দ্র যাঁহার চক্ষু হইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রহরীস্বরূপে দণ্ডায়মান আছে, তাঁহার সে শক্তি আছে। অনাদি কাল এবং এই অনন্ত গগন যাঁহার মহিমা কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত, তাঁহার সে শক্তি আছে। যাঁহার আদেশে এই বিশ্বজগতে কতশত মহাজ্ঞানী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সেই অনন্তজ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরম পুরুষের মহিমার ইঙ্গিতমাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহার সে শক্তি আছে।

আজ সেই পরম গুরুর শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই আমি পাপী তাপী সাধু অসাধু সকলকেই হৃদয়ের সহিত এই মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া পঙ্গুও অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে, মূকও বাগ্মিতা লাভ করে, তাঁহারই শক্তিতে আমার শক্তি। আমি ক্ষুদ্র কীট হইলেও এই অনন্ত জগতের অধীশ্বর সেই অমৃত পুরুষের সন্তান,

সেই মহান্ অগ্নি হইতে নিঃসৃত একটী বিস্ফুলিঙ্গ। জগতের প্রত্যেক ধূলিকণা, প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক মানবাত্মা তাঁহা হইতে নিঃসৃত এক একটা বিস্ফুলিঙ্গ। আজ তাই আমি সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা মিলাইয়া, বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর সহিত একপ্রাণ হইয়া, গিরিনদী, ভূধরসাগর, জীবজন্তু, দেবমানব, সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে, এই মহোৎসবের মহান্ অবসরে সেই পরব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জীবনকে ধন্য কর! এই মহোৎসবের সময় দুঃখশোকের কথা, পাপতাপের কথা, নিরাশা-নিরানন্দের কথা, সংশয়-অবিশ্বাসের কথা, সকলই পশ্চাতে পড়িয়া থাক; যাহা কিছু মলিনতা, সমস্তই ছিন্ন কন্থার মত পরিত্যাগ কর। প্রসন্ন মুখে, বিমল হৃদয়ে, আনন্দের নববস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেই আনন্দস্বরূপের উৎসবে উপস্থিত হও। আমাদিগের হৃদয় নবোৎসাহে নব আনন্দে নৃত্য করুক; আমরা এই মুহূর্ত্তেই নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হই।

আজ এই মহোৎসবের দিনে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের ভিতর দিয়াই তাঁহার করুণা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি। এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনে তাঁহার করুণা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা বড়ই দেদীপ্যমান আকারে প্রকাশ পাইতেছে। যে সময়ে ভারতবর্ষ সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার পেষণযন্ত্রের নিম্নে পড়িয়া শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা হারাইতে বসিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই দুর্ব্বল বঙ্গদেশেই ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়াই মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার বীজ সর্ব্বপ্রথম নবতর ভাবে প্রোথিত করাইলেন। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের ফলে দেশের এবং জগতের যে কি মহান্ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজ মানবাত্মার স্বাধীনতারূপ যে বটবৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, আজ সেই বৃক্ষ হইতে দেশে বিদেশে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে কত বিভিন্ন আকারে শিকড় নামিয়া সমুদয় পৃথিবীকে আপনার আশ্রয়ের ভিতর আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

দয়াময় পরমেশ্বরের এত দিকে এত রকমে মঙ্গলভাবের শুভ উদ্দেশ্যের পরিচয় যখন পাইতেছি, তখন তাঁহাকে করুণাময় বলিয়া ডাকিতে কুণ্ঠিত হইও না। যুদ্ধ, নরহত্যা, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের কারণে তাঁহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিও না। সরিয়া থাকিবে কি? তাঁহার রাজ্য শুধু এই পৃথিবীটুকু নয়—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চরাচরই যে তাঁহার রাজ্য। তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া তো কোথাও যাইতে পারিব না। দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্যই বল, যুদ্ধ-মহামারীই বল, এসকলের প্রতীকারসাধনে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু ইহার কারণে যদি মৃত্যুও আসে, তাহাতেও বিমূঢ় হইলে চলিবে না। মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার চরণে আছড়াইয়া পড়, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর, দেখিবে যে, মৃত্যু তোমা হইতে দূরে পলায়ন করিবে। যাঁহার ভয়ে মৃত্যু আমাদের নিকটে উপস্থিত হয় এবং যাঁহার ভয়ে মৃত্যু আমাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে, সেই মৃত্যুঞ্জয় পরমেশ্বরকে অন্তরতম প্রাণসখা বলিয়া উপলব্ধি কর। যে ব্রহ্মাণ্ডপতি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই আমার মত ক্ষুদ্র মানুষেরও সকল তাপ সকল ব্যথা স্বীয় কোমল হস্তে মুছাইয়া দেন। তাঁহার করুণার কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ইচ্ছা হয় যে, আমার সকল কথা, সকল ভাষা, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হৌক, কেবল তাঁহাকে প্রাণনাথ হৃদয়েশ বলিয়া ডাকিবার ভাষা আমার জিহ্বাগ্রে জাগ্রত থাকুক। তিনি আমাদিগকে তাঁহার সূক্ষ্মতম কিন্তু অচ্ছেদ্যতম স্নেহপ্রেমের বর্ম্মে সর্ব্বদাই আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহোৎসবের সম্মুখে সেই প্রাণসখাকে সকলে মিলিতভাবে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার অবসর পরিত্যাগ করিও না। তোমাদের সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দাও—তাঁহারে নিকট হইতে দূরে থাকিও না। তাঁহাকে চক্ষের অন্তরালে রাখিও না এবং বিভীষিকা দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইও না। তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে যোগযুক্ত থাকিয়া সম্মুখের ব্রহ্মোৎসবকে সার্থক কর এবং জীবনমনকে পবিত্র ও সার্থক কর।

—:—

ব্রাহ্মসমাজের পুরাতনী।

(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়)

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে মন্থনদণ্ড লইয়া দেশ-বিদেশীয় শাস্ত্রবারিধি আলোড়ন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে উপনিষদপ্রতিপাদ্য সেই প্রাচীন একেশ্বরবাদ ভারতে আবার ফিরিয়া আসিল। যৌবনের প্রথম বিকাশের সঙ্গে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানের উপরে তাঁহার অনাস্থা জন্মিয়াছিল; কিন্তু এই অনাস্থা হৃদয়ের মধ্যে পোষণ করিয়া নির্বীর্য্যভাবে তিনি অবস্থান করেন নাই। তিনি সত্যের ভিখারী, প্রকৃত সত্য লাভ করিবার জন্য তাঁহার দারুণ পিপাসা। সে সময়ে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি তাঁহার পিপাসা দূর করিতে পারেন। তাঁহাকে আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতেই হইবে, এই অধ্যবসায় লইয়া পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া তিনি দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কোথায় পাটনা, কোথায় বারাণসী, কোথায় তিব্বত—তাঁহার অগম্য স্থান রহিল না। পাটনা সে সময়ে আরবী-ফার্সী ভাষার কেন্দ্র ছিল। তিনি তথায় গিয়া ঐ দুই ভাষা অভ্যাস করিয়া কোরাণের মর্ম্ম জানিতে চেষ্টা করিলেন। অসাধারণ মেধাশক্তি বলে সফলকাম হইয়া তিনি বারাণসী গমন করিলেন।

সে সময়ে বেদ ও উপনিষদচর্চ্চা বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি কাশীর পণ্ডিতগুলীর নিকট উপনিষদ চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন। দারুণ পরিশ্রমের ফলে তিনি উহাতে এমন অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন যে, উত্তরকালে কয়েকখানি উপনিষদের মূল ও অনুবাদ তিনি বঙ্গভাষায় প্রকাশ করেন। প্রাচীন দর্শনের আলোচনাও বঙ্গদেশে একভাবে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল; রাজা তাহাতেও সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে শারীরকসূত্র অনুবাদ সহ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বুঝিবার জন্য তিনি আপনার জীবনকে বিপন্ন করিয়া তিব্বত অঞ্চলে গমন করিলেন। সে সময়ে যাতায়াতের কোন সুবিধা ছিল না, লৌহবর্ত্ম তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সত্য যাঁহার লভ্য ও কাম্য বস্তু, কে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে? আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে তিনি ভীরু বঙ্গবাসী, কলিকাতা হইতে বহুদূরে মফঃস্বলে তাঁহার আবাস-নিকেতন। কোথা হইতে তিনি এই অমানুষিক বীর্য্য লাভ করিলেন, কে তাঁহার সকল ভয় বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল, কে বা তাঁহার সুদূর পথশ্রান্ত দেহের সর্ব্ববিধ অবসাদ বিদূরিত করিয়া দিয়াছিল, আলোচনা করিতে গিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই! কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারি, দেশের মুক্তি-সাধনের জন্য যাঁহাদের জন্ম, দৈববলই তাঁহাদের একমাত্র সহায়, ভগবৎপ্রদত্ত অভেদ্য বর্ম্মই তাঁহাদিগকে সকল প্রকার বিপদপাত হইতে রক্ষা করে। তাঁহাদের পিপাসু অন্তরের ভিতরে প্রতিভার এমন এক জ্বলন্ত আলোক অবতীর্ণ হয় যে, ভাষা ও শাস্ত্রের সর্ব্ববিধ জটিলতা ও কাঠিন্য তাঁহাদের নিকট পরাভূত হয়, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় তাঁহাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে, দশটি ভাষার উপর তিনি অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের যুগ হইতে প্রায় শত বৎসর অতীত হইয়া গেল। আমাদের মধ্যে আজও এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা সহজে বাইবেল ও কোরাণ পাঠ করিতে বিমুখ। কিন্তু রাজার হৃদয় এমনই বিরাট ও বিশাল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি এই উভয়বিধ গ্রন্থই পরম শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া "তুহফত-উল-মুওয়াহিদিন" গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় এবং বাইবেল হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া Precepts of Jesus রচনা করিয়া যান। কোন অন্ধ সংস্কারের মোহ তাঁহাকে আপন কুক্ষিগত করিতে পারে নাই।

এক শত বৎসরের পূর্ব্ব সময়ের জনসমাজের চিত্র আপনার কল্পনার মধ্যে একবার আনয়ন কর। যে সময়ে জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে কালাপানি পার হইতে লোকে সাহস করিত না, সেই সময়ে রাজা অসঙ্কুচিত হৃদয়ে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সে সময়কার বিপদসঙ্কুল সমুদ্রযাত্রা তাঁহাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই। তিনি সেখানে গিয়া সুধীবর্গের নিকটে আপনার জ্ঞানের প্রাচুর্য্যে যে সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। কি ধর্ম্মসংস্কারে, কি রাজনৈতিক ব্যাপারে, কি শাস্ত্রালোচনায়, কি স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে, তিনি যে আদর্শের সূচনা করিয়া গিয়াছেন ও যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন এবং যে নব চেতনার সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, একভাবে বলিতে গেলে সমগ্র ভারতের চিন্তার ধারা আজও সেই পথেই অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার জীবনের আর একটি বিশেষত্ব এই, তিনি দেশীয় ভাবকে পরিহার করেন নাই। কি ধর্ম্মপ্রচারে, কি খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে, কি বেশভূষায় তিনি জাতীয় ভাব আমরণকাল পোষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহা হইতেই বেদ-বেদান্ত উপনিষদ প্রাচীন দর্শন আবার এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া অনেকের অন্তরে দেশীয় উপকরণ-বহুল প্রচলিত ধর্ম্মের উপরে অনাস্থা আইসে। কিন্তু রামমোহন রায়ের অন্তরে একেশ্বরবাদের যে সন্ধান জাগিয়াছিল, তাহা একভাবে বলিতে গেলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তখনও ইংরাজি-ভাষার সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই, তিনি ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন পরিণত বয়সে। তিনি ঐ ভাষায় উপর সমধিক অধিকার লাভ করিয়া ইংরাজি-ভাষায় একেশ্বরপ্রতিপাদক পুস্তিকারচনা ও প্রকাশে আত্মনিয়োগ করিলেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার গ্রন্থাবলীর পরিমাণও সামান্য নহে। পুস্তিকাদি রচনা ও প্রকাশে তিনি শিক্ষিতমণ্ডলীর অন্তরে ক্রমাগত আঘাত দিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তখনও কেহ প্রস্তুত হয় নাই। যখনই দেখিলেন যে কয়েকটি লোক ধর্ম্মসম্বন্ধে কতক পরিমাণে তাঁহার সমভাবাপন্ন হইয়াছে, তখনই তিনি ১৭৩৭ শকে "আত্মীয় সভা" স্থাপন করিলেন। সেখানে প্রকাশ্য ভাবে উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত হইতে আরম্ভ হইল। উহার তিনটি অধিবেশন প্রকাশ্য ভাবে বৃন্দাবন মিত্রের গৃহে, বড়বাজারে তুলাপটীতে কিশোরী লাল চোবের বাটীতে এবং ভূকৈলাস রাজবাটীতে হইয়াছিল। রাজা বৈষয়িক কার্য্যে বিব্রত হইয়া পড়ায় "আত্মীয় সভার" কার্য্য স্থগিত হইয়া গেল। কিন্তু এই একেশ্বরবাদ রাজার অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় নীরবে বহিতেছিল। ক্রমে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন সমৃদ্ধিশালী কলিকাতার অধিবাসীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিল।

তাঁহার অনুগত প্রধান শিষ্য চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার অপরাপর বন্ধু-বান্ধবের উত্তেজনায় তিনি বর্ত্তমান আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহের সান্নিধ্যে ফিরিঙ্গি কমললোচন বসুর বাটীতে ভগবৎউপাসনা ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। "আত্মীয় সভায়" যে ভাব বিকশিত হইয়াছিল, কমল বসুর বাটীর উপাসনায় তদপেক্ষা আমরা অধিকতর ও পরিস্ফুটতর বিকাশ দেখিতে পাই। সেখানে আরও প্রকাশ্যভাবে একেশ্বরবাদ-প্রচারের আয়োজন, উহাকে স্থায়িত্বদানের অধিকতর আগ্রহ। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি সংস্কৃত কলেজের জনৈক উদারচেতা অধ্যাপক ছিলেন, তিনি রাজার দক্ষিণ হস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। ঐ স্থান হইতে বঙ্গ-ভাষায় লিখিত ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইতে আরম্ভ হইল। প্রাথমিক ব্যাখ্যানগুলি রাজার রচিত এবং পরবর্ত্তী ব্যাখ্যানগুলি যাহার মধ্যে কয়েকটির সন্ধান মিলিয়াছে, তাহা বিদ্যাবাগীশের রচিত হইলেও বিদ্যাবাগীশ মৌখিক বক্তৃতার পরিবর্ত্তে উভয়বিধ ব্যাখ্যানের এক-একটি পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে জনসাধারণের রোষ প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। অনেকে রাজার জীবন-নাশের জন্য উদ্যত; রাজা বিপদ বুঝিয়া তাঁহার মাণিকতলার উদ্যানবাটিকা হইতে উপাসনালয়ে আসিবার সময় পরিচ্ছদের অন্তরালে কিরিচ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে উপাসনার জন্য একটী স্থায়ী ও নিজস্ব গৃহ-সংগ্রহের আবশ্যকতা অনুভব হইতে লাগিল। এ বিষয়ে রাজা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহসম্পন্ন। তিনি ১৭৫০ শকে এই বর্ত্তমান গৃহ ক্রয় করিয়া ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে পবিত্র ১১ই মাঘ দিবসে তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই যে ত্রিতল দেখিতেছ, ইহা মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ কর্ত্তৃক বহু পরে নির্ম্মিত। শত বৎসর ধরিয়া অব্যাহতভাবে এখানে উপাসনা-কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। বাহিরের কোন বাধা ইহাকে আঘাত দিতে পারে নাই। রাজা উপাসনাপদ্ধতি নিজে রচনা করিয়া যান। উহাতে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত "ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎ-কারণায়" এই মন্ত্র স্থান পাইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষি বর্ত্তমান উপাসনাপদ্ধতি প্রচলন করেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্মসমাজের জন্য Trust deed যাহা রচনা করিয়া যান, তাহা অপূর্ব্ব। উহাতে তাঁহার উদার হৃদয়ের ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। তিনি কোন সম্প্রদায়বিশেষের জন্য এই অট্টালিকা সংগ্রহ করেন নাই। সাম্প্রদায়িক ভাব তাঁহাকে আদৌ স্পর্শ করে নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন সকল সম্প্রদায়ের লোক বর্ণনির্ব্বিশেষে ও জাতিনির্ব্বিশেষে এখানে আসিয়া সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করে। তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের পক্ষপাতী ছিলেন। একেশ্বরবাদকে কেন্দ্র করিয়া সকলে মিলিত হউক, আপনাদের হৃদয়কে বিপুল ও বিরাট করিয়া তুলুক, একেশ্বরবাদের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হউক, ইহাই তাঁহার প্রাণগত কামনা ছিল। তাঁহার রচিত Trust deedএ ইহাই সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে "Strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds."

তিনি ইচ্ছা করিয়া এই উপাসনালয়কে কোন নাম দেন নাই; নামহীন অবস্থায় বহুদিন ধরিয়া ইহার কার্য্যা-বলী চলিয়া আসিতেছিল। মুসলমান রাজত্বের সময়ে যেমন গুরু নানক, কবীর, দাদূ প্রভৃতি কয়েকজন অসাধারণ প্রকৃতির লোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহারা বিরোধের পক্ষপাতী নহেন, কিন্তু হিন্দুমুসল-

মানের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটামুটি বিষয়ে মিলনের পক্ষপাতী এবং যাঁহারা হিন্দুমুসলমান উভয়েরই অপরিমেয় শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন রায় স্বীয় প্রতিভা বলে অজ্ঞাতসারে সেই পথেই চলিয়াছিলেন। রাজা স্বীয় জীবদ্দশায় সে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু একথা সত্য যে, যতই দিন যাইতেছে রাজার উপরে সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে।

স্বতন্ত্র মতবাদ একটু পুরাতন হইয়া আসিলে তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ এবং তদনুযায়ী উপাসনাপদ্ধতি তাঁহার মৃত্যু অন্তে কয়েক বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজ নাম ধারণ করিয়াছে, এবং প্রধানত ইহা তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা এখানে বলিতে চাই, স্বাধীন চিন্তার ধারাকে কেহ প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে না। সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের আদিগুরু। আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য যতই কেন হউক না, ব্রাহ্মসমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যতই বিভক্ত হউক না কেন, বিদ্বেষ ও বিসম্বাদ যেন আমাদের মধ্যে স্থান না পায়, আমরা যেন কাহাকেও বাক্যবাণে বিদ্ধ না করি। রাজার আদর্শ আমাদিগকে সর্ব্বসময়ে স্মরণে রাখিতে হইবে। মৈত্রীবন্ধনের জন্যই রাজার আগমন। ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠাই উহার জীবন্ত সাক্ষ্য।

এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিবস ধরিয়া আজ আমাদের শতবার্ষিক উৎসব। শতবর্ষ পূর্ব্বে এই মাঘেই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ লইয়া আমরা যতই আলোচনা করিব, তিনি যে পথ আমাদের সম্মুখে প্রমুক্ত করিয়া গিয়াছেন, সেই পথ ধরিয়া আমরা যতই অগ্রসর হইব, ততই আমাদের জীবন ধন্য হইবে। সে পথ মৈত্রীর পথ, বিসম্বাদ পরমেশ্বরের অভিমুখীন হইবার প্রকৃষ্ট বর্ম্ম।

আজ এই শতবার্ষিক উৎসবের প্রারম্ভে জগৎজননীর নিকট আমাদের প্রার্থনা যে রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া যে সত্যধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া যাহা আরও প্রকটিত হইয়াছে, তাহা জীবনে বরণ করিবার সামর্থ্য ভগবান আমাদিগকে প্রেরণ করুন। তাঁহার রচিত বৈরাগ্যের সঙ্গীত আমাদের সাধনপথের সহায় হউক। "ভাব সেই একে" তাঁহার এই যে আদেশ ও উপদেশ, আমরা অন্য চিন্তা পরিহার করিয়া যেন প্রতিদিনের কতক অংশ ইহারই সাধনে নিযুক্ত থাকি। আমাদের বলবীর্য্য যেন দ্বিধা হইয়া না যায়। ব্রাহ্মসমাজ অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই অপ্রতিম ঈশ্বরকে আত্মস্থ করিবার জন্য। এই পবিত্র ব্রত যেন আমরা জীবনে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই শতবার্ষিক উৎসবমুখে ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা ও প্রার্থনা।

উৎসবের প্রাণ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের নামে আজ আমরা এই পবিত্র স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে সমবেত হইয়াছি। তিনিই আমাদের পূজার একমাত্র পাত্র। এই উৎসবের প্রারম্ভে হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই প্রণিপাত কর।

প্রতি বৎসরই আমাদের প্রিয় মাঘ মাস আসে, আর চলিয়া যায়। প্রতি বৎসরই মাঘোৎসব আসে, আর মাঘোৎসব চলিয়া যায়। মাঘোৎসবের জন্য আমরা উৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করিয়া থাকি; মাঘোৎসব উপস্থিত হইলে আমরা তাহাতে মাতিয়া যাই; মাঘোৎসব শেষ হইয়া গেলে আবার আমরা নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এখন আমরা মাঘোৎসবের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি। এবারকার মাঘোৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সাধারণ মাঘোৎসব নয়—এই মাঘোৎসবে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হওয়া অবধি শতবর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল। আজিকার এই উৎসবে বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানবীর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং ধ্যানবীর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশে আমাদের অন্তর হইতে শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার সমুত্থিত হইতেছে।

এই উৎসবে জননীর আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রতিদিন তো আমরা প্রত্যেকে নীরবে ভগবানের সঙ্গে আত্মার যোগসাধনের জন্য নির্জ্জনে আত্মসমাধান করি। কিন্তু আজিকার এই উৎসব নির্জ্জনে আত্মসমাধান করিবার জন্য নয়; আজ ভাইভগ্নী সকলের মিলিত ভাবে, একসঙ্গে, একহৃদয়ে জননীর চরণে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহারই জন্য আজ এই উৎসবের বিশেষ আয়োজন; উৎসবের বংশী বাজিয়া উঠিয়া আমাদের প্রাণে নব জাগরণ আনিয়া দিয়াছে, তাই আজ উৎসবের মঙ্গল শংখ ধ্বনিত হইয়া আমাদিগকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। মোহনিদ্রায় ও আলস্যে কালহরণ করিবার এতটুকু অবসর আমাদের নাই।

অগ্রসর হইতে হইবে—শতাব্দী পরে আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার কথা উঠিতেই পারে না। অন্যোন্যসাহচর্য্যে ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ তাঁহার উপাসনা দ্বারা নিজেরও অগ্রসর হইতে হইবে এবং সকলকে লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এই প্রকার [illegible] সহিত মিলিতভাবে উপাসনার পরিণামে আমরা যে আনন্দ লাভ করি, সেই [illegible] উৎসবের [illegible] হইল ব্রাহ্মজীবনের এবং ব্রাহ্ম[illegible]।

সমাজেও থাকিতে হইবে, ধর্ম্মসাধনাও করিতে হইবে; সমাজে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে; সমাজের অপর পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়াই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে—এই ভাব, এই সত্যই ব্রাহ্মসমাজের আদ্যন্তমধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। আমাদের মাঘোৎসবই সেই ভাবের সেই সত্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

রোগ-শোক জরা বার্দ্ধক্য, এ সমস্তই তো সংসারের নিত্য সহচর-অনুচর। সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব, সম্পদ ও বিপদের বিবাদ; পদে পদে সংসারের কঠিন আঘাত; কথায় কথায় উদ্যত অদৃষ্টবজ্রের বিভীষিকা; আত্মীয়স্বজনের হতাশার ক্রন্দনধ্বনি; ভাগ্যহীন অসহায় বন্ধুবান্ধবের তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস, এ সমস্তই তো সংসারের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এ সমস্তই আমাদের প্রাণে ব্যথা দিতে অগ্রসর হয় সত্য; কিন্তু ভগবানের আশ্চর্য্য মঙ্গলবিধানে, সংসারের এই সমস্ত সহচর অনুচরদিগকে আমরা যতই ঠেলিয়া ফেলিতে পারিব, যতই আমরা তাহাদের সহিত নির্ভীকহৃদয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিব, ততই আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। কেবল তাহাই নহে। সংসারের সহিত সংগ্রামে যাহাতে আমরা বিজয় লাভ করিতে পারি; যাহাতে আমরা আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ করিবার অধিকার বজায় রাখিতে পারি, মঙ্গলবিধাতা পরম পুরুষ পরমেশ্বর তাঁহার প্রকৃতিরাজ্যে তাহার উপায়সকলেরও বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতির চারিদিকে চক্ষু খুলিয়া দেখ, সকল সৌন্দর্য্যের একমাত্র আকর ভগবান সর্ব্বত্র কি অনুপম সৌন্দর্য্যরাশিই না ঢালিয়া রাখিয়াছেন, আনন্দের কি অক্ষয় রসধারায় না তিনি বিশ্বজগতকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। শারদ-প্রভাতের বিগলিত স্বর্ণধারা, বিহগদিগের সুললিত কাকলি, বিচিত্র সুগন্ধ কুসুমরাশি, পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না, এ সমস্তই আমাদের সম্মুখে আনন্দের প্রস্রবণ দিবানিশি উন্মুক্ত রাখিয়াছে। এই সকলের ভিতর দিয়া ঈশ্বরই স্বয়ং আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই উৎসবের ভিতর দিয়াও তিনিই তাঁহার আনন্দ-মঙ্গল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন।

ভারতের ঋষিরা সকল স্থানে, সকল সময়ে ও সকল অবস্থার ভিতরে ভগবানের আনন্দরূপে প্রকাশ দেখিয়া আনন্দে ডুবিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই আনন্দরূপ ভাষায় ব্যক্ত করিতে গিয়া তাঁহাকে রসস্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। এই "রসস্বরূপ" কথাটীতে ঋষিদের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত প্রেম, হৃদয়ের যাহা কিছু ভাল ভাব, সমস্ত যেন ঘন হইয়া, একত্র মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

আনন্দস্বরূপের আনন্দসাগরে অবগাহন করা মানবের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার হইতে আমাদিগকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারে না। কিন্তু অনেক সময়ে আমরা নিজেদের দোষেই এই অধিকারকে ব্যর্থ করিয়া তুলি। উচ্চনীচের ভেদাভিমানে আপনাকে বড় দেখিয়া অপরকে হেয়দৃষ্টিতে দেখিবার স্পর্দ্ধা কর; লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অপরের প্রতি হিংসাপ্রদর্শনে অগ্রসর হও, আনন্দসাগর কলুষিত হইয়া উঠিবে, সুনির্ম্মল আনন্দসাগর ভেদ করিয়াও তোমার সম্মুখে পঙ্করাশি উত্থিত হইবে। আপাতসুখের আশায় তুমি অনাচার-কদাচারের আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমার শরীর মন ও আত্মার আনন্দ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইবে। তুমি সত্যের পথ ছাড়িয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমার রাষ্ট্রনীতিই বল, সমাজনীতিই বল, অথবা যে নীতিই বল না কেন, সমস্তই কলুষিত হইয়া উঠিবে; জীবনের সকল বিভাগে, সমাজের সর্ব্ব অঙ্গে শতবিধ কুসংস্কার প্রভৃতির আগাছা উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে মৃত্যুর মুখে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিবে—আনন্দের মূল শুকাইয়া যাইবে—উৎসবের প্রাণ অন্তর্হিত হইবে।

প্রত্যক্ষ কর, এই উৎসবযজ্ঞে আনন্দস্বরূপ ভগবান তাঁহার মঙ্গলচক্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান আছেন। কে সেই চক্র-গ্রহণে অগ্রসর হইবেন? ভগবানের সত্য আশ্বাসের মঙ্গল-বাণী এই উৎসব-যজ্ঞকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। কে সেই মঙ্গলবাণী অন্তরে ধারণ করিতে অগ্রসর হইবেন? হৃদয়কে মলিনতার পঙ্কমুক্ত করিয়া সেই চক্র গ্রহণের অধিকারী না করিলে; অন্তরকে মঙ্গলভাবে, মঙ্গল চিন্তায়, সত্য আচারব্যবহারে বিশুদ্ধ করিয়া সেই মঙ্গলবাণী শ্রবণের অধিকারী না করিলে, বৃথা এই উৎসব, বৃথা আমাদের আনন্দ-কোলাহল এবং বৃথা আমাদের আনন্দ-সঙ্গীত। আমাদের এই উৎসবে, আমাদের এই পরস্পরমিলনে যদি আমরা নবপ্রাণের নবতর প্রেরণা লাভ না করি, অন্তরে যদি পরস্পরের সহযোগে মিলনসম্ভোগের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা অনুভব না করি, তবে বন্ধ করিয়া দাও এই বৃথা উৎসব, কাজ নেই এই মুখোসপরা আনন্দের কপট কোলাহল-কলরবে। শতাব্দী পরেও যদি আমরা অন্তরে সত্যকার উৎসবের আনন্দ না আনিতে পারি, মুখে না দেখাইলেও অন্তরে যদি পরস্পরের প্রতি অপ্রেম, অসদ্ভাব পোষণ করি, তবে শতাব্দী ধরিয়া করিলাম কি—তবে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়, জনসমাজের নিকট আমাদের মুখ দেখাইব কি প্রকারে?

কিন্তু ভগবান আমার অন্তরে যে অভয়বাণী অহর্নিশি শুনাইতেছেন, সেই অভয়বাণীর বলে আমি জগতবাসীকে শুনাইতে চাই—ভয় নাই—ভয় নাই—তাঁহার চরণতলে আসিয়া দাঁড়াও, তাঁহার অজেয় পতাকা উন্মোচিত করিয়া তাহার তলে নির্ভয়ে আসিয়া দাঁড়াও—সকল ভয়, সকল শঙ্কা বিদূরিত হইবে। আপনাকে জান যে, তুমি আনন্দস্বরূপের সন্তান, তুমি অমৃতপুরুষের সন্তান—নিরাশা নিরানন্দ, দুঃখশোকের বিভীষিকা তোমার অন্তরে আসিবার অধিকার নাই! বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ব্বে এমন সুখের কথা, প্রাণের এমন শান্তিপ্রদ বার্ত্তা আর কোনও ধর্ম্মই এত স্পষ্ট ভাষায় বলিতে সাহস করেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মই ব্যক্তিবিশেষের নয়, জাতিবিশেষের নয়, দেশবিশেষের নয়, কিন্তু প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভগবানের সহিত সমধর্ম্মিত্ব সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট ভাষায় বিঘোষিত করিয়াছেন; তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রচারক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজের এত গৌরব, এবং সেই ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দিবার জন্য আমাদের সকলেরই এত আগ্রহ।

প্রত্যেক মানবই অমৃতের পুত্র; এবং এই সত্যই মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটনের অনন্য উপায়, ইহা জানিয়া শতবিধ দুঃখদৈন্যের বিভীষিকা দূর করিয়া দাও, শঙ্কাত্রাস পদদলিত করিয়া দাও। মিথ্যা মায়ার কথায়, মিথ্যা ছলনার বাণীতে ভগবানকে ভুলিয়া মৃত্যুমোহের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে প্রবেশ করাইও না। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় বিরাট পুরুষকে প্রত্যক্ষ কর; মানবের অন্তরে যে চৈতন্যময় ভূমা পুরুষ অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর।

ব্রাহ্মসমাজ যেদিন অমৃতের পুত্র হইবার কারণে, ভগবানের সহিত সমধর্ম্মিত্বের কারণে, দেশ, জাতি ও কালনির্ব্বিশেষে প্রতি মানবের ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার বিঘোষিত করিলেন, সেদিন দেশে কি আশ্চর্য্য সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সেইদিন মাঘোৎসবের শুভ ১১ই মাঘে, ঐ সত্যেরই সুফলপ্রসূ বারিধারা লাভ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার বীজ মহাসমারোহে প্রোথিত হইয়াছিল। তাই সেইদিন শুধু কয়েকজন ব্রহ্মোপাসকের নহে, কিন্তু সমগ্র দেশের এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর মহামহোৎসবের দিন। সেইদিন অবধি কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; কত মহাত্মা গগন কম্পিত করিয়া এই উৎসবের গান গাহিয়াছেন। আজ শতাব্দী পরে এই উৎসবের প্রারম্ভে তাঁহাদের হৃদয়ের উপলব্ধি, তাঁহাদের নবপ্রেরণা আমাদিগকেও অমৃতধারায় অভিষিক্ত করিতেছে; আমাদেরও অন্তরে নবচেতনা ও নবশক্তি আনিয়া দিতেছে। এই নবশক্তির অনুভূতিই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, আমাদের নিরাশার কোনই কারণ নাই; অশুভ অমঙ্গল বিপদ আপদ আমরা যতদূর দুর্ব্বিহ ভার বলিয়া মনে করি, উহারা তত দুর্ব্বিহ নহে—ঐ সকল ভেদ করিয়া মঙ্গলের চির উৎস হইতে শত নির্ঝর নামিয়া জগৎসংসার সিক্ত রাখিয়াছে। এই নবশক্তির অনুভূতিই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, অজ্ঞানের অন্ধকার চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না, পাপের অন্ধকার আমাদিগকে চিরকাল গ্রাস করিয়া রাখিতে পারে না; আমাদের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রভাবে, জ্ঞানের তেজে সে অন্ধকার অচিরেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে!

আজ এই উৎসবের প্রারম্ভে আমাদের অন্তরে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার সত্য প্রতিষ্ঠিত হউক; আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে উৎসবের প্রাণ আনন্দ সুপ্রতিষ্ঠিত হউক। জীবনের প্রতিদিবসের দুঃখদৈন্যের গ্লানি পথের ধারে সঞ্চিত থাক। আমাদের মোহগ্রস্ত জীবনের অবসাদ আজ পশ্চাতে পড়িয়া থাক; আমাদের ভুলভ্রান্তি সমস্তই ধরণীর ধূলির সাথে মিশিয়া যাক। আজ এই উৎসবের মাঝে আমাদের সমস্ত মর্ম্মব্যথা তুচ্ছ হউক।

হে অন্তর্যামী! আজ তুমি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে বিরাজমান হও। তুমি যে পুত্রকলত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতে প্রিয়তম; তুমি যে আমাদের উৎসবের প্রাণ, আনন্দের মূল উৎস, এই সত্য আজ আমাদের প্রত্যেককে অনুভব করিতে দাও। আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে, প্রত্যেকের শিরায় শিরায়, আমাদের প্রত্যেকের চৈতন্যে তোমার আগমনে আনন্দস্রোত উদ্বেলিত হইয়া উঠুক। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, হে হৃদয়নাথ, জলদগম্ভীর মন্ত্রে একবার তোমার নব উৎসাহের বাণী শোনাও। তোমার অমৃতধারায় আমাদের প্রাণের জীর্ণতা, শুষ্কতা বিদূরিত হৌক। আমরা জানি, পতনঅভ্যুদয়, হর্ষবিষাদ, সম্পদবিপদের ভিতর দিয়াই তোমার চরণতলে আমাদের উপস্থিত হইতে হইবে। আমরা জানি যে, কখনও বা সুখসম্পদের কিরণজাল আমাদের গমনপথ আলোকিত করিয়া তুলিবে; কখনও বা উহা দুঃখবিপদের গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইবে, ঝঞ্ঝাঝটিকা আমাদিগকে দিগভ্রান্ত করিয়া তুলিবে। সেই দুর্দ্দিনে, হে মৃত্যুর অতীত পরম পুরুষ, হে অভয়দাতা মঙ্গলবিধাতা, তুমি আমাদের প্রাণে অভয়বাণী শুনাইয়া বরাবিধান করিও। আমাদিগকে

এই বর দাও আমরা যেন একনিষ্ঠভাবে তোমারই পথে চলিতে পারি। মানবাত্মাতে তুমি যে আনন্দমূর্ত্তিতে স্বপ্রকাশ আছ, তাহাই আমাদের অন্তরে ফুটাইয়া তোল। তুমি ভূমা, তুমিই রসস্বরূপ। এসো প্রভু—আমাদের সুমার্জ্জিত ও সুসজ্জিত হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া তোমার দিব্যমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হও। আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বসকল অপহৃত হোক, সকল বিরোধ শান্ত হোক। তোমার উপস্থিতিতে আমাদের পাপতাপ লজ্জাভয় বিনাশপ্রাপ্ত হোক; কাপুরুষ ভীরুর ভীতিসঙ্কুচিত জড়ত্ব বিদূরিত হোক। বিগতবিবাদং তোমার আবির্ভাবে আমাদের শত্রু যাহারা তাহারাও বন্ধুরূপে দেখা দিক এবং আমাদের সমবেত কণ্ঠ হইতে তোমারই জয়ঘোষণার বিপুল আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইয়া গগনের পরতে পরতে প্রতিধ্বনিত হোক। তোমার নামে আমরা যে উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেই মহোৎসব সার্থক হোক।*

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও স্বাধীনতাপ্রীতি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মুখবন্ধ।

আজ মহর্ষির তিরোভাবের দিন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে যে সকল স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল স্মৃতিসভার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, সভাস্থলে উপস্থিত বক্তা ও শ্রোতা সকলে পরস্পর আলোচনা করিয়া শিখিতে চান যে, সেই সকল মহাপুরুষদিগের জীবনের ভিতর কি শিক্ষা করা যায়; কোন্ বস্তু ধরিয়া, কিসের প্রভাবে সেই সকল মহাপুরুষেরা মহাপুরুষের আসন অধিকার করিয়াছেন; কোন্ পদার্থের দ্বারা তাঁহারা নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছেন যে তাঁহারা towering personality লাভ করিলেন, আর তুমি আমি তাহা লাভ করিতে পারি নাই। আমি উহাই শিক্ষা করিবার জন্য—আজ এই পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিবার জন্য আমার বিশেষ অধিকার আছে মনে করি, কারণ তিনি আমার পিতামহ এবং সেই কারণে তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিবার জন্য আপনাদের সময় অনুমাত্র ভিক্ষা করিতেছি।

উন্নতি বহুমুখী।

জলাশয় হইতে জল উঠাইতে গেলে শুধু এক ঘট জলই ওঠে না, কিন্তু তাহার সঙ্গে জলাশয়ের আরও কতকটা জল অনেকদূর উঠিয়া পড়ে। সেইরূপ মহাপুরুষও যখন বিশেষভাবে কোন এক বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার উন্নতি সেই এক বিষয়েই আবদ্ধ থাকে না, অন্যান্য বিষয়েও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই অল্পবিস্তর উন্নতি লাভ করেন। যিনি প্রজ্ঞানের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, বিজ্ঞানের পথেও তাঁহার কতকদূর অগ্রসর না হইয়া উপায় নাই; আবার বিজ্ঞানেরও পথে যিনি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, প্রজ্ঞানেরও পথে তাঁহার কতকদূর অগ্রসর হইতেই হইবে—না হইয়া উপায় নাই। রাজা রামমোহন রায় যখন অধ্যাত্মরাজ্যের উন্নতিশিখরে আরোহণ করিলেন, তখন তিনি সেই একই বিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে উন্নতিসাধনের পথে অগ্রসর হইতে স্বতই বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি যে হিন্দুসমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিপার্শ্বস্থ সেই হিন্দুসমাজকেও উন্নতির পথে তুলিয়া ধরা তাঁহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। সেইরূপ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যখন ভারতের বহু সহস্র যুগব্যাপী ধারা অনুসরণ করিয়া অধ্যাত্ম বিষয়ে উন্নতি লাভ করিলেন, তাঁহার সেই উন্নতির সঙ্গে দেশে নানাবিষয়ক উন্নতির একটা বাতাস বহিয়া গিয়াছিল; রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তাই প্রকৃতির নিয়মেই তাঁহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরিপার্শ্বস্থ হিন্দুসমাজেরও উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজের অবস্থা সমুন্নত ছিল না, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। অন্য সকল বিষয় ছাড়িয়া দিলেও, ঐ যে বলপূর্ব্বক সতীদাহের অন্যায্যতা জনসাধারণের উপলব্ধিতে আসে নাই, তাহাই তো তদানীন্তন হিন্দুসমাজের অধঃপতন ও শোচনীয় অবস্থা স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই সতীদাহ নিবারিত হইয়াছিল বটে, এবং হিন্দুসমাজে উন্নতির অরুণ আভা দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ের হিন্দুসমাজ রামমোহন রায়ের সময় হইতে বড় অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে অযথা গুরুবাদ, অযথা পৌরোহিত্য প্রভৃতির সাহায্যে প্রবর্ত্তিত সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার যে পুঞ্জীভূত গাঢ় অন্ধকার দেশের গগনাঙ্গনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে সেই অন্ধকারের এক চতুর্থাংশও অপসৃত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। যে পথ দিয়া দেশবাসীকে সত্যের লক্ষ্যভূমিতে উপনীত হইতে হইবে; ভগবৎপ্রাপ্তির যে পথ ভারতের পূর্ব্বতন ঋষিরা ভারতবাসীর জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, কালক্রমে সেই পথ শতবিধ আগাছায় কণ্টকাকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল—সেই পথ দিয়া লক্ষ্যভূমিতে উপনীত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে সাহসের অভাবে, আলস্যজনিত অবসাদের কারণে রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে সে সমস্ত আগাছা কাটিয়া কুটিয়া পথটী জনসাধারণের জন্য খুলিয়া দিতে কেহই অগ্রসর হন নাই। একমাত্র অসমসাহসিক রাজা রামমোহন রায়ই স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি

---

* শততম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই মাঘে বিবৃত।

অসির সাহায্যে, অসাধারণ জ্ঞানের কুঠারের আঘাতে সেই সকল কণ্টকতৃণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া পথটী জনসাধারণের গমনাগমনের উপযোগী করিয়া খুলিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি সেই পথটীকে সুপ্রশস্ত সুপরিষ্কৃত রাজপথে পরিণত করিবার অবসর পান নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অন্যতর যুগপ্রবর্তক।

অবশেষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই স্বয়ং এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশ, বেদান্তপ্রবেশ-প্রণেতা চন্দ্রশেখর বসু প্রভৃতির ন্যায় সুপণ্ডিত পণ্ডিতদিগের সাহায্যে ঋগ্বেদ অবধি তন্ত্র পর্য্যন্ত ভারতের শাস্ত্রসিন্ধু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া ঐ পথটীকে সুপ্রশস্ত রাজপথে পরিণত করিয়া শুধু ভারতবাসী নহে, কিন্তু জগতবাসী জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির মুখ খুলিয়া দিবার জন্য যেমন বর্ত্তমান যুগ রামমোহন রায়ের যুগ বলিয়া সর্ব্বসাধারণে স্বীকৃত হয়, এবং রাজা রামমোহন রায়ই যেমন সাধারণত যুগপ্রবর্ত্তক ও নমস্য মহাপুরুষ বলিয়া গৃহীত হন, সেইরূপ আর একদিক দিয়া বর্ত্তমান যুগকে আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও যুগ বলিতে পারি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেও বর্ত্তমান যুগের অন্যতর যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া ধরিতে পারি। রাজা রামমোহন রায় উন্নতির যে সকল ক্ষীণধারা স্বর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়াছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই সকল ধারা মর্ত্ত্যভূমে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, সুপ্রশস্ত নদের আকারে বহমান হইবার সুযোগ দিয়া বর্ত্তমান যুগের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বাণী।

শুধু বেদবেদান্ত প্রভৃতি ভারতের শাস্ত্রসিন্ধু নহে, কিন্তু তৎসঙ্গে বাইবেল, কোরাণ এবং পাশ্চাত্যজগতের দর্শনাদি আলোচনা-অনুধ্যানের ফলে ও সুতীক্ষ্ণ মনীষার বলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতার এই এক অসাধারণ মন্ত্র আবিষ্কার করিলেন যে, ব্রাহ্মণ-পঞ্চম জাতিনির্ব্বিশেষে, ইংলণ্ড-ভারত দেশ-নির্ব্বিশেষে, ধনী-দরিদ্র ও পাণ্ডিত-মূর্খ অবস্থানির্ব্বিশেষে, মানবমাত্রেরই ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার আছে। এই উদারতম বাণী, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার এই চরম বাণী রাজা রামমোহন রায় তাঁহার জীবনের কার্য্যের দ্বারা অতি ক্ষীণ স্বরে আমাদিগকে শুনাইলেও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই জগতের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম স্পষ্টতম ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন—তাঁহার পূর্ব্বে এই গভীরতম সত্য আর কেহই এত স্পষ্টরূপে এত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে, রাজা রাম-মোহন রায়ের আবির্ভাব না হইলে, খুব সম্ভব, আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে পাইতাম না। ইহাও কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হইলে আজ আমরা রাজা রামমোহন রায়কে চিনিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের মূল কেন্দ্র ছিল, সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল। এই স্বাধীনতার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই তিনি পূর্ব্বতন প্রথার অনুগমনে হ্রীং ক্লীং প্রভৃতির ন্যায় গুপ্তমন্ত্রের দ্বারা দীক্ষার্থীকে দীক্ষিত করিবার ব্যবস্থাপ্রবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে ভগবানে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনমূলক ও মঙ্গলসাধক উপাসনার অমোঘ মন্ত্র মানবমাত্রেরই জন্য চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিলেন,—ছড়াইয়া দিলেন। স্বাধীনতা তাঁহার প্রাণ ছিল বলিয়াই তিনি ইহাকে কর্ণেজপ গুরুমন্ত্রের ন্যায় গুরুর অন্তর-কৌটায় আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইতে পারিলেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের আর সমস্ত ঘটনার কথা যদি মুছিয়া যায়, তাঁহার প্রকৃত উপাসনার বীজমন্ত্র এবং স্বাধীনতার বাণী চিরজাগ্রত থাকিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

দেবেন্দ্রনাথ সকল ধর্ম্মে সন্তুষ্ট।

এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইবার কারণেই তিনি সকল ধর্ম্মের প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন। হাফেজের কবিতা শুনাইতে শুনাইতে তিনি কিরূপ মসগুল হইয়া যাইতেন, তাহা ব্রাহ্মমণ্ডলীর অনেক প্রাচীন ব্যক্তির নিকট অনেক ভাবে শোনা যাইত। মহর্ষি খৃষ্টধর্ম্মেরও প্রতি বীতরাগ ছিলেন না। আমার বেশ মনে পড়ে, একদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহার পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে গিয়াছি—দেখি, তাঁহার সম্মুখে এক-খানি ছোট তেপায়ার উপর একখানি কাল চামড়ায় বাঁধা বাইবেল রাখা আছে। যতদূর মনে পড়ে, তাহা হইতে এক অংশ তিনি আমাকে পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। আমি তাঁহার জীবন আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমি খুবই জোরের সহিত বলিতে পারি যে, তিনি কোনও ধর্ম্মেরই বিরোধী ছিলেন না; কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও কোনও ধর্ম্মের অন্তর্গত নরপূজা, মূর্ত্তিপূজা, অবতারবাদ প্রভৃতির সমর্থক অংশ খুব সাবধানতার সহিত দূরে পরিহার করিতেন। আমাদের দেশের অবস্থা বিবেচনায়, নরপূজা মূর্ত্তিপূজা অবতারবাদ প্রভৃতি খুব সহজেই আমাদের দেশে পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহা তিনি বিবেচনা করিতেন, এবং এবিষয়ে তাঁহার বিশেষ আশঙ্কা ও ভীতি ছিল, ইহা আমরা বেশ জানি। এবিষয়ে তিনি কি হিন্দুধর্ম্ম, কি মুসলমানধর্ম্ম, কি খৃষ্টধর্ম্ম, কোনও ধর্ম্মেরই মধ্যে ভেদবিচার করিতেন না। দুই একটী গল্প বলিলেই এবিষয়ে তাঁহার মনোভাব পরিস্ফুট হইবে আশা করি। আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে রাজা রামমোহন রায়ের যে স্মৃতিসভা সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্মৃতিসভায় রামমোহন রায়ের একটী প্রস্তর-মূর্ত্তি রাখা হয়, এবং সেই প্রস্তরমূর্ত্তির কণ্ঠে রাশি রাশি পুষ্পমাল্য অর্পিত হইয়াছিল; তদুপরি, রাজার পরমভক্ত ও জীবনীলেখক ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রতি, কথায় কথায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে করিতে তাঁহাকে অনেকটা দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মহর্ষি সভার বিবরণ সুস্পষ্টরূপে শুনিয়া ভবিষ্যতের স্মৃতিসভায় রাজার কোন প্রকার প্রতিমূর্ত্তি রাখিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন, এবং তদনুসারে আমাদের বাটীতে পুনরায় যে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সে সভায় রাজার কোনও প্রকার মূর্ত্তি চিত্র বা প্রস্তরমূর্ত্তি রাখা হয় নাই। একবার মহর্ষির অন্যতর পৌত্র ৺দ্বিপেন্দ্রনাথ এবং মহর্ষির

শিষ্য ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী পরামর্শ করিয়াছিলেন যে মহর্ষির পরলোকগমনের পর তাঁহার দগ্ধাবশেষ ভস্ম লইয়া শান্তিনিকেতনের সুপ্রসিদ্ধ ছাতিমতলায় প্রোথিত করিয়া তদুপরি একটী মন্দির নির্ম্মিত করাইবেন। কোনক্রমে কথাটী মহর্ষির কানে গিয়া পৌঁছাইল। তিনি উভয়কে ডাকাইয়া ঐ অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে ঐরূপ কার্য্যের ফলে তাঁহার সমস্ত জীবনের সংকল্প ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সাধারণত এই দুইটী কথা ক্ষুদ্র মনে হইলেও আমাদের দেশবাসীর যেপ্রকার মানসিক ভাব, তাহাতে মহর্ষির এপ্রকার মত পোষণ করা অস্বাভাবিক হয় নাই। আমাদের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে মহর্ষির নিজের একটা মূর্ত্তি রাখা আছে; আশ্চর্য্য! কয়েকজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সেই মূর্ত্তিকে দেবমূর্ত্তি বিবেচনায় প্রতিদিন নিয়মিত ফুলচন্দনে পূজা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্টবিরোধী ছিলেন না।

আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপরে দণ্ডায়মান হইবার কারণেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ত্রিত্ববাদী প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম এবং তাঁহার সমসাময়িক খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রচার-প্রণালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসলেখকদিগের অনেকেই মহর্ষির সমসাময়িক ব্যক্তি। তাঁহাদের সময়ে যে কলহবিবাদ ব্রাহ্মসমাজে সমুত্থিত হইয়া মহর্ষি ব্রহ্মানন্দের বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছিল, সেই কলহবিবাদের কোন বিষয়েরই বিচার এখানে করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু ইহা বলিলে নিশ্চয়ই অসংগত হইবে না যে, সেই কলহ-বিবাদের কারণে তাঁহাদের কতকটা দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের লিখিত ইতিহাসেও উহার ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ একটী ইতিহাসে লিখিত আছে—(দেবেন্দ্রবাবুর) "খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি বিষম বিদ্বেষ এবং আন্তরিক ঘৃণাই চিরদিন প্রকাশ পাইয়াছে। কেবল হিন্দু ধর্ম্মকেই তিনি সর্ব্বস্ব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন"। উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতার বলে আমি যাহা জানি তাহাতে খুব জোরের সহিত বলিতে পারি যে, ঐ উক্তি ভ্রমপূর্ণ ও অনিষ্টকর উক্তি। রাজা রামমোহন রায় কল্পিত চীনদেশীয় লোকের মুখে উপহাসপূর্ণ বিচারের ভিতর দিয়া খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তাহাতে রাজাকে যদি খৃষ্টবিরোধী বলা না যায়, তবে প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম্ম এবং তাহার অন্যায় প্রচারপ্রণালীর বিরুদ্ধে যাওয়ায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেও খৃষ্টবিরোধী বলা যাইতে পারে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ খৃষ্টবিরোধী, এই অযথা অপবাদ আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সময় আসিয়াছে, যখন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের ঐ সকল কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে, হৃদয় হইতে ঐরূপ অপবাদ অসংগত ও ভিত্তিহীন বলিয়া নির্ম্মূলরূপে উৎপাটিত করিতে হইবে এবং প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে যত্নবান হইতে হইবে।

অন্যায় খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারপ্রণালীর বিরোধী ছিলেন।

মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনি কখনও কিছু বলিয়াছেন বলিয়া তো মনে পড়ে না—বলিবার কোনও অবসরই আসিয়াছিল বলিয়া জানি না। একথা অস্বীকার করি না যে, নরপূজা অবতারপূজা প্রভৃতির প্রতীকরূপে খৃষ্টপূজার এবং বিশেষভাবে তাহার নীতিবিরুদ্ধ প্রচার-প্রণালীর বিরুদ্ধে তিনি যথাশক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার কারণ দেবেন্দ্রনাথের গভীর স্বাধীনতাপ্রীতি। সেই সময়ে একদিকে আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে খৃষ্টান মিশনরিগণ চাঁদাসংগ্রহের উদ্দেশ্যে হিন্দুসমাজের বড় বেশী কুৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অপরদিকে ছলে বলে কৌশলে এদেশবাসীকে খৃষ্টান করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সকল ঘটনা দেবেন্দ্রনাথকে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিল। ঐ যে মতের স্বাধীনতা প্রকারান্তরে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল, উহা দেবেন্দ্রনাথের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাই তিনি বিশেষভাবে খৃষ্টধর্ম্মের তাদনীন্তন প্রচারপ্রণালীর বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। উহারই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকল্পে তিনি হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন—যাহার প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়। উহারই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকল্পে তিনি তাঁহার পরম বন্ধু ও সহায় ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু দ্বারা সেই সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক অগ্নিময় বক্তৃতা দেওয়াইয়া তদানীন্তন মিশনরিগণের ভিতরে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সকল উপায় অবলম্বিত না হইলে আজ এদেশ হইতে Hindu culture যে কতদূরে সরিয়া যাইত তাহা বলা যায় না।

বাঙ্গলায় পত্রব্যবহার।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে স্বাধীনতাপ্রিয়তা এতই গভীর ছিল যে, তিনি official চিঠি না হইলে ইংরাজী ভাষায় চিঠি লিখিতেন না। সেই কারণে আমাদের পরিবারে সাধারণত বাংলায় পত্রব্যবহার একটা গৌরবের প্রথারূপে দাঁড়াইয়াছিল। আমরা যখন দেখিতাম যে, কোন পরিবারে পিতাপুত্র নিজেদের মধ্যে ইংরাজীতে পত্রব্যবহার করিতেছেন, তখন আমরা তাহা অবাক-দৃষ্টিতে দেখিতাম এবং হাসিয়া গড়াগড়ি যাইতাম।

উপাধিলাভে বিমুখতা।

স্বাধীনতাপ্রিয়তার ফলেই তিনি কোনপ্রকার রাজোপাধি লাভের জন্যও লালায়িত হন নাই। ইহা তাঁহার পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য্য নহে। যে শাণ্ডিল্য-গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে সমাগত সেই শাণ্ডিল্যগোত্রীয়দিগের আদিপুরুষ মহাপুরুষ কবি ভট্টনারায়ণ রাজা আদিশূরের নিকট হইতে ভূমি উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু তাহা রাজপ্রসাদ-রূপে বিনামূল্যে গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই। প্রবাদ আছে যে, ইহাঁর পিতা পূজ্যপাদ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়কে রাজোপাধি দিবার প্রস্তাব হইলে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে "বাবু" উপাধিই যথেষ্ট।

দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুপ্রবণতার কারণ।

স্বাধীনতার প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকিবার কারণেই তিনি উপনিষৎ প্রভৃতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মনের ভাব ছিল এই যে, নিজের দেশে নিজেদের শাস্ত্রে যখন শতসহস্র যুগের

সঞ্চিত অমূল্য ধন পাওয়া যায়, সামান্য চেষ্টায় যখন সহজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তখন দূরদূরান্তরে পাশ্চাত্য-সেবিত শাস্ত্রাদির ভিতরে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য আকুলচিত্তে ধাবমান হইবার প্রয়োজন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি প্রবণতার, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থকে শ্রুতিস্মৃতির মন্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবার ইহাই একমাত্র কারণ।

উচ্ছৃঙ্খলতার বিরোধী।

স্বাধীনতা তাঁহার পরম প্রিয় বস্তু হইলেও উচ্ছৃঙ্খলতার তিনি এতটুকু পক্ষপাতী ছিলেন না। বরঞ্চ আমার মনে হয় যে, তিনি শৃঙ্খলার একটু বেশী ভক্ত ছিলেন। মাঘোৎসবের সময় অথবা পারিবারিক কোন অনুষ্ঠানের সময় বেদীর কোন্ দিকে কে বসিবেন, কে উপাসনাকার্য্য করিবেন, কে বা প্রার্থনা করিবেন, কে বা উপদেশ দিবেন, এ সমস্ত বিধিবদ্ধ করিয়া তাহা ছাপাইয়া এক-একখানি মুদ্রিত কাগজ প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে দেওয়াইতেন।

উপসংহার।

এই স্মৃতিসভা যাঁহার উদ্দেশে আহূত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গেলে আমাদিগকে সকান্তঃকরণে স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করিয়া সত্যং শিবং সুন্দরং পরমেশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে হইবে; উচ্ছৃঙ্খল ভাবকে হৃদয় হইতে নির্ম্মূল করিতে হইবে। তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের আসন অধিকার করিতে গেলে একদিকে যেমন সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাকে, বিশেষত আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে প্রাণের বস্তু করিয়া লইতে হইবে; অপরদিকে তাঁহার সেই অমোঘ মুক্তিমন্ত্র—ভগবানে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্যসাধনরূপ একমাত্র উপাসনা দ্বারাই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়—সেই অমোঘ মুক্তিমন্ত্রকে কৌস্তুভ মণির মত অন্তরে ধারণ করিতে হইবে, এবং সেই মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে।*

মিলনোৎসবে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের নামে আজ আমরা এই পবিত্র স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে সমবেত হইয়াছি। তিনিই আমাদের পূজার একমাত্র পাত্র। এই উৎসবের প্রারম্ভে হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই প্রণিপাত করি।

এই মাঘ মাসের শুভ একাদশ দিবসে ব্রাহ্মসমাজের এক শতাব্দী পূর্ণ হইতে চলিল। সেই উপলক্ষ্যে আজ যে আমরা সকল ব্রহ্মোপাসক ছোটখাটো মতামতের পার্থক্য ও বিভিন্নতা ভুলিয়া গিয়া একত্র মিলিত হইয়া যথার্থই একপ্রাণে একহৃদয়ে সমবেত কণ্ঠে সেই বিগত-বিবাদং পরমেশ্বরের মহিমাকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। এই যে বৎসরে বৎসরে মাঘোৎসবের ভিতর দিয়া ভগবান আমাদিগকে নিবিড় প্রেমের মধ্যে মিলিত হইবার একটী সুন্দর অবসর প্রদান করেন, ইহার গুরুত্ব বড় অল্প নহে। এই শততম ব্রহ্মোৎসবে মিলিতভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য আজ যে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার গুরুত্ব এতই অধিক যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। এই সুযোগের ভিতর, এই অবসরের ভিতর আমি কেবলই ভগবানের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব, তাঁহার মঙ্গল হস্তের প্রত্যক্ষ স্পর্শ সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি। এই শততম ব্রহ্মোৎসবে ব্রহ্মোপাসকদিগের মিলনসভার ভিতর দিয়া, প্রথম প্রথম যে সকল মিলনসভা হইয়াছিল, সেই সকল সভার সুন্দর ছবি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া আমার চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে। ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু, ব্রহ্মানন্দে মগ্নপ্রাণ শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কর্ম্মবীর আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী এবং অন্যান্য যে সকল মহাপ্রাণ ব্রহ্মোপাসকেরা সর্ব্বপ্রথম এই মিলিত ব্রহ্মোপাসনার বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধন্য—তাঁহারা ধন্য। মনে পড়ে, আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে প্রথম যে মিলিত ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল, সেই উপাসনামণ্ডপে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মুখ হইতে এই উদার বাণী—মূল বিষয়ে ঐক্য, অবান্তর বিষয়ে পার্থক্য এবং সকল বিষয়েই সদয় ভাব—unity in essentials, difference in non-essentials and charity in all—এই উদার বাণী শুনিতে পাই। মনে পড়ে, এই প্রকার মিলিত ব্রহ্মোপাসনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নামিয়া আসিয়া উপস্থিত সকলের উপরে তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেন এবং সমবেত সকলের শ্রদ্ধাভক্তি প্রগাঢ় আকারে তাঁহার অভিমুখে সমুত্থিত হইত—সে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা যদি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া দেখিতেন যে, তাঁহাদের রোপিত মিলিত ব্রহ্মোপাসনা আমাদের অন্তরের পরস্পরপ্রীতি কিরূপ বৰ্দ্ধিত করিতেছে, আমাদের পরস্পরের মন হইতে ছোটখাটো পার্থক্যজনিত মান অভিমান দ্বন্দ্বকলহ বিদূরিত করিবার সহায়তা করিতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা আমাদের মস্তকে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ অজস্রধারে বর্ষণ করতেন।

আর দুই দিন পরেই শুভ ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন অবধি শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। এই শতাব্দীয় ব্রহ্মোৎসবে আজিকার এই মিলিত ব্রহ্মোপাসনার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের পরস্পরের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করিয়া পরস্পরের হাত-ধরাধরি করিয়া আমাদিগকে একতার, উন্নতি ও মঙ্গলের পথে এবং সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। দ্বেষহিংসা দ্বন্দ্ববিবাদ পদতলে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া মিলিত শক্তিতে অধর্ম্ম ও বিনাশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। পরস্পরের সহানুভূতিপূর্ণ সাহচর্য্যে মিলিতভাবে কার্য্য করিবার উপরেই ব্রাহ্মসমাজের সকল আশাভরসা নির্ভর করিতেছে। সংসারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের সাহায্যের আদান-প্রদান ভগবানের মঙ্গল বিধান। আহারে বিহারে, জ্ঞান অর্জ্জনে বা ধর্ম্মলাভে, সকল বিষয়েই পরস্পরের সাহায্যের আদানপ্রদান অনিবার্য্য। জগতের ইতিহাসেও দেখা যায়, যে জাতিতে বা সমাজে পরস্পরকে সাহায্য করিবার ভাব যত কম, সেই জাতি বা সমাজ

---

* শততম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ৩ই মাঘ আলবার্ট হলে বিবৃত।

ততই হীনবল, এবং যে জাতিতে বা সমাজে সাহায্য করিবার ভাব প্রবল, সেই জাতি বা সমাজ উন্নতির পথে তত দ্রুতগতি অগ্রসর হয়। ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবকালে মৈত্রীভাব, পরস্পরকে সহায়তা করিবার ইচ্ছা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই অল্পকালের মধ্যেই দেশবিদেশ ব্যাপ্ত করিয়া ইহার প্রবল প্রতাপ অনুভূত হইয়াছিল। অল্পকালের মধ্যেই জাতীয় জীবনের সকল বিভাগেই ইহা একটা প্রবল শক্তিরূপে দাঁড়াইতে পারিয়াছিল।

আজ শততম ব্রহ্মোৎসবের এই মিলনক্ষেত্রে ভগবানের নামে আমাদের সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী আবার সমভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠুক। চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, দেশবিদেশের চারিদিক হইতেই মিলনের ক্ষুদ্রবৃহৎ শত শত নির্ঝর নিঃসৃত হইয়া প্রবল বন্যার আকারে জগতকে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। আমরা যে সত্যধর্ম্মের পতাকা বহন করিয়া অমৃতধামের যাত্রী হইবার পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছি, তাহারও মূল প্রাণ মৈত্রীসাধন। তাই উদারতম ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া আমাদেরও সকলকে একপ্রাণ একহৃদয়ে মিলিতে হইবে। আজ এই নবজাগরণের দিনে সেই পরম পুরুষ ভগবানকে একমাত্র পিতামাতা জানিয়া জীবনকে ধন্য কর এবং শুধু কথায় নয়, কাজেও মিলনের এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং—এক হৃদয়ে চল এবং একপ্রাণে কথা বল। বর্ত্তমান শুভ অবসরে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া, সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। বর্ত্তমান জাগরণকে আরও জাগ্রত করিয়া তোল।

আমরা যদি ব্রাহ্মসমাজকে আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল বলিয়া জানি; ব্রাহ্মসমাজকে যদি আমরা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার উৎস এবং সকল কল্যাণের মূল বলিয়া মনে করি; ইহা জানিয়া ব্রাহ্মসমাজকে যদি আমরা সকল প্রকার অমঙ্গল অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি; ব্রাহ্মসমাজকে যদি সত্যই আপনার মনে করিয়া তাহাকে অকালমৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইতে ইচ্ছা করি, তবে নিশ্চয়ই মৈত্রীভাবকেই আমাদের সকল কার্য্যের নিয়ামক করিয়া তুলিতে হইবে। এখন আমাদিগকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে যে, বিরোধবিবাদের সময় চলিয়া গিয়াছে, বৃথা বাদবিসম্বাদের সময় চলিয়া গিয়াছে। এখন আমাদিগকে মিলিতভাবে পরস্পরের স্কন্ধে স্কন্ধ দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে; মৈত্রীকে সহায় করিয়া ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া অধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিতে হইবে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতে হইবে।

মূল বিষয়ে আমাদের ঐক্য রাখিতে হইবে। ভগবানে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ উপাসনা দ্বারা মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূল বীজমন্ত্রে একমত হইয়া জীবনের পথে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি অবান্তর বিষয়ে থাক না কেন শত মতভেদ। উপাসনাপ্রণালী, অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রভৃতি ধর্ম্মের বহিরঙ্গ বিষয়ে চলুক না কেন মতামত লইয়া তর্কবিতর্ক বাদবিসম্বাদ। কিন্তু ঈশ্বরভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, লোকহিতৈষণা প্রভৃতি ধর্ম্মের যাহা সার, সেই সকল বিষয় দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের একত্র মিলিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে।

সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র হইতেছে—ঈশ্বরকে প্রীতি করিয়া এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াই তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। এই উদারতম ধর্ম্মবীজ এবং তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত মহান উদার ধর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিয়াছি, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসনার ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তখন মৈত্রীভাবকে আমাদের সকল কার্য্যের পশ্চাতে দূরে সরাইয়া রাখিলে চলিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি আমাদের নিজেদের জীবনে প্রতিপালিত দেখিতে চাই; ব্রহ্মোপাসনাকে দেশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত যদি সত্যই আমরা অন্তরে পোষণ করি; ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও চরিত্রে যদি সন্তানগণকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শ লক্ষ্যপতিষ্ঠ দেখিবার ইচ্ছা রাখি; অবসাদগ্রস্ত ব্রাহ্মসমাজকে যদি নবজীবনে উৎফুল্ল দেখিতে চাই; তবে স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া, সঙ্কীর্ণভাবকে নির্ম্মূল করিয়া, অহংকারকে ছিন্ন করিয়া মৈত্রীভাবকেই আমাদের সকল কার্য্যের নিয়ামক করিতেই হইবে।

অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মই হইল মৈত্রীভাবের শ্রেষ্ঠতম ভিত্তি। এই সত্যধর্ম্ম জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যতই ফুটিয়া উঠিতেছে, মৈত্রীভাবও ততই অভিব্যক্ত হইয়া জাগ্রতভাব ধারণ করিতে চলিয়াছে। এই সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইলে কিছুতেই বিবাদ আসিতে পারে না। বিশ্বজগত ব্যাপ্ত করিয়া যে সত্যধর্ম্ম দাড়াইয়া আছে, তাহা লইয়া কি প্রকারে বিবাদ আসিবে? ঈশ্বর আছেন, ইহার উপর বিরোধ আসিতে পারে না; ঈশ্বরকে প্রাণ মন দিয়া ভালবাসিতে হইবে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, একথা লইয়াও বিবাদ আসিতে পারে না। সেই সর্ব্বব্যাপী সত্যকে যখন সীমাবদ্ধ সংসারে নামাইয়া আমাদের সীমাবদ্ধ কার্য্যে প্রয়োগ করিতে চাই, তখনই বিরোধের সম্ভাবনা আসে।

বিরোধ-বিবাদ দূর করিয়া মৈত্রীভাবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে আমাদিগকে ঐ অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের উপর, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের উপর দাঁড়াইতে হইবে; সংসারে তাহার প্রয়োগপ্রণালীর উপর বেশী ঝোঁক দিলে চলিবে না। আমাদের স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, ভগবান এক, কিন্তু তাঁহার অনন্ত শক্তি অসংখ্য মানবে অসংখ্য আকারে নামিয়া আসিতেছে। সুতরাং সহস্র মতভেদ সত্ত্বেও কাহাকেও ঘৃণা করিবার অধিকার আমাদের নাই; অথবা এই অসংখ্য মানবকে ছোটখাটো মতামত বিষয়ে বলপূর্ব্বক আমাদের সহিত এক ও অভিন্ন করাইবার অধিকারও নাই। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই চাহে যে, তাহার বহিঃস্থিত প্রত্যেক ধর্ম্মই তাহার ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক মতে, প্রত্যেক ক্রিয়াপদ্ধতিতে সম্পূর্ণ সায় দিবে; সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই চাহে যে, প্রাণে যত মিল হোক আর নাই হোক, সকলেই তাহার বহিরঙ্গে সায় দিক। কিন্তু সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে, সকলে মূলভাবে, বীজমন্ত্রে একমত হোক, প্রাণে একমত হউক, কিন্তু অন্যান্য অবান্তর বিষয়-

সকলে যথাযথ স্বাধীনতা অব্যাহত থাকুক। ব্রাহ্মধর্ম চাহেন যে, ভগবানের নামে যেন আমাদের সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী সমানভাবে ঝঙ্কার দিয়া ওঠে, এবং আমাদের সকল কার্য্যই স্বাধীনভাবে প্রত্যেকের নিজের নিজের উপযোগীরূপে করিবার অধিকার থাকিলেও যেন সে সমস্তই তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের অনুগত করা হয়।

সত্যধর্ম্মের এক অঙ্গ ভগবানকে প্রীতি করা—এটী আমাদের প্রত্যেকের নিজের প্রাণের কথা, এবং ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ। সত্যধর্ম্মের বহিরঙ্গ হইল তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। এবং বহিরঙ্গই হইল মৈত্রীভাবের সাধনাক্ষেত্র। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে গেলে যেমন আমাদের নিজেরও শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, তেমনি অপরাপর সাধুভক্তজনেরও নিকটে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। আবার, সিদ্ধির পথে যাহা লাভ হইবে তাহাও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বাটিয়া দিতে হইবে। একদিকে আমাদের নিজেদের হৃদয়কে বিশ্বজগতের সহিত একসুরে বাঁধিতে হইবে, অপরদিকে ভাইবন্ধু দেশবাসী সকলেরই হৃদয়কে সেই সুরের সঙ্গে সমতানে ঝঙ্কার দিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। শত মতভেদ সত্ত্বেও বিবাদবিসম্বাদকে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দূরে রাখিতে হইবে; শত মতভেদ সত্ত্বেও অন্তরে দ্বেষহিংসাকে স্থান দিতে পারিব না।

মৈত্রীসাধনের পথে অগ্রসর হইলে, আমাদের মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে আমরা নব-বলে বলীয়ান হইতে পারিব। এই সদ্ভাব ও শান্তি অপেক্ষা সংসারে ভগবানের শ্রেষ্ঠতর আর কোন আশীর্ব্বাদ আছে কি না সন্দেহ। মৈত্রীসাধন এবং তাহারই পরিণামে শান্তি ও সদ্ভাবস্থাপন সর্ব্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণসাধনের অনুকূল। সমাজে বল, জাতিতে বল, বা গৃহে বল, সর্ব্বত্রই বিরোধবিবাদ বিষকীটের ন্যায় সকল কল্যাণের মূল বিনষ্ট করে। আমরা যেন সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ববিবাদ হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্মুখের শতাব্দীতে মিলিত শক্তিতে পূর্ণ উদ্যমে ভগবানের উপাসনাপ্রচারে দৃঢ়সংকল্প হই। এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে যাহাতে কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, সকল কার্য্য সকল প্রতিষ্ঠান সত্যধর্ম্মের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজকে সজীব রাখিতে চাহিলে, ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিমান করিয়া তুলিতে চাহিলে কেবল ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে নয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও, যেখানে যে কোন ক্ষেত্রে শুভকার্য্য ও কল্যাণপ্রদ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে, নিজের স্বার্থের প্রতি দৃকপাত না করিয়া এবং সত্যধর্ম্মের বীজমন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেই সকল অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মসমাজকে যোগদান করিতে হইবে—বীজমন্ত্রের অপ্রতিকূল অনুষ্ঠান আচার-ব্যবহারকে নিজের অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে হইবে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় মৈত্রীসাধনের সুন্দর অবসর আসিয়াছে। প্রেমের যুগ আসিয়াছে। ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। এখন কথাকাটির উপর আর সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই। কেবল ঈশ্বর আছেন জানিয়া কোনই লাভ নাই। তাঁহার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। সংসারঅরণ্যের কণ্টকে যাহারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহাদিগকে সত্যসত্যই প্রাণের মধ্যে স্থান দিতে হইবে, ভ্রাতৃবন্ধনে নিজের বুকের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে, এবং মঙ্গলস্বরূপ ভগবানের অমৃত নাম শুনাইয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে, ঈশ্বরের পথে অটলভাবে দাঁড়াইয়া ভাইবন্ধু সকলকে সেই সরল পথ দেখাইতে হইবে। এক সময়ে যে শক্তিবলে ব্রাহ্মসমাজ সমস্ত হিন্দসমাজে সত্যধর্ম্মের আগুন ছড়াইতে পারিয়াছিলেন, আমাদিগকে আবার সেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া মৈত্রীভাবের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিবার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। একমাত্র ভগবানের মঙ্গল দৃষ্টির উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া দেশের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন আর ভেদাভেদ করিবার অবসর নাই। কে স্পৃশ্য, কে অস্পৃশ্য, কে উচ্চ আর কে নীচ, সে প্রশ্ন করিবার অবসরই নাই। এই সুন্দর অবসরে দেশের মধ্যে মৈত্রীভাবের ধারা বহাইয়া দাও, প্রেমের নদী বহাইয়া দাও এবং বিগতবিবাদ পরমেশ্বরের নাম মহিমান্বিত কর।

আজ এই শততম ব্রহ্মোৎসবে ভগবানের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি যে, সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া অনতিবিলম্বে আমাদিগকে মিলনের সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। হিংসাদ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়া, উচ্চনীচ ক্ষুদ্রবৃহতের ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া আমাদের পরস্পর মিলিতেই হইবে। সংশয়াত্মা সংসারী লোকের কথায় বিচলিত হইও না। আমাদের যিনি একই পিতামাতা, তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে সমাসীন থাকিয়া, আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছেন—পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিও না—মিলিত হও। ঐ অনন্ত আকাশ হইতে সেই মঙ্গলবাণীরই প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছে—মিলিত হও—মিলিত হও। যে সংহতি কার্য্যসাধিকা, যে মিলনে সকল কার্য্য সাফল্যলাভের পথে অগ্রসর হয়; যে মিলনের পরিণামে বলবীর্য্য লাভ হয়, এই শততম ব্রহ্মোৎসবে অদ্যকার এই শুভ মিলন যেন সেই মিলনে পরিণত হয়; এই মিলন যেন আমাদের কথায় ও কার্য্যে এক হয়। আজ এই উৎসবমন্দিরের ভিতর দিয়া যদি আমরা আবার ভায়ে-ভায়ে মিলিতে পারি, তবে এই ব্রহ্মোৎসব সার্থক হইবে, ব্রাহ্মসমাজ ধন্য হইবে। সেই মিলনের উপর দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিবেন, এবং ভগবান তাঁহার নিত্য আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।

আজ এই শততম মহামঙ্গোৎসবের ভিতর দিয়া আমাদের মিলিতভাবে কথায় ও কার্য্যে সত্যধর্ম্ম প্রচারের যে শুভ অবসর আসিয়াছে, এই শুভ অবসরে আমাদের নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। ভগবানের মাভৈ-বাণী আকাশের পরতে পরতে প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বনিত হইতেছে। এই জাগরণের মুখে, আমোদপ্রমোদের মোহে পড়িয়া থাকিয়া, ঘুমের ঘোরে মৃতপ্রায় হইয়া থাকিলে চলিবে না। সম্মুখের নবশতাব্দীর মুখে বৃথা হাসিখেলায়, অশ্লীল আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকিলে চলিবে না; ভায়ে-ভায়ে বৃথা দ্বন্দ্ববিবাদ করিয়া নিজের শক্তির, দেশের শক্তির অপচয় করিতে দিলে চলিবে না। ভেদাভেদের কথা দূর করিয়া দাও, নৃত্যগীতের কথা পদতলে দলিত করিয়া দাও। জ্ঞানে বড় হও, ধর্ম্মে বড় হও, কর্ম্মে বড় হও। ভগবানের হস্তে ফলাফলের ভার সমর্পণ করিয়া

নিজের মঙ্গলসাধনে, সমাজের ও দেশের কল্যাণসাধনে একমনে একপ্রাণে আপনাকে নিয়োগ কর। দ্বেষহিংসা বিদূরিত করিয়া জ্ঞানে বিদ্যায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে ও অর্থে সকল বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা কর—পরস্পরের প্রতি দক্ষিণমুখ প্রকাশ কর—সহায়হস্ত বিস্তার কর। স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণপঞ্চমনির্ব্বিশেষে, সকলের সম্মুখে জ্ঞানলাভের দুয়ার খুলিয়া দাও। ভগবানের অমোঘ আশীর্ব্বাদ দেশের মস্তকে ঝরিতে থাকুক; দেশ সজীব হইয়া উঠুক, এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের সাহায্যে সকল সদ্গুণের আধার হইয়া উঠুক। সমগ্র দেশে আনন্দের সুবিমল হাসি এবং শুভ অনুষ্ঠানের মঙ্গল শঙ্খ আবার বাজিয়া উঠুক।

এস, আমরা মিলিতকণ্ঠে এই মিলনোৎসবের যিনি দেবতা, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সেই মহান দেবতা পরমেশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া জীবনকে ধন্য করি। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় হইতে এবং সমবেত কণ্ঠ হইতে ভগবানের নামে এই জয়ধ্বনি সমুত্থিত হউক—জয় ভগবানের জয়।*

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

Invocation

(Sadananda Sj Kali Prasanna Biswas)

[গত ১০ই মাঘ শুক্রবার সায়ংকালে আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সদানন্দ শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয় ইংরাজী ভাষায় যে উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহার উদ্বোধন ও উপদেশ নিম্নে যথাক্রমে প্রকাশিত হইল।]

We have assembled here today, on the memorable occasion of the hundredth anniversary of the Theistic Church in India, founded by the late illustrious Raja Ram Mohun Roy, of blessed memory, of Bengal. This is a day of rejoicing not only for the members of the Brahmo Samaj, (the Theistic Church), but for all Indians, nay for the whole world. The new spirit, that we find now manifested in every religious body—the spirit of catholicity and toleration—the spirit of unity and brotherhood—the spirit of love and humanity—the spirit of work and service—the spirit of universal faith and charity—the spirit of nationalism and self consciousness—owes a great deal to the movement inuagurated by the great founder of the Brahmo Samaj. We, therefore, think it our first duty to commence our proceedings of today with a grateful and reverential remembrance of Raja Ram Mohun Roy. Next to him, our homage is due to the late Maharshi Devendra Nath Tagore, who having realised Brahman in self, had elevated the devotional side of the Theistic Church to so great an extent that he became worthy of the name of Maharshi, and was acknowledged by the members of all communities in India as such. Then we must not forget to pay our humble tribute to the late Brahmananda Keshud Chundra Sen, the beloved disciple of the Maharshi, whose devotion towards the cause of the Brahmo Samaj cannot be gain-said. Then we should pay our respectful tribute and reverence to the venerable Pandit Siva Nath Sastri, and all the departed and living enthusiasts of the Brahmo Samaj, who sacrificed their everything for the cause of Theism. We also offer our most respectful namaskars to all the Theistic missionaries of the world, to the Acharyas, and members of all the Theistic Churches in India and abroad who are keeping the flag of our church unfurled in every part of the world. Our heart next turns with adoration to the feet of the saints and prophets of all nations, of all religions and of all times all those that have passed the pale and all those who are in the land of living here on earth, who have contributed directly or indirectly to mould, shape and develope the views and thoughts of the Brahmo samaj. There are many members of other religions, who, although they have not the courage enough to come to the fold of our church for some reason or other, have practically broken the limits of bigotry and sectarianism, and accepted the principles of the Brahmo samaj in heart. To them also, we send our greetings, May they be with us today present in spirit on this auspicious occasion !

To you, our young friends, the future torch-bearers of our beloved church, we offer our most sincere and heartfelt love and blessings, May the Divine Light descend on you and make you worthy of the trust we impose on you with full confidence ! The old workers of our samaj are now worn out. They have done their duty, the most strenuous duty, during the critical days of our movement, and done it exceedingly well, for which they deserve your thanks. May God bless them ! They now want rest, the well deserved rest, I should say, and it will be cruel on your part to inflict on them any

---

* শততম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ৯ই মাঘে বিবৃত।

more pressure. They should now be allowed to take rest and watch and guide you. You should now relieve them and take up their work in your own hands. Let the flag of the Brahmo samaj be unfurled by you in every part of the world already approached or not ! Let you be blessed with the sadhana of Maharshi, and eloquence of Keshub ! Let your lives be dedicated lives like that of Pandit Sivanath ! Let your energy be always evergreen as that of our friend Krishna Kumar ! Let you be successful in uniting the whole world under the banner of the Theistic Church ! Let your young blood infuse a new spirit in the service of One God without a second and thereby fulfil the desire of the founder of the Brahmo samaj ! This is our most ardent prayer.

Let us now invoke the blessings of the Almighty and Omnipresent God. May He be manifest here to accept our humble prayers and offerings !

Message to Young India.

INDIA is now coming under a psychic change. A momentous change awaits the country in the near future. You that are young have, therefore, a most sacred duty, a most responsible and difficult task before you. Will you rise equal to the occasion ?

Then must you prepare yourselves and acquire the necessary *Shakti* which will make India great again. I by no means underrate physical *Shakti* which Patanjali regards as a preliminary stage of *Yoga*. The Rishis spoke not without reason of *Hotayoga*, *pranayam* &c. The physical *shakti* helps in maintaining health of the body and so helps the concentration of mind. Physical *shakti* is necessary: but we must not confound it with brute force which robs man of all his finer qualities, and turns him into a beast. The real physical *shakti* is non-violence and not violence.

These are days of revolutions, but a revolution does not necessarily mean violence. India needs a revolution but of a higher character. India neebs a spiritual revolution which will remove all the dirt and rust from our religions all the accumulations of ages. Violence will not help India. In the words of Mazzini "The world-Spirit calls her to the service of humanity", and violence is not service. The life of India should be a life in the Spirit—the creative-spirit and not one of brute force. The *shakti* of India now lies hidden, imprisoned, suppressed. You must release it and utilise it for the service of your Motherland—nay of the whole world. In order to do so, you must have strong and unwavering faith in God, and you should have clean hearts and unbending will. Let God be your guiding star ; let love be your weapon of war ; let service be your aim and aspiration ; and let sacrifice be your coveted victory.

India's religion is *Nishkam Dharma*. Develope the Soul-force within you and be inspired with the *Skakti* before which the strongest material power will benought, all diplomacy will vanish and all communalism will disppear. This was the secret of Mazzini, who liberated Italy, it was the sarength of Vashista who defeated Viswamitra and his powerful army, it is the only weapon with which Mahatma Gandhi has captured the heart of India.

I know it is difficult to persuade a man of the present day to believe it. Materialism has shaken his faith in religion. He struggles for worldly pleasures and has no time to think of God—no opportunity to test the power of the Almighty.

Listen to Mazzini : "I do not know speaking histoiically, a single conquest of the human spirit, or a single important stage for the perfecting of human society", he says, ' which has not had its roots in a strong religious faith. Without God, you can coerce, but you cannot persuade ; you may be tyrants in your turn, but you cannot be educators and apostles.

"Without religion,—deep, heartfelt, vitalising religion, there can be no true community. Materialism had been tried, and had failed—failed because it was "an individualist, cold calculating doctrine. that slowly, infallibly extinguished every spark of high thinking or free life, that fiirst plunged men into the worship of success, then made them slaves of triumphant violence and the accomplished fact, It

killed enthusiasm in the individual; it killed true greatness in a nation."

Materialism was not the aim of our Rishis before whom the most powerful monarchs trembled. Materialism cannot bring salvation to a country. Materialism has given the West only wars, strifes and confusion, which the people there now deplore. Even in our unfortunate country the very advent of materialism has been signalled by communal and other strifes, troubles, disorder and insecurity. Therefore I say:—materialism will be of no help to us at any time. India needs the spiritual force which alone will achieve our salvation.

The leaders of the materialistic world are now gradually realising that they have gone too far, and they must cry halt. This has given rise to the League of Nations, and if today all the talk of world peace, disarmament &c., has not achieved success, the reason is not far to seek: they are still struggling in a boat without a spiritual helmsman in the fierce and troublous waters of materialism.

This should be a lesson to you, young men of India,—this should convince you of the superiority of spiritual force over material power-intoxication. The spiritual force is everlasting and eternal but the material power is transitory and limited to time, and sooner or later it must collapse like a house of cards having no solid foundation in religion and God.

I want you, young men, therefore, to profit by what is before you and cultivate the real *shakti* the Spiritual Shakti, India needs at present. You must determine once for all whether you should follow your Rishis of old, who had raised India to the highest pinnacle of civilization, or the materialistic culture of Marx, Mussolini and Stalin, leading the world to a path of destruction.

Your must remember that a Nation is in Mazzini's noble words "a God appointed instrument for the welfare of the race, and in this alone its moral essence lies. Countries are but the workshops of humanity and a Nation is a living task, her life is not her own, but a force and a function in the universl Providential scheme". "Humanity is a great army," said Mazzini, "to the conquest of unknown lands, against enemies both strong and cunning. The peoples are its corps, each with its special operation to carry out, and the common victory depends on the exactness with which they execute the different operations."

I find to my great distress, that in this land of the Rishis some of our young leaders want to banish religion and God from the country. This impending danger, I ask you most solemnly and with all the force I can command, to avoid, if you would do real good to your country,—if you would save pour country, your dear Motherland, from a dire calamity.

India's patriotism must be based on religion. India, the Land of the Rishis and Prophets, has given inspiration to the world. Let you not forget thaa India has a great mission—a moral duty—a solemn responsicility not only to her own people but to the whole world.

Let your patriotism be silent and manly, hating display and talk; and bright with a spiritual flame that will neither be "roared to heaven nor sunk in ashes". I want you to create that irresistible moral and spiritual force, by which you will not only be able to raise your own Motherland but the whole world, that now lies prostrte in depths of materialism,

"O my brothers, love your country. Country is our home, the house that God has given us, settling thereon a populous family, to love us and be loved by us, to ukderstand us and be understand by us better and more readily than others are". These are the burning words of patridism with which Mazzini inspired young Italy to save his country. I repeat ahese memorable words to you. Love your country, love the noble tradition of your country, and be good to humanity. Your Risihis have taught you, thar love is the divine weapon with which the whole world can be conquered. Your conquest should be conquest of love. Love God, love your religion, love your country and love humanity. This is the ideal of India life placed before you by your saints and prophets.

Patriotism is love. It is sacred and unselfish. It is based on truth and righteousness. Its soul is God, its body is religion, and the limbs are we all the people. A true patriot's heart is saturated with the love-spirit, which is not confined to one country or one nation alone, but embraces humanity as a whole. I do not want you to sacrifice yourselves at the altar of Godless creeds. "Be good, be good" advised Mazzini to his young friends. My advice to you is also, "Be good, be exceedingly good and serve humanity with your goodness". Startle the whole world with India's conception of true patriotism. Love your own country and love also other countries. This is the idea of patriotism I have cherished throughout my life; this is the conception of patriotism before which I have bowed down my humble head in reverence; this is the patriotism which should be the shrine of your heart's temple.

Rise up O! sons of the East! rise up from your long slumber, and make yourselves ready for the spiritual conquest of the world. Let your *Sadhana* subjugate materialism as Lord Buddha subjugated Mara. In your hands lies the final salvation of the Motherland. And in there lies the hope of the world. This is not a dream. I see a clear vision before me—I hear a distinct voice within me. Therefore I say to you:—awake! arise! and claim the heritage of the Rishis. Believe me the final victory, the final glory are yours. But on this one condition that you are true to India and her spiritual ideal, true to the rishis and there inspiration.

Sadananda—
Editor, the Message.

১১ই মাঘের উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান আজ ভারতভূমিতে যে নবজাগরণ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার প্রবল বেগ প্রতিরুদ্ধ করে কাহার সাধ্য? সমগ্র বিশ্বের প্রাণ হইতেও এই জাগরণের অনুকূল এক আশ্চর্য্য পবনহিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে। এই নব জাগরণের দিনে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। শুভ ভাব ও চিন্তা, শুভকর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের সাহায্যে নব জাগরণের পথে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পথে দ্রুতবেগে চলিয়া যাও। অগ্রসর হইলেই জীবন লাভ এবং নিদ্রা ও আলস্যের ক্রোড়ে শয়ন করিলে মৃত্যু ও বিনাশ অপরিহার্য্য।

এই নব জাগরণের মূলপ্রাণ স্বাধীনতার আকাংক্ষা। ইহা চিরন্তন ও অক্ষয়, কারণ ইহা প্রতি মানবের অন্তরে ভগবৎপ্রদত্ত জন্মগত অধিকার। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার মধ্যে বাস করিবার ফলে আমরা স্বাধীনতার মর্য্যাদা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছি, এবং কুসংস্কার প্রভৃতির গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনতাকে আটক রাখিবার ব্যবস্থা করি। পরাধীনতা সর্ব্ববিধ দুঃখ ও অমঙ্গলের নিদান এবং সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা উন্নতি ও মঙ্গলের কারণ, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার উপর আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করে, ইহা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। কিন্তু মানবের অন্তরে ভগবন্নিহিত অক্ষয় উৎস হইতে স্বাধীনতা-স্রোত প্রবাহিত হইতে বিরত হয় নাই।

আজ একশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, ঐ বিশালবপু ও বিরাটহৃদয় দূরদর্শী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন যে, এই স্বাধীনতা-স্রোতকে বৃথা রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে সময়ে ইহার সংহত বেগ ভারতের বৈশিষ্ট্যকে কোথায় ধুইয়া লইয়া যাইবে। তাই তিনি ঐ সকল গণ্ডী ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতাস্রোতকে সরলপথে বহিতে দিয়া ভারতভূমিকে এবং সমগ্র জগতকে শস্যশ্যামল করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

স্বাধীনতার মূল উৎস একমাত্র ভগবান। স্বাধীনতার অর্থ উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। স্বাধীনতা জীবন আনয়ন করে, দেহে মনে ও আত্মাতে শক্তি ও তেজ সঞ্চার করে; উচ্ছৃঙ্খলতা দেহ মন ও আত্মার শক্তি ও তেজ হরণ করিয়া মানুষকে মৃত্যু ও বিনাশের পথে লইয়া যায়। স্বাধীনতা মানবের অন্তরে ভগবন্নিহিত অমোঘ শক্তি; উচ্ছৃঙ্খলতা মানবপ্রবর্ত্তিত ধ্বংসসাধক প্রলয়ের তাণ্ডবলীলা। দূরদর্শী রাজা রামমোহন রায় ইহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া ঐ স্বাধীনতাস্রোতকে ভগবদুপাসনার পথে পরিচালিত করিয়া দেশের নবজাগরণকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শতাব্দী পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যের গুরুত্ব সাধারণ দেশবাসী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেও এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রচারিত সত্যসকল শতাব্দী পরে তাঁহার দেশবাসীর নিকটে উদ্ভাসিত হইবে।

তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইতে চলিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল মুক্তিপ্রদ বাণীসকল আজ একটী প্রকোষ্ঠের চারি কোণের মধ্যে অথবা একটী ব্রহ্মমন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ না থাকিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে—ভারতবাসী জনসাধারণের মর্ম্মে মর্ম্মে মিশিয়া গিয়া সুফলপ্রসূ শতবিধ আকারে প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। আজ শতাব্দী পরে কেবল ভারতবাসী নয়, সমগ্র জগতবাসী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের সত্যসকল শুধু বৃহত্তর হিন্দুসমাজের নয়, কিন্তু জগতের সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইতেছে। তাই মনে করি, এই শতাব্দী পরে ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত আনন্দ উৎসবের দিন আসিয়াছে।

সত্যধর্ম্মপ্রচারে ব্রাহ্মসমাজের সকল সমাজের সকল সম্প্রদায়ের অগ্রণী হইয়া চলিতে হইবে। যতদিন না ব্রাহ্মসমাজকে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে দেখিব, ততদিন আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জাগরণবাণী প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতে ক্ষান্ত হইব না যে, ব্রহ্মোপাসকমাত্রকেই সমস্ত জাতি অপেক্ষা কি জ্ঞানে, কি বিদ্যায়, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে, সকল বিষয়ে উন্নত হইতেই হইবে। হিন্দুসমাজও যদি বাঁচিতে চায় এবং প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, তবে ব্রাহ্মসমাজকেও বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্মের যে নবতর সত্যমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সত্যমূর্ত্তিকেও সজীব রাখিতে হইবে।

ভগবানের দান সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে সজীব রাখিতে চাহিলে এবং তাহার প্রচারকেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিলে আমাদিগকে নবোদ্যমে নবোৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য তত্ত্বসকল ধনীর অট্টালিকায় এবং দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, সুখের সংসারে এবং পাপীর তাপক্লিষ্ট আঁধার প্রাণে, সর্ব্বত্র বহন করিতে হইবে। আমাদের বক্তৃতা উপদেশ প্রভৃতি কেবলমাত্র ব্রহ্মোপাসকদিগের উদ্দেশে দিলে চলিবে না। যে হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই মহত্তর হিন্দুসমাজ এবং বৃহত্তম মানবসমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সকল কার্য্য করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিমান করিতে চাহিলে কেবল শিক্ষিতদের মধ্যে ইহার বিশুদ্ধ মতসকল আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। উচ্চ-নীচনির্ব্বিশেষে, পাপী-সাধুনির্ব্বিশেষে, বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে, নর-নারীনির্ব্বিশেষে, দেশ-বিদেশ-নির্ব্বিশেষে, জগৎবাসীমাত্রকেই ইহার আশ্রয়ে টানিয়া আনিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় মহত্বপূর্ণ সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইবার পথে পদে পদে ভুলভ্রান্তি হইতে পারে; পদে পদে বৃথা ও মিথ্যা নিন্দাবাদ, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উপহাসের সুতীব্র বাণ বর্ষিত হইবে; কিন্তু তাহার জন্য কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ হইলে বা কাপুরুষের মত সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে চলিবে না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্যের পথে, দিকে দিকে সত্যধর্ম্মের বীজ বপন করিবার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুলভ্রান্তির মূল নষ্ট করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ শত অত্যাচার অবিচার শত অপবাদ উপহাস সহ্য করিয়াও কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া একনিষ্ঠভাবে সত্যধর্ম্মকে অন্তরে ধারণ করিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমানে জনসমাজে এক আশ্চর্য্য সবল প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই মাঘোৎসব তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবার সুন্দর অবসর। তাঁহাদের জীবন কেবল ব্রাহ্মসমাজের নয়, সমগ্র জগতের ধর্ম্মসমাজের গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের সাধুজীবন পথপ্রদর্শকরূপে আমাদের গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। তাঁহারা সুখ-সোয়াস্তি অপেক্ষা মন্ত্রের সাধনকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা এখন মন্ত্রের সাধন অপেক্ষা সুখ-সোয়াস্তিকেই অধিক করিয়া দেখি। কিন্তু বিনা স্বার্থত্যাগে, দেশের মঙ্গল ও জাতির কল্যাণরূপ বৃহত্তর স্বার্থের নিকট নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলিদান না করিলে কোনও সদনুষ্ঠান দাঁড়াইতে পারে না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তর হইতে নিঃসৃত এই মহা সত্যবাণী অন্তরে ধারণ কর এবং নির্ভয় হও—"আমাদের সম্মুখে পর্ব্বতসমান বাধা, কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়"। ভয় নাই—ভয় নাই, ভগবানের মাভৈরবের এই শৃঙ্গধ্বনি গগন ভেদ করিয়া আজ শততম মাঘোৎসবে আমাদের কর্ণে ও মর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে। চারিদিক হইতে স্বাধীনতার ও মঙ্গলের একটা প্রবল বায়ু বহিতেছে। সকলের সমবেত শক্তিতে এই বায়ুর অভিমুখে পাল তুলিয়া দাও—নিশ্চিন্ত থাকিও, সত্যধর্ম্মের তরণী কখনই ডুবিতে পারে না—কর্ণধার ভগবান তাঁহার সবল হস্তে হাল ধরিয়া আছেন।

যদি তোমাদের সত্যই এই বিশ্বাস থাকে যে, অপ্রতিহতশক্তি ভগবান আছেন, এবং তিনিই এই বিশ্বচক্রের মঙ্গলবিধাতা ও নিয়ন্তা, তবে তাঁহার পতাকাবহনে এবং তাঁহার সত্যধর্ম্মের মন্ত্রশক্তি বিতরণে কার্পণ্য প্রদর্শন করিও না। একনিষ্ঠ হও। ব্রত উদ্‌যাপনে দৃঢ়সংকল্প হও।

ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুও বরণীয়, তোমাদের বিজয়বিষাণে এই অমরবাণী ধ্বনিত করিতে করিতে অগ্রসর হও। কোনপ্রকার ভয়ে ভীত হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না, বিরামবিশ্রামের আকাংক্ষা করিও না, আলস্যে ও বিলাসে গা ভাসাইয়া দিও না।

হে অন্তর্য্যামী! বিমতবিবাদং তোমার আবির্ভাবে আমাদের বিরোধী যাঁহারা, তাঁহারাও বিরোধ পরিত্যাগ করুন, এবং আমাদের সমবেত কণ্ঠ হইতে তোমারই জয়ঘোষণার বিপুল আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইয়া গগনের পরতে পরতে প্রতিধ্বনিত হৌক। তোমার আগমনে আমাদের দ্বন্দ্ববিবাদ অপহৃত হৌক, কলহ-বিরোধ শান্ত হৌক। আমাদের পাপতাপ লজ্জাভয় বিনাশপ্রাপ্ত হৌক। তোমার নামে আমরা যে উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেই মাঘোৎসব সার্থক হৌক। *

ব্রাহ্মসমাজের দান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের নামে আজ আমরা এই পবিত্র স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে সমবেত হইয়াছি। তিনিই আমাদের পূজার একমাত্র পাত্র। এই মহামহোৎসবে আমাদের হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই প্রণিপাত করি।

আজ মাঘের শুভ একাদশ দিবস। এই ১১ই মাঘে এই ব্রহ্মমন্দিরে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়—জগতের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এই পুণ্যতীর্থে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। একশত বৎসর পূর্ব্বের এই কথা; আর আজ পূর্ণ একশত বৎসর পরে, সেই মন্দিরে আমরা বিশ্ববিধাতা অখিলমাতা পরমেশ্বরের পূজা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি—আমার অন্তরে আনন্দ যে কিপ্রকার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি যখন ভাবি যে, এই মন্দিরের নিম্নতল হইতে এই তৃতীয়তল পর্য্যন্ত প্রত্যেক তলের প্রতি ইষ্টকখানি যথাকালে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষদিগের উচ্চারিত ব্রহ্মনামের ধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই মন্দিরে আমি বসিয়া ভগবানের নাম উচ্চারণ করিবার—শুনিবার ও শুনাইবার অধিকার পাইয়াছি, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

শুনিতে পাই, এই পুণ্যতীর্থ নাকি একটু দূরবর্ত্তী বলিয়া অনেক বালক বৃদ্ধ ও যুবা এখানকার উপাসনায় যোগদান করিতে পারেন না। হিন্দু বা মুসলমান কোন প্রাচ্যবাসীর মুখে একথা আমরা শুনিতেই চাই না। কোথায় বদরিকাশ্রম, আর কোথায় কন্যা কুমারিকা, আর কোথায় মক্কা বা মেদিনা, হাজার হাজার ক্রোশ দূরবর্ত্তী তীর্থসমূহে যাঁহারা পদব্রজে যাইতে কুণ্ঠিত হন না, সেই নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপ্রাণ প্রাচ্যবাসীর মুখে বা তাঁহাদের বংশধরদিগের মুখে সিকি ক্রোশ বা অর্দ্ধ ক্রোশ প্রভৃতির দূরত্বকে এই তীর্থস্থানে আসিবার বাধা হইবার কথা আমরা শুনিতে চাই না। আমি দেখিয়াছি, নিষ্ঠাবান ব্রহ্মোপাসক বৃদ্ধ ধনী ব্যক্তি সুদূর হেদুয়া অঞ্চল হইতে স্বীয় পৌত্রাদিকে সঙ্গে করিয়া আমৃত্যু প্রতি বুধবার উপাসনায় নিয়মিতরূপে যোগদান করিয়াছেন। প্রাচীন ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, আমাদের দেশের প্রাচীন ধারা বজায় রাখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যোড়াসাঁকো হইতে ভবানীপুর এবং বেহালায় ব্রাহ্মসমাজে সদলবলে পদব্রজে গমন করিতেন, ফিরিবার সময় যানবাহনে চড়িয়া ফিরিতেন। এই শতবার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এই পুণ্যতীর্থের উপাসনায় নিয়মিতরূপে যোগদান করুন এবং উপাসনা বা অন্যান্য বিষয়ে যাহা মঙ্গলজনক বিবেচনা করেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করুন।

আমার ইহা পরম সৌভাগ্য মনে করি যে, আমা অপেক্ষা বিজ্ঞতর ও শ্রেষ্ঠতর অনেক ব্যক্তি থাকিতেও সেই অকিঞ্চনগুরু মঙ্গলবিধাতা ভগবান শতবার্ষিক মহোৎসব, এই শততম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবার গৌরবপূর্ণ অধিকার এই অকিঞ্চনের উপর সন্ন্যস্ত করিয়াছেন। কোথায় সেই বিশালবপু ও বিরাটহৃদয় রাজা রামমোহন রায়, আর কোথায় বা আমি; কোথায় সেই ধ্যানবীর ব্রহ্মানন্দরসপানে নিমগ্ন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আর কোথায় বা আমি; কোথায় বা ভক্তিবীর ও কর্ম্মবীর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আর কোথায় বা আমি। পুরাকালে যেরূপ ঋষিরা তাঁহাদিগের যাগযজ্ঞে দেবতাদিগকে আবাহন করিতেন, আজ এই শতবার্ষিক ব্রহ্মোৎসবের মহাযজ্ঞে আমরাও সেইরূপ ঐ সকল মহাপুরুষদিগের আবাহন করিতেছি—তাঁহারা আমাদের এই উৎসবযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া আমাদের সঙ্গে একপ্রাণে একহৃদয়ে পরব্রহ্মের জয়কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া আমাদের এই উৎসবযজ্ঞকে সফলতা প্রদান করুন।

মানুষের জীবনে একশত বৎসর দীর্ঘকাল মনে হইতে পারে, কিন্তু একটা সমাজের জীবনে, একটা জাতির জীবনে একশত বৎসর বিন্দুপরিমিত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু যে ব্রাহ্মসমাজ এই শতবর্ষের মধ্যে রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষদিগের জন্মদান করিয়াছে, সে ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত অশ্রদ্ধার চক্ষে দৃষ্টিযোগ্য নহে। এক শতাব্দী মধ্যে যে ব্রাহ্মসমাজ দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল, সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের বীজ রোপণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে ব্রাহ্মসমাজ যে নিশ্চয়ই এক শক্তিকেন্দ্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শক্তিকেন্দ্র হইতে শতাব্দী মধ্যে আমরা কি পাইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ দেশকে কি দিয়াছেন, জগতকে মঙ্গলের পথে কতটুকু অগ্রসর করিতে পারিয়াছেন, শতাব্দী পরে সে সমস্ত আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে করি।

মানুষ শরীর, মন ও আত্মা লইয়াই মানুষ। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য আলোচনা করিতে গেলে, মানুষের

---

* শততম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১১ই মাঘে বিবৃত।

শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দ্য বিধান, মানসিক উন্নতিসাধন এবং ভগবানের সহিত আত্মার আধ্যাত্মিক যোগসাধন, এই তিন বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ দেশকে কি দিয়াছেন, আমাদের তাহাই দেখিতে হইবে। খাওয়া পরার ব্যবস্থা না থাকিলে, অন্নবস্ত্রের যথাযুক্ত সংস্থান না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে না। যে দেশে, যে জাতির মধ্যে মানুষ অন্নবস্ত্রের অভাবে মৃতপ্রায় থাকে, সে দেশের মঙ্গল নাই, সে জাতির কল্যাণ নাই। ইহা বুঝিয়া প্রজার সপক্ষে সর্ব্বপ্রথম দাঁড়াইলেন কে? ঐ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মজ্ঞানের ধারা আনিবার ভগীরথ—ঐ রাজা রামমোহন রায়। যখন দেশে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সর্ব্বপ্রথম সংশোধন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইল, তখন টাউন হলে সভা করিয়া অধিকাংশ জমীদারের মতের বিরুদ্ধে প্রজাগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক সর্ত্তসমূহের স্বপক্ষে দাঁড়াইলেন কে? ঐ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিজেন্দ্রনাথ-প্রমুখ পুত্রগণ। দেশের অধিকার সংরক্ষণের জন্য যে সভা অগ্রণী, সে সভার মূল সংস্থাপক ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংপৃক্ত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর। মূলত দেশের প্রজাসাধারণের জন্য যে সভা সংস্থাপিত হইল, সেই সভার মূল সংস্থাপক ঐ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংপৃক্ত, স্বাধীনতার ভাবে পরিপুষ্ট আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রভৃতি। যে সতীদাহ প্রকারান্তরে নারীহত্যায় দাঁড়াইয়াছিল, সে সতীদাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন কে? ব্রাহ্মসমাজেরই দুই কর্ম্মবীর—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর।

ইহা তো জানা কথা, বাল্যবিবাহ বল, বহুবিবাহ বল, এই সকল সামাজিক কুপ্রথা নিবারণেও অগ্রণী হইয়াছিলেন—ঐ ব্রাহ্মসমাজ। বর্ত্তমান বিধবাবিবাহের সপক্ষে যে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে, সেই বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তন জন্য যিনি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, সেই দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মসমাজেরই ভাবে পরিপুষ্ট ছিলেন—বহুকাল যাবৎ তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজই এক হিন্দু খৃষ্টপন্থীকে তাঁহার প্রার্থনামত পুনরায় হিন্দু ব্রহ্মপন্থী-রূপে গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি সাধনের পথ বহুকাল পূর্ব্বে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এক সময়ে যখন সুরাপান শিক্ষিত সমাজের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়া মহামারীর ন্যায় উহাকে নির্ম্মূল করিতে বসিয়াছিল, তখন কে তাহার বিরুদ্ধে পতাকা উত্তোলিত করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া সাড়া পাইয়াছিলেন?—কে তিনি?—ঐ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। আজ যে দেশের সর্ব্বত্র রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সুবিস্তৃত দেখিতে পাই; ঐ সকল সেবাশ্রমের সেবকগণকে অক্লান্তভাবে ও গ্লানিমুক্ত প্রাণে রোগশোকে ক্লিষ্ট দেশবাসী জনসাধারণের সেবা করিতে সমুদ্যত দেখি, তাহার আদর্শ কে সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল? ঐ কয়েকজন ব্রাহ্মযুবকের প্রতিষ্ঠিত দাসাশ্রম। দাসাশ্রম স্থাপনের পূর্ব্বে, পথের ধারে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, রোগক্লিষ্ট এমন কি, কুষ্ঠরোগীদিগেরও সেবায় যে দেশবাসী আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, একথা কাহারও ধারণাতেই আসে নাই। বর্ত্তমানে অসংযত স্ত্রীস্বাধীনতার নামে অনাকিস্তর উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়াছে সত্য; কিন্তু ঐ যে ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান যুগে আর্য্যঋষিগণের প্রচারিত এবং তাঁহাদের পদানুসরণে জনসাধারণের সেবিত শাস্ত্রসম্মত স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল এবং পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ ব্যবহারের উপদেশ ক্রমাগত দিয়া আসিয়াছিল, সেই সমস্ত মহান ভাব অন্তর্নিগূঢ় ভাবে কার্য্য করিবার ফলে দেশবাসী যখন মাতৃভাব গ্রহণের অধিকারী হইলেন, সেই শুভ মুহূর্ত্তে অর্দ্ধোদয় যোগ দেখা দিল এবং সেই যোগস্নান উপলক্ষে দেশবাসীর পরীক্ষা উপস্থিত হইল; সেই পরীক্ষায় দেশবাসী উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পথে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। নারীগণের শালীনতাবিধায়ক পরিচ্ছদ, যে পরিচ্ছদ মোটামুটি বলিতে গেলে সমগ্র ভারতের শিক্ষিত সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেই পরিচ্ছদেরও মূলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবার, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এই সকল হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা করিবার পথে ব্রাহ্মসমাজই অগ্রণী হইয়া আসিয়াছেন।

কেবল শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে যত্নবান হইয়াই ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চেষ্ট হয় নাই। শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের ন্যায় মানসিক উন্নতিবিধানেও ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বাগ্রে পতাকা বহন করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় বুঝিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব হইলে শারীরিক সুখবিধানের ব্যবস্থা কিছুতেই স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। তাই তিনি শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতিসাধনে নিজের শক্তি যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন বুঝিয়াছিলেন যে, তদানীন্তন দেশীয় পণ্ডিতদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালীর ফলে সে তেজ আসিতে পারে না, যাহার সাহায্যে কুসংস্কার ও কুপ্রথাসকল বিধ্বস্ত হইতে পারে। তিনি তাঁহার দূরদর্শিতায় ইংরাজী শিক্ষার সুফল সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যে শিক্ষার গুণে দেশবাসী আজ স্বাধীনতাসংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার সক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, সেই ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের স্বপক্ষে রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সুপ্রসিদ্ধ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা দেশের শিক্ষিত সমাজের সকলেরই সুবিদিত। একথা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, তদানীন্তন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের শিক্ষা ধরিয়া থাকিলে আজ দেশবাসী স্বাধীনতাসংগ্রামে কখনই নামিতে পারিতেন না—কুপ্রথা ও কুসংস্কারসকল দেশকে আরও কতদিন যে আঁকড়াইয়া থাকিত, কতদিন যে দেশকে উন্নতির পথ হইতে পিছাইয়া রাখিত, তাহা কে বলিতে পারে? আজ যে বঙ্গভাষা এত শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, ঐ রাজা রামমোহন রায়ই তাহার মূল পত্তন করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্র বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া দেশবাসী শুধু পণ্ডিতদিগের নিকটে নহে, কিন্তু জনসাধারণের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া

দিবে? বঙ্গভাষাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার জন্য তাহার ব্যাকরণ আবশ্যক—ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ঐ রাজা রামমোহন রায়ই তাহার আদর্শ দেশবাসীকে প্রদান করিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পর যিনি ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার হইলেন, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশবাসী জনসাধারণের নিকট জ্ঞানের পথ উদারভাবে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন—নির্ব্বাধ করিয়া দিলেন। রাজা রামমোহন কিছুদিনের জন্য কৌমুদী নামে একখানি সম্বাদপত্র প্রকাশ কারলেও বেশী দিন উহা চলে নাই। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শুধু বাঙ্গলায় নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতের দেশীয় মাসিক পত্রের জননী তত্ত্বোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিয়া এবং তাহাকে ভাবরাজির শতভূষণে বিভূষিত করিয়া দেশের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার ও বিতরণের যে কি অনুপম বিধান করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। ভগবানের দয়ায় এই তত্ত্বোধিনী পত্রিকাই সর্ব্বপ্রথম দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব দেশবাসীর সম্মুখে তাহাদের নিজেদের ভাষায় সমুপস্থিত করেন। এই তত্ত্বোধিনী পত্রিকাই দেশবাসীকে সর্ব্বপ্রথম এবং আজ ৮৭ বৎসর ধরিয়া দেশীয়ভাবে ও স্বদেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে দেশবাসীর জীবনের এমন কোন বিভাগ ছিল না, যে বিভাগে ব্রাহ্মসমাজ না মঙ্গলস্পর্শে উন্নতিসাধন করিয়াছিল। দেশবাসীর প্রকৃত উন্নতি চাহিলে কিরূপ বিদ্যালয় করা উচিত; কেবল বিদেশীয় রাশি রাশি সাহিত্য কণ্ঠস্থ করিয়া নয়, কিন্তু ধর্ম্মভিত্তির উপর দেশীয়ভাবে চরিত্রগঠনের সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষা কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে, তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই কলিকাতাবাসী সমগ্র শিক্ষিত সমাজের সহযোগে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। বেদ স্ত্রীশূদ্রাদির পাঠ্য নয়, এই অন্যায় বাধা ভাঙ্গিয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতেই সর্ব্বপ্রথম বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া নরনারী নির্ব্বিশেষে দেশবাসী সাধারণের সুপাঠ্য করা হইল। ব্রাহ্মসমাজ হইতেই সুলভ মূল্যে সানুবাদ অমূল্য শাস্ত্ররাশি একটীর পর একটী প্রকাশিত হইয়া ক্রমাগত আঘাত করিতে করিতে দেশবাসীকে নিজেদের মানসিক উন্নতিবিধানে জাগাইয়া তুলিল। ঐ ব্রাহ্মসমাজের কুসংস্কারমুক্ত ভাবে পরিপুষ্ট মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর অগ্রসর হইয়া শবদেহ স্পর্শ করিবার পথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা এত চিকিৎসক ও চিকিৎসালয় পাইতেছি। এই যে আজ ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা ব্যাখ্যানাদি শুনিতে পাই, ইহার মূলেও ঐ ব্রাহ্মসমাজের প্রদত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান। এই যে আজ চারিদিকে সঙ্গীতচর্চ্চার বন্যা আসিয়াছে, রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভায় সেই "অলখ নিরঞ্জনেই" তাহার সূত্রপাত এবং ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিই তাহার বিস্তৃতির একমাত্র কারণ।

কিন্তু এই যে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে এবং মানসিক উন্নতিবিধানে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী হইয়া পথপ্রদর্শন করিতে পারিলেন, ব্রাহ্মসমাজ তাহার মূল—আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় যখন উপনিষৎ প্রভৃতি ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনই তিনি অন্তরে বুঝিয়াছিলেন নিঃসন্দেহ যে, মানবমাত্রের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা আছে। নরনারীনির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণচণ্ডাল-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই যে ভগবানকে লাভ করিবার অধিকার আছে এবং যে কোন জ্ঞান, যে কোন বিদ্যা তাহার উপায়স্বরূপে সম্মুখে আসিবে, তাহার পথে বাধা দিবার অধিকার কাহারও নাই, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার এই সত্যতত্ত্ব রাজা রামমোহন রায় যে ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই স্বাধীনতার কথা স্পষ্টতম ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া সমগ্র ভারতে এবং সমগ্র বিশ্বজগতে এক ধর্ম্মোজ্জ্বল কর্ম্মোজ্জ্বল নবযুগের প্রবর্ত্তন করিলেন। বেদবেদান্তের ভিতরে প্রবেশ করিয়া এবং শাস্ত্ররাশি অনুসন্ধান করিয়া যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বাণী—ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার নরনারীমাত্রেরই আছে—লাভ করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে নিবদ্ধ করিলেন, আশ্চর্য্য এই যে, শত শত বৎসর যাবৎ প্রচলিত ভারতের অন্তরে বদ্ধমূল সংস্কারের বিরুদ্ধ হইলেও, ঐ বাণী সত্য বলিয়াই তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের এবং অগ্রগামী অধ্যাপকদিগের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই সহযোগিতায় ঐ সত্যবাণী আজিকার মত এক শুভ ১১ই মাঘের পবিত্র দিবসে বিঘোষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বে আর কেহই বলিতে পারে নাই বলিয়া, শুনিয়াছি, ঐ ঘোষণার দিনে দেশবাসীর প্রাণে এক আশ্চর্য্য সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। আমরা ঐ স্বাধীনতার মধ্যে লালিত পালিত বলিয়া আমাদের পক্ষে ঐ সাড়ার পরিমাণ করা সাধ্যায়ত্ত নয়। চিরপরাধীন ব্যক্তির স্বাধীনতালাভের ন্যায় দেশবাসী ঐ মুক্তিবাণী শুনিয়া মুক্তির পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিল।

এই মুক্তিবাণীর সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া আর একটী অমোঘ শান্তিমন্ত্র দেশবাসীকে দিয়াছেন। সেই শান্তিমন্ত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ—ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনাই সর্ব্ববিধ মঙ্গল ও কল্যাণের আকর। ঐ স্বাধীনতার বাণী এবং ঐ শান্তিমন্ত্র বর্ত্তমান যুগের গতি উন্নতির পথে মঙ্গলের পথে আশ্চর্য্যরূপে ফিরাইয়া দিয়াছে।

এই সকল কার্য্য করিয়াই ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন নিঃশেষ হয় নাই। এখনও ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ঘন অন্ধকারের ভিতর আলোকের প্রয়োজন যেমন তীব্রভাবে আমাদের উপলব্ধিতে আসে, সন্ধ্যার আলো-আঁধারের ভিতর নূতন কোন আলোকের প্রয়োজন তত তীব্রভাবে উপলব্ধ হয় না; সেইরূপ বর্ত্তমানে আমরা ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত সত্যসমূহের ভিতরে সর্ব্বদা লালিত পালিত ও সর্ব্বথা পরিপুষ্ট হইতেছি বলিয়া উহার প্রয়োজন আমাদের অন্তরে সেই আদিমকালের ন্যায় তত তীব্র আঘাত প্রদান করে না। যে প্রয়োজন লইয়া ব্রাহ্মসমাজ এই বঙ্গদেশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে প্রয়োজন সংসিদ্ধ হইতে এখনও অনেক বাকী আছে। আমাদের বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে। যে প্রয়োজন সংসিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, মানবজাতি সাধারণত যতদিন বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, ততদিন ঐ প্রয়োজন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, ঐ প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটা সমাজের উন্নতি ও মঙ্গলের দীপ্ত দীপ ধারণ করিয়া রাখা আবশ্যক। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্যের পথে—এদেশবাসীকে এবং সেই সঙ্গে জগৎবাসীকে পরিচালিত করাই ব্রাহ্মসমাজের জন্মগ্রহণের কারণ। এই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধনের ইচ্ছা ও আশা যতদিন মানবাত্মার অন্তরে জাগ্রত থাকিবে, ততদিন সেই উন্নতির একটা আদর্শ ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটা সমাজকে মাথা তুলিয়া থাকিতেই হইবে।

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূলকেন্দ্র ভগবান। তাই ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বরবাদকেই কেন্দ্রে রাখিয়া অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন। এই একেশ্বরবাদকে কেন্দ্রে রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকে মূল লক্ষ্য করিয়া মৈত্রীসাধনের সঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বারা সংযত স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করাই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। যেদিন আমরা আমাদের ছোটখাটো মনের পরদাসকল ছিন্ন করিয়া সত্যসত্য পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, বিশ্ববাসীকে একই পিতামাতার সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিব, সেইদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন নাই বলিলেও বলিতে পারি, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নয়। যতদিন না আমরা ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের কেন্দ্র করিব, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া তুলিব; যতদিন না আমরা সকলের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার উপর দাঁড়াইতে পারিব, ততদিন ব্রাহ্মসমাজকে আদর্শদীপ হস্তে অবিচলিতভাবে শত সংস্র নিন্দাঝঙ্কার মধ্যেও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, একেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে হইবে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সরল পথ প্রদর্শন করিতে হইবে, স্বাধীনতার অনুপম আনন্দ সাধারণের উপলব্ধিতে আনিতে হইবে এবং মৈত্রীর অপূর্ব্বশক্তি অসাধারণ বল প্রত্যক্ষ করাইতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সমগ্ররূপে সংসিদ্ধ হয় নাই বলিয়া আমাদের নিরাশার কোনই কারণ নাই। ব্রাহ্মসমাজ এই একশত বৎসরের মধ্যে যাহা করিয়াছে, তাহাই আমাদের হৃদয়কে আশায় পূর্ণ করে, এবং তাহারই জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। সম্মুখে নব শতাব্দীর মুখে আমাদের হাহুতাশ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবার অবসর নাই। আপনাকে জান—আপনাকে অমৃতের সন্তান ও অমরণধর্ম্মা বলিয়া জান—মহান্ অগ্নি পরম পুরুষ হইতে নিঃসৃত এক-একটী মহাশক্তি সজীব বিস্ফুলিঙ্গ বলিয়া জান। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, প্রকৃতিতে যেমন হিমালয়েরও প্রয়োজন আছে, সেইরূপ ধূলিকণারও প্রয়োজন আছে; সেইরূপ ভগবানের ধর্ম্মরাজ্যে আমাদের ন্যায় অকিঞ্চনেরও স্থান আছে। ব্রাহ্মসমাজে কার্য্যের অভাব বলিয়া ক্ষোভপ্রকাশের কোনই অবকাশ নাই। আলস্য ও নিশ্চেষ্টতা হইতেই কার্য্যের অভাবের কথার উৎপত্তি হয়। ভগবানের রাজ্যে কার্য্যের অভাব নাই। ব্রহ্মের মঙ্গলস্বরূপে যদি আমাদের স্থির বিশ্বাস থাকে, তবে আমাদের অন্তরে নিরাশা কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না। যে পরব্রহ্মে জগতের সকল উন্নতির পরিসমাপ্তি, সেই সত্য পরব্রহ্মকে যদি আমরা অন্তরের সহিত ধরিয়া থাকি, তবে আমাদের অন্তরে নিরাশা কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না।

ব্রাহ্মসমাজের নিকটে আমরা যাহা কিছু লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য যদি আমাদের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা জাগিয়া উঠে; সত্যসত্যই যদি আমরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের মঙ্গলের জন্য, নানাবিধ পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য কৃতজ্ঞ থাকি, তবে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সমগ্রভাবে সংসিদ্ধ করিবার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত শ্রদ্ধাভক্তি নিয়োজিত করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই শতাব্দীয় ব্রহ্মোৎসবই তো উপযুক্ত অবসর। ব্রাহ্মসমাজের যিনি দেবতা, তিনি আমাদের বন্ধু। এই শতাব্দী পূর্ণ হইবার অবসরে তাঁহাকেই একমাত্র পিতামাতা জানিয়া এবং তাঁহারই আদেশ জানিয়া উত্থান কর, ধর্ম্মকর্ম্মে রত হও; সন্তানগণকে বাল্যাবধি অশুভ দুর্নীতি হইতে রক্ষা করিয়া জ্ঞানধর্ম্মে চলিবার পথপ্রদর্শন কর। সুখদুঃখ বিপদসম্পদ সকলেরই মধ্যে স্নেহময়ী জননীর মঙ্গলহস্ত উপলব্ধি করিয়া নববল লাভ কর। এই শততম ব্রহ্মোৎসবে আমাদের হৃদয়ে নবতর আনন্দের উৎস খুলিয়া যাক, ভয়ভাবনা অন্তর্হিত হোক। যিনি এই জগৎসংসারকে নিশ্বসিত করিয়াছেন, তিনি যখন আমাদের পরম আশ্রয়, তখন আত্মাকে নিরাশা নিরানন্দে ও দুঃখদৈন্যে মুহ্যমান হইতে দিতে পারি না। এই মহামহোৎসবের মধ্যে আমাদের আত্মা সকলের সন্তজনীয় সেই পরমাত্মার পবিত্র সংস্পর্শ লাভের অধিকারী হউক।

নিবেদন।

(শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক)

[ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক সপ্ততিবর্ষীয় প্রবীণ ব্রাহ্ম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ শততম ব্রহ্মোৎসবে যোগদানে অসমর্থ হইয়া রোগশয্যা হইতে এই সংক্ষিপ্ত 'নিবেদন'টুকু পাঠাইয়াছিলেন; এবং ইহা গত ১৩ই মাঘ সোমবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে উদ্বোধনের পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছিল।]

আজ বড় শুভ দিন। শতবর্ষ পূর্ব্বে ১১ই মাঘে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা তদুপলক্ষে এই শতবার্ষিক উৎসব করিতেছি। গত ১৩৩৫ সালের ভাদ্রমাসে আর একটি উৎসব হইয়া গিয়াছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন নিরাকার ব্রহ্মে জ্ঞানযোগে উপাসনা আরম্ভ করেন। বৈদিক

ঋষিরা বহু পুরাকালে জ্ঞানযোগে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। পৌরাণিক যুগে সেই উপাসনা লোপ পায়। মহাত্মা রামমোহন শতবর্ষ পূর্ব্বে ১২৩৫ সালের ৬ই ভাদ্র তারিখে কমল বসুর বাটীতে সেই পূজা পুনঃস্থাপিত করেন। আর ১২৩৬ সালের ১১ই মাঘে এই নগরে জোড়াসাঁকোর নূতন বাটীতে "ট্রষ্টডীড" সহযোগে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রাহ্মসমাজ এই উপলক্ষে গত বৎসর হইতে উৎসব করিতেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি জীবিত থাকিয়াও এই উৎসবে স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য সশরীরে যোগ দিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমার অধ্যাত্মযোগ সম্পূর্ণভাবে রহিয়াছে। ইচ্ছাময়ী মায়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, তাহার অন্যথা করিবার কাহারও শক্তি নাই। শুধু আমি কেন, ব্রাহ্মসমাজের কত মহাপ্রাণ ত অকালে চলিয়াই গিয়াছেন।

একটা কথা বোধ হয় এসময় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "ব্রাহ্মসমাজের অবসান হইতেছে" আজকাল এই একটা ধুয়ো উঠিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক; বরঞ্চ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সমগ্র ভারত গ্রহণ করিতেছে। বাল্যবিবাহ-নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ ও অনুন্নত বর্ণদের তুলিয়া লওয়া প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য এখন সমগ্র ভারতে হইতেছে। দীক্ষার্থীর সংখ্যাই কেবল কমিয়াছে মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতেছে। এখন ব্রাহ্মসমাজকে কালের অনুগামী হইতে হইবে। যেমন ভারত অগ্রসর হইতেছে, সেই প্রকার ব্রাহ্মসমাজকেও অগ্রসর হইতে হইবে। বরিশালের ভক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়াছে। এ কথারও উত্তর যে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সমগ্র ভারত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হয় নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজকে অন্য সমাজের সহিত কার্য্য করিতে হইবে। বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভা, রামকৃষ্ণ-আশ্রম, ধর্ম্মাঙ্কুরসভা প্রভৃতি সকল সমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজকে মিলিয়া কার্য্য করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন-নিবারণ এবং শিক্ষাদান প্রভৃতি সমুদয় শুভানুষ্ঠানে ব্রাহ্মসমাজকে সকলের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে হইবে। তাহা না করিলে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন ও আর্য্যসমাজ প্রভৃতি সকলকে লইয়া অগ্রসর হওয়া যায় না। ক্রমে মৈত্রীর দিকে পৃথিবী চলিতেছে, উদারতা বাড়িতেছে—ব্রাহ্মসমাজকেও সেই পথে চলিতে হইবে।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

বেদগান।

(সঙ্গীত ভারতী শ্রীবাণী দেবী D. Mus. (Ind.))

খটভৈরবী—ফেরতা (একতালা ও তেওরা)

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসৎ হতে দেব তুমি সত্যে লয়ে যাও মোরে।
আঁধার হতে দেব তুমি দেখাও হে জ্যোতি মোরে।
মৃত্যু হতে দেব তুমি পারে লয়ে যাও মোরে।
স্বপ্রকাশ প্রকাশ হও, চরণে তব শরণ দাও।
দেব হয়ে দখিনমুখ, করি' দূর যতেক দুখ—
রক্ষা কর রুদ্র মোরে—রক্ষা কর নিত্য মোরে॥

সায়ংকাল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাহার—খাণ্ডারবাণী চৌতাল।

আজি বন ঘন ফুলে ফুলে ছাইল রে,
তব মধুর সুবাস মন্দ মন্দ মলয়জ সনে বয় হে।
যত ভকতবৃন্দ আসিয়া মিলি' পুঞ্জে
নব নব ফুলহার গাঁথি' দিছে তব পদে শত।—
তোমারি আরতি করি' চিত্ত হইল শান্ত;
সব সন্তাপজাল কাটিল তোমার আশীর্ব্বাদ পেয়ে—
প্রাণ গেল ভরিয়া হরষে আজি প্রাণের প্রাণ॥

খাম্বাজ—তেতালা।

প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী—
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী—
উঠুক ধ্বনিয়া সুরের লহরী, ছুটুক সে ঢেউ প্রাণের উপরি
সেই ঢেয়েতে বসিয়া সুখেতে,
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।
যে সুরে আজ জীবনতন্ত্রী বাজাইলে বন্ধু জীবনযন্ত্রী,
সেই সুরে দাও পরাণ ভরিয়া
আনন্দ ছুটুক দুকূল ছাইয়া—
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।
শুনিয়া পরাণ আকুল আমার রহিতে নারি ঘরেতে আঁধার
হাওয়ায় খোলা আলোয় খোলা
দিন রাতি যে আপন-ভোলা।
রহিতে চাহি বিভোর গানে— তৃপ্তি নাহি পরাণ মানে—
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

(মা) মিলেছি মা তোর আজি মধুর ডাকে॥ (ধুয়া)
(মোরা) হিংসা দ্বন্দ্ব গেছি ভুলে,
প্রাণ আমাদের গেছে খুলে,
এসেছি মা পূজা দিতে
ছুটে ভাইতে মিলে তোকে।

মান অভিমান ছোটখাটো
ফেলেছিল চোখে কুটো,
এতদিন তাই দেখিনিকো,
(এখন) ভরেছে প্রাণ তোরে দেখে'।
(এবার) পূজায় যেন বুঝতে শিখি—
তুই মা মোদের সবার একই ;
ভায়ে ভায়ে যেন ভালবেসে
হাসি আনতে পারি মুখে।

শক্তিময় তোর দুগ্ধ খেয়ে,
চলেছি মা মানুষ হয়ে ;
শত বাধায় আর ফিরতে না হয়,
এই-মত বল দে মা বুকে।
ত্রিশ কোটী তোর ছেলে মিলে
অভ্রভেদী মহান্ সুরে,
(তোরে) ডাকবে যবে মা মা বলে,'
সাড়া পড়বে বিশ্বলোকে॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তোর্ মা রূপে আজ্ ভরেছে ভুবন। (ধুয়া)
(তোর্) জোছনা মেখে আকাশ সারা
হাস্‌ছে দেখ্ মা আপন্-হারা ;
সেই হাসির্ মা পরশ্ পেয়ে
পাগল্ হয়্ মোর্ পরাণ মন্।
ভুবন্ ভরে আজ্ উঠ্‌ছে যে গান—
সুরের্ পরে সুর্ উঠে যে তান্—
তৃপ্তিতে অতৃপ্ত হয়ে
শোনে গিরি সাগর বন্।
(আমি) হাসি কাঁদি কি যে করি
আকুল হই মা, ভেবেই মরি ;
(তোর্) আলোর্ আঁধার অন্ধ করে—
সুখের অশ্রু ভাসায় নয়ন্
(আমার) মিটে যায় মা সকল আশ্
পরাণের মা ঘুচে তিয়াশ্।
(যবে) তোরে দেখি, তোর্ বাণী শুনি—
পড়ে রই তোর্ ধরে চরণ্।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

মন ভজ রে আনন্দ পরম ধন—
জননী—যিনি সন্তাপনাশন।
শম দম ধর চিতে নিশি দিন রে ;
স্বজন দারা সুত বন্ধু কিছু না—
শুধু তাঁহারে ধর প্রাণে অনুখন।
সন্তাপিত পরাণ তাঁরে দিয়ে
শীতল কর দেহ মন রে।
হরিপদে বিমুখ অনেক দুখ পায় রে—
কঠিন দণ্ড লভে শিরে অগণিত।
ধরি' তাঁহারি পদ লভ নিতি শুভমতি—
লভ আনন্দ প্রাণে নিশিদিন রে॥

শততম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

১

আজ হইতে শতবর্ষ পূর্ব্বে এই ১১ই মাঘের পুণ্য-প্রভাতে রাজা রামমোহন রায়ের যে উদার কল্পনা নব্য ভারতের অভিনব প্রতিষ্ঠানরূপে এই কলিকাতা নগরীর বুকে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ দিকে দিকে তাহারই বিশাল শাখাপ্রশাখা শ্যাম পত্রগুচ্ছে মণ্ডিত হইয়া ভারতের উত্তপ্ত বক্ষকে যুগপৎ ছায়া ও শীতলতা দান করিতেছে। এ কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য—ইহাতে যে মোটেই অত্যুক্তি নাই, ইতিহাস সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবে। ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ যে যুগোচিত জাগরণ লক্ষ্য হইতেছে, তাহা যে রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদার কল্পনার অভিব্যক্তি, ইহা আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার ১১ই মাঘের উপদেশে সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। কেবল বঙ্গদেশে বা কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র জগতেই যে এ যুগে রাজা রামমোহন রায় মিলন ও মঙ্গলের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহের "ব্রহ্মবাদীর বাণী"তে সুব্যক্ত হইয়াছে। তিনি অতি সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলনের মূলে মহাত্মা রাজা রামমোহনের প্রচ্ছন্ন প্রভাব। এইসকল কথা ধীরভাবে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই শততম ব্রহ্মোৎসব—ইহা কেবল সংকীর্ণ বঙ্গদেশের কোন সাম্প্রদায়িক উৎসব নহে—ইহা সমগ্র জগতের মিলন ও মঙ্গলের যুগোচিত নব উদ্বোধন-উৎসব। সুপ্রাচীন আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বসিয়া যদি কেহ চিন্তা করেন যে, নবযুগের মিলনগঙ্গার গঙ্গোত্রী এই পুণ্যভূমি, তখন সেই দিব্য অনুভূতির অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া দিবেই। এবারকার উৎসবে এই মিলন ও মঙ্গলের মাহাত্ম্য

এমনি মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল যে ব্রাহ্মসমাজের বিগত শতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় মিলে না।

মহাত্মা রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র আদিব্রাহ্মসমাজই প্রথমে এই মিলনসাধনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাকে আহ্বান ও স্বয়ং তথায় যোগদানের পুণ্য প্রচেষ্টা আদিব্রাহ্মসমাজেই প্রথমে জাগ্রত হইয়া উঠে। এবার বিভিন্ন শাখার সহিত সম্মিলিত উপাসনায় এবং উদ্যানসম্মিলনে পরস্পর মেলামেশায় এবং বিভিন্ন শাখার পরস্পরের সহযোগিতায় দীর্ঘ দশাহ-ব্যাপী উৎসব-আয়োজনের মধ্য দিয়া শততম ব্রহ্মোৎসবের বৈশিষ্ট্য নানা ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এবারকার শতবার্ষিক উৎসবে আদিব্রাহ্মসমাজে যুবকশক্তির জাগরণ ভবিষ্যৎ কল্যাণের সূচনা করিয়া নবোৎসাহ ও নবশক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। এবারকার ইংরাজীতে ব্রহ্মোপাসনা আদিব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার এবং উহা নব জাগরণ ও নব শক্তিসঞ্চারের সূচনা করিয়াছিল। ঔপনাগরিক শাখাসমাজগুলির সহিত একাত্ম হইয়া উৎসব-আয়োজনের অভিনবত্ব এবার একটী দিব্য প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিল। এবার যেন চতুর্দ্দিক হইতে নবপ্রাণ ও নূতন প্রেরণার বিপুল তরঙ্গ আসিয়া ভারতবাসীর মনোমালিন্যকে সম্পূর্ণরূপে বিধৌত করিয়া লইয়া গিয়াছে।

এবার মাসের প্রথমদিবস হইতেই উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। ১লা মাঘ বুধবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় বেদীগ্রহণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর শততম ব্রহ্মোৎসবে সমাগত উপাসকগণকে উদ্বোধিত করেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের জলন্ত 'উদ্বোধন' আমরা পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। কৃষ্ণকুমার বাবুর উপদেশ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই; উহা হস্তগত হইলে ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এদিনে সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন আদি-ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সঙ্গীত-ভারতী শ্রীবাণী দেবী D. Mus. (Ind.)। সুবিখ্যাত বাদক শ্রীপিয়ারীলাল দাস মহাশয় পাখোয়াজ বাজাইয়া সঙ্গীতের গাম্ভীর্য্যকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

গত ৩রা মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। এদিন বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন আদিব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ। উপদেশের বিষয় ছিল "ব্রাহ্মসমাজের পুরাতনী"। প্রথমে চিন্তামণি বাবু ব্রাহ্মসমাজে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-ব্যাপী কর্ম্মের ইতিকথা পাঠ করেন। ইহা পুস্তিকা-কারে মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল; এবং তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। অতঃপর স্বাধ্যায়ান্তে সতীশবাবু প্রধানতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের জীবনসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মসমাজের ইতিকাহিনী বিবৃত করেন। এদিনে প্রধানতঃ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুরাতন সঙ্গীত গীত হইয়াছিল।

গত ৫ই মাঘ রবিবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে মাসিক সমাজের অধিবেশনটিকে উৎসব দিবসে পরিণত করিয়া আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করেন। আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ উদ্বোধন ও উপদেশের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং স্বাধ্যায় পাঠ করিয়াছিলেন আচার্য্য চিন্তামণি। সভায় সমাগত উপাসকবর্গকে ক্ষিতীন্দ্রনাথের মুদ্রিত উপদেশ বিতরিত হইয়াছিল।

উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় ১নং ডাক্তার রাজেন্দ্র রোডে ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে আহূত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সায়ং উপাসনায় বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বেদী গ্রহণপূর্ব্বক উদ্বোধন ও উপাসনান্তে "উৎসবের প্রাণ" বিষয়ে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। উহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল এবং পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সঙ্গীত-ভারতী শ্রীবাণী দেবী D. Mus. (Ind.) তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করিয়া সমাগত উপাসকগণের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

গত ৬ই মাঘ সোমবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাব উপলক্ষে ১৫নং কলেজ স্কোয়ার 'আলবার্ট-হলে' একটী সম্মিলিত স্মৃতিসভার আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়। খ্যাতনামা বহু বক্তা এই সভায় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের সুপবিত্র স্মৃতিকথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এদিন আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'স্বাধীনতা-প্রীতি' বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল এবং তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইল।

গত ৮ই মাঘ (১১ই মাঘের পূর্ব্ববর্ত্তী) বুধবারে এবারে একটু নূতন ধরণের আয়োজন হইয়াছিল। সুসংবাদ সন্দেহ নাই, কয়েকজন যুবক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সাহায্য ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন। এদিন আমরা তাঁহাদেরই কয়েকজনের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলাম। বেদী গ্রহণ করিয়া-ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনান্তে বেদীর নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচ্ছন্ন প্রভাব" বিষয়ে একটী সুন্দর নিবন্ধ পাঠ করিয়া সমাগত উপাসকবর্গকে শততম ব্রহ্মোৎসবে যথার্থই উদ্বোধিত করেন। ব্রহ্মবাদীর বাণীগুলির সুনিপুণ সন্নিবেশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের স্বাধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন। তাই ঠিক স্বাধ্যায়ের পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল মহাশয় বেদীর নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া "ব্রহ্মবাদীর বাণী" বিষয়ে একটী সুচিন্তিত নিবন্ধ পাঠ করেন। স্বাধ্যায়ান্তে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ মহাশয় "ব্রাহ্মসমাজ ও শাস্ত্র" বিষয়ে তাঁহার

সুললিত কবিত্বময় ভাষায় বহু পুরাতন তথ্যপূর্ণ একটী নিবন্ধ পাঠ করিয়া সমাগত উপাসকবর্গের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদের এই তিনটী যুবকবন্ধুর সাহায্য ও সহযোগিতা আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিতেছি। আদিব্রাহ্মসমাজের তপস্যাকঠোর সুবিশুদ্ধ আদর্শ দিন দিন ইঁহাদের অন্তরকে নিষ্ঠাশীল করিয়া তুলুক। ইঁহাদের প্রবন্ধ-তিনটী আগামী ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

গত ৯ই মাঘ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬।॰ ঘটিকায় ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার আলবার্ট-হলে একটী সম্মিলিত উপাসনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এদিন সভায় আশ্চর্য্যরূপ জনসমাগম হইয়াছিল। অতবড় সভাগৃহের উপরে ও নীচে আর তিলধারণেরও স্থান ছিল না। আচার্য্য কৃষ্ণকুমারের উদ্বোধন ও আচার্য্য কামাখ্যানাথের আরাধনান্তে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ "মিলনোৎসবের" উপযুক্ত একটী হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া সভায় বিতরিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

গত ১০ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬॥॰ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে সদানন্দ শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস পণ্ডিত শ্রীসুরেশ চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের সহিত বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক ইংরাজীতে উদ্বোধন ও উপাসনান্তে "Message to Young India" নামে একটী সুচিন্তিত অগ্নিময় উপদেশ দান করেন। ইহা মুদ্রিত হইয়া সভায় সমাগত উপাসকগণকে এক এক খণ্ড প্রদত্ত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যায় এই উপদেশ ও উদ্বোধন উভয়ই প্রকাশিত হইল।

এই কয়দিন ধরিয়া প্রতি উপাসনায় উপদেশে ও উদ্বোধনে যাহার আগমনী গীতি ঝঙ্কৃত হইতেছিল, অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত ১১ই মাঘের পুণ্যপ্রভাত নামিয়া আসিল। শত বৎসরের সুপ্রাচীন উপাসনালয় আজ উৎসবোচিত নববেশে সুসজ্জিত হইয়াছে। পত্রে পুষ্পে সানাইয়ের প্রভাতী রাগিণীতে ও ধূপ-ধুনার পবিত্র সৌরভে উপাসনামন্দির একটী অভিনব-শ্রী ধারণ করিয়াছিল। অবশেষে বেলা ৮ ঘটিকায় উপাসনাগৃহটী ধীরে ধীরে উপাসকগণে পূর্ণ হইয়া আসিল। শঙ্খ-ঘণ্টার সুমঙ্গল নিনাদে উপাসনার শান্ত আহ্বান দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সুগম্ভীর স্বরে সমবেত কণ্ঠে বেদগান উত্থিত হইল—"অসতোমা সদ্গময়" 'অসৎ হতে মোরে তুমি সত্যে লয়ে যাও মোরে' মাতৃচরণে বাণী দেবীর এই নব-উপহৃত পুষ্পাঞ্জলি সমবেত উপাসকগণের অন্তরের সঞ্চিত ভক্তি-প্রীতিকে প্রগাঢ় ও প্রস্ফুট করিয়া তুলিল। বেদগানান্তে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ বেদী গ্রহণ করিলে সঙ্গীতাচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ ভৈরবী রাগিণীতে গান ধরিলেন 'প্রাণ সঁপিনু তোমার পদে অন্তর্য্যামী'। অতঃপর বাণী দেবীর নেতৃত্বে কয়েকটি বালিকাকণ্ঠে গান্ধারী রাগিণীতে "মোর প্রাণ-মন ভরি" পূজিব তোমায়—এস সজ্জিত সুন্দর মনোমন্দিরে হে" সঙ্গীতান্তে ক্ষিতীন্দ্রনাথ সমবেত উপাসকগণকে সুগম্ভীর কণ্ঠে উদ্বোধিত করিলেন। এই উদ্বোধন-বাণীর প্রতি পংক্তি অগ্নিশিখার ন্যায় অন্তরকে স্পর্শ করে। আমরা এই ১১ই মাঘের উদ্বোধন পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। অতঃপর মধুর রামকেলী রাগিণীতে গীত হইল—'রজনরি উঠল গগন ভরে'। 'তাঁরি দেখ ভুবনে মোহন ভাব মহিমা বিচিত্র সবে হে' গানটী আলাইয়া রাগিণীতে গীত হইবার পর আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ সুগম্ভীর কণ্ঠে ব্যাখ্যায় আরম্ভ করিলেন—'যোদেবোহগ্নৌ যোহপ্সু' ব্যাখ্যানান্তে সমগ্র উপাসকগণের অন্তরের অনুভূতি যেন বাণী দেবীর কণ্ঠে সঙ্গীতের আকারে মূর্ত্ত হইয়া ভৈরবীর সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—'কনকভানু গগনভালে রাজাইছে জ্যোতি তাঁরি প্রকাশি'। অতঃপর সঙ্গীতাচার্য্য সুরেন্দ্রনাথের সুগম্ভীর কণ্ঠে 'হে। ওঙ্কার মহাদেব শঙ্কর' ভক্তিগীতটী ভৈরবরাগে গীত হইবার পর আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ বেদী হইতে জলদগম্ভীর কণ্ঠে "ব্রাহ্মসমাজের দান" বিষয়ে তাঁহার প্রাণময়ী ভাষায় বহু তথ্যপূর্ণ একটী সুচিন্তিত উপদেশ দান করেন। ব্রাহ্মসমাজের বিচিত্র ও বিপুল জীবনকাহিনীর সহিত ইহা আদ্যন্ত এমনই ভাবে বিজড়িত যে, পাঠকালে শ্রোতৃবর্গের অন্তরে চলচ্চিত্রের ন্যায় তড়িতগতিতে সেই শতবর্ষব্যাপী অতীত ইতিহাস জাগ্রত হইয়া উঠে। ব্রাহ্মসমাজ যে নির্বিচারে হিন্দুসমাজের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে, বিশাল হিন্দু-সমাজের আজিকার এই জাগরণ যে মূলে ব্রাহ্মসমাজেরই দান, ক্ষিতীন্দ্রনাথের এই উপদেশে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। আমরা তত্ত্ববোধিনীর এই মাঘোৎসব সংখ্যায় উহা প্রকাশ করিলাম এবং সভাস্থলেও উহা পুস্তিকাকারে বিতরিত হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে তিনটী সঙ্গীত গীত হয়; তাহার মধ্যে বাণী দেবীর কণ্ঠে 'বাঁশরী মরমে আজি বাজিছে তোমারি' গানটী এবং রামপ্রসাদী সুরে সমবেতকণ্ঠে গীত সর্ব্বশেষবর্ত্তী '(মা) মিলেছি মা তোর আজি মধুর ডাকে' সকলের হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছিল। এদিন প্যারীবাবুর পাখোয়াজ ও গোবিন্দবাবুর এস্রাজ সঙ্গীতগুলিকে একটী অভিনব-শ্রী দান করিয়াছিল। উৎসবান্তে ক্ষিতীন্দ্রভবনে একটী ক্ষুদ্র প্রীতিভোজের আয়োজন হইয়াছিল।

১২ই মাঘ রবিবার সন্ধ্যা ৬।॰ ঘটিকায় বেহালা ব্রাহ্মসমাজে সায়ং উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেহালা-ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মসমাজের কালীঘাট বলিতেন। সহরের কৃত্রিম আবেষ্টনীর মধ্যে নিত্য উৎপীড়িত নরনারীর পক্ষে বেহালার এই পল্লীসুলভ শ্যামলতা ও নীরবতা সত্যই লোভনীয়। কলিকাতার এত নিকটে উপাসনার অনুকূল এই নির্জ্জন ব্রহ্মমন্দিরটীর যাহাতে যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার হয়, সে বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ-হিতৈষী মাত্রেরই মনোযোগ বাঞ্ছনীয়। উক্ত দিবস শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থকে সঙ্গে লইয়া বেদী গ্রহণ করেন। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্রের উদ্বোধনান্তে সমবেতকণ্ঠে স্বাধ্যায় পঠিত হইলে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ একটী সময়োপযোগী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন সুকণ্ঠ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল এবং শ্রীভূদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কয়েকজন বালিকার

ভদ্রলোক। আমাদের মুদ্রিত কার্য্যতালিকায় উল্লিখিত না হইলেও চিন্তামণিবাবুর পুত্রগণের উৎসাহে ও আয়োজনে এইদিন প্রাতঃকাল ৭॥০ ঘটিকায় বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিমোহন সেন এম-এ মহাশয় ভক্তবাণী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তরুণবয়স্ক যুবক শ্রীহিমাংশুশেখর দত্ত অধ্যাপক মহাশয়ের ব্যাখ্যাত বাণীগুলিকে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করিয়া সমাগত উপাসকগণকে বড়ই আনন্দদান করিয়াছিলেন।

গত ১৩ই মাঘ সোমবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোডে 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে' সায়ং উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকে সঙ্গে লইয়া বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমাজের সম্পাদক শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাঁহার প্রেরিত সংক্ষিপ্ত 'নিবেদন' উদ্বোধনের পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছিল এবং মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল। উহা আমরা পত্রিকার মাঘোৎসব-সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ সমবেত উপাসকবর্গকে উদ্বোধিত করিয়া উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন, বেহালা-ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সম্পাদক শ্রীসুদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন যুবক বন্ধু।

গত ১৯শে মাঘ রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় বেলগেছিয়ার উদ্যানবাটিকায় ব্রাহ্মসমাজের শাখাত্রয়ের একটী সম্মিলিত 'উদ্যানসম্মিলনী' হইয়া গিয়াছে। এরূপ অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। শততম ব্রহ্মোৎসবের আনন্দকল্লোল যে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাগুলিকে কিরূপ উদ্বেলিত ও আন্দোলিত করিয়াছে, তাহা এদিন অতি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছিল। পরস্পরের আলাপ-আলোচনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার আর অন্ত ছিল না। একটী সুবৃহৎ তেঁতুল গাছের ছায়াচ্ছন্ন তলদেশে উপাসনার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী মাননীয়া শ্রীসুচারু দেবী বেদীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে অনেকক্ষণ কীর্ত্তন ও প্রসঙ্গাদি চলিয়াছিল। অতঃপর মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মসমাজের শাখাত্রয়ের আবালবৃদ্ধবনিতার সম্মিলিত প্রীতিভোজন এক অভূতপূর্ব্ব ও অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

এবার নববিধান ব্রাহ্মসমাজ মৃজাপুর-ষ্ট্রীটে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটী প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক শততম ব্রহ্মোৎসবকে একটী অভিনব-শ্রী দান করিয়াছিলেন। গত ১১ই মাঘের পুণ্যতম দিবসে ইহার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল এবং মাঘের চতুর্ব্বিংশতি দিবস পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ দিবস ধরিয়া ইহা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এখানে আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে একটী পুস্তকালয় খোলা হইয়াছিল।

গ্রন্থপরিচয়।

চুলের গাছ—শ্রীহিমাংশু প্রকাশ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস এম্‌. এস্‌. সি ২৪।১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

অমর গল্প—শ্রীহিমাংশু প্রকাশ রায় প্রণীত। প্রকাশক—ষ্টুডেণ্টস্‌ লাইব্রেরী ৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

এই দুই সচিত্র পুস্তকে হিমাংশু বাবু বাংলার শিশুদের জন্য দুইটি প্রসিদ্ধ বিদেশী গ্রন্থের রস পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাচন সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকদুইটি যাহাদের জন্য লিখিত, তাহাদের আনন্দ দিবে সন্দেহ নাই। দুইটি পুস্তকেই কতকগুলি সুন্দর চিত্র আছে।

ভাগবত ধর্ম্ম—শ্রীঅবনীমোহন বটব্যাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও অনুবাদিত। মূল্য আট আনা। ঢাকা, ডাকঘর ফরিদাবাদ, গণ্ডারিয়া হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শাস্ত্রসমুদ্র হইতে সংগৃহীত কতিপয় রত্নরাজি দ্বারা গ্রন্থকার এই মনোহর হার গ্রথিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার যে সুনিপুণ ডুবুরী, তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থের প্রতিপত্রে দেদীপ্যমান। আমরা আশা করি সকলেই এই রত্নহার কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

দীপ ও ধূপ।—'আলো ও ছায়া' প্রণেত্রী-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায় বি-এ, ৩২।এ হাজরা রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয়। তখন জাতীয় কবি হেমচন্দ্র উহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা গুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি"। তাহার পর 'আলো ও ছায়া'র কবি বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবার ফলে সাহিত্যের ভাণ্ডারে বহু অমূল্য রত্ন আহরণ করিয়া আনিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যকে অপূর্ব্ব ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আজ তাঁহার নাম শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচিত, আজ গ্রন্থনিয়োগে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইবার কারণ ছিল না।

বোধ হয় ল্যাণ্ডর বলিয়াছেন, অখিল জনপ্রবাহ দেখিতে যত গভীর মনে হয়, স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী দেখিতে তত গভীর মনে হয় না; সরল ও প্রাঞ্জল রচনা স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতীর ন্যায়। কবি কামিনী রায়ের রচনা পড়িলে এই কথাই বারম্বার মনে উদিত হয়। আজি-কালিকার প্রহেলিকাময়ী গীতিকবিতার সহিত এই কবিতাগুলির কত পার্থক্য! এই সরল কবিতাগুলির মধ্যে কবিহৃদয়ের কি গভীর আন্তরিকতা, কি নিবিড় সহৃদয়তা, 'সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলে'র প্রতি কি অপরিসীম শ্রদ্ধা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! তাঁহার ভাষার অপূর্ব্ব সংযম, রচনার শান্ত মাধুর্য্য, প্রতিভার অলোকসামান্যা দীপ্তি প্রতি ছত্রে কবির অপূর্ব্ব সাধনার পরিচয় দিতেছে! কবির এই গ্রন্থ পরিণত বয়সের রচনা হইলেও উহাতে সর্ব্বত্র আধুনিকতার ছাপ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তরুণ বয়সে কবি লিখিয়াছিলেন,

"আমি যৌবনের লাগি তপস্যা করিব ঘোর,
কালে না করিবে জয় জীবন-বসন্ত মোর;"—

পুনশ্চ—

"সে কেমন হবে, আমি অবহেলি বর্ত্তমান,
স্বপন-সন্ধান এক অতীত করিব ধ্যান,
অন্ধ চক্ষুঃ তপ্তধারা বরষিবে অনুদিন,
সম্মুখে আলোকরাজ্য হেরিবে না দৃষ্টিহীন?"

পরিণতবয়সের রচনা পড়িয়া মনে হইতেছে কবির তপস্যা সফল হইয়াছে। তাঁহার দেশপ্রেমবিষয়িণী কবিতাগুলিতে বাঙ্গলার আধুনিক প্রাণের অপূর্ব্ব সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মতে গ্রন্থসন্নিবিষ্ট প্রায় একশত নানাবিষয়িণী কবিতার মধ্যে দেশপ্রেমোদ্দীপনী কবিতাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফুটিয়াছে। ইচ্ছা হয়, কবিতাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিই, কিন্তু এস্থলে তাহার স্থান নাই। "ওরে তোরা ভবিষ্যের দল" শীর্ষক কবিতা হইতে শেষাংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল:—

"দৃপ্ত তোদের পদভরে যাক্‌গে রসাতল,
অতীত যা', পতিত যা', নাই যাহাতে বল,
বর্ত্তমান সে প্রাণের বেগে করুক টলমল,
এগিয়ে ধর ভবিষ্যতের আলোক উজ্জ্বল,
ওরে তোরা পথ দেখাবার দল।

মৃত্যুবরণ করি' যারা মৃত্যুরে জয় করে,
কাঁটার মুকুট হ'তে যাদের নিত্য আলো ঝরে,
তাদের মত ভাবা তোদের, তাদের মত হাস,
তাদের জয়-মাল্য-গন্ধে শৃঙ্খল সুবাস।
থাক্ না হাতে হাতকড়া, থাক্‌না বেড়ী পায়ে,
যাক্‌না নিয়ে কারাগারে, দিক্‌না ধুলা গায়ে,
পিছে যারা আসছে তারা উদ্দেশে নমিয়া,
বলবে—ধন্য জন্মভূমি এদের জনম দিয়া।"

কবি বহুস্থানে জাতির জীবন-সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন, প্রত্যেক পাঠক এই কবিতাগুলিতে চিন্তার পর্য্যাপ্ত উপাদান পাইবেন। "নবজাগরণ" শীর্ষক কবিতার উপসংহারাংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য:—

* * * তবে এইবার
দাঁড়াও মা, আপনার পায়ে করি ভর,
চেয়ে দেখ, দেখ চেয়ে পূর্ব্ব সিন্ধু পার
উদিছে নবীন ভানু, অপূর্ব্ব ভাস্বর।
মুক্ত কণ্ঠে, যুক্ত করে, অন্তর ব্যাকুল,
'পিতা নোঽসি' বলে আজ ফিরে গাও গান,
যাবে ভয়, হবে ক্ষয় অতীতের ভুল,
জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে দৈন্য হবে অবসান।
বুঝে লও, হে প্রাচীনা, কোন্ উৎস হতে
অনন্ত জীবনধারা যৌবন অক্ষয়
বহি আসে, অবগাহি কোন্ মহাস্রোতে
সমবর্ণ সর্ব্বনর দ্বিজ শূদ্র নয়।
জীবনের ইহকূলে যাহা করণীয়
কর আজ, থাকে যাহা থাক্ পরপার;
মান দাও মানবেরে—সে যে বরণীয়,
মনে তার দাও জ্ঞান, অন্ন মুখে তার।

উপসংহারে, আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গবাণীর মন্দিরে আজ কবি যে 'দীপ ও ধূপ' লইয়া আসিয়াছেন, সেই দীপের উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি বহুযুগ ব্যাপিয়া অন্ধকারে পথহারা পথিককে 'সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের' পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে, এবং সেই ধূপের প্রীতিকর প্রাণামোদকারী সুবাস আবর্জ্জনার পূতিগন্ধে দূষিত বাণীমন্দিরকে স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত করিয়া রাখিবে।

গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রচ্ছদপটটী শিল্পী চারু রায়ের প্রতিভার উপযুক্ত হইয়াছে। *

গার্হস্থ্যসংবাদ।

বিবাহ।—গত ৫ই মাঘ রবিবার রাত্রি ৮৷৷৹ ঘটিকায় শুভ লগ্নে ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-ভবনে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমেধা দেবীর সহিত বেরিলীনিবাসী পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথের পুত্র পণ্ডিত শ্রীমান্ রাজনাথের শুভ-বিবাহ আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

* আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৌলিক গ্রন্থরচনার জন্য কবি কামিনী রায়কে 'জগত্তারিণী পদক' প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন। এ সম্মান আরও পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রদান করা উচিত ছিল।

ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। বিবাহ সভায় বহু আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইয়াছিল। ভগবান এই নব দম্পতিকে নিত্য প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দীক্ষাগ্রহণ।—গত ৪ঠা মাঘ শনিবার সায়ংকালে বেরিলী-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথের পুত্র পণ্ডিত শ্রীব্রজনাথের দীক্ষাগ্রহণ উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীক্ষিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উপাসনা-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ভগবান ইঁহাকে নিত্য জ্ঞান ও ভক্তির পথে অগ্রসর করিয়া ইঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির সহায় হউন।

নামকরণ।—গত ১৭ই মাঘ শুক্রবার সায়ংকালে ৩৯ নং আণ্টনি বাগান লেনে স্বর্গীয় ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের নবকুমারের নামকরণ উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক উপাসনা ও উপদেশান্তে নবকুমারের শ্রীমান গীতীন্দ্রকুমার নামকরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়া সমাগত উপাসকগণের অন্তঃকরণে আনন্দবিধান করেন। উপাসনান্তায় বহু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সমাগম হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে একটী প্রীতি-ভোজনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভগবান এই নবকুমারকে আশিষ্ট দ্রাঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথে নিত্য বিবর্দ্ধিত করুন।

শোকসংবাদ।

৺শিতিকণ্ঠ মল্লিক—বিগত ১৩ই মাঘ বৃহস্পতি-বার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে'র সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় ২নং চক্রবেড়িয়া লেনে তাঁহার ভবানীপুরের স্বকীয় বাসভবনে প্রায় ৮৭ বৎসর বয়সে বার্দ্ধক্য জনিত পীড়ায় কিছুদিন ভুগিয়া অবশেষে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে'র যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আনুমানিক ইং ১৮৭১ সালে তাঁহার পঠদ্দশায় ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগদান করিয়া তাঁহাদের উভয়ের অন্তর ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে। তদবধি আমৃত্যু শিতিকণ্ঠ বাবুর ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতম যোগ ছিল। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র ছিলেন এবং পরে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যৌবনে তিনি কেশব-চন্দ্রের বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। তিনি মহর্ষিদেবকে স্বীয় ধর্ম্মগুরু বলিয়া যেমন ভক্তি করিতেন, তেমনই ব্রহ্মানন্দকেও প্রেম ও ভক্তিসাধনার পথপ্রদর্শকরূপে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি মহর্ষিদেবের বিশুদ্ধ ভাবধারায় পরিপুষ্ট হইয়া নিজেকে কখনই বিরাট হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক্ মনে করিতেন না। ওকালতি পাশ করিয়া কয়েক বৎসর পরে তিনি মুনসেফ নিযুক্ত হন। যোগ্যতার সহিত বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে তিনি অস্থায়ী ভাবে সবজজের পদে উন্নীত হন। কার্য্যোপলক্ষে তিনি যে যে স্থানে বদলী হইয়াছেন, সর্ব্বত্রই তিনি স্থানীয় ব্রাহ্ম ও উদারপন্থী হিন্দুগণকে একত্র করিয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ব্রহ্মোৎসবের ব্যবস্থা করিতেন। তিনি ইং ১৮৯৯ সালে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তদবধি আমৃত্যু তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সেবায় তাঁহার সকল চেষ্টা ও যত্ন নিয়োগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তিনি প্রতি সোমবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় নিয়মিত যোগদান করিয়া গিয়াছেন। উপাসনায় এরূপ নিষ্ঠা অধুনা ব্রাহ্মসমাজে একান্ত বিরল। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ইঁহার অনুরাগ এরূপ সুতীব্র ছিল এবং ইহার সেবায় তিনি এত আনন্দ পাইতেন যে, এই বার্দ্ধক্যে সময় সময় রোগে শয্যাশায়ী হইয়াও সমাজের নিয়মিত কর্ম্ম হইতে বিরত হইতেন না। এবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে শতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন হইলে তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া উৎসবের জন্য তাঁহার 'নিবেদন' লিখিয়া উহা ছাপাইবার নিমিত্ত চিন্তামণি বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। রোগে দুর্ব্বলতাবশতঃ উৎসবে যোগ দিতে পারিবেন না জানিয়া তিনি উহাতে লিপিবদ্ধ করেন যে, "যদিও আমি সশরীরে উৎসবে যোগ দিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু আমার অন্তর উৎসবে যোগদান করিবে"। তিনি প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার থাকিয়া উহার অর্থসমস্যা বিদূরিত করেন। আদিব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য স্বর্গগত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহবাসে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আস্বাদ পান; এজন্য কেবল তাঁহার উপর নহে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উপরেও আজীবন তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি এই বার্দ্ধক্যেও বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে নিয়মিত যোগদান করিতেন এবং দ্বিপ্রহরে তথায় সকলের সহিত একত্র বসিয়া আহারাদি করিয়া আপন অন্তরের উদারতা ও প্রীতি সুব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও ইনি একান্ত পশ্চাৎপদ ছিলেন না। 'দুই ভাই' নামে একটী ছোট গল্প লিখিয়া ইনি পারিবারিক জীবনে সদ্ভাববিকাশের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সুদীর্ঘ জীবনে নানা উৎসবে ও উপাসনায় ইনি যেসব সুচিন্তিত নিবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেগুলিকে একত্র করিয়া 'সৎপ্রসঙ্গ' নামে একটী গ্রন্থ-প্রকাশে ইনি বাঙ্গলার ধর্ম্মসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কি ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। এ যুগে এরূপ মহাপ্রাণ ও সরলচেতা ব্যক্তি সত্যই দুর্লভ। মৃত্যুর দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি আদিব্রাহ্মসমাজে ২০০৲ এবং বেহালা ব্রাহ্মসমাজে ১০০৲ টাকা দান করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুকে অকাল-মৃত্যু বলা না গেলেও এরূপ ধর্ম্মপ্রাণ উদারহৃদয় ব্যক্তিকে হারাইয়া কেবল আমরা নহি, ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসমাজ-হিতৈষী মাত্রই ব্যথিত হইবেন সন্দেহ নাই। ইঁহার সুযোগ্য পুত্র রায় শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক বাহাদুর এবং অন্যান্য আত্মীয়বন্ধুগণের এই প্রগাঢ় শোকে আমরা গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহাদের অন্তরে সান্ত্বনা এবং লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

হিতৈষণাগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত।

বন্ধু আমার—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিতৈষণা-গ্রন্থাবলীর ২৮ সংখ্যক গ্রন্থ; আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত, দাম একটাকা মাত্র।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ শ্রীভগবানের করালমূর্ত্তি উপাসনা করেন না, বিশ্বপাতা মনে করিয়া তাঁহাকে তিনি ভয়ের চোখে দেখেন না—তিনি তাঁহাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন; এবং বন্ধু বলিয়া জানিয়া বুঝিয়া বন্ধুর মতোই সরলভাবে তিনি তাঁহার প্রাণের দেবতাকে প্রাণের বেদনা নিবেদন করিয়াছেন। সাধকরা এরূপ একটা অবস্থা পান বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"ধ্যানস্থ আসনে বন্ধুর সহিত বিচরণ-কালে দিনে দিনে যে সকল ভাব অন্তরে সমুদিত হইয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

—নবশক্তি, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।

The book is a sort of prose poem embodying the deep spiritual experiences of the author over a period of two eventful years of his life, during which he had had a spell of difficulties. Kshitindra Nath is of course no novice in the field of literature. He has already established a fine reputation for himself by his other literary works, especially on religious subjects. The present volume also fully sustains his previous reputation and gives us an excellent and very intimate insight into the delights and depressions of his profound and soulful spiritual experiences with the Divine Personality whom he calls his "Friend" in the plenitude of his inspired spiritual enthusiasm! —Liberty, October 6th 1929.

খেয়াল—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। পকেট সাইজ; ছাপা, বাঁধাই, কাগজ উত্তম। অনেকগুলি উত্তম ফটোচিত্র-সম্বলিত। কলিকাতা হাই-কোর্টের জজ স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

"খেয়ালের" প্রধান বিষয় নানাস্থানে এবং নানা সময়ে গ্রন্থকারের ভ্রমণ এবং পরিদর্শন বিষয়ক বৃত্তান্ত—যথা, (১) সাহিত্যিকের উড়োযাত্রা; (২) আমার সন্ন্যাসযাত্রা; (৩) রাঁচিতে দিন-কয়েক এবং (৪) রামপুর-যাত্রা। যে যে স্থানেই গ্রন্থকার ভ্রমণে গিয়াছিলেন,—সেই সেই স্থানেরই বহুবিধ বিবরণ ইনি এই 'খেয়ালে' সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইঁহার অনুসন্ধিৎসা এবং তথ্য-সংগ্রহ-শক্তির প্রচুর প্রমাণ এই পুস্তকে পরিস্ফুট। প্রসঙ্গতঃ কলিকাতার সে বৎসরের দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং রেলের ক্রু-ম্যান প্রভৃতি আরও অনেক কথা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কল-কারখানার পরিণামচিন্তাও ইহাতে এক স্থানে আছে। ৬৩ পৃষ্ঠায় লক্ষ লক্ষ স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর চির-প্রচলিত শ্যামাপূজা সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে,—"শ্যামাপূজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যিনি যতই বিস্তৃতভাবে করুন না কেন, অনার্য্যদিগের অনুষ্ঠিত শ্যামাপূজা দেখিলে সকলেরই দৃঢ় প্রতীতি হইবে বলিয়া মনে হয়, শ্যামা প্রকৃতই অনার্য্যদের দেবতা; সামাজিক প্রয়োজন হওয়ায় কালক্রমে আর্য্যেরা তাহাকে নিজেদের পূজিত দেবতাদিগের অন্যতর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্যামাপূজা কোন বর্দ্ধিষ্ণু (?) ও সভ্যতার সোপানে সমুন্নত পল্লীর পক্ষে উপযোগী বা শোভন বলিয়া মনে হয় না।" ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে হিন্দুর পরমারাধ্য শ্যামাপূজা লইয়া এই অনধিকার চর্চ্চা কখনই উচিত নহে।

—বঙ্গবাসী, ১১শে আশ্বিন, ১৩৩৬।

এই পুস্তকখানি কয়েটি ভ্রমণবৃত্তান্তের সমষ্টি। গন্তব্য স্থানগুলি সাধারণের পরিচিত হইলেও এই ভ্রমণবৃত্তান্তের ব্যপদেশে অধ্যাত্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে; অথচ এতই চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক যে পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না। রচনা সহজ ও সরল, শব্দচাতুর্য্যে বা বর্ণনাবাহুল্যে কোথাও নীরস নয়। এক স্থানে একটু ত্রুটী পরিলক্ষিত হইল, অজন্তার গুহাশ্রেণী নিজাম-রাজ্যে; উহা বোম্বের এপোলো বন্দরের সম্মুখে নহে। ঐ অজন্তার স্থানে 'এলিফেণ্টার' হইবে বলিয়া মনে হয়।

—সুবর্ণবণিক-সমাচার, পৌষ, ১৩৩৬।

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা ভাবিয়া চিন্তিয়া না বলিয়া স্বাভাবিক ভাবে বলিলেও তার প্রত্যেক বাক্যটীই শুনিবার মত হইয়া দাঁড়ায়। গ্রন্থকার তাঁহার আত্ম-কাহিনী খেয়ালের মতই লিখিয়াছেন। কখন ঘরে বসিয়া ভূতের ভয়ে অভিভূত হওয়া, কখন সন্ন্যাসী হইয়া দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ—খোলা প্রাণে সব কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। খোলা প্রাণে লেখা বলিয়াই ইহার একটি স্বতন্ত্র মূল্য দাঁড়াইয়াছে। ১৬+২৬৭ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানি একের পর আর কেবল পড়িতেই ইচ্ছা করে। খুঁটিনাটি বিষয়াবলীর ভিতর দিয়া গ্রন্থকার বহু মূল্যবান রত্নে পুস্তকখানি গ্রথিত করিয়াছেন।

—মাতৃমন্দির, আশ্বিন ১৩৩৬।

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ১৺০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—৫৫, আপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

ভগবান মাতৃত্বে নারীপ্রকৃতির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং এই মাতৃত্বের সুপ্রকাশেই নারীত্ব। এই নারীত্বের সম্পূর্ণতার জন্য নারীদিগের শিক্ষার প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের নারীশিক্ষার উৎকর্ষ গ্রন্থকার বহু উদাহরণ এবং শাস্ত্রীয় শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার নারীশিক্ষার পাশ্চাত্য আদর্শ আদৌ সমর্থন করেন না। অন্ধভাবে পরানুকরণে পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য প্রণালীমাত্রই যে পরিত্যাজ্য একথা মানিয়া লওয়া যায় কি? এ যুগে অবরোধপ্রথা ও প্রচলিত সংস্কারের সমর্থন কেহ সমর্থন করিবে কি? যাহা হউক, সামান্য দুইএকটি বিষয়ে মতান্তর থাকিলেও গ্রন্থকারের শাস্ত্রজ্ঞান, পবিত্র চিন্তাধারা, জাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেম প্রভৃতির জন্য পূজনীয় গ্রন্থকারকে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠক-সমাজে ইহার সমাদর সূচিত করিতেছে। আমরা প্রত্যেক শিক্ষিতা মহিলাকে ইহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। —বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ, ১৩৩৭।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 405.

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত
দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০৩৯ | ১৮৫১ শক ফাল্গুন

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

৫ই মাঘে উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ এই পবিত্র স্থানে শুভ মুহূর্ত্তে আমরা সকলে একহৃদয়ে বিশ্বমাতার চরণ বন্দনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি, ইহাতে আমাদের কত-না আনন্দ হইতেছে। এই উপাসকমণ্ডলীকে আমি আর উদ্বোধিত করিব কি—বেশী আর জাগাইয়া তুলিব কি? উৎসবের বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই তো সেই বিশ্বজননী আমাদের সকলকেই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। বোধনের বাঁশী আমাদের কানে শুনাইয়া তিনিই তো আমাদের প্রাণে জাগরণের একটা সাড়া আনিয়া দিয়াছেন। আমি আর নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিব কি? ভক্তি শ্রদ্ধা আজ আমাদের হৃদয়ে স্বভাবতই অজস্রধারে নামিয়া আসিতেছে, তাই আজ আমরা আপনারাই বিশ্বমাতার পূজার জন্য এখানে আসিয়াছি।

যিনি বিশ্বপিতা অখিলমাতা, তিনি আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা। যে ভক্তিশ্রদ্ধার ভাগীরথী আমাদের প্রাণে আজ নামিয়া আসিয়াছে, সেই ভক্তিশ্রদ্ধার সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতার চরণ বন্দনা করিতে হইবে, তাঁহার পূজা করিতে হইবে। তাঁহাকে এখনই এখানেই প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ করিব বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে একবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, তিনি ঈশ্বরকে কি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, কেবলই ঈশ্বর ঈশ্বর করেন? তাহার উত্তরে তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, সম্মুখের দেওয়াল অপেক্ষাও তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন। বাস্তবিক, প্রত্যেক সাধকেরই এই কথা। তাঁহারা যে বলেন যে, সাধনা করিলে ভগবানকে করতলন্যস্ত আমলকের মতো প্রত্যক্ষ করা যায়, ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর কিছুই নাই। যে দেশের শত সহস্র লোক চকিতের জন্যও তাঁহার দেখা পাইলে পাগল হইয়া উঠে, পদতলস্থ ধূলিকণার মত সমস্ত বিষয়বিভব আহ্লাদের সহিত পরিত্যাগ করিতে পারে; যে দেশের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার চরম লক্ষ্যই হইল তাঁহাকে লাভ করা, সে দেশের লোককে এ কথা বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি ঐ সাধনায় সিদ্ধ হইব বলিয়া, ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখিবার সাধনায় সিদ্ধ হইব বলিয়া। ঐ যে শতসহস্র বর্ষের প্রাচীন সৌম্যমূর্ত্তি ঋষি হিমালয়ের উন্নত শিখরে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্ববাসীর নাস্তিকতাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং—আমি সেই পুরুষ মহানকে জানিয়াছি, আমাদেরও প্রত্যেককে সেই প্রকার নাস্তিকতা, মূর্ত্তিপূজা, প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু ভগবানকে আমাদের চক্ষের অন্তরালে রাখিতে উদ্যত হয়, সকলেরই সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিয়া সেই অমিত-তেজা ঋষির সহিত একপ্রাণে বলিতে হইবে—আমি তাঁহাকে জানি-

য়াছি, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কেবল সুখসম্পদ সম্ভোগের মধ্যে বসিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে এক একটা উচ্ছ্বাসের মধ্যে ভগবানের কৃপার কথা মুখে বলিলে চলিবে না; সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, আমোদ আহ্লাদের মধ্যে এবং কশাঘাতের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে, সকল অবস্থাতে, প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, সত্য সত্য তাঁহাকে জাগ্রতমূর্ত্তিতে দেখিতে হইবে, তাঁহার মঙ্গলভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। ভারতবাসী সিদ্ধিকামী এই ভাবেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসকেও হংসমন্ত্রের জপ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিলেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রাচীন ঋষিদিগের, ভারতের অগণিত সাধক ও সাধু পুরুষের অমূল্য সাধনাসম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা যত মূলধন পাইয়াছি, এত মূলধন অন্য কোন দেশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। সেই মূলধনকে অবহেলা না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদের প্রত্যেকের সেই মূলধন বৃদ্ধি করিবার পক্ষে সহায় হওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এই কার্য্যে বিশেষ সহায় জানি বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এত প্রিয় এবং এই মাঘ মাসে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মাঘোৎসব আমাদের এত প্রিয়।

বর্ত্তমান যুগের একটী বিশেষ সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে; এখন আমাদের আর ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে না। এমন সুন্দর অবসর হেলায় হারাইলে চলিবে না। এক শতাব্দী পরেও আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। একদিকে আমাদের প্রত্যেকের গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সযত্নে পালন করিতে হইবে; আমাদের আচারে ব্যবহারে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শকে জনসাধারণের সম্মুখে জাগাইয়া রাখিতে হইবে; অপরদিকে, ব্রাহ্মসমাজে, ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলীর মধ্যে ভগবানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবে—যেন ব্রাহ্মসমাজ ভক্তিশ্রদ্ধার তড়িতাধার হইয়া উঠে—যথাসময়ে উপযুক্ত ভক্তজনের হৃদয়তন্ত্রী যখনই তাহা স্পর্শ করিবে, তখনই তাহা যেন জ্বলিয়া চারিদিকে চারিপার্শ্ব অগ্নিময় করিয়া তুলিবার শক্তিসামর্থ্য ধারণ করে।

আজিকার এই উৎসবের প্রারম্ভভাগে আমরা যেন সকলে মিলিত হইয়া আমাদের মনপ্রাণ বিশ্বজননীর পূজার উপযুক্ত করিয়া বিশ্বের আরতির সঙ্গে আমাদেরও আরতি যোগ দিয়া উৎসবকে সত্যসত্যই সার্থক করি। বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বরকে, যেন এখানেই এখানেই প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের প্রাণে ঐশ্বর্য্য অতন্দ্রতা তুলি এবং সকলকে জানাইয়া দেশবিদেশকে জাগাইয়া তুলি যে—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং—সেই তিমিরাতীত মহান-পুরুষকে জানিয়াছি। বিশ্বমাতা আত্মার আত্মা মঙ্গলময় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তোমরাও নির্ভয়ে অগ্রসর হও এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হও।*

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তাহার প্রচ্ছন্ন প্রভাব।

(শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়)

আজ শতবর্ষ হইতে চলিল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম নবোদ্যমে পুর্ণপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই শুভ মুহূর্ত্তে আমাদের আজ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন হইয়াছে যে, এই ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে আমরা কি কি পাইয়াছি; এবং এই ধর্ম্মের প্রভাব আমাদের উপর কতটুকু বিস্তারলাভ করিতে পারিয়াছে। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর পাইতে হইলে আমাদের জানিতে হইবে যে, তখন আমাদের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং এখনই বা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য যাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে আস্থাবান তাঁহারা বলিবেন যে এত বিশ্লেষণ-বিবেচনারই বা প্রয়োজন কি? তাঁহারা গীতার "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্" শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিবেন যে সে সময়ে একটি নব ধর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছিল। আস্থাবানদের সহিত এবিষয়ে আমাদেরও কোনও মতভেদ নাই; কিন্তু যে জিনিষ আমাদের জীবন-মরণের সঙ্গী তাহাকে সম্যকরূপে না জানিলে তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা দেওয়াও যায় না এবং প্রাণপণে গ্রহণও করা যায় না।

যখন এই ধর্ম্ম মহাত্মা রাজা রামমোহন প্রথম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তখন একদিকে ইউরোপের চমকপ্রদ আচার-ব্যবহার, বিলাসিতা ও সহজ-সরল উপাসনাপদ্ধতি আমাদিগকে ঐদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল; অন্যদিকে আমাদের সমাজপতিদের অতি কঠোর শাস্তি ও গুরু-পুরোহিতদের প্রাধান্য ও অত্যাচার জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আমাদের দেশীয় ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। যাঁহাদের চেষ্টা ও যত্ন দেশকে বহুভাবে উন্নত করিতে পারিত, তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণান্তর দেশীয় সমস্ত নিয়মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে বিদেশীদের সাহায্য করিয়া আমাদের নিয়মগুলি জগতের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করিতে পারিলেন। শিক্ষিত ও শক্তিমান সম্প্রদায় সমাজ হইতে বাহির হইয়া যাওয়ায় অবশিষ্ট কতিপয় স্বার্থান্ধ গুরু ও পুরোহিত

---

* গত এই মাঘ রবিবার শান্তিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিবৃত।

শ্রেণীর লোকেরা শাস্ত্রগ্রন্থাদির উল্টা অর্থ করিয়া জনসাধারণের কাছে প্রচার করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার নূতন নূতন পূজা যজ্ঞ ও শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা নিজেদের প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করিতে লাগিলেন, একথা রাজা রামমোহন রায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। লোকেও নানাপ্রকার লোভে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এই সব পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়াও যখন ঈপ্সিত ফল পাইল না, তখন এই ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে লাগিল। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি কুসংস্কারমূলক প্রথার ফলে সমাজের গাত্রে পাপ প্রবেশ করিতে লাগিল। তথাকথিত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, অন্যের কথা তো দূরে থাক, অতি রক্ষণশীল হিন্দুদেরই নিকটে হেয় বোধ হইতে লাগিল; এবং এই সুযোগে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাদের স্বীয়-স্বীয় ধর্ম্মমতের প্রাধান্য প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মীদিগকে নিজ দলে টানিয়া লইতে লাগিলেন।

ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ ক্রমে ক্রমে যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহাতে মনে হয়, যদি সে সময়ে মহাত্মা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদাদি ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম প্রচার করিয়া বুঝাইয়া না দিতেন যে, যে সব অত্যাচার ও অন্যায় সমাজে চলিতেছে তাহা শাস্ত্রানুমোদিত নয়, পরন্তু কতিপয়ের স্বার্থানুমোদিত মাত্র, তাহা হইলে হয় ত আজ হিন্দুর ধর্ম্ম বা সমাজের কোনও অস্তিত্বই আমরা দেখিতে পাইতাম না; আর যদিই বা সামান্য চিহ্ন থাকিত তাহা এত হীন ও কলুষিত অবস্থায় থাকিত যে, নিজেকে হিন্দু বলিতে যে কোনও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি লজ্জাবোধ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মগ্রন্থাদির পুনঃপ্রচার করিয়া ও তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা সকলকে জানিবার শুভ অবসর দিয়া প্রাচ্য ঋষিদের যুগযুগান্তের তপস্যা ও অভিজ্ঞতার ফল সমগ্র মানবজাতিকে উপভোগ করিতে দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। সকল ধর্ম্মের মূলই সত্য এবং সত্যই আমাদের লভ্য। সত্যকে লাভ করিলেই মানব দুঃখ-শোকের অতীত হইয়া অমরত্বলাভ করে, বহুদিনের পর ব্রাহ্মসমাজই বহু আয়াস ও ঐহিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ইহা প্রচার করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মসমাজ আর্য্যঋষিদের প্রবর্ত্তিত মহা কল্যাণকর উপনিষদ ও বেদের ধর্ম্মকেই গ্রহণ করেন এবং কালের কুটিল গতিতে যে সকল অকল্যাণকর সংস্কার ও নিয়ম ধর্ম্ম বা উপধর্ম্মের নামে প্রকৃত ধর্ম্মকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল তাহা বর্জ্জন করিয়া দেশ, কাল ও অবস্থা উপযোগী নিয়ম প্রচলিত করিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যখন আর্য্যঋষিদের অনুমোদিত ধর্ম্মই পুনরুদ্ধার করা হইল, তখন ভিন্ন নামে কেন তাঁহাকে অভিহিত করা হইল? তাহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ যাঁহারা কুসংস্কার ও উপধর্ম্ম ছাড়িয়া সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন, স্বার্থপর ও কুসংস্কারাপন্ন সমাজপতি গুরু-পুরোহিত প্রভৃতি তাঁহাদিগকে নাস্তিক, বিধর্ম্মী ও ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া প্রচার করিতে ও তাঁহাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের আত্মরক্ষা ও স্ত্রী-পুত্রের রক্ষার জন্য একটি সংঘ গড়িয়া তুলিতে হইল। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে কেবল নিজেরা মুক্ত হইলেই চলিবে না, কিন্তু সমগ্র মানবজাতিকে এই স্বাধীনতার আস্বাদ জানিতে দিতে হইবে, সকলকে এই ভূমানন্দ লাভ করিতে শিখাইতে হইবে। দেশকে ধর্ম্মে, জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধনে, মানে ও সত্যতায় শ্রেষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। সকলকে জানাইতে হইবে যে তাহারা সকলেই অমৃতের সন্তান; সকলেই স্বাধীনতালাভের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ভগবানের নিকট সকলেই সমান এবং তিনি নিরপেক্ষ, নির্লোভ, শাশ্বত ও সনাতন এবং সর্ব্বদাই আমাদের কোলে ধরিয়া আছেন ও শুভাশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তিনি এক ও রূপহীন হইলেও আমরা যাহাতে তাঁহাকে না হারাই, সেইজন্য প্রতি অণুপরমাণুতেও মিশিয়া রহিয়াছেন। কোনও কার্য্যই তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত নয়, অতএব কোনও অন্যায় কার্য্য করিয়া সেই পরম করুণাময় পিতার বিরাগের কারণ না হই। এই পরম সত্যকে প্রচার করিতে হইলেও একটি সংঘের প্রয়োজন।

ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু সংঘবদ্ধ হইয়াও নিজেকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে চান নাই। যে কেহই হউক না কেন, যখনই ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছেন কখনও বিফলমনোরথ হন নাই। অন্য ধর্ম্ম ও সমাজ মধ্যে থাকিয়াও যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ আদর্শকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ফিরিয়া যাইতে হয় নাই। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজ কেবল গুণেরই পূজা করিয়া আসিতেছেন, ঈশ্বরের প্রতি ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্রাহ্মসমাজ চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই ব্রাহ্মের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও ব্রাহ্মসমাজের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আজ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। কুসংস্কার, স্বার্থ বা ভীতি বশতও যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কুকথা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আজ যে সাদা-সিধা পোষাকপরিচ্ছদ ও চাল-চলন প্রচলিত রহিয়াছে, ইহাও ব্রাহ্মসমাজেরই প্রভাবে। আজ যে ছুঁৎমার্গ পরিহার, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ-পরিহার প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে ইহাও ব্রাহ্মসমাজের

প্রাণপণ চেষ্টার পরিণাম ফলে; ছুৎমার্গ, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ প্রথা যে আর্য্যধর্ম্মবিরোধী, ইহা একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রথম ব্রাহ্মসমাজই প্রমাণিত করেন। স্ত্রীশিক্ষা যে সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং স্বামী ও স্ত্রীর যে সংসারে সমান দায়ীত্ব ও সমান মূল্য ইহাও আজ ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সুসংযত স্ত্রী-স্বাধীনতাও যে জাতি তথা দেশের কল্যাণের জন্য আবশ্যক তাহাও ব্রাহ্মসমাজের দ্বারাই এদেশে অন্ততঃ প্রচারিত হইয়াছে। মা সবল সুস্থকায় ও স্বাধীনচেতা না হইলে যে সন্তানও সেরূপ হইতে পারে না, তাহা ধীরে ধীরে লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষা ও গুণের আদর করিতে ব্রাহ্মসমাজই আমাদের শিখাইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত, ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দুসমাজের কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া বুঝান কঠিন। আমার মনে হয় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজের অনেক বাকী আছে এবং আমাদেরই তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষীদের কাছে যাহা পাইয়াছি তাহা কেবল নিজেরাই আত্মসাৎ করিলে চলিবে না—ইহা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ছাড়াইয়া দিতে হইবে, যাহাতে সমস্ত পৃথিবী এই সত্যকে জানিয়া পরম শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

এস আজ এই পবিত্র মন্দিরে এই শুভমুহূর্ত্তে সেই পরম দয়াল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি সকলকে তাঁহারই দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য করাইয়া লন। সমগ্র জগৎই যেন তাঁহার স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হয় ও তাঁহার সঙ্গ উপভোগ করিয়া পরমানন্দে ডুবিয়া থাকিতে পারে। তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র গম্য ও একমাত্র পূজনীয়। তিনিই আমাদের প্রত্যেকের পিতা মাতা পরিত্রাতা এবং ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; আজ সকল ইন্দ্রিয়সহ হৃদয় ও মন দিয়া তাঁহারই পদে আশ্রয় লইয়া ধন্য হই। তিনি আমাদের মধ্য দিয়া তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লউন ও তাঁহার ইচ্ছামত পরিচালিত করুন।*

আগে চল্।

(শোভাযাত্রার গান)

লুম—পটতাল।

আগে চল্ মিলে চল্ চল ভাই চল যাই কাজ্ সাধিতে—
এক্ প্রাণে এক্ মনে।
এমন সুন্দর লেগে যাও কাজে সুরনর দেখিবে, অবাক নয়নে
হৃদয়ে হৃদয়ে পড়িবে বাঁধনে, সুখ-দুঃখ বহিতে ॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীত-ভারতী শ্রীবাণী দেবী Mus. Doc. (Ind.)

১´ • ১´ • ১´ • ১
{II সা রা। গা -া I সা রা। গা -া I সা ন্া। ধ্া প্া I প্া ধ্া।
আ গে চ ল্ মি লে চ ল্ চ ল ভা ই চ ল

• ১´ • ১´ • ॥ ১´ • ১´
। ন্া সা I রা -া। সা ন্া I সা -া। -া -া I} সা -া। -া রা I পা -া।
যা ই কা জ্ সা ধি তে • • • এ • ক্ প্রা ণে •

• ১´ • ১´ •
। -া -া I মা -া। -া পা I গা -া। -া -া II
• • এ • ক্ ম নে • • •

১´ • ১´ • ১´ • ১´
I না -া। না না I র্সা -া। র্সা না I ধা না। র্সা না I ধপা মা।
এ • ম ন সু • ন্দ র লে গে যা ও কা •

• ১´ • ১´ • ১´ • ১´
। পা -া I মা মা। গা গা I মা -া। ধা ধা I পা পা। মা -া I মা মা।
জে • সু র ন র দে • খি বে অ বা ক • ন য়

• ১´ • ১´ • ১´ • ১´ •
। গা -া I পা পা। গা -া I মা মা। রা -া I গা গা। গা -া I গা পা। গা -া I
নে • হৃ দ য়ে • হৃ দ য়ে • প ড়ি বে • বাঁ ধ নে •

১´ • ১´ • ১´ • ১´ •
I সা -া। রা -া I গা -া। পা -া I মা -া। গা রা। গা -া। -া -া II II
সু • খ • দু • খ • ব • হি • তে • • •

---

* গত ৮ই মাঘ বুধবার আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিবৃত।

ব্রাহ্মসমাজ ও শাস্ত্র।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ)

মানবীয় সভ্যতার প্রথম প্রভাতে ভারতীয় ঋষিদের তপোবন হইতে ঊষায় ও সন্ধ্যায় পবিত্র বেদগান আকাশ-বাতাস মুখরিত করিত; উপনিষদের তত্ত্ব হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া পরব্রহ্মের চরণে আত্ম-নিবেদন করিতে সহায়তা করিত—যিনি অনলে অনিলে, যিনি সাগরে সরিতে, মরু গিরি পর্ব্বতে, যিনি হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে, তাঁহাকে পূজা করিতে শিক্ষা দিত। সেই সময়ে ভারতীয় সভ্যতার শান্ত রশ্মি বিশ্বভুবন আলোকিত করিয়াছিল; ভারতীয় দর্শন, বেদ-বেদাঙ্গ, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডাররূপে ভারতীয় ঋষির সাধনার পরিচয় ঘোষণা করিত দেশে দেশে কালে কালে।

কালচক্রনেমির অলঙ্ঘ্য পরিবর্ত্তনে আর্য্যঋষির দীপ্ত প্রতিভার দান অমূল্য শাস্ত্র অবজ্ঞাত হইল, অধ্যাত্মজাতি ভারতবাসী অধ্যাত্মতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক অকিঞ্চিৎকর পদার্থে মনোনিবেশ করিল। ডুবিল—কাল সাগরের অতল তলে সব ডুবিল—ধর্ম্ম ডুবিল—কর্ম্ম ডুবিল—স্বাধীনতার গৌরবসূর্য্য প্রতীচ্যের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিবার জন্য প্রাচ্যের উদয়াচল হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়া নীলাম্বুধির অন্তহীন জলতলে লীন হইয়া গেল! বিরাজ করিতে লাগিল ভারতব্যাপী এক বিরাট অন্ধকার—অজ্ঞানের, কুসংস্কারের, ধর্ম্ম-বিমুখতার এক মোহ তিমির! যেদিকে তাকাই, সব দিকেই দেখি অন্ধকারের অট্টহাসি! মোগল-রাজত্বের শেষ ভাগ হইতে ইংরেজ-রাজত্বের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত ভারতের এই মোহতিমিরের রাজত্ব।

সেই সময় হিন্দুজাতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্মরণ করিলে দুঃখে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। মনে হয়, যে হিন্দুজাতি একদিন জগতের বরেণ্য শীর্ষস্থানীয় ছিল—আজ তাহার কি অধঃপতন! ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞান ভারত হইতে নির্ব্বাসিত, বেদের ধ্বনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় হোমধূম-সুরভিত আকাশকে প্রতিধ্বনিত করে না; জাতিভেদের প্রবল নিষ্পেষণে ভারতবাসী নিষ্পিষ্ট; সকলেরই মুখে এক কথা—আমায় ছুঁয়ো না; কুসংস্কারের শত বন্ধনে হস্তপদ বদ্ধ; গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার পথে যদি কোন অস্পৃশ্য জাতির অঙ্গে অঙ্গ স্পর্শ হয়, তখনি আবার ফিরিয়া গঙ্গায় গমন করিয়া স্নান করিতে হইবে—নতুবা নিস্তার নাই! ধর্ম্ম বাহ্যিক আচারে পর্য্যবসিত—তিলক-ফোঁটা লইয়া মারামারি কাটাকাটি; পঞ্চোপচার ষোড়শোপচারই মানসরাজ্য জুড়িয়া বসিয়া রহিল, ভক্তি সরিয়া গেল দূরে, জ্ঞান পলায়ন করিল হিমালয়ের গহ্বরে। ঈশ্বর? বোধ হয় তিনি ন্যায় ও স্মৃতির আবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া গেলেন—রহিল বাহ্যিক ধর্ম্মের আবরণে প্রকাণ্ড মিথ্যাচার—নাস্তিকতার দিগন্তব্যাপী প্রতিচ্ছবি।

বেদ-বেদান্ত উপনিষৎ দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র আর কেহ আলোচনা করিত না। মাত্র কোথাও কোথাও পিতৃপুরুষের নিকট প্রাপ্ত শালগ্রাম শিলার সঙ্গে সেই সমস্ত শাস্ত্র পুঁথির আকারে চন্দনলিপ্ত হইয়া পূজা লাভ করিত—অনেক পুঁথি জীর্ণ, কীটদষ্ট অবস্থায় ক্রমশঃ কালের ও কুক্ষিগত হইতেছিল!

ভারতের এই অবনতির অবস্থায় মনে হইল, বুঝি আর এই অমানিশার অন্ধকার তিরোহিত হইবে না—ঊষার আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিবে না প্রাচীর উদয়াচলে; মনে হইল বুঝি, এইবার আত্মজ্ঞানবিমূঢ় ভারতবাসীর নাম জগতের বক্ষ হইতে চিরতরে মুছিয়া গেল।

কিন্তু বিধাতার বিধানে অমানিশারও অবসান হয়; আবার কঠোর হিমযামিনীর অবসানে দিব্যপ্রভা-বিলসিনী হেমকায়া ঊষা নিদ্রার রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করে; সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ হাসিয়া উঠে পুরমন্দির-দেউলে, বৃক্ষরাজির উন্নত শিরে, প্রস্ফুটিত ফুলদলে, নির্ঝরিণীর চঞ্চল তরঙ্গরঙ্গে; ভারতের মুক্তির পথও বিধাতৃবিধানে খুলিয়া গেল। যাহা কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই, সত্য সত্যই ভারতের ভাগ্যে সে মহাদিন উপস্থিত হইল; অদৃষ্টদেবী ভারতের কণ্ঠদেশে বরণীয় লোভনীয় রত্নহার দুলাইয়া দিলেন।

শত বৎসর পূর্ব্বে এমন এক মহাপুরুষ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন; আমাদের সৌভাগ্যবলে—যিনি অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতের বুকে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধ নয়ন জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় উন্মীলিত করিয়া দিলেন; যিনি স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়বলে ভারতের তপোবন-নিহিত লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রকে পুনরায় স্বীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়।

সে এক মহা স্মরণীয় দিন—যেদিন সত্যান্বেষী রামমোহন সহস্র বাধা-বিঘ্ন পদতলে দলিত করিয়া সত্যের পূজার জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া মিথ্যাচার ও নাস্তিকতার মূলে কুঠারাঘাত করেন। যে উন্নতির বন্যা আজ হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বিপ্লাবিত করিতেছে—তাহার মূলে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ। আজ যে দেশ-বিদেশে, প্রাচ্যে প্রতীচ্যে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের আদর দেখা যাইতেছে, বেদ-বেদান্ত-গীতা-উপনিষদ্ বিবিধ ভাষায় অনূদিত হইয়া দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে—তাহার মূলে রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ।

সত্যান্বেষী রামমোহন যখন সত্যতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য

বেদান্তদর্শন পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি দেখিলেন ভারতের গৌরব বেদান্তদর্শন বাঙ্গালার কোথাও পাওয়া যায় না; অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাটীতে খোঁজ করিতে করিতে এক স্থানে বেদান্তদর্শনের হস্তলিখিত পুঁথি চন্দনচর্চ্চিত অবস্থায় দেখিতে পান। বহু আয়াসে সেই কীটদষ্ট, চন্দনচর্চ্চিত পুঁথি হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া পাঠ করেন। তৎপরে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের অন্বেষণে দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইয়াছেন—এমন কি তখনকার ঠগী-দস্যুসঙ্কুল স্থানের মধ্য দিয়া সুদূর তিব্বতে পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই অদম্য অধ্যবসায়বলে রামমোহন উপনিষদ্ ও বেদ অধ্যয়ন করতঃ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন।

এই শাস্ত্রচর্চ্চার মধুময় ফল তাঁহার জীবন-কল্পবৃক্ষ হইতে সমুদ্ভূত হইল—লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার ক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রবহির্ভূত ইংরাজী শিক্ষার ফল, তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র-নিহিত অমূল্য ব্রহ্মজ্ঞান, এবং উহা লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে উপদেশই দেশকে রামমোহনের দান—উহাই তাঁহার 'বাণী'।

এই জন্য তিনি শঙ্করের অদ্বৈত মতের পন্থী না হইয়া দ্বৈতাদ্বৈত ভাবে পরব্রহ্মের উপাসনার প্রচলন করেন। বাস্তবিক, আজ হিন্দু যে বলিতেছে, আমি পুতুল বা মূর্ত্তিপূজা করি না, মূর্ত্তির মধ্য দিয়া পরব্রহ্মের পূজা করি—মূর্ত্তি প্রতীক মাত্র—তাহাও এই ব্রাহ্মসমাজের দান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

তার পর, রামমোহন সর্ব্বসাধারণের জন্য শাস্ত্রপ্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, যদি সাধারণ লোক শাস্ত্রে কি আছে, তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারে, তবে আর তাহারা কুসংস্কারে বশীভূত হইবে না। উক্ত উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া তিনি ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি ছয়খানি উপনিষৎ বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন এবং ঐ সমস্ত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশ করেন। এই উভয়বিধ অনুবাদ-কার্য্যে রামমোহনকে প্রথম পথপ্রদর্শক বা pioneer বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। তিনি ভগীরথরূপে শাস্ত্রগঙ্গার পূত-নির্ম্মল ধারা হিমাচল-সদৃশ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই ভারতের দীনতম ব্যক্তির কুটীরপ্রাঙ্গণ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত করিয়াছেন।

রামমোহন অকালে বৃষ্টল নগরে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্য্য লুপ্ত হইল না; মঠের মোহান্তের দেহত্যাগে চেলা যেমন গদী অধিকার করিয়া দেবসেবার ভার গ্রহণ করে, ঠিক তেমনি রামমোহনের লোকান্তরের পর যে আত্মত্যাগী সত্যনিষ্ঠ মহাপুরুষের প্রতিভাদীপ্তি ব্রাহ্মসমাজকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল, যিনি রামমোহনের আরব্ধ অসম্পূর্ণ কার্য্য স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিলেন—তিনি প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, দেবেন্দ্রনাথ উহার রক্ষাসাধক ও উন্নতিবিধাতা; রামমোহন শাস্ত্রপ্রচারের পথপ্রদর্শক, দেবেন্দ্রনাথ উহার পুষ্টিসাধক। মহারাজ অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মও তদ্রূপ উন্নতি ও প্রসার লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

মহর্ষি দেখিলেন, সকলেই বেদের দোহাই দেয়, অথচ বেদে কি আছে, তাহা কেহই জানে না। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে বৈদিক জ্ঞানপ্রচারের জন্য মহর্ষি সংক্ষিপ্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ ঋগ্বেদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহা দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল শরতের কমলবনে সূর্য্যকিরণের মত। ঋগ্বেদের অনেকাংশ প্রকাশিত হইবার পর মহর্ষি দেখিতে পান, পণ্ডিত-প্রবর MaxMuller ঋগ্বেদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। Max Muller তত্ত্ববোধিনীর ঋগ্বেদ-প্রকাশের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং ইহাও স্বীকার করেন যে, তাঁহার বেদপ্রকাশের অনুপ্রেরণা তিনি তত্ত্ববোধিনী হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর মহর্ষি ভাবিলেন, শাস্ত্রপ্রচার প্রভৃতি কার্য্যে শক্তি বিভক্ত হইলে কার্য্যের হানি হয়; সুতরাং Max Muller যখন বেদ প্রচার করিতেছেন, যখন যোগ্য ব্যক্তি উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন মহর্ষির কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি নাম চাহিতেন না, চাহিতেন জগতের কল্যাণ; সুতরাং তিনি ঋগ্বেদপ্রকাশে ক্ষান্ত হন।

গ্রাম্য সরোবরের কালো জলে মুদিত শতদল যেমন প্রভাতসূর্য্যের কনক-কিরণ-স্পর্শে একটি একটি করিয়া দলরাজি বিকশিত করিতে থাকে, তেমনি মহর্ষির কোমল করপল্লবস্পর্শে শাস্ত্রশতদলও দলরাজি বিকশিত করিতে লাগিল। তৎপরে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি প্রামাণ্য উপনিষৎগুলি সংক্ষিপ্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। রামমোহন-প্রচারিত ঈশ কেন প্রভৃতি ছয়খানি উপনিষদ্‌ও টীকাসহ প্রকাশ করেন। তত্ত্ববোধিনীর সহায়তায় এই সমস্ত উপনিষৎ প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। উপনিষদ্ প্রচার করিয়া মহর্ষি ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি আনন্দ বেদান্তবাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দ্বারা সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনের প্রবন্ধ লিখাইয়া তত্ত্ব-

বোধিনীতে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। আদিব্রাহ্ম-সমাজ হইতেই শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য শ্রীধরস্বামী ও আনন্দ গিরির টীকা এবং বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভগবদগীতা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করেন। আজকাল যেখানে সেখানে শাস্ত্রপ্রচারের কার্য্যালয় সন্ধ্যার আকাশে নক্ষত্রমালার মত যে পরিদৃষ্ট হইতেছে, উহার মূলে সূর্য্যরূপী দেবেন্দ্রনাথের আপ্রাণ চেষ্টা বর্ত্তমান। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের তত্ত্বাবধানে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে মহাভারত অনুদিত করেন, তাহাও প্রথম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই শাস্ত্রসঙ্কলন কার্য্যে ব্রতী হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে সার উইলিয়ম জোন্সপ্রতিষ্ঠিত Asiatic society পুঁথি সংগ্রহ করিত না, কিন্তু মহর্ষির এই কর্ম্মপ্রচেষ্টা সোসাইটীর সভ্যগণের গোচরীভূত হইবার পর Asiatic society পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত হন। আজকাল এসিয়াটিক সোসাইটির বিরাট পুঁথিবিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে—ভারত গবর্ণমেণ্ট ৫ বৎসর অন্তর পুঁথি সংগ্রহের জন্য দশ হাজার টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন—কিন্তু ঐ প্রচেষ্টার মূলেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। এসিয়াটিক সোসাইটীকে পুঁথিসংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া যে উদ্দেশ্যে তিনি ঋগ্বেদ প্রকাশ পরিহার করিয়াছিলেন, ঠিক সেই মহান্ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া পুঁথিসংগ্রহ কার্য্য পরিত্যাগ করেন। যদিও মহর্ষি কর্ত্তৃক প্রকাশিত নহে, প্রথম ছাপান চণ্ডী হিন্দু কম্পোজিটর ও হিন্দু প্রেসম্যানের সাহায্যে আদিব্রাহ্মসমাজের প্রেস হইতেই ছাপা হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজকে উন্নতির তুঙ্গশৃঙ্গে তুলিয়া দিয়া মহর্ষি লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু তাঁহার আরব্ধ কার্য্য শাস্ত্রপ্রচার বন্ধ হয় নাই। আদিব্রাহ্মসমাজ মহর্ষির প্রদর্শিত পথ ধরিয়া চলিতেছে। আদিব্রাহ্মসমাজ 'বৈয়াসিক ন্যায়মালা' প্রকাশ করিয়া মহর্ষির ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। 'বৈয়াসিক ন্যায়মালা' সাধারণ্যে বিশেষ সমাদৃত। বিশেষত ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এই আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে যখন গীতার interpolation theory বা প্রক্ষিপ্তবাদ বিখণ্ডিত করা হয়, তাহাতে দেশে রীতিমত একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এখনও শাস্ত্রপ্রচারের প্রচেষ্টা সমভাবে চলিতেছে।

আজ এই শত বর্ষ পরে দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রপ্রচারে যাহা করিয়াছে, অন্য কোন সমাজ তাহা করে নাই। ব্রাহ্মসমাজের এই প্রচেষ্টার জন্য আজ সমগ্র সভ্যজগৎ ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী।

শাস্ত্রপ্রচারের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মনিষ্ঠা এদেশবাসীর হৃদয়ে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, দেশে যদি লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞান পুনরায় পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্রাহ্মসমাজের এই প্রচেষ্টার ফলে যদি দেশে দেশে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রভাত-সূর্য্যের হিরণকিরণের মত ছড়াইয়া পড়ে, দেশবাসীর হৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যদি উন্মুখ হইয়া উঠে, তবেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও শতবর্ষব্যাপী চেষ্টা সার্থক হইবে।

যে মহাপুরুষগণ শাস্ত্রপ্রচারের পথপ্রদর্শক, আজ এই শতবার্ষিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহারা আনন্দময় অমৃতময় ব্রহ্মলোক হইতে ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্রপ্রচার কার্য্যের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন—তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য জয়যুক্ত হউক। *

বাঙ্গলা সাহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দান।

(শ্রীনিরঞ্জন সরকার)

আজকাল যে সমস্ত পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী'ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। বাঙ্গলা ভাষা যে কতটা পরিমাণে তত্ত্ববোধিনী ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বাঙ্গলা ভাষার আর সে দিন নাই; দেখিতে দেখিতে এই ভাষা বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে; কত ছোট-বড় সাহিত্যিক প্রতিদিন বাঙ্গলা ভাষাকে পুষ্ট করিতেছেন—কিন্তু কাহারা এই ভাষাকে গড়িয়া তুলিলেন তাহা দেখিতে গেলে আমাদিগকে পুনরায় সেই প্রাচীনকালের বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন দেখিতে পাইব, এ ভাষায় তত্ত্ববোধিনী ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের দান কত বড়।

রাজা রামমোহন।

বহুপূর্ব্বে বাঙ্গলা গদ্য ছিল না। বাঙ্গলা গদ্য যে একেবারে ছিল না তাহা বলিলে ভুল হইবে। ছিল, কিন্তু তাহা কেবল গ্রাম্য চলতি ভাষায় ব্যবহৃত হইত, তাহার দ্বারা সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবপর ছিল না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন তাঁহার নবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন তখন তিনি বাঙ্গলা ভাষার সহায়তা লইলেন, এবং বাঙ্গলা গদ্যকে সাহিত্যের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি ভাষার জড়তা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেন না।

---

* গত ৮ই মাঘে আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

ঈশ্বরচন্দ্র।

মহাত্মা রামমোহনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলা গদ্যের সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা বাঙ্গলা গদ্যের স্রোত ফিরাইয়া দিলেন। রামমোহনের পরবর্ত্তীযুগের বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃতের ভয়ানক প্রভাব দেখা যায়, বড় বড় সমাস প্রভৃতির ভার তখন এত বেশী ছিল যে, তাহার স্বচ্ছন্দে নড়িবার-চড়িবার ক্ষমতা ছিল না। বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা ভাষাকে সমাসের শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া মুক্তি দিলেন। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি ইহাকে সুসংযত করিলেন, তাহাতে একটা অনতিলক্ষ্য ধ্বনি-সামঞ্জস্য যোজনা করিয়া দিলেন। বাঙ্গলাভাষা তখন আর কেবলমাত্র গ্রাম্য পণ্ডিতের ভাষা রহিল না।

কিন্তু বিদ্যাসাগর সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, সংস্কৃতের প্রভাব হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পান নাই, তাঁহার লেখার মধ্যে সংস্কৃতের ছাপ রহিয়া গিয়াছে; সেইজন্য তাঁহার সাহিত্যে অলঙ্কারের আধিক্য দেখিতে পাই। তাঁহার ভাষায় শক্তি আছে, তেজস্বিতা আছে, কিন্তু তত পরিমাণে সহজ গতি নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই বাঙ্গলা ভাষার এ দৈন্য দূর করিয়াছিলেন; তত্ত্ববোধিনী তাঁহার সেই দান আমাদের নিকট বহন করিয়া আনিয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনী।

দেবেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ তাঁহার ধর্ম্মমত সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার মানসে তত্ত্ববোধিনী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইলে সাধারণে তাঁহার বাণীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইজন্য তাঁহাকে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিসাধনের জন্যও চেষ্টা করিতে হইয়াছে। এবং এই জন্যই তিনি ভাষার সহজ গতি দান করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পরিচালনার ভার দেন স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে। তাঁহার সম্বন্ধে মহর্ষি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি যে সমস্ত প্রবন্ধ ইত্যাদি তত্ত্ববোধিনীর জন্য লিখিবেন তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তিনি নিজে দেখিয়া দিলে তবে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যেও আমরা তাঁহার প্রভাব দেখিতে পাই।

অক্ষয় দত্ত।

তাহা ভিন্ন দেবেন্দ্রনাথই প্রথম অক্ষয়কুমার দত্তকে নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি রচনা করিতে উৎসাহ দিয়া এবং তাহা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করাইয়া পরোক্ষভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যে এই সকল বিষয় আলোচনার সূত্রপাত করেন। এ বিষয়েও বাঙ্গলা ভাষা তাঁহার নিকট চিরঋণী।

এইত গেল পরোক্ষভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার দান। তাঁহার নিজের রচনার মধ্যে মাত্র দুইখানি বই আমরা দেখিতে পাই। একখানি পত্রাবলী, অপরখানি তাঁহার আত্মচরিত।* তাঁহার আত্মচরিত পাঠ করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে কিরূপ সহজভাবে তিনি বাঙ্গলা লিখিতেন এবং কিরূপে তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে সুললিত বাক্‌ছন্দের সৃষ্টি করেন। এখন বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের যুগে বসিয়া হয়ত ধারণাও করিতে পারিব না যে তাঁহার সাহিত্য পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে কত উচ্চে উঠিয়াছিল; সেই পুরাতন ভাষার সহিত তুলনা করিলে তবেই বুঝিতে পারিব।

তিনি যেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অন্য কোন বস্তুর বর্ণনা করিয়াছেন সেখানে শব্দের আড়ম্বর নাই, অলঙ্কারের ছটা নাই; আছে শুধু সরস, সরল, হৃদয়গ্রাহী ভাষার মাধুর্য্য। তাঁহার সে ভাষা কোথাও বাধে না; তরতর করিয়া স্বচ্ছ, নির্ম্মল স্রোতস্বিনীর মত বহিয়া যায়। তাঁহার সুললিত বাক্‌ছন্দের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এইরূপ তাঁহার বহু দান বঙ্গভাষায় আছে; আজ হয় ত সে সবগুলির সংবাদই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তবুও, একদিন যাঁহাদের চেষ্টায়, আমাদের মাতৃভাষার উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল, আজ যদি আমরা তাঁহাদের কথা ভুলিয়া যাই তবে তাহা আমাদের অকৃতজ্ঞতারই পরিচায়ক হইবে।†

অধিবাসন।

(শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস)

একতারা তোর মধুর সুরে, বাজারে ভাই বাজা।
প্রভুর বেদী ভরা রে ভাই, সুবাস কুসুম তাজা॥
ভক্তি-প্রদীপ ধূপের সাথে,
জ্বালিস্ পূজার আঙ্গিনাতে,
শুভ্র কোমল পরাণ-পাতে,
অধিবাসন সাজা॥

ভাণ্ডারে তোর যা কিছু ধন আছে রে ভাই আছে,
আনিস্ সকল উজোড় করে, আজকে প্রভুর কাছে;
আজকে সাঁজে, বারে বারে,
ডাকিস্ রে ভাই সবাকারে,
আসে যেন দেউল-দ্বারে,
দেখতে হিয়ার রাজা॥

---

* ইহা ব্যতীত তাঁহার বহু রচনা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস' 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তঃ সং

† মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুতিথিতে শান্তিনিকেতনে তাঁহার স্মৃতিসভায় পঠিত।

সঙ্ঘের প্রসার।

উপাসনা ও উপাসিকা।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

গৌতম নবদীক্ষিত কশ্যপ-ভ্রাতৃত্রয় সমভিব্যাহারে রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরপ্রান্তবর্ত্তী যষ্টিবনে সমুপস্থিত হইবা মাত্রই বনরক্ষিগণ রাজ-সকাশে তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করিল। মহারাজ বিম্বিসার রাজন্যবর্গসহ অবিলম্বে আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

এতদঞ্চলে প্রাচীন তাপস কশ্যপের অত্যন্ত খ্যাতি ও সম্মান ছিল। কেহ কেহ ভাবিলেন, সম্ভবতঃ গৌতম কশ্যপমুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কশ্যপ সর্ব্বসমক্ষে বুদ্ধের পদবন্দনা করিয়া সকলের সন্দেহ মোচন করিলেন। বিমুগ্ধ রাজা রাজন্যবর্গসহ তথাগতের শরণ গ্রহণ করিলেন। যশের পিতার পর বিম্বিসারই দ্বিতীয় উপাসক * বলিয়া পরিগণিত হইলেন। প্রত্যহ বুদ্ধ-দর্শনে এতদূর যাতায়াত কষ্টকর বলিয়া বিম্বিসার রাজধানীমধ্যস্থ বেণুবন নামক উদ্যানবাটী বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দান করিলেন। দান পরিগৃহীত হইলে বুদ্ধ সশিষ্যে বেণুবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। †

স্বয়ং মহারাজা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া মগধবাসিগণ দলে দলে বুদ্ধের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মগধরাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মবক্তা ও ধর্ম্মাচার্য্যরূপে খ্যাতি লাভ করিলেন।

রাজা শুদ্ধোদন সংবাদ পাইলেন, তদীয় তনয় বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া রাজগৃহে অবস্থান করিতেছেন। পুত্র-দর্শনেচ্ছু হইয়া তিনি অবিলম্বে তাঁহাকে স্বরাজ্যে আনয়নের জন্য বহু জনসমভিব্যাহারে জনৈক রাজ-পুরুষকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যে সময় বেণুবনে আসিয়া পৌছিলেন, বুদ্ধ তখন ধর্ম্মব্যাখ্যায় নিরত ছিলেন। বুদ্ধের সর্ব্বতাপহর উপদেশামৃত পান করিয়া সকলেরই সংসারে বিরাগ জন্মিল—তাঁহারা তথাগতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন।

এদিকে রাজা শুদ্ধোধন কোন সংবাদ না পাইয়া অপর একটি দলকে পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এবারেও কেহ ফিরিয়া আসিল না, কোন সংবাদও তিনি পাইলেন না। এইরূপে একাদিক্রমে নয়টি দল প্রেরণ করিয়াও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না দেখিয়া তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন। পরিশেষে একদিন গৌতমের বাল্যসহচর ও বিশ্বস্ত অমাত্য কালোদায়ীর কথা তাঁহার মনে পড়িল। যাহাতে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হয়, কালোদায়ীকে তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। বাল্যসখা গৌতমের সহিত পুনর্ম্মিলনের সম্ভাবনায় কালোদায়ী পরম পুলকিত হইলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পুনরায় গৌতমের সুখদুঃখের সমভাগী হইবার তাঁহার প্রবল বাসনা হইল। তিনি শুদ্ধোদন সমীপে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ব্যথিতান্তঃকরণে সম্মতি প্রদান করিয়া রাজা কহিলেন,—"কিন্তু, উদায়ী, যেরূপেই হউক গৌতমকে একবার কপিলবস্তুতে লইয়া আসিতে হইবে"। কালোদায়ী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সঙ্গিগণসহ যাত্রা করিলেন। বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণে কালোদায়ীর মন অপূর্ব্ব ভাবাবেশে বিভোর হইয়া রহিল—প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া শুদ্ধোধন ক্ষুব্ধচিত্তে নিরাশ হইলেন।

বুদ্ধ বারাণসীর মৃগদাবে বর্ষাবাস * করিলেন। অতঃপর শীতঋতু উরুবেলায় অতিবাহিত হইল। বসন্তাগমে তিনি বেণুবনে পুনরাগমন করিলেন। এই সময়ে একদিন কালোদায়ীর স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। ফাল্গুনী পূর্ণিমারাত্রে তিনি বুদ্ধের সমীপস্থ হইয়া উচ্চকণ্ঠে বসন্তশোভার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখনকার সুন্দর পথসমূহে দূরভ্রমণে বহির্গত হওয়া যে কিরূপ সুখকর, তিনি সুসংবদ্ধ ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ বুঝিলেন, ইহার ভিতর কালোদায়ীর কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে। জিজ্ঞাসিত হইয়া কালোদায়ী সবিনয়ে শুদ্ধোধনের অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। তাঁহার অনুরোধে বুদ্ধ কপিলবস্তুতে যাইতে সম্মত হইলেন।

অতঃপর বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে বুদ্ধ কপিলবস্তু যাত্রা করিলেন। আকাশপথে কালোদায়ী যাইয়া পূর্ব্বেই সেখানে সংবাদ দিয়া আসিলেন। বংশগৌরবোন্মত্ত শাক্যগণ ভিখারী গৌতমকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। কালোদায়ী বহু তর্কযুক্তির ফলে তাহাদের ভ্রম দূর করিলেন। ক্রমাগত দুইমাসকাল পথ চলিয়া বুদ্ধ ন্যগ্রোধবনে পৌছিলেন। শাক্যগণ

---

* উপাসক—গৃহীভক্ত।

† জৈনগণ বিম্বিসারকে মহাবীরের শরণাপন্ন বলিয়া দাবী করেন। "One of the staunchest champions of Jainism"—Vide Heart of Jainism—Sinclair Stevenson, pp. 41. সম্ভবতঃ তৎকালীন বহু রাজগণের ন্যায় বিম্বিসারও সকল গুণবান ধর্ম্মবক্তার গুণগ্রাহীমাত্রই ছিলেন।

* তৎকালে সকল পরিব্রাজক ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বর্ষার তিনমাস স্থির হইয়া একস্থানে অবস্থান করিতেন। কোন কোন গ্রাম বর্ষাবাসের জন্য আবাহন করিত। সেই গ্রামকে ঐ সময়ের জন্য নিমন্ত্রিতদলের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইত। ত্যাগীদলও প্রতিদানে গ্রামবাসিগণকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান করিতেন।

সমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠরাজবংশের আভিজাত্যাভিমান সহজে যাইবার নহে। শাক্যগণ অল্পবয়স্ক শাক্যকুমার ও কুমারীগণকে অগ্রগামী হইয়া বুদ্ধের অভ্যর্থনা করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ শাক্যগণের কেহবা সম্পর্কে গৌতমের জ্যেষ্ঠতাত, কেহ বা খুল্লতাত, কেহ বা অগ্রজ ইত্যাদি। তাঁহারা কেহই গৌতমকে অভিবাদন তো করিলেনই না, যথাযোগ্য সম্মান দেখাইতেও কুণ্ঠাবোধ করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাদের মানসিক বিকৃতাবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিভূতি সহায়ে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিলেন। তিনি শূন্যারূঢ় হইয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। শুদ্ধোদন তদ্দৃষ্টে—"এই তৃতীয়বার তোমায় প্রণাম করিতেছি" বলিয়া পুত্রকে অভিবাদন করিলেন। অন্যান্য শাক্যগণের মস্তকও সঙ্গে সঙ্গে আনত হইল।

বুদ্ধ যথারীতি ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। রাজকুমারকে ভিক্ষার্থী দেখিয়া পুনরায় শাক্যগণের বংশমর্য্যাদাজ্ঞান জাগিয়া উঠিল। তাঁহারা বুদ্ধের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। রাজা শুদ্ধোধন আসিয়া তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আবেগভরে বলিলেন, "আমার পুত্রের ভিক্ষাবৃত্তি শোভা পায় না, ক্ষান্ত হও, গৌতম। আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার হাতে, যাহা ইচ্ছা যত ইচ্ছা ভাণ্ডার হইতে লও। ভিক্ষা ত্যাগ কর।"

বুদ্ধ শান্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"এ আমাদের কুলরীতি মহারাজ!"

"না গৌতম, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কেহ কখনও ভিক্ষা করেন নাই।"

"ভুল করিতেছেন রাজা, আপনি রাজবংশধর। আমার পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্বগামী বুদ্ধগণ। প্রত্যেক বুদ্ধই ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেন।" অনন্তর বুদ্ধ শুদ্ধোদনকে সদুপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

উত্তিট্‌ঠে নপ্‌পমজ্জেয্য ধম্মং সুচারিতং চরে।
ধম্মাচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরমাহি চ॥
ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চারিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ;

"উঠুন, আলস্য ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম আচরণ করুন। ধর্ম্মাচারী ইহ ও পর উভয় লোকেই সুখ লাভ করেন। সদ্ধর্ম্ম আচরণ করুন; অসদ্ধর্ম্ম আচরণ করিবেন না; ধর্ম্মাচারী ইহ ও পর উভয় লোকেই সুখে থাকেন।"

উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে রাজা নির্ব্বাণপথে বহুদূর অগ্রসর হইলেন। তিনি আর বাধা প্রদান করিলেন না—গৌতমের ভিক্ষাপাত্র স্বয়ং বহন করিয়া শিষ্যগণসহ তাঁহাকে প্রসাদে লইয়া গেলেন এবং শ্রেষ্ঠ ভোজ্যসামগ্রী দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিলেন। আহারান্তে পুরনারীগণ একে একে বুদ্ধদর্শনে আগমন করিলেন। আসিলেন না কেবল অভিমানিনী যশোধরা। বুদ্ধ প্রিয় শিষ্য শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সহ যশোধরার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই যশোধরার সমস্ত অভিমান দূর হইল, তিনি তাঁহার পদতলে প্রণত হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন তখন সমীপবর্ত্তী হইয়া গৌতমের ভিক্ষুবেশ ধারণের সংবাদ পাইয়া যশোধারা কিভাবে তদনুরূপ বেশ পরিধান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার একাহারের সংবাদ পাইয়া কিভাবে একবেলা আহার আরম্ভ করেন, তাঁহার ভূশয্যার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কিরূপে স্বয়ং পালঙ্কে শয়ন ত্যাগ করেন, তৎসমুদয় বিবৃত করিতে লাগিলেন। যশোধরার এই বিলাসত্যাগ ও সংযমাভ্যাসের সংবাদে বুদ্ধ পরম হৃষ্ট হইলেন।

সপ্তাহকাল কপিলবস্তুতে শান্তিবার্ত্তা প্রচার করিয়া তিনি পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শীতবনে তাঁহার আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সময়ে শ্রাবস্তিনগরের শ্রেষ্ঠ বণিক অনাথপিণ্ডিক রাজগৃহে আগমন করিয়া তদীয় কোন বন্ধুর নিকট বুদ্ধের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করেন। বন্ধুর আগ্রহে তিনি বুদ্ধদর্শনে শীতবনে গমন করেন। অনাথপিণ্ডিকের গুপ্ত নাম ছিল—'সুদত্ত'। তিনি মনে স্থির করিলেন বুদ্ধ যদি তাঁহাকে ঐ নামে আহ্বান করিতে পারেন, তবেই কেবল তিনি তাঁহার মাহাত্ম্য স্বীকার করিবেন। বুদ্ধের সম্মুখীন হইতেই তিনি তাঁহাকে 'সুদত্ত'নামে আহ্বান করিলেন। অনাথপিণ্ডিক চমৎকৃত হইয়া তথাগতের শরণ গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধের উপদেশশ্রবণে তাঁহার স্রোতাপত্তি ফললাভ হইল।

অনাথপিণ্ডিক শাস্তাকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সম্মতি পাইয়া তিনি অবিলম্বে শ্রাবস্তিতে চলিয়া গেলেন। জমিতে পাশাপাশিভাবে যতমুদ্রার স্থান লইল * এতমূল্যে যুবরাজ জেতের প্রমোদোদ্যান 'জেতবন' ক্রয় করিয়া তথায় বহু অর্থব্যয়ে এক প্রকাণ্ড বিহার (মঠ) নির্ম্মাণ করিলেন। যথাসময়ে বুদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার হস্তে জলপ্রক্ষেপ করিয়া সেই † সুরম্য জেত-বনবিহার সঙ্ঘকে দান করিলেন।

শ্রাবস্তির অপর বিখ্যাত বণিক মিগারও পুত্রবধূ বিশাখার যত্নে, জৈনমার্গ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধের

* ১৮ কোটী রৌপ্যমুদ্রা।
† তাদানীন্তন প্রথা।

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিশাখা অঙ্গের প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী ভদ্রিয়ের কন্যা। বুদ্ধ যখন অঙ্গরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, বিশাখা সেই সময়ে পিতার সহিত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিগারের গৃহে নগ্ন সন্ন্যাসীগণ যাতায়াত করিতেন। মার্জ্জিতরুচি বিশাখা এ সকল কদাচার পছন্দ করিত না। এজন্য মিগার তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিতেন। কিন্তু বিশাখার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মিগার একবার বুদ্ধদর্শনে যাইতে সম্মত হন। বুদ্ধের দিব্য কান্তিদর্শনে ও তাঁহার অমৃতবর্ষী উপদেশশ্রবণে সদ্গুণসম্পন্ন সকলের এপর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে, মিগারেরও তাহাই হইল। মিগার তথাগতের শরণ গ্রহণ করিয়া পুত্রবধূকে 'মিগারমাতা' নামে ভূষিত করিলেন।

বিশাখা শ্রাবস্তিতে পূর্ব্বারামবিহার নামক আর একটি সুরম্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া, সংঘকে তাহা দান করিলেন। উপাসিকাশ্রেণীর মধ্যে বিশাখার জন্য শ্রেষ্ঠাসন নির্দ্দিষ্ট হইল। বিশাখা বুদ্ধের নিকট আটটি বর চাহিয়া লইলেন:—(১) বুদ্ধের নিকট কোন ভিক্ষু উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বিশাখার নিকট পাঠাইবেন, বিশাখা ঐ ভিক্ষুকে ভক্ষ্যদ্রব্য দিবেন; (২) বিশাখা আজীবন প্রতিদিন পঞ্চশত ভিক্ষুর আহার যোগাইবেন; (৩) কোন ভিক্ষুর পীড়া হইলে তাহার পথ্যাদির জন্য যাহা আবশ্যক বিশাখা তাহা সমস্ত নির্ব্বাহ করিবেন; (৪) যাঁহারা পীড়িতের শুশ্রূষা করেন বিশাখা তাঁহাদের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিবেন; (৫) বিশাখা পঞ্চশত ভিক্ষুর জন্য যে খাদ্য দিবেন, বুদ্ধ নিজে তাহার অংশ গ্রহণ করিবেন; (৬) প্রতি বৎসর বর্ষাকালে বিশাখা পঞ্চশত ভিক্ষুর প্রত্যেককে চীবরাদি অষ্ট 'পরিষ্কার' দান করিবেন; (৭) বিহারের জন্য যত ঔষধের প্রয়োজন সমস্ত বিশাখার নিকট হইতে আনিতে হইবে, এবং (৮) বিশাখা প্রতি বৎসর সমস্ত ভিক্ষুকে 'কণ্ডু প্রতিচ্ছাদন' নামক পরিচ্ছদ দান করিবেন। *

রাজগৃহে বর্ষাবাস করিবেন স্থির করিয়া বুদ্ধ অতঃপর মগধরাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। এইস্থানে তিনি পীড়িত হইলে, রাজবৈদ্য জীবক আসিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিলেন।

বৈশালী নগরে আম্রপালীনাম্নী অতুলনীয় রূপগুণসম্পন্না এক বারাঙ্গনা বাস করিত। মগধরাজ উহার খ্যাতিতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া আপন রাজধানীর জন্য ততোধিক রূপগুণশালিনী নারীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শালবতীকে তাঁহার পছন্দ হওয়ায় তিনি যথাযোগ্য প্রাসাদ-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। * কালে তাঁহার পুত্র রাজকুমার অভয়ের ঔরসে এই বারনারীর গর্ভে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাজকুমারের অজ্ঞাতসারে এই নবজাত শিশুকে অরণ্যে নিক্ষেপ করা হয়। রাজকুমার শিকারান্বেষণে অরণ্যে গমন করিয়া বনমধ্যে এই শিশুকে আবিষ্কার করেন। তখনও শিশু জীবিত ছিল বলিয়া তিনি ইহার নাম 'জীবক' রাখেন। এই শিশু যে তাঁহারই সন্তান তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন।

জীবক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অভয়কে আপনার মাতৃপরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু অভয় তাঁহার পিতামাতার সন্ধান অবগত নহেন জানিতে পারিয়া জীবক ক্ষুণ্ণ হইলেন। জীবকের এতকাল ধারণা ছিল অভয়ই তাঁহার পিতা। কিন্তু এখন তিনি দেখিলেন যে তিনি মগধরাজ্যের উত্তরাধিকারী নহেন। ভাবী জীবনযাত্রার উপায় স্থির করিবার মানসে তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে একদিন তক্ষশিলায় প্রস্থান করিলেন।

তক্ষশিলার মহাবিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যের অধীনে শিক্ষালাভ করিয়া জীবক অল্পকাল মধ্যেই আয়ুর্ব্বেদ ও শল্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শিক্ষান্তে গুরুর অনুমতি লইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিমধ্যে অভয় তাহাকে আপন পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। জীবক ফিরিয়া আসিলে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে রাজকুমারের আসন দান করিলেন। মহারাজ বিম্বিসারকে চিকিৎসাগুণে নীরোগ করিয়া জীবক রাজবৈদ্যের স্থান অধিকার করিলেন।

বুদ্ধের পীড়ার সংবাদ পাইয়া মহারাজ জীবককে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিলেন। জীবকের ব্যবস্থায় তিনি ক্ষণেকের মধ্যেই সুস্থ হইলেন। কিন্তু রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া জীবক চিকিৎসিতের নিকট আপনি বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সে মধুবর্ষী বাণী, সে অপূর্ব্ব দেহকান্তি, সে অন্তর্ভেদী স্নেহদৃষ্টি জীবককে সম্মোহিত করিল। জীবক তথাগতের শরণ লইলেন। আপন উদ্যানবাটীতে প্রাসাদোপম বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তিনি তাহা সঙ্ঘকে দান করিলেন।

রাজগৃহের বেণুবনে তাঁহার তৃতীয় বর্ষাবাসের সময় মগধরাজ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত মহামারী

---

* ঈশানচন্দ্র ঘোষ—জাতক ১ম খণ্ড—২৮৯ পৃষ্ঠা।

* এই শ্রেণীর নারীকে 'নগরশোভিকা' বলিত। প্রত্যেক নগরে এইরূপ নারী পরিপোষণ তখনকার রাজা ও রাজন্যবর্গের একটি গৌরবের বিষয় ছিল। এই সকল রমণীগণ অনেকসময়ে পাণ্ডিত্যাদি বহু সদ্গুণে খ্যাতিসম্পন্না ছিল। গ্রীসেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এথেন্সের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিসের রক্ষিতা পণ্ডিতা এসপাসিয়ার নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

উপস্থিত হইল। তীর্থিকগণ মহামারীশান্তিতে অসমর্থ হওয়ায় লিচ্ছবিগণ বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। বুদ্ধ অবিলম্বে তাহাদের রাজধানী বৈশালীনগরে গমন করিলেন। তাঁহার আগমনে মহামারী উপশমিত হইল। ফলে লিচ্ছবিগণ বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠাসনে বরণ করিয়া লইল।

তথাগত রাজগৃহে ফিরিয়া আসিয়া উপর্যুপরি তিন বৎসর কাল বেণুবনে অবস্থান করিলেন। পঞ্চমবর্ষায় তিনি বৈশালীর উপকণ্ঠে মহাবনে কূটাগারশালায় গমন করিলেন। এই সময়ে শাক্য ও কোলিয়গণের মধ্যে একটি বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। শাক্য এবং কোলিয়-রাজ্যকে পৃথক করিয়া রোহিণী নদী প্রবাহিত হইতেছিল। জলের অল্পতাবশতঃ উভয় রাজ্যের চাষোপযোগী জল দিতে এই ক্ষুদ্র নদী সমর্থ ছিল না। ফলে উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হইল। এই সংবাদ পাইয়া বুদ্ধ তথায় গমন করিলেন। তাঁহার উপদেশে সকলে জিঘাংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। তাঁহার বাণীতে অমৃতত্বের সন্ধান পাইয়া বহুলোক তাঁহার শরণ গ্রহণ করিল।

শুদ্ধোদনের অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া বুদ্ধ পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। মুমূর্ষু পিতা তাঁহার উপদেশ শুনিতে শুনিতে তনয়কে চতুর্থবার প্রণাম করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

ষষ্ঠবর্ষা শ্রাবস্তিনগরে অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধ রাজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন।* অষ্টমবর্ষায় তিনি ভর্গরাজ্যে † গমন করেন। অবন্তিরাজকুমার যুবরাজ বোধি এই সময়ে ভর্গরাজ্যে নবনির্ম্মিত কোকনদ নামক প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। তিনি বুদ্ধের গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বভবনে আমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধের আগমন উপলক্ষে প্রাসাদের দ্বিতলে উঠিবার সোপানাবলীতে বহুমূল্য বস্ত্র বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু বুদ্ধ উহার উপর দিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। বস্ত্র অপসৃত হইলে তিনি যথাস্থানে গমন করিয়া আহার্য্য গ্রহণ করিলেন। আহারান্তে উপস্থিত সকলকে সদুপদেশ দান করিয়া স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বর্ষান্তে তিনি শ্রাবস্তিনগরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতদঞ্চলে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া দ্বাদশবর্ষায় তিনি বৈরস্তিনগরে গমন করেন। বর্ষাশেষে তক্ষশিলা অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া সংকাশ্য, কান্যকুব্জ ও প্রয়াগ হইয়া তিনি বারাণসীতে ফিরিয়া আসেন। ব্রহ্মবাদের করগত সীমানায় বুদ্ধের প্রবেশ ইহাই প্রথম এবং শেষ। তথাগতের আহ্বান সেখানে কার্য্যকরী হইল না। অন্তরদ্বার যেখানে বজ্রঅর্গলে রুদ্ধ, মর্ম্মবাণী সেখান হইতে প্রতিঘাত মাত্র লইয়াই ফিরিয়া আসিল।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ষা শ্রাবস্তিতে অতিবাহিত করিয়া চতুর্দ্দশবর্ষার শেষভাগে তিনি পুনরায় কপিলবস্তুতে গমন করিলেন। গৌতমের গৃহত্যাগ হেতু যশোধরাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া সুপ্রবুদ্ধ জামাতার প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সুপ্রবুদ্ধের পুত্র দেবদত্তও গৃহত্যাগ করিয়া সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিল। বুদ্ধের কঠোর শাসন তাহার প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। সুপ্রবুদ্ধের ক্রোধ ক্রমে ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল। ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তিনি এইবারে গৌতমের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিলেন। ফলে সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁহার দেহান্ত ঘটিল।*

বিংশ বর্ষান্তে বুদ্ধকে অঙ্গদেশে গমন করিতে হইল। অনাথপিণ্ডিক অঙ্গদেশস্থ এক প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠীপুত্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বণিকপরিবার আজীবকমতাবলম্বী ছিল। নববধূর ইচ্ছাক্রমে তাঁহারা বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। ইহাদের আহ্বানে পঞ্চশত শিষ্যসহ বুদ্ধ তথায় গমন করিলেন। তাঁহার অমৃতময়ী বাণীতে মুগ্ধ হইয়া সমগ্র পরিবার সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিল। অনিরুদ্ধকে অঙ্গদেশে রাখিয়া তিনি শ্রাবস্তিনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তথাগতের বয়ঃক্রম যখন ৭২ বৎসর, দেবদত্ত তখন সাক্ষাৎভাবে বিদ্রোহী হইলেন। স্বমতাবলম্বী একদল ভিক্ষু সহ তিনি পৃথক সঙ্ঘ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় মগধ-রাজকুমার অজাতশত্রু পিতাকে নিহত করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করিলেন। অজাতশত্রুর সাহায্যে বুদ্ধের প্রাণনাশের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পিতৃবধের অনুতাপে অজাতশত্রুর মনে শান্তি ছিল না—সে নির্ম্মম স্মৃতি নিরন্তর অন্তরকে মর্ম্মপীড়ায় জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছিল। অবশেষে তিনি জীবকের

* বৌদ্ধ কথক বলেন ষষ্ঠবর্ষায় বুদ্ধ একবার ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গে স্বীয় জননী মায়া দেবীর নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে গমন করেন। তিন মাসকাল তিনি তথায় অবস্থান করেন। এই সময়ের জন্য ধরায় তিনি তাঁহার অনুরূপ একটি মায়াশরীর রাখিয়া যান, স্বর্গ হইতে তিনি সাংকশ্য নগরে অবতরণ করেন। অবতরণকালে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত তিনটি সিঁড়ি নির্ম্মিত হয়। মধ্যের সোপানাবলী বহিয়া বুদ্ধ, দক্ষিণে ব্রহ্মা ও বামে শক্র অবতরণ করেন। see M. of B.—Ken pp. 33. for another interesting version see M. of B, Hardy, 302 ff

† বর্ত্তমান এলাহাবাদের অনতিদূরে। এই রাজ্য বৎস্য রাজ্যের অধীন ছিল। see Pol. Hist of Anc. ind Dr. Raychaudhuri—pp. 98.

* আখ্যানকথক বলেন পাতালস্থ অবিচী নামক নরকে সুপ্রবুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়।

উপরোধে শান্তির আশায় তথাগতের সমীপস্থ হইলেন। শান্তি মিলিল—অজাতশত্রু বুদ্ধকে হৃদয়াসনে গ্রহণ করিয়া লইলেন। *

তথাগতের বয়ঃক্রম ৭৯ বৎসর। নালন্দা, পাটলিগ্রাম প্রভৃতি পরিক্রম করিয়া তিনি পুনরায় বৈশালী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আম্রপালীর আম্রবনে উপনীত হইবামাত্র উক্ত বারনারী সসম্ভ্রমে আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। তাঁহার উপদেশ শ্রবণে বারাঙ্গনার অন্তর নিষ্কলুষ হইল। দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া সে আম্রবন সঙ্ঘকে দান করিল এবং সশিষ্য বুদ্ধকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিল। আমন্ত্রণ গৃহীত হইল। ক্ষণপরেই লিচ্ছবি রাজগণ আসিয়া বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিক্ষাগ্রহণের নিমন্ত্রণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই আম্রপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তথাগত তাঁহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

বুদ্ধের সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া আম্রপালীর অন্তর আজ হঠাৎ উৎসবে মাতিয়া উঠিল। সমস্ত দিবস কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি হৃদয়ে এক লোকাতীত আনন্দ অনুভব করিলেন। বুদ্ধ ও বুদ্ধশাবকগণের সেবা করিয়া তিনি নিজকে ধন্যা জ্ঞান করিলেন। আম্রপালী সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের স্বহস্তে দীক্ষিত শেষ উপাসিকারূপে পরিগণিতা হইলেন।

তাঁহার সর্ব্বশেষ সাক্ষাৎ উপাসক হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল মন্দভাগ্য (!) চুন্দের। বেলুব, মহাবন প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অশীতিবর্ষ বয়সে তথাগত মল্লরাজধানী পাবানগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। কর্ম্মকার চুন্দ জগৎপাবনকে স্বগৃহে অতিথিরূপে পাইয়া নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করিল। আপনার শ্রেষ্ঠ উপাদেয় খাদ্য শূকরমাংসে সে সোল্লাসে অতিথিসৎকার করিল। হতভাগ্য জানিতেও পারিল না যে তাহারই বিষম ভ্রমে তাহার প্রিয়তম কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। †

পুরুষতর্পণ।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ মহাপুরুষদিগের নামে, তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে এখানে এসেছি। মহাপুরুষের কথা বল্লেই মার্কিণ মহাকবি লংফেলোর কবিতাটী মনে পড়ে, যা আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলুম—সেই জীবন গাথা—সেই Psalm of Life। এমন সুন্দর সার কথা এত অল্পের ভিতর জগতের সাহিত্যে খুব অল্পই আছে। ঐ মহাকবি ঐ গাথায় বলেছেন যে মহাপুরুষদের স্মরণ করা চাই, তাঁদের জীবন আলোচনা করা চাই—কেন চাই? তাঁহাদিগকে স্মরণ করলে, তাঁদের জীবন আলোচনা করলে, তাঁদের মহাপুরুষত্বের কারণ ও লক্ষণ সকল আমাদের জীবনের ভিতরে মিশিয়ে নিলে, আমরাও যে তাঁদের পথে চলতে পারব, মহাপুরুষের পদ অধিকার করতে পারব। মহাপুরুষত্ব কারও নিজস্ব নয়। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তরে আছেন—তাঁর জ্ঞান, তাঁর প্রেম, তাঁর শক্তির এক কণাও যিনি অন্তরে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন, তিনিই স্বভাবতই মহাপুরুষের স্থান অধিকার করবেন। অন্যান্য দেশে সভাসমিতি করে মহাপুরুষদিগকে স্মরণ করা হয়; আমাদের দেশে ধর্ম্মের সহযোগে তর্পণ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষেরও স্মরণ করবার বিধান আছে। আমরা বিদেশীয় সাহিত্যে বীরপূজার উপদেশ পেয়ে তবে সে বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হলুম এবং তখন নিজেদের দেশে কিরকম বীরপূজা প্রতিষ্ঠিত আছে, তার সন্ধান করতে উদ্যত হলুম। সন্ধান করতে গিয়ে দেখি—আশ্চর্য্য প্রণালীতে ঐ ধর্ম্মের সহযোগে এদেশে বীরপূজা চির-প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ব্রহ্মমন্দির যাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি, যাঁর অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র, সেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্মসমাজের ভিতর বীরপূজা এনে নবতরভাবে নূতনতর প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ইহাই নববিধান। আমরাও যদি বীরপূজার অন্তর্নিহিত সত্যটুকু উপলব্ধি করে ধর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, ভক্তিবীর, কর্ম্মবীর মহাপুরুষদিগকে

---

* এই সময়ে কোশলরাজ বিরূঢক কর্ত্তৃক কপিলাবস্তুর ধ্বংস সংসাধিত হয়। মহারাজ প্রসেনজিতের এক সময়ে ইচ্ছা হয় গৌতম-বুদ্ধের পিতৃবংশের সহিত আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। শাক্যরাজসমীপে তিনি কোন শাক্যকুমারীর পাণি প্রার্থনা করিলেন। শাক্যগণ আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠবংশজাত মনে করিতেন বলিয়া কোশলরাজের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন গ্লানিকর বিবেচনা করিলেন। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ কোশল-নৃপতির অনুরোধ উপেক্ষা করিবার মত বল তাঁহাদের ছিল না। অতএব তাঁহারা এক কৌশলের আশ্রয় লইলেন। শাক্যরাজ মহানামের ঔরসে ও এক দাসীকন্যার গর্ভে বাসবক্ষত্রিয়ার জন্ম হইয়াছিল। মহানাম উঁহাকে শাক্যকুমারীরূপে প্রসেনজিতের হস্তে অর্পণ করেন। বাসবক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিরূঢকের জন্ম হয়। কোন সময়ে শাক্যরাজ্যে গমন করিলে, শাক্যগণ বিরূঢকের প্রতি অপমানজনক ব্যবহার করেন। বিরূঢক শাক্যগণের নীচ কৌশল অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি শান্তিকামী বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। বহু সৈনাবলসহ তিনি কপিলাবস্তু আক্রমণ করিয়া শাক্যবংশ নির্ম্মূল করেন। ফিরিবার পথে আকস্মিক বন্যাস্রোতে বিরূঢকের প্রাণত্যাগ হয়।

† সঙ্গে আগত অনুচরবর্গকে বুদ্ধ এই মাংস গ্রহণ করিতে দেন নাই। চুন্দের প্রাণে আঘাত লাগিবে বলিয়া নিজে তাহার অংশমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে গত ২৩শে পৌষ "মহাপুরুষস্মরণে"র দিবসে বিবৃত।

অন্তরাসনে বসাতে পারি, তাঁদের জীবনবেদের উপদেশগুলি যথার্থই অন্তরে গ্রহণ করতে পারি, তবে তো আমাদের দুর্লভ মানবজন্ম সফল হয়ে গেল।

আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি—জড় পদার্থ হয়ে, জড়যন্ত্র বা machine হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি। আমরা প্রত্যেকেই মহাপুরুষত্বের বীজ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। পুরুষশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ভগবান তাঁরই বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদিগকে এই সংসারে পাঠিয়েছেন। তাঁর কোন্ লক্ষ্য, কোন্ মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আমাদিগকে পাঠিয়েছেন, তাহা জানি না বটে, সকল সময়ে তাহা আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুট হয় না বটে, কিন্তু এটা স্থির জানি যে, আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটী মঙ্গলকার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা যদি জীবনটাকে ব্যর্থতার পথে না চালাই; অসৎপথে চলে, অন্যায় কার্য্যসমূহে নেমে আমরা যদি আমাদের শরীর মন ও আত্মাকে ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে, বিনাশের পথে না নিয়ে চলি, তবেই ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্য, আমাদের জন্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কাজ আমাদের সম্মুখে ফুটে ওঠে। ফুলের কুঁড়ি যেমন আস্তে আস্তে ফুটে উঠে প্রস্ফুটিত ফুলের আকার ধারণ করলেই সুগন্ধে লোকসকলকে আনন্দিত করে, স্বীয় সৌন্দর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করে, তেমনি আমরাও যদি আমাদের জীবনে দুশ্চিন্তা দুষ্কর্ম্ম প্রভৃতি পাপকীট সকল প্রবেশ করিয়ে, ফুটবার পূর্ব্বেই তাকে বিনষ্ট না করি; আমরা যদি আমাদের জীবনকে ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত করে সুভাবে সদ্ভাবে ফুটে উঠতে দিই, তবেই আমাদের জীবন সার্থক হবে, তবেই আমাদের জীবন জগতের মঙ্গলসাধনে, জগতের উন্নতির পথ খুলে দেবার কাজে, মুক্তির পথপ্রদর্শনে লেগে যাবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা যেমন জড় পদার্থও নই, তেমনি জড় যন্ত্রও নই যে, একটা কাঠি খুলে দিলুম, আর যন্ত্র চলতে লাগল—যে পথে তাকে চালালুম—ভাল হোক বা মন্দ হোক—সে চল্ল। আমাদের অন্তরে ভগবান আত্মা বলে একটা কিছু দিয়েছেন এবং কি আশ্চর্য্য উপায়ে কি সুন্দর প্রণালীতে সেই একবিন্দু আত্মাতে জ্ঞান, প্রেম, শক্তি সকলই দিয়ে আমাদিগকে তাঁর সঙ্গে সমধর্ম্মী করে তুলেছেন। কি আশ্চর্য্য সে জ্ঞান, যার বলে আমরা চেষ্টা করলে, উপযুক্ত সাধন করলে ইহলোকের ও পরলোকের গভীর তত্ত্বসকল জানতে পারি। কি আশ্চর্য্য সে প্রেম, যার বন্যা এনে বুদ্ধদেব চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সমস্ত জগতকে তারস্বের বক্ষে টেনে আনতে পেরেছিলেন। আমরা জড় নই জেনে আমাদের শুভকর্ম্ম করে যেতে হবে। নিশ্চল অলসভাবে জীবন কাটালে সে আত্মাকে জীবিত বলা যেতে পারে না, সে আত্মা মৃত।

আত্মা যতই মৃতপ্রায় হউক, সে মৃত জড়ে পরিণত হতে পারে না—ভগবানের আগুন তার ভিতর ওতপ্রোতভাবে নিহিত আছে—উপযুক্ত ইন্ধন পেলেই তার নির্জীব ভাব, তার নিশ্চেষ্টতা চলে যায়। মহাপুরুষদের স্মৃতিই মৃতসঞ্জীবনী শক্তি, যার স্পর্শমাত্রে আত্মা সজীব হয়ে উঠে, আত্মা জাগ্রত হয়ে নব জ্ঞান, নব প্রেম ও নব শক্তি লাভের পথে ধাবমান হয়। মহাপুরুষদের স্মৃতি, তাঁদের জীবন, আমাদিগকে স্পষ্ট বলে দেয়, দেখিয়ে দেয় যে আমাদের হাওয়ার উপরে চল্লে চলবে না, আমাদের জীবন শূন্যগর্ভ একটা বৃথা স্বপ্নমাত্র নয়—আমাদের জীবন একটা মস্ত সত্য পদার্থ, আমাদের জীবনের একটা বড় রকমের দাম আছে। এর সাক্ষী এই যে, আমরা সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে চল্লে আমরাও আমাদের পরিপার্শ্বস্থ শত সহস্র লোককে সেই পথে পরিচালিত করতে পারি।

আমাদের জীবনে সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব, বিপদ-সম্পদের সংগ্রাম তো লেগেই আছে। তার জন্য তো ভয় করলে চলবে না। কাপুরুষের মত সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে চলবে না। যদি আমরা আমাদের জীবনকে বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনের মত গড়ে তুলতে চাই, তবে প্রাতঃসূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান যে জাগরণভেরী বাজিয়ে দেন, সেই ভেরীর তালে তালে আমাদের প্রাণের ভিতর, আমাদের আত্মাতে যে বীরভাব জেগে ওঠবার অবসর খুঁজছে, তাকেই আরও—আরও—আরও জাগিয়ে তুলতে হবে; আর আমাদের প্রাণের এক কোণে যে কাপুরুষতা লুকিয়ে আছে এবং সময়ে সময়ে উঁকিঝুঁকি মারে ও বাহির হবার চেষ্টা করে, সেই কাপুরুষতা ও তাহার অনুচর-সহচর শতবিধ বিভীষিকাকে পায়ে দলে ফেলতে হবে। ভগবানের পতাকার তলে দাঁড়িয়ে তাঁর কার্য্যসাধনের উদ্দেশ্যে নির্ভীকহৃদয়ে অগ্রসর হওয়ার মত সুখের বিষয় আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। জনসাধারণের অন্তরে নির্ভীকতা, স্বাধীনতা, মঙ্গল ও উন্নতির পথে চলিবার সাহস প্রতিষ্ঠিত করা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কিছু আছে বলিয়া জানি না। মহাপুরুষদের জীবন আমাদিগকে এই কথাই শিক্ষা দেয়। মহাপুরুষদের জীবন আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, আমাদিগকে কোন প্রকার দ্বন্দ্বের কোন প্রকার বিবাদের অধীন হলে চলবে না। সকল দ্বন্দ্বের, সর্ব্ববিধ বিবাদের অতীত হয়ে তাদের উপরে উঠে কাজ করে যেতে হবে। ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখলে চলবে না। সর্ব্ববিধ পরা-

ধীনতার উপরে উঠতে হবে। স্বাধীনতাই হোল মহাপুরুষদের জীবনের কেন্দ্র। আমরাও যদি স্বাধীনতার ভিত্তিতে দাঁড়াতে পারি, আমরাও তখন মহাপুরুষের পদবীতে উন্নীত হতে পারি এবং জনসাধারণের পূজা আকর্ষণ করতে পারি। স্বাধীন না হলে মহাপুরুষত্ব-লাভের আশা বৃথা দুরাশা।

প্রকৃত স্বাধীন মহাপুরুষ নিজের শুভবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে শুভকর্ম্মেরই অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন। স্বাধীনতার অর্থই হোল আত্মনির্ভর। আত্মনির্ভর যাঁর সম্বল, স্বাধীনতা যাঁর প্রাণ, তিনিই মহাপুরুষ। তাঁর কোনও অভাব থাকে না বলেই বিশ্বজগত তাঁর সেবা করতে অগ্রসর হয়। এই কারণেই আমরা সাধু যোগী মহাপুরুষদের চরণে সর্ব্বদাই আত্মবিক্রয় করতে প্রস্তুত থাকি। আত্মনির্ভর যাঁর সম্বল সেই স্বাধীন পুরুষ সংসারের ভয়ে মিথ্যা বলেন না; সত্য কথা, সত্য চিন্তাই তাঁর একমাত্র ধ্যেয়; সকল বিষয়ে তিনি সত্যের পথেই চলেন; কোন বিষয়েই সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হন না। স্বাধীন মানবের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ নির্ভীকতা। পরের নিকটে কোন কিছু প্রত্যাশা না থাকলে তো নির্ভীকতা আপনিই আসবে। সুখসম্ভোগ যখন তোমার করায়ত্ত হবে, তখন তাহাতে উচ্ছ্বসিত হয়ো না, পাগল হয়ে যেয়ো না; দুঃখবিপদের অন্ধকার যখন তোমাকে ঘিরে ফেলবে, তখন তাহাতে তিলমাত্র বিচলিত হয়ো না। জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে, প্রতি মানবের জীবন নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, দ্বন্দ্ববিবাদের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া ব্যক্তিগত মানবেরও উদ্দেশ্য নয়, মানবসমাজেরও লক্ষ্য নয়। প্রতি মানবের, প্রতি মানবসমাজের, বিশ্বজগতেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখা যায়, পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের পথে অগ্রসর হওয়া। সমস্ত জ্ঞানকে, সমস্ত প্রীতিকে, সমস্ত শক্তিকে বিক্ষিপ্ত হতে না দিয়ে, সংহত করে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে হবে, সমস্ত স্বাধীনতার একমাত্র মূল উৎস ভগবানের চরণে পৌঁছতে হবে, তবেই আমাদের জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি সকলই চরিতার্থতা লাভ করবে।

স্বাধীনতার অর্থে স্বেচ্ছাচারিতা নয়, কথায় কথায় বিপ্লবের সূচনা করা নয়। প্রকৃত স্বাধীনতার পরিণামে মঙ্গলসাধনে মতি হবে, সত্যসাধনে ব্রতী হবে। প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে হলে ধর্ম্মের উপর দাঁড়াতে হবে। প্রকৃত স্বাধীনতা মিথ্যাভিত্তি অধর্ম্মের সঙ্গে কখনই মিশতে পারে না। মিথ্যা থেকে যত অত্যাচার, যত অনাচার, যত অধর্ম্ম সকলেরই উৎপত্তি এবং তার পরিণামে পরাধীনতার কঠিন নিগড়বন্ধন।

মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ যেমন ব্যক্তিবিশেষের, সেইরূপ সমাজেরও জীবনের লক্ষণ। বাল্মীকি যখন দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ঋষি হলেন, তখন তাঁর আত্মা যে সজীব ছিল এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজও যে সজীব ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যে সমাজ ঋষিদের জন্ম দিয়েছিল, সে সমাজ যে জীবনে টগ্‌বগ্‌ করত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে সমাজে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমাজ নিশ্চয়ই প্রাণবান ছিল। সেইরূপ ইহাও আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, যে সমাজে শতাব্দীর মধ্যেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ প্রভৃতি আত্মত্যাগী জ্ঞানবীর, ধ্যানবীর, ভক্তিবীর, কর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ সমুত্থিত হতে পেরেছেন, সে সমাজ নির্জীব বা প্রাণহীন ছিল না এবং নয়ও—বরঞ্চ ঐ সকল মহাপুরুষের আবির্ভাবে সমাজের প্রাণের, জীবনের সম্যক পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। অন্য দেশের কথা আমরা তেমন জোরের সঙ্গে না বলতে পারি, কিন্তু ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখি যে, এখানে প্রধানত ধর্ম্ম নিয়েই যত কিছু সংস্কার, যত কিছু সংগ্রাম ঘটেছে। ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট সংগ্রামের ফলেই ভারতে বৈদিক ঋষিদের আবির্ভাব; ইহারই ফলে কপিল ও পতঞ্জলি, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের প্রকাশ; ইহারই ফলে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ; ইহারই ফলে বুদ্ধদেব ও অশোক, শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্যদেব, গুরুনানক ও গুরুগোবিন্দ; এবং ইহারই ফলে রাজা রামমোহন অবধি আচার্য্য শিবনাথ পর্য্যন্ত এবং পরমহংস রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি কত না মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে ভারতের প্রতি ধূলিকণাকে পবিত্র করে তুলেছেন।

আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষেরা প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁদের অভিমুখে অগ্রসর হবার জন্য আমাদিগকে ইঙ্গিত করছেন। আমরা যদি তাঁদের প্রতি সত্যই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে চাই, তবে সত্যের পথে শুভকর্ম্মের পথে অগ্রসর হয়ে তাঁদের পরিত্যক্ত আসন অধিকার করতে হবে। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কল্যাণকর ও শুভদায়ক সকল বিষয়েই উন্নতির উচ্চতম শিখরভূমি অধিকার করতে হবে। সত্য সত্য যদি এইরূপ লক্ষ্য সম্মুখে রেখে সংসারপথে চলি, তবেই মহাপুরুষদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হবে; তবেই আমরা নিজেদের সঙ্গে পরিবারের, সমাজের, দেশের ও বিশ্বজগতের প্রকৃত মঙ্গলসাধনে সক্ষম হব এবং ভগবানের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ লাভ করব।

বেদগান।

মিশ্র ভৈরবী—তাল ফেরতা—একতালা ও তেওরা।

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়
অবিরাবীর্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যাম্

অসৎ হতে দেব তুমি সত্যে লয়ে যাও মোরে।
আঁধারেতে দেব তুমি দেখাও হে জ্যোতি মোরে
মৃত্যু হতে দেব তুমি পারে লয়ে যাও মোরে।
স্বপ্রকাশ প্রকাশ হও চরণে তব শরণ দাও
দেব হয়ে দখিণমুখ করি' দূর যতেক দুখ
রক্ষা কর রুদ্র মোরে রক্ষা কর নিত্য মোরে।

গান, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

একতালা

২´ ৩ ০ ১ ২´
I সসা সা -া। র্সর্সা -া র্সা। র্সর্সা র্সর্সা র্সর্সা। -া র্সর্ঋা -া I র্ঋা -া র্ঋা।
অ স তো ০ মা০ ০ সদ্ গম য়ত মসো ০ মা০ ০ জ্যো ০ তির্

৪ ০ ১ ২ ৩
। র্ঋর্ঋা র্ঋর্ঋা র্ঋা। ঃর্ঋাঃ র্সর্জ্ঞা র্ঋর্ঋা। -া র্সর্সা র্সা I র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জ্ঞা -া -া।
গ ম য় মৃ ত্যো ০ র্মাঽ ০ ০ মৃ তং ০ গ ম য় আ ০ বি রা ০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০
। র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা। র্জ্ঞর্ঋা -া র্ঋা I র্ঋা -া র্ঋা। র্ঋা -া -া। র্ঋা র্সা র্ঋা।
বী ০ র্ম এ ০ ধি আ ০ বি রা ০ ০ বী ০ র্ম

১ ২´ ৩ ০ ১
। র্জ্ঞা র্ঋা র্সা I র্সা র্সা র্সা। র্সা -া -া। ণণা ণা -া। দদা -া -া I
এ ০ ধি রু দ্র য ত্তে ০ ০ দক্ষি ণং ০ মুখং ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´
I জ্ঞা -া মা। পা -া -া। মপা দা দদা। দা -া -া I দা পা দা।
তে ০ ন মাং ০ ০ পা০ ০ হিনি ত্যাম্ ০ ০ তে ০ ন

৩ ০ ১ ২´ ০
। র্সা -া -া। ণা দা দদা। পা -া -া I জ্ঞা রা জ্ঞা। জ্ঞমা -া -া।
মাং ০ ০ পা ০ হিনি ত্যাম্ ০ ০ তে ০ ন মাং০ ০ ০

০ ১
। জ্ঞা ঋা জ্ঞঋা। সা -া -া I
পা ০ হিনি ত্যাম্ ০ ০

তেওরা

১´ ২ ৩ [পদপা] ১´ ২ ৩
{ I মা মমা মা। পা -া। পা মা I পা র্সা র্সা। ণা দা। দা পা I
অ • সৎ হ • তে • দে • ব তু • মি •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ [-া]
I পা মপা জ্ঞা। পা মপা। দা পা I মজ্ঞা -া মা। জ্ঞা ঋা। সা ঋা I }
স • ত্যে ল • য়ে • যা • ও মো • রে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
{ I দা দা মা। দা -া। দা ণা I ণা র্সা র্সা। র্ঋা ণা। র্সা -া I
আঁ ধা • রে • তে • দে • ব তু • মি •

১´
[দা জ্ঞা] ২ ৩ ১´ ২ ৩ [-া]
I র্সা র্সা র্রা। র্জ্ঞা: র্রঃ। র্জ্ঞা -া I র্জর্মা -া র্জ্ঞা। র্জর্ঋা -া। র্সা ণা I }
দে খা • ও • হে • জ্যো • তি মো • রে •

১´ ২´ ৩ ১´ ২ ৩
I না র্সা র্সা। র্ঋা -া। র্সা র্ঋা I র্সা ণা ণদা। ণা দা। পা -া I
মৃ • ত্যু হ • তে • দে • ব• তু • মি •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা মপা জ্ঞা। পা মপা। দা পা I মজ্ঞা -া জ্ঞা। জঋা -া। সা ঋা II
পা রে • ল • য়ে • যা • ও মো • রে •

১´
[পা মা মা] ২ ৩ ১´ ২ ৩
{ I পমা -া মা। মাঃ জ্ঞঃ। মা -া I পা পা -া। দা মা। পা -া I
স্ব • প্র কা • শ • প্র কা • শ • হ ও

৩ ১´
১´ ২ ৩ ১´ ২ [পা -া] [নর্সা দা দা।
I দা দা দা। দা -া। দা ণা I দণা দা দা। পা মা। পাঃ দঃ I} দা -া ণা।
চ র ণে ত • ব • শ র ণ দা • • ও দে • ব

২ ৩ ১´ ২
না -া। র্সা -া I র্ঋা র্ঋা র্সা র্ঋর্সা না।] ৩ ১´ ২
। দা ণা। দণা র্সর্ঋা I র্জ্ঞা র্ঋা র্সা। র্সর্ঋর্সা ণা। র্সা -া I নর্সা দা -া। না র্সা।
হ • রে • • • দ খি ণ মু • • • • খ • ক • রি • দৃ •

৩ ১´ ২ ৩ [-া] ১´ ২
। র্জ্ঞা -া I র্জর্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জর্ঋা -া। র্সা র্ঋা I} না র্সা র্সা। র্সর্ঋা -া।
র • য তে ক হ • থ • র • ক্ষা ক •

৩ ১´ ২´ ৩ ১´ ২
। র্সা র্ঋা I র্সা ণা ণদা। দণা দা। পা -া I পা মপা জ্ঞা। পা মপা।
র • রু • দ্র • মো • রে • র • ক্ষা ক •

৩ ১´ ২ ৩
। পদা পা I জ্ঞা রা মা। জ্ঞা ঋা। সা ঋা IIII
র • নি • ত্য মো • রে •

বাঙ্গালী কবি ও বিদেশী সমালোচক।

(শ্রীপ্রিয়নাথ দাস)

(২)

রাম শর্ম্মার রচিত "শেষ দিন" (The Last Day) নামক দীর্ঘ কবিতাও মৌলিক রচনা। "সুমেরুর স্বপ্নে"র ন্যায় ইহাতে-ও স্বপ্নোত্থিত ঘটনাবলীর চিত্র কবির তুলিকা অঙ্কিত করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। কবিবর রামশর্ম্মা স্বপ্নে দেখিলেন যেন প্রলয় কাল সমুপস্থিত। চিত্রগুপ্ত যমরাজার সম্মুখে বসিয়া আছেন, প্রেতাত্মারা একে একে সেখানে চলিয়াছে। সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যত পুণ্যাত্মা মানুষ জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগকে কবি সেখানে দেখিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্ম্মাত্মাগণকে সম্বোধন করিয়া আকাশ-বাণী হইল,—"ভগবদ্-ভক্তগণ, কর্ম্মক্ষেত্রে তোমরা কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ। তোমরা স্বর্গে যাও, সেখানে চিরকাল দেবতাদের সহিত বাস কর"। কবি দেখিলেন ঊর্দ্ধদিকে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিসকল চলিয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিশিয়া যাইতেছে। এইখানে প্রথম সর্গ সমাপ্ত করিয়া কবি দ্বিতীয় সর্গে স্বপ্নে দৃষ্ট চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে পাপাত্মাগণের ঘৃণিত কার্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া কবি তাহাদের দৈবাদেশে নরকবাস হইবে শুনিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত শেষ করিয়াছেন। "সুমেরুর স্বপ্ন"-রচয়িতার ন্যায় রামশর্ম্মাও "শেষ দিনে"র নীতি-কথা কবিতার শেষে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

আলোচ্য কাব্যের শেষে কবির টীকাপাঠে জানা যায় যে, তিনি রাজা রামমোহন রায়, লালাবাবু, ডেভিড হেয়ার, রাজা রাধাকান্ত দেব, লর্ড ক্যানিং, স্যার জামসেটজি, জিজিভাই রাও, স্যার সালার জঙ্গ, রবার্ট নাইট, হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি, ডাঃ হেষ্টি, ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী ও মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের ইসারায় নামোল্লেখ উক্ত কাব্যে করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, হিন্দুধর্ম্মের মতে যাহারা যথার্থ যোগী তাঁহাদের অনুসৃত আদর্শের সহিত কবি খৃষ্টধর্ম্মানুমোদিত আদর্শের তুলনা করিয়া উক্ত টীকায় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মূলতঃ এই দুইটী ধর্ম্ম এক। খৃষ্টধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত বিবিধ অনুষ্ঠানের উপর গঠিত তাহা রামশর্ম্মা বাইবেল হইতে উদ্ধৃত বহু শ্লোক দ্বারা, খৃষ্ট ও খৃষ্টানগণের জীবনী হইতে ও এই দুইটী ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বাদি হইতে রূপকের আবরণ সরাইয়া আশ্চর্য্যভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

মিল্টনের "প্যারাডাইজ্ লষ্ট" ও "প্যারাডাইজ্ রিগেণ্ড" বুঝিতে গেলে বাইবেলোক্ত ঘটনাবলীর আদ্যোপান্ত জানা দরকার। রায় বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্তের "সুমেরুর স্বপ্ন" ও রামশর্ম্মার "শেষ দিন" বুঝিতে গেলে কিন্তু শুধু খৃষ্টানদের ধর্ম্মগ্রন্থ ও খৃষ্টধর্ম্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিলে চলে না, সেই সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব ও পৌরাণিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা দরকার। পাশ্চাত্যের সাহিত্য-জগত হইতে-ও দত্ত কবি ও রামশর্ম্মা এত বেশী আলঙ্কারিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাব্যে সাজাইয়া রাখিয়াছেন যে, যাঁহারা গভীরভাবে পাশ্চাত্যের কাব্য-সাহিত্য আলোচনা করেন নাই তাঁহাদের পক্ষে এই দুইজন হিন্দু কবির রচিত প্রধান কাব্যগুলির অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করা ত দূরের কথা, কাব্য-সাহিত্য পাঠে যে আনন্দ উপভোগ করা যায়, তাহাতেও তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ন্যায় শশীচন্দ্র ও তরু-দত্ত য়ুরোপীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামশর্ম্মা ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই অলঙ্কারের খাতিরে বিদেশী সাহিত্য হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের রচিত কাব্যের ভাষা-পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সেই কারণে তাঁহারা য়ুরোপীয় আদর্শের দাস, তাঁহাদের কাব্যে বিদেশী প্রভাব ছাড়া স্বদেশের প্রভাব অনুভূত হয় না, এই প্রকার অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তাহা এই প্রতিভাশালী কবিগণের রচিত প্রধান কাব্যগুলির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মধু কবি ও তরু দত্তের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কবি শশীচন্দ্র ও রাম শর্ম্মা তাঁহাদের সমসাময়িক হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাবের অভাব ও তৎসঙ্গে প্রাচীন আদর্শ হইতে তাহাদিগকে কক্ষচ্যুত দেখিয়া ভারতবাসীর অবনতির কারণ অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মের নামে হিন্দুসমাজে অধর্ম্ম অনাচার ও ভণ্ডামি প্রবেশ করিয়া সমাজের জীবনী শক্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালীর কবিহৃদয় দেশের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদন পাশ্চাত্য-মোহী বাঙ্গালী রাক্ষসের দলকে লঙ্কার ট্রাজিক্ রণক্ষেত্রে যেভাবে ধ্বংস করিয়াছেন "মেঘনাদবধ" কাব্যের পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। আধুনিক বঙ্গভাষার একমাত্র মহাকবি মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান হইয়াও হিন্দুকে হিন্দু আদর্শ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার রামচন্দ্র বাঙ্গালীর ন্যায় দুর্ব্বল হইলেও স্বধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন ও দেব দানবজয়ী রাক্ষসকে পরাভূত করিয়াছিলেন। "সুমেরুর

স্বপ্নে” হিন্দুকবি শশীচন্দ্রও দর্পান্বিত হিন্দু দেবদেবীগণকে দর্পহারী বিশ্বদেবতার বিচারাধীন করিয়া শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। ধর্ম্মের নামে কেবলমাত্র আস্ফালন ব্যতীত যখন আর কিছুই দেখা যায় না, তখন বিশ্বের অন্তরতম স্থান হইতে ন্যায় ও সত্যের সামান্য একটুখানি আলোক শতসূর্য্যের তেজ ধারণ করিয়া দর্পকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। বাস্তবিক, হিন্দু কবি শশীচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুয়ানীর সর্ব্বাঙ্গে স্বার্থপর চিকিৎসা-জনিত দুষ্টব্যাধির সংক্রামক প্রভাব সম্বন্ধে যেরূপ নির্ভীকতার সহিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। ধর্ম্মান্ধ সমালোচনা হয়ত এই প্রকার সত্যবাদিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিবে; কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে আত্মানুসন্ধানের অভাবে বর্ত্তমান যুগে হিন্দুয়ানীকে যে খ্রীষ্টধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, তৎসম্বন্ধে কবিদিগের উক্তির মূলে যে অপ্রিয় সত্য সহস্র চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জাগিয়া রহিয়াছে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিবে না। বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশী সমালোচকের পক্ষপাতদোষে দুষ্ট সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত মনে করিয়া ইংরাজী শিক্ষিত পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী সমালোচকগণের মস্তিষ্ক এমন বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহারা বাঙ্গালী কবির রচনায় বিদেশী গন্ধ ছাড়া কোনও কিছুর সৌরভগ্রহণ করিতে পারেন না।

রামশর্ম্মা “শেষের দিনে” ও একাধিক খণ্ড-কবিতায় তাঁহার সমসাময়িক বিস্তর উদারহৃদয় হিন্দুসমাজ-সংস্কারকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালার নৈতিকজগতে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও তাহার পরবর্ত্তী সময়ে এদেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু কবিদিগের মধ্যে সাম্য স্বাধীনতা ও ন্যায়ের উপর সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তাহার মূলে স্বদেশহিতৈষিতা-ই বিদ্যমান। সেই কারণে হিন্দুদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা তাঁহারা অনেক সময়ে করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকে তাঁহারা অপদার্থ বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন নাই। কবিবর রাম শর্ম্মা “ভাগবতী গীতা” ও “রাজকুমারী লীলার স্বয়ম্বর” নামে ইংরাজী কবিতা দুইটীতে রূপকের অন্তরালে হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত যোগতত্ত্ববিশেষের গূঢ় রহস্য দার্শনিকের ন্যায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য-ভাবাবিষ্ট সংস্কৃতানভিজ্ঞ শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই যে, কবি পদ্যময় ইংরাজী ভাষার মারফৎ উক্ত যোগতত্ত্ব শুনাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এই নিষ্ঠাবান হিন্দুর কবিহৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া কোনও কিছু ছিল না। তাঁহার সমকালে যে সকল হিন্দু কবি পদ্যময় ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ন্যায় ও সত্যের দিক হইতে হিন্দুর ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বিচার করিয়া গিয়াছেন। বিবেকের বাণীকে দাবিয়া রাখিয়া তাঁহারা অন্ধের ন্যায় যুক্তিহীন কর্ম্মকাণ্ডের পিছনে ছুটিয়া চলেন নাই। ইংরাজী শিক্ষার ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের বিচারশক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও বেদ-পুরাণাদি হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবার সুবিধা হওয়াতে খাঁটি হিন্দু কবিরা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াও যেমন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন নাই, তেমনি আবার তাঁহাদের সমসাময়িক হিন্দুসমাজে যে সকল কু-সংস্কার কদাচার অন্যায় ও অবিচার প্রবেশ করিয়া সমাজকে কলুষিত করিয়াছিল সেগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহাদিগকে বদ্ধপরিকর করিয়াছিল। হিন্দু-ভারতের পরাধীনতার প্রধান কারণ যে হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্মমতের অনৈক্য, ইহা ইংরাজী ভাষার বাঙ্গালী কবিরা উত্তমরূপ বুঝিয়াছিলেন। রূপকের আবরণ, কবি-কল্পনার যাদুকরী সৃষ্টি-ক্ষমতা, মানব-শাসিত সমাজের বিধিব্যবস্থার অন্তরালে স্বার্থপরতার অস্তিত্ব কিরূপে স্বাধীন আর্য্যজাতিকে উপশাস্ত্রের নিষ্পেষণে নির্জ্জীব করিয়া শেষে অনৈক্যের পিশাচশক্তির প্রভাবে বিদেশী আদর্শের পক্ষপাতী করিয়াছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। জাতীয় দুরবস্থার যথার্থ কারণ বুঝিতে পারিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেক হিন্দু কবি সেইজন্য ইংরাজী কবিতার ভিতর দিয়া এদেশের দেবতাবহুল ধর্ম্মজগতে একেশ্বরবাদিতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী কবির মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লেখকদিগের নিকট আমরা কেন যে এদেশের কবি ও কাব্যের সুসম্পূর্ণ সমালোচনা আশা করি না তাহার কারণ, তাঁহারা হিন্দু-কবির জন্মজন্মান্তরের সংস্কারের সংবাদ রাখেন না, কবি ও তাঁহার বংশের ইতিহাস পাঠ করেন না, পারিপার্শ্বিক সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে আংশিকভাবে আলোচনা করেন মাত্র ও বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী কবির আদর্শ বুঝিবার জন্য যতটা সহৃদয়তা ও কল্পনা দরকার তাহা তাঁহাদের অনেকেরই নাই। মিল্টন, শেলি, কীটস্, টেনিসনপ্রমুখ কবিরা বাল্যাবধি রোমান ও গ্রীক-সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া যদি বৃটিশ কবির বৈশিষ্ট রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে মধুসূদন, শশীচন্দ্র, রাম শর্ম্মা, রবীন্দ্রনাথ, তরু দত্ত প্রভৃতি ইংরাজি ও বঙ্গভাষার কবিরা পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া কেন যে

বাঙ্গালী কবির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবেন না, ইহা ত আমরা বুঝি না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের চিন্তারাজ্যে যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুকবিরা সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় খৃষ্টান কবিদের সংখ্যা নগণ্য বা উপেক্ষণীয় নহে। খৃষ্টান কবি মধুসূদন বিপ্লবময় সমসাময়িক হিন্দু-জগতের চিত্র 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যের পটে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। বিলাসপরায়ণ ধর্ম্মহীন বাঙ্গালী রাক্ষসগণ কিরূপে ঐশ্বর্য্যহীন ধর্ম্মভীরু ত্যাগী প্রাচীনপন্থীর নৈতিক বলের সম্মুখে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা মধুসূদন 'মেঘনাদবধ'-কাব্যে দেখাইয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়পরতা পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে সীতাকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সুপ্রাচীন আর্য্যসমাজের ভেদজ্ঞানশূন্য অত্যুন্নত আদর্শে সাম্য ও মৈত্রীর অধিকারের মধ্যে বানররূপী অস্পৃশ্যকে টানিয়া লইয়াছিল। মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ'-কাব্যের নাটকীয় ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া অতি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম ও সমাজনীতির আলোচনা করিয়া অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতিকে যে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তিনি বাল্মীকির নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। আর্য্যসমাজ স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নেতৃত্বে অস্পৃশ্য ঘৃণিত বানররূপী অনার্য্যের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া কিরূপে রাক্ষসের অত্যাচার হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিল, বাল্মীকির রামায়ণে তাহা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। মধুসূদন দত্তের অমিত শক্তিশালী প্রতিভা সপ্তকাণ্ড রামায়ণের যুগব্যাপী ঘটনার ভিতর হইতে লঙ্কাকাণ্ডের একটিমাত্র অধ্যায় বাছিয়া লইয়া অত্যাশ্চর্য্য শিল্প-কৌশলে তাহাকে স্বাধীনতাবাদের মহাকাব্যে পরিণত করিয়াছে। "মেঘনাদবধ" কাব্যে বর্ণিত ট্রাজিক্ ঘটনাবলীর সূত্রপাত যেখানে, তৎপ্রতি আর একজন খৃষ্টান কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং সমাজ যে কারণে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয় তাহারও সন্ধান পাইয়াছিল। বাস্তবিক তরুদত্ত "হিন্দুস্থানের গাথা ও কাহিনী"তে (Ballads and Legends of Hindusthan) "লক্ষ্মণ" শীর্ষক ইংরাজী কবিতায় সীতাহরণের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহারও মূল আদর্শ রামায়ণ হইতে গৃহীত। স্বাধীনতা সমাজের অবস্থাবিশেষ। ইহার চরম লক্ষ্য সমাজ যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না পড়ে। স্বাধীন জাতিরা জাতিদেবতার প্রতিভূস্বরূপ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আদেশ সেইজন্য প্রাণপণে পালন করে। জাতি বা সমাজের মধ্যে যদি অধিকাংশ লোকে স্ব-স্বপ্রধান হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অনৈক্যের উৎপত্তি হয়, সমাজ বা জাতি তাহাতে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, শেষে শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারে না। সীতা আর্য্য-সমাজের নেতা শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া লক্ষ্মণকে সতর্ক রক্ষকের কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিলে তিনি যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার ফলে স্বাধীনতা হারাইয়া তিনি রাক্ষসের গৃহে বন্দিনী হইয়াছিলেন। এস্থলে বক্তব্য যে, বাল্মীকি মধুসূদন বা তরুদত্ত কোন তত্ত্ববিশেষ আলোচনা করিবার জন্য রামায়ণে বিবৃত ঘটনাবিশেষ পদ্যময় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন নাই। নিপুণ শিল্পী কাব্যের আসরে বীর ও করুণ রসকে উপদেষ্টার পদ্যময় যুক্তির ভাণ্ডে ফেলিয়া তত্ত্ববিশেষের ব্যাখ্যা লইয়া ব্যস্ত থাকেন না। সমাজতত্ত্ব কাব্যরসের উপাদান না হইলেও ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনাবিশেষের উপর যে কাব্য গঠিত হইয়াছে, তাহার মূলে একটুখানি সমাজতত্ত্বের যে ইঙ্গিত আছে তাহা অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারেন। পারিপার্শ্বিক বাঙ্গালী সমাজের প্রভাব যে "মেঘনাদবধ" কাব্যে অনুভূত হয়, একথা সমালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। মধুসূদন ও তরুদত্তের সমকালে বাঙ্গালী সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া যে আন্দোলন চলিতেছিল, যদি কেবল সেই দিক দিয়া তাঁহাদের রচিত কাব্যের গূঢ়ার্থ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি তাহা হইলেও এই দুইজন খৃষ্টান কবি কেন যে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ ব্যাপারটীকে কেন্দ্রীভূত করিয়া আলোচ্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। এতদ্ব্যতীত অতুলনীয় সীতাচরিত্র কাব্যের আসরে স্বাধীনতাবাদকে পরিস্ফুট করিবার পক্ষে যে সম্পূর্ণ উপযোগী তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

লহ প্রভু!

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এনেছি চরণে যাহা হে মোর দেবতা!
লহ প্রভু লহ—মরমে দিও না ব্যথা।
ধনরত্ন নাহি মম, তব সিংহাসনে
সাজাইব যাহা দিয়া পরম যতনে।
তরাসে কম্পিত হাতে হৃদয় আমার
এনেছি—দেখিতে ক্ষুদ্র—জীবনের সার।
একমাত্র প্রিয় তুমি—জেনেছ দিয়েছি
সকলি—আমার বলে না কিছু রেখেছি।
লহ প্রভু লহ তুমি। দিওনা নিভিতে
বল বীর্য্য মম। তব ইচ্ছার সহিতে
লহ গো মিলায়ে মম ভাব চিন্তা যত;
তব পদে মম শির কর অবনত।
কঠিন বাদ বা কভু দুখের আঘাতে
ফিরে চাহি—দাও যদি ফিরায়ে দয়াতে
হৃদয়, দেছিনু যাহা, দিও গো করিয়া
শুদ্ধ অশুদ্ধে; সুন্দর মাঝে তব হিয়া,
রেখো মোরে। শান্তিসুধা করি' যেন পান
নূতন মুরতি লভি—লভি নব প্রাণ—
আপনে আপনি যেন না পারি চিনিতে—
তোমারি হাতের গড়া পারি গো বুঝিতে॥

ডাক্তার শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবীর শুভ বিবাহ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গত ২৪শে ফাল্গুন সঙ্গীতভারতী ডাক্তার শ্রীমতী বাণী দেবীর (Mus. Doc. Ind.) সহিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত শচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের (M.B.) শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রার পূর্ব্বে এই বিবাহে তাঁহার অনুমোদন ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই বিবাহে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ বিবাহপদ্ধতিতে বরার্চ্চনা, কন্যাসম্প্রদান, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীগমন প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মবিবাহের প্রধান অঙ্গগুলি সুরক্ষিত হওয়ায়, প্রবর্ত্তন অবধি ইহা ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক বিশুদ্ধ হিন্দুবিবাহ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। বহুকাল পূর্ব্বে এই পদ্ধতি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু আজকাল তাহার প্রণালী অনেকে অবগত নন। অথচ এই পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য অনেকের আগ্রহ দৃষ্ট হয়। তাই বর্ত্তমান বিবাহ উপলক্ষে আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে ঐ পদ্ধতি যথাযথ প্রকাশ করিলাম।

বিবাহপদ্ধতি।

ঈশ্বরস্মরণ—সম্প্রদাতা যথাকালে সম্প্রদানশালায় বেদীর সম্মুখে বেদীকে দক্ষিণ বা বামপার্শ্ব করিয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক, পাত্রকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের স্মরণ করিলেন—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থসকল দর্শন করে, সেইরূপ ধীরেরা সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পরম পদ সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন।

অনন্তর স্বস্তিবাচন করিলেন। সম্প্রদাতা—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু—এই কর্ত্তব্য শুভ কন্যাসম্প্রদানকর্ম্মে আপনারা সকলে 'পুণ্যাহ' বলুন। সভাসদগণ ও জামাতা—ওঁ পুণ্যাহং—'পুণ্যাহ'।

সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু—এই কর্ত্তব্য শুভ কন্যাসম্প্রদানকর্ম্মে আপনারা সকলে 'ঋদ্ধি' বলুন। সভাসদগণ ও জামাতা—ওঁ ঋধ্যতাং—'ঋদ্ধি' হউক।

সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু—এই কর্ত্তব্য শুভ কন্যাসম্প্রদানকর্ম্মে আপনারা সকলে 'স্বস্তি' বলুন। সভাসদগণ ও জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

অনন্তর সম্প্রদাতা বরকে অর্চ্চনা করিলেন। সম্প্রদাতা অর্ঘ্য লইয়া—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর। জামাতা—ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণামি। অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছি। সম্প্রদাতা পরিচ্ছদ লইয়া—ওঁ এষঃ পরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাং। এই পরিচ্ছদ গ্রহণ কর। জামাতা—ওঁ পরিচ্ছদং প্রতিগৃহ্ণামি। পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতেছি। সম্প্রদাতা অঙ্গুরীয় লইয়া—ওঁ ইদম্ অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং। এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর। জামাতা—ওঁ অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্ণামি। অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিতেছি।

অনন্তর সম্প্রদাতা বরকে বরণ করিলেন। ওঁতৎসৎ। অদ্য ফাল্গুনে মাসি কুম্ভরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য মধুসূদন-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহরিনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহেমন্তকুমার-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রং, কাশ্যপগোত্রং কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবরং শ্রীশচীকুমার-দেবশর্ম্মাণং; শাণ্ডিল্য-গোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য দেবেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবল প্রবরস্য হেমেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রাং শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরাং শ্রীবাণী-দেবীং কন্যাং শুভবিবাহেন দাতুম্ এভিরর্ঘ্যাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।

ওঁতৎসৎ। অদ্য ফাল্গুন মাসে সূর্য্য কুম্ভরাশিগতে শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈধ্রুবপ্রবর শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায়কে; শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র

শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্রা শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরা কন্যা শ্রীবাণী দেবীকে শুভ বিবাহে দান করিবার জন্য এই অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া তোমাকে আমি বররূপে বরণ করিতেছি। জামাতা—ওঁ বৃতোঽস্মি। বৃত হইলাম। সম্প্রদাতা—ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু। যথাবিহিত বিবাহকর্ম্ম কর। জামাতা—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি। যথাজ্ঞান করিতেছি।

অনন্তর স্ত্রী-আচার।

তৎপরে সম্প্রদাতা বেদীর অভিমুখে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার বামহস্তের নিকটস্থ চিত্রিত কাষ্ঠাসনে পাত্রকে ও দক্ষিণ হস্তের নিকটস্থ তাদৃশ আসনান্তরে কন্যাকে বেদীর অভিমুখী করিয়া উপবেশিত করিলে আচার্য্যগণ বেদীতে উপবেশন করিয়া সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী ব্রহ্মোপাসনা করিলেন।

কল্যাণ—তেওরা।

ওঁ পিতা তুমি। জ্ঞানদাতা হে।
নমি তোমা। ছেড়োনাকো মোরে।
যতেক দেব হে পিতা
দুরিত মোর করি' দূর,
আশীষ তব বরিষ।
নমি দেব শম্ভব শুভদাতা হে
নমি দেব শঙ্কর শুভাকর হে!
নমি দেব শিব শিবতর তোমায় হে॥

উদ্বোধন।—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থসকল দর্শন করে, সেইরূপ ধীরেরা সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পরম পদ সর্ব্বদা দর্শন করেন। প্রণাম—ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধিষু যো বনস্পতিষু :তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ। যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে; সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

সমাধান—ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং। যে সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষ আমাদের পূজা গ্রহণের নিমিত্ত এখনই এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। অনন্যমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপে সমাধান করি। ওঁ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা। তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ। তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন। ইহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে; ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে; ইঁহার ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

ধ্যান—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। সর্ব্বলোকপ্রকাশক সর্ব্বব্যাপী সেই জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

স্তোত্র—ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়, নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ, ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পং॥

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।

মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥

বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাস্তজামো, বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপন্নমামঃ।

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়; তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ। তুমিই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণীগণের গতি ও পাবনের পাবন। তুমিই মহোচ্চ পদসকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

স্বাধ্যায়—এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীবসকল উপভোগ করে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

তৎপরে সম্প্রদাতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পাত্র ও কন্যা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিলে সম্প্রদাতা পাত্রের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। ওঁ ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং দদানি; তোমাকে আমি এই কন্যা দান করিতেছি। জামাতা—ওঁ দদস্ব। দান করুন।

তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্র ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্তোপরি স্থাপন করিয়া—ওঁ তৎসৎ। অদ্য ফাল্গুনে মাসি কুম্ভরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মা ঈশ্বরপ্রীতিকামঃ কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবরস্য মধুসূদন-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহরিনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহেমন্তকুমার-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, কাশ্যপগোত্রায় কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবরায় শ্রীশচীকুমার-দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায়; ওঁতৎসৎ। অদ্য ফাল্গুন মাসে সূর্য্য কুম্ভরাশিগতে শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে শাণ্ডিল্যগোত্র শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবর শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবর শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপধ্যায়ের পুত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম অর্চ্চিত বর শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে; শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য দেবেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য হেমেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রাং শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরাং শ্রীবাণী-দেবীং; শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরা শ্রীবাণী দেবীকে;

কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবরস্য মধুসূদন-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহরিনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহেমন্তকুমার-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, কাশ্যপগোত্রায় কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবরায় শ্রীশচীকুমার-দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায়; কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবর শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবর শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্সার-নৈঞ্রুবপ্রবর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম অর্চ্চিত বর শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে; শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য দেবেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য হেমেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রাং শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরাং শ্রীবাণী-দেবীং; শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবল-

প্রবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্রা শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরা শ্রীবাণী দেবীকে ;

কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য মধুসূদন-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহরিনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবরস্য শ্রীহেমন্তকুমার-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, কাশ্যপগোত্রায় কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবরায় শ্রীশচীকুমার-দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায় ; কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুব-প্রবর শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবর শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম অর্চ্চিত বর শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে ; শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য দেবেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য হেমেন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, শাণ্ডিল্য-গোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরস্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, শাণ্ডিল্যগোত্রাং শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরাং শ্রীবাণী-দেবীম্ এনাং কন্যাং সালঙ্কারাম্ অরোগিণীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্র শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবর শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রী, শাণ্ডিল্যগোত্রা শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবলপ্রবরা সালঙ্কারা অরোগিণী সুশীলা বস্ত্রাচ্ছাদিতা কন্যা শ্রীবাণী দেবীকে তোমার হস্তে আমি সম্প্রদান করিতেছি। জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

সম্প্রদাতা—ধর্ম্মে চ অর্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং। ধর্ম্ম অর্থ ও ভোগবিষয়ে তুমি ইহাকে অতিক্রম করিবে না। জামাতা—নাতিচরিষ্যামি। অতিক্রম করিব না।

সম্প্রদাতা সুবর্ণ লইয়া—ওঁ তৎসৎ। অদ্য ফাল্গুনে মাসি কুম্ভরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ-দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং কাশ্যপগোত্রায় কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবরায় শ্রীশচীকুমার-দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

ওঁতৎসৎ। অদ্য ফাল্গুন মাসে সূর্য্য কুম্ভরাশিগতে শুক্লপক্ষে নবমীতিথিতে শাণ্ডিল্যগোত্র আমি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুষ্ঠিত এই শুভকন্যাসম্প্রদান কর্ম্মের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য দক্ষিণাস্বরূপ এই কাঞ্চনখণ্ড কাশ্যপগোত্র কাশ্যপ-অপ্‌সার-নৈধ্রুবপ্রবর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম বর শ্রীমান শচীকুমার চট্টোপাধ্যায় তোমাকে সম্প্রদান করিলাম।

জামাতা—ওঁ স্বস্তি। এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর গ্রন্থিবন্ধন হইলে জামাতা পাঠ করিলেন।

ওঁ বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে। আমি সত্যগ্রন্থি দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় বন্ধন করিতেছি।

ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম॥ আমার যে এই হৃদয়, তাহা তোমার হউক ; তোমার যে এই হৃদয়, তাহা আমার হউক। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা পতিকুলে ইয়ং॥ দ্যুলোক যেমন ধ্রুব, পৃথিবী যেমন ধ্রুব, এই বিশ্বজগৎ যেমন ধ্রুব, এই সকল পর্ব্বত যেমন ধ্রুব, সেইরূপ এই স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুব হইয়া থাকুন।

অনন্তর বর ও কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অন্যোন্যাবলোকন করাইলেন।

পাণিগ্রহণ—ভর্ত্তা ও বধূ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলে ভর্ত্তা আপন অঞ্জলির অভ্যন্তরে বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন। ওঁ গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। আমি সৌভাগ্য নিমিত্ত তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি যে, তুমি যাবজ্জীবন আমার সহিত অবস্থান করিবে। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নী এধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূর্জীবসূর্দেবকামা স্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ তোমার চক্ষু প্রসন্ন হউক, তুমি পতির হিতকারিণী হও, জীবগণের প্রতি কল্যাণদায়িনী হও, তোমার মন সুন্দর হউক, তুমি তেজস্বিনী হও ; তোমার সন্তান বীর ও দীর্ঘায়ু হউক, তুমি ঈশ্বরপরায়ণা ও সুখভাগিনী এবং মনুষ্য ও পশুগণের কল্যাণকারিণী হও। ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রূাং ভব। ননান্দরি চ সাম্রাজ্ঞী সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥ শ্বশুর-শ্বশ্রূ, ননন্দা ও দেবরগণের নিকট শোভমানা হও। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তং তেঽস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব ধর্ম্মাবহস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যং॥ আমার ব্রতে তোমার হৃদয় নিহিত হউক ; তোমার চিত্ত আমার চিত্তের সদৃশ হউক ; একমনা হইয়া আমার বাক্য পালন কর, ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর আমার প্রতি তোমাকে নিয়োগ করুন।

তৎপরে বধূ স্বামীগোত্রে আপনার নাম উল্লেখ করিয়া ভর্তাকে অভিবাদন করিবেন—

কাশ্যপগোত্রা শ্রীবাণী দেবী অহং ভো অভিবাদয়ে। কাশ্যপগোত্রা আমি শ্রীবাণী দেবী, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

ভর্তা—ওঁ আয়ুষ্মতী ভব। 'আয়ুষ্মতী হও' এই বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিবেন।

রাগিণী সাহানা—ঝাঁপতাল।

তোমারি আহ্বানে আজ পরিয়া মিলন সাজ
এসেছে আশীষতরে শুভ মিলনের পরে।
দীরঘ জীবনপথে ধরি' যেন তব হাতে,
তোমারি করুণা'পরে চলে নির্ভর ক'রে—
তব এ আশীষ শিরে ঘরে লয়ে যেন ফিরে॥
সম্প্রীতি ফেলুক ছেয়ে শত কলতানে গেহ;
তব পুণ্য নাম গেয়ে ধন্য হোক প্রাণদেহ;
জ্ঞানেতে উজ্জ্বল হোক; ঘুচে যাক দুঃখ-শোক;
আনন্দ হউক নিত্য; অন্তরে সদা সত্য—
তব এ আশীষ শিরে ঘরে লয়ে যেন ফিরে॥

আচার্য্যের উপদেশ। তৎপরে ভর্ত্তার আসনে বধূ ও বধূর আসনে ভর্তা বেদীর অভিমুখে উপবেশন করিলে আচার্য্য এই উপদেশ প্রদান করিবেন—

অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এতদিন একাকী জীবন-পথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদনিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। ইহার পথসকল অতি দুর্গম, ইহার প্রলোভন রাশি রাশি। সাবধান, যেন সংসারের মোহে অভিভূত না হও, ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্বসুখদাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্যস্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতিসাধনে ও সুখবর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, সকল গৃহকর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে—ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥ গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। তোমাদিগের যাহা কিছু, সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিবে; তিনি তোমাদিগকে রোগ-শোক, ভয়বিপদ ও পাপতাপ হইতে উদ্ধার করিবেন।

শ্রীমান্ শচীকুমার! তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গলসাধনে যত্নশীল থাকিবে। অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্তচিত্ত থাকিবে। যেরূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে, সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্মপথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সাংসারিক শুভকার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যের পথে মঙ্গলের পথে তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন। শ্রীমতী বাণী দেবী! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একাগ্র মনে নির্ভর করিবে ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে; অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন, বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে এবং স্বামীর সাহায্যে সর্ব্বদা আত্মার উন্নতিসাধনে যত্নশীলা থাকিবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

ওঁ যএকোহবর্ণোবহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর; তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আশীর্ব্বাদ—অনন্তর দম্পতী তদ্গতচিত্তে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলে আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদিগের উভয়ের মঙ্গল করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

খাম্বাজ—তেতালা।

প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী—প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী—
উঠুক ধ্বনিয়া সুরের লহরী—ছুটুক সে ঢেউ প্রাণের উপরি—
সেই ঢেয়েতে বসিয়া সুখেতে প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।
যে সুরে আজ জীবনতন্ত্রী বাজাইলে বন্ধু জীবনযন্ত্রী,
সেই সুরে দাও পরাণ ভরিয়া, আনন্দ ছুটুক দুকুল ছাইয়া
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী—প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী॥

সপ্তপদীগমন। দম্পতী দণ্ডায়মান হইলেন, এবং ভর্ত্তা পাঠ করিলেন। ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত। সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়াথাস্তং বিপরেতন। এই বধূ কল্যাণবতী; আপনারা সকলে মিলিয়া ইহাঁকে দর্শন করুন এবং ইহাঁকে সৌভাগ্য দান করিয়া গৃহে গমন করুন।

পরে সম্প্রদান স্থান হইতে বাসগৃহ-গমনের পথে প্রদত্ত সাতখানি আসনে বা সপ্ত মণ্ডলিকায় বধূ ক্রমান্বয়ে পদনিক্ষেপ করিয়া গমন করিলেন এবং ভর্ত্তা সেই সপ্তপদে সাতটী উপদেশ দিলেন।

ওঁ ঈশে একপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত প্রথম পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও।
ওঁ উর্জ্জে দ্বিপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। বললাভের নিমিত্ত দ্বিতীয় পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও।
ওঁ ব্রতায় ত্রিপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। ব্রতের নিমিত্ত তৃতীয় পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও।
ওঁ ময়োভবায় চতুষ্পদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। সুখলাভের নিমিত্ত চতুর্থ পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও।
ওঁ পশুভ্যঃ পঞ্চপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। পশুলাভের নিমিত্ত পঞ্চম পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও।
ওঁ রায়স্পোষায় ষট্পদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। ধনলাভের নিমিত্ত ষষ্ঠ পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও।
ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব। সপ্তম পদ নিক্ষেপ করিয়া আমার সহিত সখ্য বন্ধন কর এবং আমার অনুব্রতা হও। অনন্তর সপ্তপদীগতা পত্নীকে ভর্ত্তা এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—

ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সখ্যং তে গমেয়ং সখ্যং তে মা যোষাঃ সখ্যং তে মায়োষ্ঠ্যাঃ। সপ্তম পদে গমনপূর্ব্বক আমার সখী হও, আমি তোমার সখ্য লাভ করি, অন্য স্ত্রীরা আমার সহিত তোমার সখ্য ছেদন না করুন, সুখকরী স্ত্রীরা আমার সহিত তোমার সখ্য বন্ধন করিয়া দিউন। অনন্তর বধূ ও ভর্ত্তা বাসগৃহে গমন করিলেন।

বিবাহসভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিলাম।

ডাক্তার শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসংজ্ঞা দেবী, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীইন্দিরা দেবী, ডাক্তার শ্রীঅশ্বিনীকুমার চৌধুরী, শ্রীলীলা দেবী, শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমনীষা দেবী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশোভনা দেবী, শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীঅজিতকুমার মল্লিক, শ্রীসরোজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানদা সুন্দরী দেবী, শ্রীসরোজনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযামিনীপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীআনন্দময় মুখোপাধ্যায়, শ্রীগার্গী দেবী, শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার, ডাক্তার শ্রীরসিকলাল দত্ত, ডাক্তার শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, ডাক্তার শ্রীতোজেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীবেণীমাধব দাস, শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ, শ্রীক্ষীরোদকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীসিদ্ধেশ্বর মল্লিক, জে. সি. মুখার্জি, এস. এন্. বসু, শ্রীআনন্দ বসু, শ্রীসুজাতা বসু, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত, এন. সি. সেন, শ্রীসতীনাথ রায়, রায় বাহাদুর শ্রীমোহিনীনাথ রায়, শ্রীক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

উদীচ্য কর্ম্ম।

বিবাহের পর দিবস প্রাতে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ আপনার সম্মুখে ভর্ত্তাকে ও ভর্ত্তার বামপার্শ্বে বধূকে উপবেশন করাইয়া যথাবিধি ব্রহ্মোপাসনা করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে পাঠ করিলেন। যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্। যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহম্। পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশান-সমান। প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন। সন্তান উৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রী-সকল বহুকল্যাণ-পাত্রী এবং আদরণীয়া; ইঁহারা গৃহকে উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী-স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ। ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে। পুরুষ সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধিসম্মত পত্নী নহে। অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ। এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ। স্ত্রী-পুরুষে মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না, সংক্ষেপেতে তাঁহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে। তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ। যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহারও প্রতি ব্যভিচার না করেন; এমত যত্ন তাঁহারা সর্ব্বদা করিবেন। সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্। যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি, এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চয় কল্যাণ। সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী। মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী। সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী। ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু। সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া। ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্মসাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহকার্য্যে সুদক্ষ হইবেন। ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী। ন চাতিব্যয়শীলা স্যাৎ ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী। কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না। পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া। ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্। যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন। স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যম্ এষ ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ। সদ্বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ। স্ত্রীরা স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী সদাচারশীলা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়েন। সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যা বিশেষতঃ। দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ। স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্টরূপে রক্ষা করিবেক, যেহেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃ-কুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন। অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ। আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ। বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধ থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা। ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা। যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরু-পত্নী-স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র-বধূস্বরূপ, ইহা মুনিরা কহিয়াছেন।

ব্যাখ্যান।—ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন, তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, এবং যে কোন কর্ম্ম করিবেন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। ধর্ম্মসাধনসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই যে প্রথম উপদেশ ইহা অতীব সারগর্ভ। ব্রহ্মেতে যাঁহার নিষ্ঠা তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ। সাধকের প্রথম সাধন ব্রহ্মনিষ্ঠা, দ্বিতীয় সাধন গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যাঁহার নাম নাই, ধাম নাই, রূপ নাই, যিনি সকল সত্যের মূল সত্য, সকল মঙ্গলের মূলাধার, সকল সৌন্দর্য্যের মূল আকর, তাঁহাতে মনের একাগ্রতা হউক, নিষ্ঠা হউক, ভক্তি হউক এবং এই নামরূপময় সংসারের তাবৎ কার্য্যে তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হউক, এই দুইটি সংকল্প যাঁহার মনে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে ধর্ম্মের মূলপত্তন করিয়াছেন, তিনিই সাধক-নামের যোগ্য হইয়াছেন।

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রথম কর্ত্তব্য পরব্রহ্মকে গৃহমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা; এই কার্য্য যদি বিধিমতে অনুষ্ঠিত

হয়, তবে পবিত্র প্রেমে গৃহের মুখ উজ্জ্বল হইবেই হইবে, ইহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। উত্তম ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে এবং তাহাতে ঈশ্বরের প্রসাদ-বারি বর্ষিত হইলে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবেই হইবে, অতএব গৃহের ন্যায় এমন পবিত্র ক্ষেত্রে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ কর্ষিত না হইবে তবে কোথায় হইবে? এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উপদেশ দিতেছেন যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন। গৃহেতে পরব্রহ্মের পবিত্র প্রেমের ছায়া স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়; "এক ভানু অযুত কিরণে উজলে যেমতি সকল ভুবন, তোমার প্রেম হইতে শতধা বিকশে নরের প্রেম জননী-হৃদয়ে করে বসতি।" গৃহ অতি পবিত্র স্থান, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি অতি পবিত্র বস্তু, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি প্রেম অতি পবিত্র বস্তু, পতি-পত্নীর প্রেম অতি পবিত্র বস্তু, পুত্র-কন্যার প্রতি স্নেহ-মমতা অতি পবিত্র বস্তু, অতএব গৃহেতে পরব্রহ্মকে আনয়ন কর, পবিত্রতা এবং কল্যাণের ক্ষেত্র যে গৃহ, তাহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মঙ্গল বীজ বপন কর, তাহা হইলে যথাকালে প্রচুর পরিমাণে ফল লাভ করিবে তাহাতে আর সংশয় নাই।

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন। ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, আমাদের মনের চাঞ্চল্য বশতঃ প্রথমে আমরা তৎপ্রতি বুদ্ধিকে স্থির করিতে পারি না। প্রীতির সহিত এবং ভক্তির সহিত পরব্রহ্মকে ভজনা করিলে মন প্রশান্ত হয়, এবং বুদ্ধি স্থির হয়, এবং সেই একনিষ্ঠ স্থির বুদ্ধিতে পরব্রহ্ম ধ্রুব তত্ত্বরূপে প্রকাশিত হন। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তত্ত্বজ্ঞানীর কার্য্য কিরূপ, ইহা সর্ব্বশেষে উক্ত হইয়াছে,—তিনি যে কোন কর্ম্ম করিবেন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। সাংসারিক ব্যক্তিরা যে কোন সৎকর্ম্ম করেন তাহাতে আপনাকেই প্রতিবিম্বিত দেখিতে চান এবং আপনার নামকে প্রতিধ্বনিত শুনিতে চান, কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আপনার কৃত কার্য্যে আপনার প্রিয়তম পরমাত্মাকেই দেখিতে পান এবং তাঁহার নামকেই শুনিতে পান, কেন না আপনা অপেক্ষা তিনি পরমাত্মাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। পরব্রহ্মেতে যখন আমরা আমাদের সকল কার্য্য সমর্পণ করিতে পারিব তখনই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত পথে দণ্ডায়মান হইব। হে পরমাত্মন্! যাহাতে তোমার সেই অমৃতময় পথ অবলম্বন করিতে পারি তুমি আমাদের আত্মাতে সেইরূপ বলবীর্য্য প্রদান কর। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর বধূকে ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিলেন। বৎসে বাণীদেবী! এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ কর।

সর্ব্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা হইতেছে—সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গলস্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব। ঈশ্বরের উপাসনাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা হইতেছে—পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোনও বস্তুর আরাধনা করিব না। ব্রহ্মোপাসকের এই প্রতিজ্ঞাটী দৃঢ়রূপে অন্তরে ধারণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিবার অবসর নাই। ভূমা পরমেশ্বর সৃষ্টির অতীত—স্থান, কাল ও সর্ব্ববিধ সীমার অতীত; সৃষ্ট বস্তুমাত্রই অন্ততঃ স্থানে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবেই। সুতরাং আমাদের ক্রমোন্নতিশীল আত্মার শ্রদ্ধাভক্তি পরিমিত বস্তুতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

ঈশ্বর কোন এক ব্যক্তিতে বা জাতিতে বা দেশে বা কালে আবদ্ধ নহেন। প্রাণের ইচ্ছা লইয়া সরল পথে তাঁহার নিকট যাও, সকল বাধাই অতিক্রম করিবে। তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা। এই সরল কথা ভুলিয়া মানুষকে যতই শ্রদ্ধা কর, অতিপ্রাকৃত অবতাররূপে ভগবানের আসনে বসাইও না। একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অতিপ্রাকৃত বা প্রকৃতির অতীত আর কেহই হইতে পারে না।

অগ্নিহোত্রী যেমন তাঁহার পূজার অগ্নিকে অবিচ্ছেদে প্রজ্বলিত রাখেন, আমাদেরও অন্তরে বিশ্বপিতা অখিল মাতা ঈশ্বরের উপাসনাকে সেইরূপ একনিষ্ঠভাবে জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে।

তিনি নিরাকার বলিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা দিতে ক্ষান্ত হইও না। সেই অন্তর্য্যামী পরম পুরুষ শূন্য নিরাকার নহেন। আমাদের আত্মা যেমন নিরাকার—ইচ্ছা শক্তি জ্ঞান ও প্রীতিবিশিষ্ট নিরাকার পুরুষ, অনন্তমঙ্গল ভগবানও সেইরূপ অনন্ত ইচ্ছা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রীতিবিশিষ্ট নিরাকার পরম পুরুষ। নিরাকার বলিয়াই যেমন আমাদের আত্মা আমাদের দেহ ও মনের সকল অংশ একই সময়ে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়, তেমনি সেই পূর্ণ পুরুষ নিরাকার বলিয়াই কি বহির্জগতের কি অন্তর্জগতের প্রত্যেক অংশ নিজের পূর্ণস্বরূপে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি এইরূপে নিজের স্বরূপে তাঁহার ব্রহ্মচক্রের প্রত্যেক অংশ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়াই সর্ব্বত্র ও সকল অবস্থাতেই তাঁহার পূজা করা সম্ভব। এই কারণেই উপাসকের সহিত উপাস্য ভগবানের প্রত্যক্ষ যোগ।

তৃতীয় প্রতিজ্ঞা—রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মসমাধান করিব। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আত্মাকে জানিবার অধিকার রাখি, কিন্তু জড়পদার্থেরও যেমন স্বরূপ জানি না, আত্মারও সেইরূপ স্বরূপ জানি না। দর্শন, মনের নিয়মন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা আত্মার পরিচয় পাই। সেই আত্মা মহান আত্মা পরমাত্মাতে অধিশ্রিত। সুখসম্পদের মোহে আচ্ছন্ন থাকিলে অনেক সময়ে এই সত্য স্পষ্ট দেখিতে পাই না। কিন্তু দুঃখবিপদের কঠোর কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া একটা আশ্রয় পাইবার জন্য যখন ব্যাকুল হই, তখনই বুঝিতে পারি একটি আত্মাও নিরাশ্রয় নহে, প্রত্যেক আত্মাই সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করি যে, বিশ্বজগতেরও আত্মা সেই পরমাত্মা; তাঁহাতেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

আত্মা যেমন আমাদের শরীর ও মনের আশ্রয়, পরমাত্মাও সেইরূপ আত্মার একমাত্র আশ্রয়, আত্মার প্রাণ। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, আত্মার দ্বারাই পরমাত্মাকে জানিবে। আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিলে সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায়। আত্মাকে না জানিলে সকলই শূন্য। আত্মাকে ছাড়িয়া পরমাত্মাকে পাইবে না। আত্মা সুস্থ থাকিলেই আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে জানা সহজ হয়। শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য যেমন প্রতিদিন নিয়মিত অন্ন আহার করা আবশ্যক, সেইরূপ আত্মারও স্বাস্থ্য রাখিবার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করা আবশ্যক। যেমন মাটির নীচে যথেষ্ট জল থাকিলেও গাছে নিয়মিত জলসিঞ্চন করিয়া তাহাকে সজীব রাখিতে হয়, সেইরূপ ভগবান আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া থাকিলেও নিয়মিতরূপে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধন করিয়া আত্মাকে সতেজ করিয়া তুলিতে হয়। এইরূপ যোগসাধনই হইল আত্মার অন্ন। মৃত্যুর পরে শরীর পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু যোগযুক্ত আত্মা পরমাত্মার সহিত অনন্তকাল বিচরণ করিতে থাকিবে। পরমাত্মার সহিত আত্মার অবিচ্ছেদ্য যোগসাধনই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের আদি এবং তাহাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্ত।

পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগসাধনের ফলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি তো অবশ্যম্ভাবী; সঙ্গে সঙ্গে আত্মা মধুময় হয়। বিশ্বজগৎ সেই আত্মার নিকটে মধুময় হয়। যোগযুক্ত আত্মা শান্তিসমুদ্রে অটল থাকে। জগতের অনেক বিষয়ের কারণ ও তত্ত্ব বুঝিতে না পারিলেও, জীবনের অনেক রহস্য ভেদ করিতে না পারিলেও মঙ্গলস্বরূপের উপর তাহার বিশ্বাস কিছুমাত্র টলে না। ঈশ্বরকে যিনি আত্মস্থ দেখেন, তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়; মৃত্যু তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইতে পারে না; বিপদ তাঁহার নিকটে সম্পদ হয়, মৃত্যু অমৃতের সোপান হয়। তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি অমৃতের পুত্র, অমৃতের অধিকারী এবং ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় পিতামাতা, অন্তরতম সখা সুহৃৎ। এইভাবে ঈশ্বরের উপাসনাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

এই আত্মসমাধানের জন্য যেমন ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন ব্যতীত অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ স্থান বা কালের বিষয়েও নির্দ্দিষ্ট কোন বিধিনিষেধ নাই। যে স্থানে এবং যে সময়ে যে অবস্থায় চিত্তের একাগ্রতা আসিবে, সেই স্থানে, সেই সময়ে এবং সেই অবস্থাতেই পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিবে।

আত্মসমাধানের জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনেরও একান্ত প্রয়োজন নাই। ওঁকার বা অন্য কোন মন্ত্রের অর্থধ্যান বা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী বা অন্য কোন হৃদয়গ্রাহী রচনা, যাহাতে আত্মার তৃপ্তি হইবে এবং পরমাত্মাতে আত্মসমাধান সহজসাধ্য হইবে তাহাই অবলম্বন করিবে। পরমাত্মাতে আত্মসমাধান অভ্যস্ত হইলে আমরা তাঁহাকে পিতামাতা বলিয়া জানিতে পারি; বিপদের সময় তাঁহাকে বিপদের কাণ্ডারী এবং সুখে দুঃখে তাঁহাকে সখা ও সুহৃৎ বলিয়া বুঝিতে পারি। পাপে পতিত হইলে তিনি পতিতপাবন; মুক্তির জন্য শরণাপন্ন হইলে তিনি মুক্তিদাতা।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা হইতেছে—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব; পঞ্চম প্রতিজ্ঞা—পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব। আত্মসমাধানের ফলে ঈশ্বরকে প্রীতি করিবার সঙ্গে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনও সহজ হয়। তখন অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধার বলেই আমরা বুঝিতে পারি যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাঁহার প্রিয় এবং পাপকর্ম্ম তাঁহার অপ্রিয়। আমরা প্রত্যক্ষও করি যে, সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ফল সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতি এবং পাপকর্ম্মের ফল সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি। ভগবানে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। মুখে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন এবং কার্য্যে তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যসাধন—ইহাতে গুরুতর অধর্ম্ম হয়।

পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইলেও সীমাবদ্ধ মানুষ সময়ে সময়ে পাপাচরণ করিয়া ফেলে। কিন্তু অনন্ত মঙ্গলের রাজ্যে অনন্ত নরক থাকিতে পারে না। ইহা জানা কথা যে, সংসারে নানা বিষয়ে নানা

ভুলভ্রান্তি করিয়া অনেক অমূল্য সময়ও নষ্ট করি এবং অনর্থও আনি। কিন্তু তজ্জন্য বৃথা হাহুতাশ করিবার পরিবর্ত্তে মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাবে অটল আস্থা রাখিয়া, তাঁহার হস্তে ফলাফলের ভার নির্ভয়ে সমর্পণ করিয়া নিষ্কামহৃদয়ে শুভ কর্ম্ম করিতে থাক, ভগবৎবিধানেই সমস্ত ভুলভ্রান্তি পদ্মপত্র হইতে জলের মত ঝরিয়া পড়িয়া কোথায় অদৃশ্য হইবে। মোহবশত কখন কোন পাপাচরণ করিয়া ফেলিলেও তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইলে, পাপের জ্বালায় জর্জ্জরিত হৃদয়ের অনুতাপের রক্তে পরমেশ্বরের চরণ ধৌত করিলে তিনি সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া আদরপূর্ব্বক তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন। তাই ষষ্ঠ প্রতিজ্ঞায় পাপ করিলে তাহা হইতে অনুশোচনা পূর্ব্বক বিরত হইবার কথা আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণের সর্ব্বশেষ প্রতিজ্ঞা এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিসাধনার্থ বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে যথাশক্তি দান করিব। যে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগবিষয়ক নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে। সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা, মঙ্গল ও উন্নতির পথপ্রদর্শক মোক্ষপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশের সম্মুখে যে উচ্চতম আদর্শ ধারণ করিয়াছেন, সেই আদর্শকে গৃহে গৃহে উপস্থিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করা চাই-ই। ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ব্রাহ্মসমাজে যথাশক্তি দান করা। তাই প্রতিজ্ঞায় প্রত্যেকের পক্ষে এই দান যতদূর সম্ভব সহজ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে যে ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, বর্ষে বর্ষে যথাশক্তি দান করিলেও সে ঋণদায় হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি না। আমাদের কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ঈশ্বর ও সংসারের বিরোধ উপস্থিত হইলে সহস্র বাধা সত্ত্বেও সংসারকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে হইবে। এই সকল উপায়ে যে বিদ্বান ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হয়।

এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবনের প্রতি নিশ্বাসে ঈশ্বরকে জীবনের সাক্ষী জানিয়া নির্ভয় হও—রোগ-শোক ভয়-ভাবনা হইতে মুক্তিলাভ কর। তাঁহাকে মহান প্রভু বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ববিধাতা পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি কর—তাঁহাকে অন্তর্য্যামী পরম পুরুষরূপে উপলব্ধি কর, তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত সখা-সুহৃৎরূপে থাকিয়া, পিতা মাতার মূর্ত্তিতে জাগ্রত থাকিয়া অনুক্ষণ তোমার মঙ্গলবিধান করিতেছেন, বিপদে আপদে তোমাকে নিজ স্নেহের বর্ম্মতর্গে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের ঘনিষ্ঠতম যোগ—তিলমাত্র ব্যবধান নাই। তিনি আমাদের প্রত্যেক কার্য্য দেখিতেছেন, প্রত্যেক কথা শুনিতেছেন। তাঁহাকে নিকটতম অন্তরতম প্রাণের প্রাণরূপে প্রত্যক্ষ কর এবং জীবনকে সার্থক কর।

সৌম্য শ্রীমান শচীকুমার! যাহাতে তোমার পত্নী এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত পালনে সমর্থ হন, তুমি তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবে। তোমার সহধর্ম্মিণীর জ্ঞান-ধর্ম্ম, সুখ-শান্তি সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিবে। কায়মনোবাক্যে হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিবে। 'ধর্ম্মএব হতোহন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ। তস্মাদ্ধর্ম্মোন হন্তব্যোমা নোধর্ম্মোহতোহবধীৎ।' যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্ম তাহাকে নষ্ট করেন; আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে নাশ করিবে না, ধর্ম্ম হত হইয়া আমাদিগকে নষ্ট না করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ। অনন্তর ভর্ত্তা ও বধূ উভয়ে 'ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ' বলিয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ওঁ য একোহবর্ণোবহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। যিনি এক এবং বর্ণহীন, যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; এই ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত-মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর; তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি উদীচ্য-কর্ম্ম সমাপ্ত।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(প্রাতঃকাল)

গান্ধারী—আড়াঠেকা।

আজিকে মধুর সুবিমল প্রাতে
মরম বাঁশরী উঠিল বাজিয়া।
আজি নামে তব ওহে প্রিয়তম
শত নব গান উঠিছে ফুটিয়া।
তোমারি মধুরে সকলি মধুর—
তব পুণ্য গন্ধ পড়িছে ঝরিয়া।
সুমন্দ বাতাস তোমারি নিশ্বাস
দিতেছে আমারে পাগল করিয়া।

আশাবরী—আড়াঠেকা।

প্রাণ মোর ধাইছে
তোমার পদে প্রভু হে
দূর কর জননী ত্রাস আমার
ভবে ভয়সঙ্কুল॥

রামপ্রসাদী।

(মন) প্রাণ খুলে গাও, মায়েরি নাম॥ (ধুয়া)
বিপদ্ আপদ্, যাই না আসুক,
বিকট্ হাসি যতই হাসুক,
(ওরে) বাঁকিস্ নে টুক্, এদিক্ ওদিক্,
মায়ের্ পরে রাখিস্ রে প্রাণ।
(যবে) ধনরাশি, রাশি সুখ,
ভরে দেয় তোর হাসিতে মুখ,
(তখন) ভুলিস নেকো, সার কথাটী,
সকলি এ মায়েরি দান।
উঠিস যবে সকাল হোলে,
ফিরিস যবে সাঁঝের কোলে,
(তখন) ভক্তিভরে চরণ পরে,
মাথা খুরে করিস প্রণাম॥

ভৈরবী—চৌতাল।

প্রাণ মন সঁপিনু তোমার পদে অন্তর্যামী
তোমা নাথ যেই চাহে তাহে দাও অচল শরণ।
তব প্রথম তেজ দেব অসংখ্য ভুবন সৃজিল;
সকল পাপ অজ্ঞান দূরিল প্রীতি তব দেব সুখন।
গাহিছে গুণ অশেষ সুর মানব, দেবেশ তব
অন্ত কেহ নাহি পায়।
চিত্তে দাও ভক্তি অচল, দাও হে কৃপা আনন্দ—
যাচি আর নাহি কিছু; তুমি মোর হে দারিদ্র্যহরণ।

দরবারী টোড়ী—চৌতাল।

শঙ্কানাশিনী জননী মহা দুঃখহানি-বারণ হে প্রেমসাগর।
যাচি অপার দয়া বিতরি' প্রেমরূপ
ভক্তচিতে ভয়হারী হে পুরুষোত্তম কর অশুভ দূর।
হরষ উৎস প্রাণবন্ধু প্রাণেশ্বর পুণ্যনাম
পিতা তুমি স্নেহে অতুল।
জগন্নাথ সুখশান্তি ঝরে তব নাম গানে;
উপজে দরশে পরশে তব
হৃৎবৃন্দাবনে শুভামল।

ভৈরবী—তেতালা।

দেখা দাও—দাও সখা হৃদয়ে—মোর হৃদয়ে।
থেকোনা দূরে মোর—ধরি তব চরণে;
ডাকিছে সুদীনে করজোড়ে—দেখা দাও প্রাণবিহারি—
প্রভু বাঁচাও ভকতে॥

মহাত্মা গান্ধীর অভিযান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঘটনাটী ভারতের ইতিহাসে এতই বড় যে, ইহা রাজনীতিসংশ্লিষ্ট হইলেও আমরা ইহার উল্লেখ না করিয়া নীরব থাকিতে পারি না। গত ২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ) ভারতের ইতিহাসে একটী অনন্যসাধারণ স্মরণীয় দিবস। ঐ দিন মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ৭৯ অনুচর সহ সবরমতী আশ্রম হইতে দুইশত মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জালালপুরে লবণকর সম্বন্ধীয় নিষেধবিধি অহিংস-প্রণালীতে অমান্য করিবার জন্য পদব্রজে যাত্রা করিয়াছেন। বহুকাল অবধি লবণ প্রস্তুত করিয়া নিষেধবিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন ন্যূনাধিক বলে মধ্যে মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। লবণ ব্যতীত কি মনুষ্য, কি জীবজন্তু জীবন ধারণ করিতে অন্ততঃ নীরোগ থাকিতে পারে কি না সন্দেহ। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, যখনই কোন কারণে লবণের দাম বাড়িয়া যাইত, তখনই লবণকরের বিরুদ্ধে নানাবিধ আন্দোলন চলিত। লবণের দাম বৃদ্ধি হইলে কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলকে, বিশেষত দরিদ্রদিগকেই বিশেষভাবে আঘাত করে ও পীড়া দেয়, কারণ লবণ ব্যতীত দরিদ্রদিগের শাকভাত খাইয়াও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্ভব হয় না। যে বিষয় ধরিয়া অভিযান করিলে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অধিবাসী মাত্রেরই সহানুভূতি পাইতে পারেন, এমন একটী বিষয় মহাত্মা গান্ধী কিছু কাল ধরিয়া অন্বেষণ করিতেছিলেন। সে দিক দিয়া

দেখিলে আমাদের মনে হয় যে, বিষয়টী ঠিকই ধরা হইয়াছে, কারণ ইহা ব্যতীত এমন কোন বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, যাহার জন্য সমগ্র দেশের সহানুভূতি সহজে আকর্ষণ করা যাইতে পারে। এই লবণসমরের রাজনৈতিক ফলাফল যাহাই কেন হোক না, ইহার নৈতিক ফল বড় অল্প নহে। ঐ যে একটী ভাব—ধীর বিবেচনার পর যাহা অত্যাচার বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহার বিরুদ্ধে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, মৃত্যুকেও বরণ করিয়া অহিংস প্রণালীতে বাধা দিবার ব্যবস্থা করা, ইহার মূল্য যে কত অধিক, ইহা সমগ্র দেশবাসীকে নৈতিক উন্নতির সংযমের কত উচ্চ শিখরে লইয়া যাইতেছে, তাহা ঠিক এই মুহূর্ত্তে কিছু কিছু বুঝিলেও সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারিতেছি বলিয়া বোধ হয় না—কিছুকাল পরে যে নিশ্চয়ই বুঝিব তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। একটা বড়ই সুখের বিষয় যে, মহাত্মা গান্ধী যে কোন বিষয়ে হাত দিতেছেন, ধর্ম্মকে ছাড়িয়া, ভগবানকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া হাত দেন না; প্রত্যুত, ভগবানের উপর এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সত্য ও ধর্ম্মের উপর সবল আস্থা রাখিয়া তিনি সকল সমস্যারই নিরাকরণে উদ্যত হন। যেভাবে বিশ্বামিত্রের মুখ হইতে এই বাণী উঠিয়াছিল—"ধিক্ বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং", ঠিক সেই ভাবেই প্রণোদিত হইয়া গান্ধীজি অহিংসাসিদ্ধ হইয়া হিংসামূলক রাজনীতিকে পরাজয়প্রদানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ঐ মহাবাণী ভারতবাসীর হৃদয়ে কথা ও কাহিনীর আকারে ধ্বনিত হইয়া উঠে বটে, কিন্তু ভারতেরই অধিবাসী মহাত্মা গান্ধী এই নব যুগে নিজের অনুপম সাধনার বলে সেই মহাবাণীকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। মহাত্মার এই অভিযান লইয়া বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা যথেষ্ট মাথা ঘামাইতেছেন। সেক্ষেত্রে আমাদের ন্যায় কুটিল রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কোনপ্রকার উপদেশ দিবার জন্য অগ্রসর হওয়া ধৃষ্টতা মাত্র—সে উপদেশ উপেক্ষিত হওয়াই সম্ভব। তথাপি দেশের এই দুর্দ্দিনে, যাঁহার সুবুদ্ধিতে যে উপদেশ উদিত হয়, তাহা অন্তরে চাপিয়া রাখা কিছুতেই সঙ্গত নহে—প্রকাশ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। কাঠবিড়ালও রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়; ইন্দুরও বলবান সিংহের পাশমোচনে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া কথামালায় পড়া যায়। আমাদের মনে হয় যে, গবর্ণমেন্ট যদি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ন্যূনতম বাধার পথ (line of least resistance) ধরেন, তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়। রঘুবংশে কালিদাস একস্থানে লিখিয়াছেন মনে পড়ে যে, বেত নত হইয়া যায় বলিয়াই প্রবল স্রোতের উৎপাটিত হয় না। লবণকর উঠাইবার জন্য সমগ্র দেশবাসী যখন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে উদ্যত, তখন গবর্ণমেণ্টের দেশবাসীকে বলা উচিত যে, "ভাল, লবণ-কর উঠাইয়া দিতেছি, কিন্তু তাহা হইতে যে আয় হইত, সেই আয় অন্য কোন প্রকারে পূর্ণ করিয়া দাও।" ইহা বলিলে দেশবাসীর বর্ত্তমানে কিছুই বলিবার থাকিবে না। সংবাদপত্রে দেখি যে, মহাত্মা গান্ধীর অভিযানের পথে পাঠানবাহিনী রাখিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করা হইবে। জানি না, ইহা সত্য কিনা, সত্য হইলে ইহা কোন সুবুদ্ধি সমরনীতিজ্ঞের মস্তিষ্কপ্রসূত হইতে পারে না। যিনিই ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা বলিব যে, তাঁহার বুদ্ধি বড়ই অল্প। মহাত্মার অহিংসানীতির আঘাত সকল জড়াত্মক বাধা দলিত করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের পর অবধি দেশবাসীর আত্মার বলকে নানা উপায়ে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাই না। আমাদের উপদেশ এই যে, ধর্ম্মদৃষ্টিতে বিচার করিয়া যে প্রণালীতে শাসনব্যবস্থা করা আবশ্যক, গবর্ণমেণ্ট সেই প্রণালী অবলম্বন করুন, দেশবাসীর অন্নবস্ত্রের অভাব স্থায়ীভাবে দূর করিবার ব্যবস্থা করুন, শান্তি সহজেই নামিয়া আসিবে; প্রজার সুখে রাজার সুখ, এই অভ্রান্ত সত্যবাণী সার্থক হইবে।

সংবাদ।

স্মৃতিসভা—আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় বিগত ১৬ই মাঘ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা এবং তাঁহার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতানিবেদন জন্য ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজগৃহে ২৭শে ফাল্গুন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি অধিবেশন হইয়াছিল। ভবানীপুরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমনে সমাজগৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। সঙ্গীত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক (যাঁহার সহিত শিতিকণ্ঠ বাবুর উলুবেড়িয়া অবস্থান কালীন যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল) 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্'এর ব্যাখ্যার সহিত পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করেন। পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে গীতা হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাঁহার বক্তব্য বেশ ফুটাইয়া তোলেন, পরবর্ত্তী বক্তা ছিলেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত হরকালী সেন, রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এবং আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

পরে সঙ্গীত হইয়া সভার কার্য্য শেষ হয়। শিতিকণ্ঠ বাবু জীবদ্দশায় যে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছিলেন, উক্ত সভার লোকাধিক্যই তাহার নিদর্শন। শ্রদ্ধেয় শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দ্বয় উক্ত সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে দুইখানি পত্র চিন্তামণি বাবুকে লিখেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের পত্র—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের স্মৃতিসভায় আপনাদের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া আপ্যায়িত হইলাম। শারীরিক অসামর্থ্যবশতঃ উক্ত সভায় যোগ দিতে পারিব না, কিন্তু পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতানিবেদন এবং তাঁহার কল্যাণকামনায় অন্তরের সহিত আপনাদের সঙ্গে যোগ দিব। তাঁহার আহ্বানে অনেকবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিয়াছি ও উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি এবং তদুপলক্ষে তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছি। এখন শরীর দুর্ব্বল ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে বিনা সাহায্যে অধিক দূর যাইতে পারি না, বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর। আপনাদিগকে এই পরম বন্ধুবিয়োগে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র বাবুর পত্র—

১১. ৩. ৩০

সবিনয় নিবেদন—

আমার কন্যার বিবাহের কারণে এই বৃদ্ধ বয়সে ছুটাছুটি করিয়া বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি, তজ্জন্য আমি শিতিকণ্ঠ বাবুর স্মৃতিসভায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। আজ ৩০ বৎসরের উর্দ্ধকাল হইল আমি তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে পরিচিত হইয়াছিলাম। আমার ২৬ বৎসর বয়সে মহর্ষি যখন আমাকে সমাজের ভার দিয়াছিলেন, সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্র হিসাবে শিতিকণ্ঠ বাবু ও শীতল বাবুর নাম দেখি। সেই অবধি তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হইবার ইচ্ছা বরাবর মনে জাগ্রত ছিল। অবশেষে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া তাঁর সঙ্গে পরিচিত হইয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। তাঁর মত ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ কর্ণধার আমি অল্পই দেখিয়াছি। বেশী কি বলিব—মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে যখন ভবানীপুর সমাজে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তখন পর্য্যন্ত তিনি প্রচুর উৎসাহ সহকারে একটী 'নিবেদন' পাঠাইয়াছিলেন। বড় বড় লোকের বড় বড় কাজের কথা আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু যাঁরা লোকদৃষ্টির অন্তরালে থেকে মহৎ কার্য্যের সহায়তা করেন, তাঁদের বিষয় আমরা ভাববার অবসর পাই না। তাঁর কোন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা না করলে বড়ই দুঃখের বিষয় হবে। আমার মনে এমন একটী ধনভাণ্ডার খোলা উচিৎ, যার সুদ থেকে এই ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ—তাঁর প্রাণপ্রিয় ব্রাহ্ম-সমাজকে রক্ষা করা যায়। ভগবান আপনাদের মঙ্গল ইচ্ছা ও শুভ উদ্দেশ্যকে সফল করুন। ইতি

অভিনন্দন—গত ৬ই ফাল্গুন সোমবার রাত্রি ৯ম ঘটিকায় মিষ্টার আলফ্রেড মিরোশিট্রুয়েবের অভিনন্দন জন্য সঙ্গীত-ভারতী শ্রীবাণীদেবীর Mus. Doc. Ind. নেতৃত্বে ১৩৪নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে Y. W, C. A.-এর দ্বিতলস্থ প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে গীতবাদ্যের একটী সুন্দর আয়োজন হইয়াছিল। সঙ্গীতনায়ক সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কলিকাতানগরীর বহু খ্যাতনামা গায়ক ও বাদকগণ যোগদান পূর্ব্বক অনুষ্ঠানটীকে পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। অধিক রাত্রিতেও জনসমাগম আশাতীত অধিক হইয়াছিল। আমরা আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া বাণী দেবীর এই কৃতকার্য্যতায় গৌরবান্বিত।

মহোৎসবে শান্তিবাচন—ব্রাহ্মসমাজের শাখা-ত্রয়ের নির্দ্ধারণ অনুসারে গত ২৯শে মাঘ বুধবার সায়ংকালে মাঘের শেষ-সন্ধ্যায় 'উৎসবে শান্তিবাচনার্থ' ভারতীয় সকল একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ও প্রার্থনাসমাজে বিশেষ উপাসনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ঐদিন আদি-ব্রাহ্মসমাজে বেদীগ্রহণ করিয়াছিলেন পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকে সঙ্গে লইয়া প্রবীণ আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। পণ্ডিত সুরেশচন্দ্রের উদ্বোধনান্তে বেদীর নিম্নে দাঁড়াইয়া শ্রীমান হেমেন্দ্র বিজয় সেন এম-এ মহাশয় তাঁহার "মাঘোৎসবের শিক্ষা" বিষয়ে একটী সুন্দর নিবন্ধ পাঠ করেন। উহা আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। সর্ব্বশেষে আচার্য্য মহাশয় মাঘোৎসবের শিক্ষা বিষয়ে সংক্ষেপে একটী উপদেশ প্রদান করেন।

শোকসংবাদ।

৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—রাজসাহীর স্বনামধন্য পুরুষ একাধারে সাহিত্যিক ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও বাগ্মী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি-এল, সি. আই. ই মহোদয় গত ২৭শে মাঘ সোমবার প্রভাতে তাঁহার রাজসাহীর বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি বহুদিন যাবৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী থাকিয়া অবশেষে আমাশয়-রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহার বয়ঃক্রম প্রায় সত্তর হইয়াছিল। ইহাঁর পিতা শ্রদ্ধেয় মথুরানাথ মৈত্রেয় মহাশয় তত্ত্ববোধিনীর অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের দ্বারা প্রভাবিত

হইতে পুত্রের 'অক্ষয়কুমার' নামকরণ করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার বাল্য সাহিত্যিক। ইনি প্রথম জীবনে কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিলেও পরে ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন এবং অচিরকাল মধ্যে দেশের [illegible] জীবনের সত্যচিত্র প্রচার করিয়া সাধারণের বিস্ময় ও স্বদেশবাসিগণের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণে সমর্থ হন। নবাব সিরাজের চরিত্র ও অন্ধকূপের কলঙ্ক-কাহিনী অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া গিয়াছে। এইরূপ মানসিক পরাধীনতা হইতে মুক্তিদান করিয়া অক্ষয়কুমার আমাদের জাতীয় জীবন-গঠনে যে কতখানি সহায়তা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 'সিরাজদ্দৌলা' 'মীরকাশিম' 'ফিরিঙ্গি বণিক' 'গৌড়লেখমালা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ইহাঁর অবিনশ্বর কীর্ত্তি। ১৩০২ সাল হইতে সর্ব্বপ্রথম 'সাধনা'য় ও পরে 'ভারতী'তে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে সিরাজদ্দৌলা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা একবার অক্ষয়কুমারের [illegible] বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মথুরানাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহাদের রাজসাহীর বাসভবনে গমন করিয়াছিলাম। অক্ষয়কুমার তখন যুবক; তাঁহার সৌহৃদ্যে, সেবায় ও সাহচর্য্যে আমরা ধন্য হইয়াছিলাম। দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়ের সহযোগিতায় রাজসাহীতে "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" প্রতিষ্ঠা ইহাঁর জীবনের অন্যতর মহনীয় কীর্ত্তি। ইহাঁর মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একজন যথার্থ জ্ঞানী ও গুণীকে হারাইয়া সত্যই নিঃস্ব হইল। ইহাঁর শোকার্ত্ত পুত্র-পরিজন ও শিষ্য সেবকগণকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাঁর লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

পাতিয়ালারাজ্যের শিল্প বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর

প্যারিসের কেমিষ্ট মিঃ জে, চক্রবর্ত্তী,

বি-এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন) এম, সি, এস (প্যারিস) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত

ফুলেলিয়া

"ক্যান্থারো ক্যাষ্টর অয়েল"

কেশতৈল ও সুগন্ধ।

ক্যান্থারো ক্যাষ্টর অয়েল—ভৃঙ্গরাজ ও ক্যান্থারাইডিন যুক্ত কেশ টনিক ও কেশ তৈল। সকল "কেশরোগের" মহৌষধ।

ফুলেলিয়া অয়েল—মহাসুগন্ধ সৌখিন কেশতৈল।

ফুলেলিয়া নারিকেল তেল—বিশুদ্ধ ভেজালহীন, সুরভিত, সুলভ, নিত্যব্যবহার্য্য।

ফুলেলিয়া তিল তেল—নিজেদের তত্ত্বাবধানে কাঁচা কৃষ্ণ তিল্ল হইতে প্রস্তুত হয় মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে অদ্বিতীয়। মনোহর গন্ধ।

"সুইট হার্ট" (Sweet Heart)—বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত মনোহর শিশিতে সুরাসার-বর্জ্জিত কুসুমনির্য্যাস। এক ফোটা রুমালে দিলে গন্ধ কয়েক দিন থাকে।

ফুলেলিয়া অটো—"রোজ" সুন্দর পকেট ঘড়ির আকারের শিশিতে ঘনীভূত গোলাপ গন্ধ।

ফুলেলিয়া অটো—"জেসমিন" মনোহর গোল শিশিতে দ্রবীভূত-যুঁই ফুল। সুরাসার বর্জ্জিত। গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী।

ফুলেলিয়া পারফিউমারী কোম্পানী,

(শোরুম ও অফিস) ১৭।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, (কলেজস্কোয়ার দক্ষিণ)

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ।

৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর যাবত আবিষ্কৃত হইয়া শত-সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনা মূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা

এস, সি, রায় এণ্ড কোং
১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমি অতি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে W. C. Ray আবিষ্কৃত পাগলের মহৌষধ আমার এক পিতৃব্য ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। তাঁহার উন্মাদরোগ প্রবল হইলেই তিনি উহা ব্যবহার করিতেন এবং তাহা অগ্নিতে জলের ন্যায় কার্য্য করিত। আমি ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া নির্ভয়ে প্রত্যেক উন্মাদরোগীর জন্য ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিতে পারি। ইতি—

৬।১বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন
(জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।)
১০, ১২, ২৭

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Reg. No. C 462.

সংখ্যা
১০৪০

১৮৫১ শক
চৈত্র

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

অর্থাদি সমাজের অধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হব।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ পাবনায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০৪০ — ১৮৫১ শক চৈত্র

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯৩০। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৯। চরণস্পর্শ চাই।

তোমাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত দেখিতেছি। জগতের প্রতি অণুপরমাণুতে তোমার পরিচয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। যে দিকে চাই, সেই দিকেই তোমার মঙ্গল হস্ত। সংসারের বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে আমার প্রাণ যখন হাঁপাইয়া উঠে, তখন নির্জ্জনে তোমার চরণে একটুখানি আশ্রয় পাইবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তখন তুমিই আমার মাথার শিয়রে বসিয়া তোমার স্নেহ-হস্ত আমার সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া দাও। আমার সমস্ত দেহ-মন জুড়াইয়া যায়; প্রাণের জ্বালা-যন্ত্রণা, অন্তরের আগুন মুহূর্ত্তের মধ্যে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়—আর আমি তোমার কোলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়ি। আমার প্রাণের উপর তোমার চরণের স্পর্শ দাও—আমার দেহ মন প্রাণ সমস্ত ভরিয়া স্পর্শ দাও। আমার সকল শোক, সকল কষ্ট তোমার ঐ চরণস্পর্শে বিদূরিত হোক। শৈশবে তোমারই স্তন্যে লালিতপালিত হইয়া যে প্রকার দেহে বলিষ্ঠ ও মনে দ্রঢ়িষ্ঠ হইয়াছিলাম, জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যের কালে আর একবার আমার দেহে সেইপ্রকার বল ও মনে সেইপ্রকার তেজ ঢালিয়া দাও। আর একবার তোমার নামে জয়ধ্বনি করিয়া বহির্জ্জগতে বাহির হইবার শক্তি-সামর্থ্য দাও।

১০। ধ্রুবতারা।

জননী! তুমি তো জান, তুমিই আমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। ক্ষণেকের জন্যও তোমাকে না দেখিলে জীবনটা দুর্ব্বিসহ মনে হয়। তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ। আমার সমস্ত প্রাণ ভরিয়া তুমিই অবস্থিতি কর। তোমার এতটুকু বিরহও আমার অসহ্য। আমার জীবনে সঙ্গীত যাহা কিছু ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, সে সমস্তই তোমাকেই কেন্দ্র করিয়া ধ্বনিত হয়। তোমাকে ছাড়িয়া আমার জীবনে অন্য কোনও সঙ্গীতই উঠিতে চাহে না। কত স্থানে কত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—একমাত্র আশা, প্রাণের মধ্যে তোমাকে লাভ করিব। এখন দেখিতেছি, একমাত্র অন্তরের নিভৃত নির্জ্জন কুটীরেই তুমি নিত্য জাগিয়া আছ। তাই সেই কুটীরেই ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার চরণখানি বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া সমস্ত জ্বালা সকল যন্ত্রণা জুড়াইতে চাহি। সংসারের ছোটখাটো বিষয় লইয়া দাপাদাপি মাতামাতি করা আর ভাল লাগে না—আমার সহ্য হয় না। সংসারের একএকটী বিষয় কানে আসে, আর আমার মনপ্রাণ বজ্রাহতের ন্যায় কাঁপিয়া উঠে। না—মা—আমাকে আর দূরে সরাইয়া রাখিও না—তোমার চরণতলে একটুখানি বসিবার স্থান দিও।

১১। সংসার-শ্মশানে।

জননী আমার! একটীবার আমায় দেখা দাও। এ কোন্ মরুভূমির মাঝে আসিয়া পড়িয়াছি! কে আমাকে এ কোন্ শ্মশানের মাঝে আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল! যে দিকে চক্ষু ফিরাই, সেই দিকেই মৃত্যু!

কোথায় কে মরিয়া পড়িয়া রহিল, যে সমস্ত পথিক এদিক দিয়া যাইতেছে, তাহাদের কেহই সেদিকে কোনও লক্ষ্যই করে না। পথের ধারে বসিয়া যে মরিতেছে, কেবল তাহারই মাথা কোলে লইয়া তাহার মাতা শিয়রে বসিয়া—সমস্ত শোক যেন নিংড়াইয়া তাহার মুখ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। এই আছে—এই নাই; এমন সংসারে কে তুমি আমাকে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছ? আমি কি ভূষুণ্ডি কাকের মত এই শ্মশানে বসিয়া দিন নাই রাত নাই এই মৃত্যুরই খেলা দেখিব আর হাহাকার শুনিব? জননী! এই শ্মশানে মৃত্যুর খেলা দেখিতে আমার আর ভাল লাগে না। জরা নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই, এমন যদি কোন স্থান থাকে, তবে সেই স্থানেই আমাকে লইয়া যাও। যে মরিল, কৈ—সংসারের টাকাকড়ি ঘরবাড়ী এসমস্তের কোন কিছুই তো সঙ্গে গেল না? তবে এসমস্ত লইয়া দুদিনের জন্য বৃথা খেলা খেলিয়াই বা কি করিব? যে ভবের খেলা খেলিতে চায়, সে খেলুক। তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া গেলে ছেলেরাও তো কাঁদে; তেমনি এসমস্ত লইয়া যাহারা খেলা করিবে, দুদিন বাদে তাহাদিগকেও সেই রকম কাঁদিতে হইবে। আমি যথেষ্ট খেলা করিয়াছি, যথেষ্ট কাঁদিয়াওছি। আর না—এখন তোমার চরণতলে বসিয়া, তোমার কোলে মুখ রাখিয়া মাথা রাখিয়া নিত্য শান্তি পাইতে চাহি। তুমি আমার মাথায় হাতটী রাখ, আর আমি তোমার চরণখানি বক্ষে জড়াইয়া ধরি।

১২। দর্প চূর্ণ।

জননী! শুনিতে পাই, আমি নাকি দেখিতে বড় সুন্দর ছিলাম। একথা আমাকে এখন কেহ বলিলে মনে হয় আমাকে উপহাস করিতেছে। মনে হয়—হয়তো বা আমি সুন্দরই ছিলাম। তুমি যে পরম সুন্দর—তোমার সৌন্দর্য্যের যে তুলনা নাই। তোমার সন্তান যখন আমি, তখন আমি সুন্দর না হইবই বা কেন? কিন্তু আমার তাহাতে গর্ব্ব করিবার কিছুই ছিল না—আমার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য ছিল, সে সমস্তই তো তোমারই দান। তবু মনে হয়, আমার অজ্ঞানত আমার মনে গর্ব্ব আসিয়াছিল। এখন বুঝিতেছি—আমার এই সুন্দর দেহ—ইহা তো একখানি তাসের ঘর মাত্র। কখন্ কোথা হইতে মরণবায়ুর একটী ফুৎকার লাগিবে, আর সেই তাসের ঘরখানি পড়িয়া গিয়া চুরমার হইবে। এখানকার যাহা কিছু, এসমস্তই তো মরীচিকা—মায়ার খেলা; আসিয়াছি, কাজ করিতেই হইবে—না করিয়া উপায় নাই, এইটুকু বুঝিয়াছি। কিন্তু তাহার পর? কোথায় যাব, তাহারই স্থিরতা কোথায়? তবু—এখানে তোমার কথা শুনিলেই প্রাণে এত আনন্দ হয় কেন? তখন মনে হয়—মায়া-মরীচিকার কুয়াসা বুঝি কাটিয়া গেল,—আর, সত্যের বিমল আলোক প্রাণের ভিতর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মা! আমার দম্ভ অভিমান সমস্তই চূর্ণ করিয়া দাও; তোমার চরণে আমার মাথা নত করিয়া দাও। এখন আমার সে সৌন্দর্য্যও নাই, সে শক্তিও নাই। এখন তোমার করুণাধারায় আমার অন্তরকে তুমি ধুইয়া দাও। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলুক। আমি তোমার মুখের বাণী প্রতীক্ষা করিতেছি—তোমার চক্ষে আমি সুন্দর হইয়াছি কি না।

১৩। জীর্ণতরী।

আমাকে তুমি কি দিয়াছিলে, আর জীবনের এই সন্ধ্যা-কালে তোমার চরণে আমি কি আনিয়াছিলাম! আমার অন্তর ভেদ করিয়া কেবলই তপ্ত অশ্রুর অজস্র ধারা অবিরল ধারে ঝরিতেছে! তোমার চরণতলে বসিবার আমি উপযুক্ত নহি। আমাকে অনুতপ্ত হৃদয়ে তোমা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দাও। অনুতাপের অশ্রুবারিতে আমার সকল পাপ, সকল অপরাধ ঝরিয়া যাইতে দাও। তোমার নিকট যাতায়াতের জন্য কি সুন্দর দেহতরীই না দিয়াছিলে, আর তাহাতে মনের কি সুন্দর পালই না লাগাইয়া দিয়াছিলে। কিন্তু আজ তোমার চরণে সেই তরীখানি শতচ্ছিদ্র করিয়া আনিয়াছি—চারিদিক হইতে তাহার ভিতর কেবল লবণাক্ত জল উঠিতেছে। পালখানিও ছিন্ন চীরখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে এই হারা ছেলের সন্ধানে তোমার কাতর আহ্বান শুনিয়া কোনক্রমে এই জীর্ণ তরীখানি লইয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছি। সমস্ত পথ ভয়ে ত্রাসে লজ্জায় কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি। তোমার শত-সহস্র ছেলে-মেয়ে আজ তোমার ঘরে আসিয়া কত-না আনন্দে বিচরণ করিতেছে। আমার আনন্দ আমি পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি। আবার যদি তুমি প্রফুল্ল মুখে তোমার মঙ্গল-চরণ আমায় বক্ষে ধারণ করিতে দাও, তখন আমি আবার আশার আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তোমার চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইব।

১৪। শেষ দিনে।

জীবনের কাজ যখন সারা হবে, এলোকের সঙ্গে যখন আমার কোনও সম্বন্ধই থাকিবে না, তখন তোমার ঐ পবিত্র চরণধূলি আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিও। ঐ চরণধূলিই আমার ভবসাগর পার হইবার একমাত্র তরী হইবে। আমার সকল গর্ব্ব এখন খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। সকল দর্প এখন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন পলকে পলকে দেখিতেছি, মৃত্যুর নিকট এসকল গর্ব্ব দর্প অভিমান কিছুই দাঁড়ায় না—

এত কিছু, মৃত্যু নিমিষে সকলই হরণ করে। এখন মনে করিলে হাসি পায়, লজ্জায় ও ঘৃণায় অধোবদন হই যে, এক সময়ে আমি নিজেকে জ্ঞানে বুদ্ধিতে তোমার সমকক্ষ মনে করিতাম! সেই গর্ব্বে স্ফীত হইয়া তোমার আদেশের বিরুদ্ধে গিয়া নিজের যাহা ক্ষতি করিবার তাহা তো করিয়াছি। কিন্তু সব চেয়ে ব্যথা পাই ভাবিয়া—মনের দুঃখে পাথরের আঘাতে বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়—যে, আমার অন্যায় আচরণে তোমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছে। আমি এখন সংসারের পারে দাঁড়াইয়া আমার কৃত কর্ম্ম স্মরণ করিতেছি, আর অনুতাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছি! জননী! আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর—আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার মহাপ্রস্থানে আত্মীয়স্বজনেরা শোকপ্রকাশ করুন বা নাই করুন, আমার তাহাতে বিচলিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু তোমার চরণধূলি না পাইলে, আমি ইহলোকেই থাকি বা পরলোকেই প্রস্থান করি—সঙ্গে সঙ্গেই তো আমার মৃত্যু। সেই মৃত্যু, সেই বিনাশ হইতে তোমার চরণধূলি আমাকে রক্ষা করুক।

১৫। শেষ মুহূর্ত্তে।

জননী! আমার সময় তো শেষ হইয়া আসিয়াছে—মহাপ্রস্থানের সময় তো আসিয়া পড়িয়াছে। আমার বীণায় যে গান আপনাপনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, তাহার সুর ইহলোকের সুর নহে—উহা পরলোকের সুর। তোমার সুদূর স্বর্ণপুর হইতে সেই সুরের অস্ফুটধ্বনি মৃদুমধুর স্বরে নামিয়া আসিতেছে। সেই গানের অস্ফুটধ্বনি শুনিয়া তোমার সেই স্বর্ণপুরে যাইবার জন্য আমার প্রাণ তো পাগল হইয়া উঠিয়াছে। আমার সুখ-দুঃখ শোক-তাপ সকলই তো ভুলিয়াছি। আমার এখন একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান—আমি কেমন করিয়া তোমার ঐ স্বর্ণপুরে যাইতে পারি। তোমার লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে আনন্দে হৃদয় পূর্ণ করিয়া শতবিধ বর্ণে রঞ্জিত কত সুন্দর নৌকায় চড়িয়া সারিবন্দী চলিয়াছে—মনে হইতেছে, আনন্দের হাসিগুলি লক্ষ লক্ষ বেলফুলের আকারে তোমার চরণে নিবেদিত হইতে চলিয়াছে। আমার হৃদয়খানি উহাদেরই পশ্চাতে চলিয়া কোন প্রকারে তোমার চরণে পৌঁছিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হইতেছে—আমার প্রাণখানি ছুরিকা দ্বারা উৎকীর্ণ করিয়া অথবা পাষাণের আঘাতে বিচূর্ণ করিয়া সেই অবস্থাতেই তোমার চরণে নিবেদন করিয়া আসি—যদি তাহা দেখিয়াও তোমার একটুখানি দয়া হয় আর স্নেহহস্তে তাহা তুলিয়া লও। আমি এতদিন কি করিয়া যে তোমা হইতে দূরে ছিলাম, তাহা জানি না। এখন দেখিতেছি, আমাদের উভয়ের মাঝে কি এক মহাসাগরের ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে। সেই মহাসাগরের এপারে আমার আঁধার কুটিরখানিতে আমি বসিয়া আছি। তোমার নিকটে যাইবার জন্য আমার প্রাণ পাগল, কিন্তু আমার জীর্ণ তরী লইয়া যাইতে সাহস করিতেছি না। সকলের পশ্চাতে একমাত্র আমিই পড়িয়া আছি। অপেক্ষা করিয়া আছি—কবে তুমি আমাকে এই মহাসাগর পার করিয়া দিবে।

১৬। কোলে লও।

মা আমার! তোমার কোলে উঠিবার জন্য আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। আমি তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তোমার অন্য ছেলে-মেয়েরা তোমার কোলে উঠিবার জন্য বিশেষ কিছু লালসা দেখাইতেছে না, অথচ তাহাদিগকে তুমি কোলে তুলিয়া কত না আদর-যত্ন করিতেছ; আর আমি তোমার একরত্তি আদর পাইবার অপেক্ষায় পাগল হইয়া আছি, অথচ তুমি আমাকে কোলে লইয়া আদরের পরিবর্ত্তে দুঃখকষ্টেরই আঘাতের পর আঘাত দিতেছ। তোমার জন্য আমি সংসারের সুখশান্তি সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, তোমারই চরণে বসিয়া দিনরাত্রি কাটাইবার অবসর পাইব। জননী! তোমার চরণ ধরিয়া মিনতি করি, আমাকে একটীবার কোলে তুলিয়া লও। সংসারের কাঁটার আঘাতে জ্বলিয়া পুড়িয়া আমাকে মরিতে দিও না।

সঙ্ঘের প্রসার।

শ্রমণ ও শ্রামণের।*

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য)

"যাও ভিক্ষুগণ, দিকে দিকে পরিভ্রমণ কর—বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় এই মহদ্ধর্ম্মের প্রচারব্রত গ্রহণ কর।' শাস্তার † এই আদেশবাণী সানন্দে শিরোধার্য্য করিয়া নবদীক্ষিত ষষ্টিসংখ্যক ভিক্ষু নবানুরাগের দীপ্তপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত উল্কারাশির ন্যায় দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। বুদ্ধ স্বয়ং বহু ধর্ম্মান্বেষীর সাধনক্ষেত্র উরুবেলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

উরুবেলার প্রসিদ্ধ জটিল (তাপস) কশ্যপ ও তাঁহার

* শ্রমণ—ভিক্ষু। শ্রামণের—ভিক্ষুত্ব-লাভেচ্ছু শিক্ষানবীশ। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে যেমন ব্রহ্মচর্য্যদীক্ষা, ভিক্ষুত্বের পূর্ব্বে তেমনি শ্রমণের প্রব্রজ্যা দীক্ষা আবশ্যক।

† বুদ্ধের একটি উপাধি। অর্থ 'উপদেষ্টা' (শাস্ ধাতু)।

ভ্রাতৃত্রয় সহস্রাধিক শিষ্য লইয়া একটি অগ্নিপূজক-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ কশ্যপের গৃহে অতিথি হইলেন। শুদ্ধবিচারে কশ্যপকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া তিনি বহু বিভূতি সাহায্যে তাঁহার মস্তক অবনত করিলেন। কশ্যপভ্রাতৃত্রয় শিষ্যবর্গসহ বুদ্ধের শরণ লইলেন। এই অগ্নিপূজক সম্প্রদায়কে স্বমতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে তিনি অগ্নির একটি অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন;—তিনি বলিলেন—

"হে ভিক্ষুগণ, পৃথিবীতে যাবতীয় পদার্থই অবিরাম জ্বলিতেছে। আমাদের এই যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি ইহারাও নিরন্তর প্রদাহিত হইতেছে। কোন্ অগ্নিতে? রাগ, দ্বেষ, মোহ; জন্ম, জরা, মৃত্যু; শোক, দুঃখ, তাপ, নৈরাশ্য—এইগুলিই অগ্নি। ....এই সত্যদৃষ্টি লাভ করিয়া, হে ভিক্ষুগণ, প্রকৃত সত্যান্বেষী ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপর বীতরাগ হয়েন। এইরূপে বাসনা-বিমুক্ত হইয়া তিনি মুক্তিলাভ করেন। পবিত্রাচারী তিনি যথোপযুক্ত জীবনযাপনের তৃপ্তি লইয়া চিরকালের জন্য জন্মমৃত্যুর পারে গমন করেন।"*

এই গভীর তত্ত্ব শুনিতে শুনিতে নবীন ভিক্ষুগণ অর্হত্ব লাভ করিলেন। অনন্তর বুদ্ধ বিম্বিসার সমীপে কৃত-প্রতিজ্ঞার পূরণার্থে সদলবলে রাজগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজগৃহে অশ্বজিৎও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

এই সময়ে রাজগৃহে সঞ্জয় নামে এক প্রখ্যাতনামা পরিব্রাজক বাস করিতেন। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা পঞ্চশতাধিক ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ণ নামীয় ভ্রাতৃদ্বয়ই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অশ্বজিৎ একদিন ভিক্ষাসংগ্রহে বাহির হইয়াছেন। শারীপুত্র পথে তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার শান্ত-মধুর মুখ দেখিয়া শারীপুত্র এককালে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। অশ্বজিতের কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবে মনে করিয়া তিনি নীরবে দূরে দূরে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অশ্বজিৎ যখন ভিক্ষাকার্য্য শেষ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সেই সময় তিনি তাঁহার সমীপস্থ হইয়া তদীয় আচার্য্য এবং উঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। অশ্বজিৎ জিজ্ঞাসুর উজ্জ্বল মুখের প্রতি চাহিয়া সবিনয়ে বলিলেন, "ভাই, আমি শিক্ষার্থীমাত্র—অল্পদিন হইল শাক্যমুনি তথাগত-প্রচারিত মহদ্ধর্ম্মের শরণ লইয়াছি। তাঁহার শিক্ষা বিশদভাবে তোমায় বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে মোটামুটি সারকথা—

> যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
> হেতুং তেসাং তথাগতো।
> তেসাঞ্চ যো নিরোধো
> এবংবাদী মহাসমনো॥

কারণ হইতে যে কার্য্যসমুদয় উৎপন্ন হয়, তথাগত সেই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং তত্ত্বাবতের নিরাকরণ কিরূপে সম্ভব মহাশ্রমণ তাহাই প্রচার করেন।

ক্ষেত্র উর্ব্বর হইলে অধিক কর্ষণের প্রয়োজন হয় না। শ্রদ্ধাবান মেধাবী শ্রোতার নিকট অধিক বাক্যব্যয় আবশ্যক করে না। মুমুক্ষু শ্রোতার এককথাতেই সত্যধারণা হইল। অশ্বজিতের নিকট সত্যের সহজ সন্ধান পাইয়া সত্যসন্ধ শারীপুত্রের বদনমণ্ডল আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার ভ্রাতা মৌদ্‌গল্যায়নকে এই সংবাদ দিতে চলিলেন। তাঁহার আনন্দ-দীপ্ত বদনমণ্ডল দেখিয়া মৌদ্‌গল্যায়ণেরা চমৎকৃত হইয়া গেলেন। শারীপুত্র তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। উভয়ে বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করা স্থির করিলেন।

তাঁহারা গুরু সঞ্জয়কেও সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু সম্মানের স্বপ্নাবিষ্ট সঞ্জয় দিবালোককে অভিনন্দিত করিতে পারিলেন না। লোকচক্ষে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন হইবার নিদারুণ আশঙ্কা তাঁহার শ্রেয়োলাভের অন্তরায় হইল—স্বপ্নাবেশের জড়তা তিনি অতিক্রম করিতে পারিলেন না। সঞ্জয়ের বহু শিষ্য প্রাজ্ঞ শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ণের সঙ্গী হইলেন।

বুদ্ধ তখন উপদেশ দানে রত। দূরে শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নকে দেখিবামাত্রই তিনি তাঁহাদিগকে অন্তরঙ্গ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—"ঐ দলের অগ্রভাগে যে দুইজন আসিতেছে, তাহারা আমার দুইজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য হইবে।" বুদ্ধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। নবাগত দল বিমুগ্ধ হইয়া এই উপদেশরত মহাশ্রমণের দিব্যামৃতবর্ষী মধুর বাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাপস সঞ্জয়ের আশ্রয়ে প্রত্যাগমন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। তাঁহারা সকলে বুদ্ধকে গুরুপদে বরণ করিয়া সঙ্ঘভুক্ত হইলেন। মৌদ্‌গল্যায়ণ সপ্তাহকাল মধ্যে এবং শারীপুত্র দুই সপ্তাহে অর্হত্ব লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন। শিষ্যবর্গ মধ্যে বুদ্ধ তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠাসন দান করিলেন। ইহাতে পুরাতন শিষ্যগণ ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু নবীন শিষ্যদ্বয়ের অনন্যসাধারণ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া বুদ্ধ সকলকে শান্ত করিলেন।

মহোৎসাহে প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল। দিন দিন সংঘের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সারা রাজগৃহ-

* আদিত্যপর্য্যায়-সূত্র। এস্থলে সারসংক্ষেপ দেওয়া হইল।

ব্যাপী একটা তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইল। কিশোরপ্রাণ সর্ব্বদাই সতেজ ও সজীব। নবীনতার প্রেরণার জন্য তাহার দ্বার চির উন্মুক্ত। কখন কার অন্তর-নিধির সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, ভাবিয়া সংসারীরা আকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এই বাধা তাবের সেই প্রবল স্রোতকে অবরুদ্ধ করিতে পারিল না। ভাববন্যা মগধসীমা অতিক্রম করিয়া দুকূল ভাসাইয়া উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিল। দলে দলে শুদ্ধোদনের দূতগণ তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়া কেবল ভিক্ষুসংখ্যা বৃদ্ধিই করিলেন। অনুগত কালোদায়ী শাক্যমুনিকে শাক্যরাজ্যে যাইতে সম্মত করিয়া কপিলবস্তুতে অবশ্যম্ভাবী গৈরিক উপপ্লাবনের নিমিত্তমাত্রই হইলেন।

কপিলবস্তুর অনেকে 'একূল ওকূল দুকূল রেখে' 'দুধের বাটী' খাইবার ব্যবস্থা করিলেন; আবার যৌবন-বীর্য্যবান অনেকের পক্ষে দুকূল রক্ষা অসম্ভব হইল। প্রাচীনগণের নিবিড় রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করিয়া বুদ্ধের সেই মহাবাণী কপিলবস্তুর অন্তঃপুর পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল।

শাক্যরাজ্যে অবস্থানের আজ দ্বিতীয় দিন। রাজা শুদ্ধোদন ও রাজ্ঞী মহাপ্রজাপতি গৌতমী কুমার নন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেক ও অনিন্দ্যসুন্দরী জনপদ-কল্যাণীর সহিত তাহার উদ্বাহব্যাপারে একান্ত ব্যস্ত। আপন ভ্রাতা সংসারাবদ্ধ হইয়া জরামরণের করগত থাকিবে, বুদ্ধ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নন্দের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নির্ব্বাণ-মুক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। আরব্ধ অভিষেকোৎসবাদির নিন্দা করিয়া বুদ্ধ কহিলেন, "বাসনার নাশ, ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষা, চতুরার্য্য-সত্যের জ্ঞান, নির্ব্বাণের ধারণা—এই সকলের অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ উৎসব"। তিনি আপনার ভিক্ষাপাত্র নন্দের হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে লইয়া স্বীয় আবাস-স্থান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নন্দের ইচ্ছা হইল ভিক্ষাপাত্র প্রত্যর্পণ করেন, কিন্তু সহসা তাহা পারিলেন না। তিনি বুদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ন্যগ্রোধ-বনে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধের দীর্ঘসময়ব্যাপী উপদেশের ফলে নন্দ প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। শারীপুত্র তাঁহাদের দীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু জনপদ-কল্যাণীর অপরূপ রূপলাবণ্য অন্তরে জাগিয়া জাগিয়া নন্দকে অস্থির করিয়া তুলিল। বিষণ্ণ মনে তিনি কল্যাণীর নিকট ফিরিয়া যাইবার উপায় চিন্তা করিতেন। সকল উপদেশ-বচন ব্যর্থ হইল দেখিয়া বুদ্ধ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেন। ঋদ্ধিবলে নন্দের সম্মুখে এক অপ্সরা-মূর্ত্তি উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে একাগ্রমনে নির্দ্দিষ্ট পন্থানুরূপ আচরণ করিলে তাহার এই অপ্সরালাভ ঘটিবে। কল্যাণী অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ পত্নীলাভের আশায় নন্দ সোৎসাহে ধর্ম্মাচরণ আরম্ভ করিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত আসক্তি অতিক্রম করিয়া আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

বুদ্ধের কপিলবস্তুতে অবস্থিতির সপ্তম দিবসে হঠাৎ যশোধরার মনে এক বাসনা জাগিল। তিনি সপ্তম-বর্ষীয় পুত্র রাহুলকে শ্রেষ্ঠ বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া বলিলেন—"যা, তোর পিতার নিকট পৈত্রিক সম্পত্তি প্রার্থনা কর্"। বালক ভাবিল পিতামহ শুদ্ধোদনের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে, কারণ অন্য কোন পিতার অস্তিত্ব সে অবগত ছিল না। যশোধরা পুত্রকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া বাতায়ন-পথে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"ঐ যে কান্তিমান ভিক্ষু, উনিই তোর পিতা—উঁহারি নিকটে প্রার্থনা কর্‌গে"।

বুদ্ধ তখন আহার করিতেছেন। রাহুল তাঁহার নিকট গমন করিয়া ডাকিল 'পিতা'। বুদ্ধ একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া পুনরায় আহারে মনঃসংযোগ করিলেন। আহারকাল পর্য্যন্ত রাহুল মৌনভাবে অপেক্ষা করিল। তদনন্তর সে বুদ্ধের অনুসরণ করিয়া বলিল—"পিতা, আমার প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তি দিন"। সস্নেহ দৃষ্টিতে বুদ্ধ এই নির্ভীক বালকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর শারীপুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"ইহাকে শ্রামণের-দীক্ষা দান কর।" রাহুল সোল্লাসে সংঘবদ্ধ হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ শারীপুত্রের অধীনে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদশ্রবণে শুদ্ধোদন একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পুত্র নন্দ ও পৌত্র রাহুলের শোকে অধীর হইয়া তিনি বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"আর কখনও কোন বালককে পিতামাতা বা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত সংঘবদ্ধ করা হইবে না"।

অতঃপর বুদ্ধ কপিলবস্তু ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।* পথে তিনি মল্লরাজ্যে 'অনুপিয়' নামক স্থানে কতিপয় দিবস অবস্থান করিলেন।

আনন্দ, অনিরুদ্ধ, মহানাম, ভদ্রিক, ভৃগু, দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্যকুমারগণের বুদ্ধের উপদেশশ্রবণে ইতি-পূর্ব্বেই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এতদিন তাঁহারা সংসারবন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ পিতামাতা ও স্বজনবর্গের সমক্ষে ভিক্ষুত্ব-গ্রহণের করুণ দৃশ্য তাঁহাদের কল্পনায় আঘাত

* সিংহলী বৌদ্ধগণ দাবী করেন যে, এইসময়ে বুদ্ধ একবার সিংহলে গিয়াছিলেন। See "Manual of Buddhism" —Spence Hardy pp. 212 ff.

করিতেছিল। কিন্তু বৈরাগ্য কঠোরতার দাবী লইয়াই আসিয়া উপস্থিত হয়। দাবী পুরণ করিতে না পারিলে, অন্ততঃ সহৃদয়তা দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়,—বামহস্তে অশ্রু মুছিয়া দক্ষিণহস্ত তাহাকে সমর্পণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

কুমারগণ বুদ্ধের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। রাজনাপিত উপালীকে পথপ্রদর্শক-রূপে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা গোপনে অনুপিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমাস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া সকলে আপনাদের বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি উপালীকে উপহার দিলেন। উপালী উপহার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ক্ষণপরেই তাঁহারও ভাবান্তর উপস্থিত হইল,—কুমারগণকে সামান্য বস্ত্রে দীনভাবে দেখিয়া তাঁহার অন্তরেও বৈরাগ্য জাগিল। সকলে বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন এবং আপনাদিগকে নিরভিমানী করিতে সর্ব্বপ্রথমে নাপিত উপালীকে দীক্ষিত করিতে অনুরোধ করিলেন। যথারীতি সকলের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইল গেল।

রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের দিন-কয়েক পরেই শ্রাবস্তীর বিখ্যাত বণিক অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধদর্শনে আসিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন। অনাথপিণ্ডিকের আমন্ত্রণ-রক্ষার্থে তাঁহাকে কোশল-রাজ্যে গমন করিতে হয়। শ্রাবস্তী হইতে ফিরিয়া তিনি রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী কলন্দক-নিবাপে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষা যাপন করিলেন। বৈশালীর মহামারী উপশমিত করিয়া তিনি পুনরায় রাজগৃহেই ফিরিয়া আসেন এবং উপর্য্যুপরি চারি বৎসরকাল তথায় পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে অতিবাহিত করিলেন।

ধীরে ধীরে প্রচারের উত্তেজনা ও উন্মাদনা শমিত হইয়া আসিল। এখন হইতে প্রচারকার্য্য ধীর ও স্থির গতিতে চলিতে থাকিল। বুদ্ধও নিজের দৈনন্দিন কার্য্যাবলী নিয়মবদ্ধ করিয়া লইলেন। কার্য্যের শৃঙ্খলা ও সুবিধার জন্য তিনি দিবসকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন,—১। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বভাগ; মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরের দিবাভাগ; ৩। রাত্রি, প্রথম-ভাগ; ৪। রাত্রি, মধ্যমভাগ এবং ৫। রাত্রি, শেষভাগ।

অতি প্রত্যুষে শয়নাগার ত্যাগ করিয়া তিনি হাতমুখ প্রক্ষালন করিতেন। প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলী সমাপন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। তৎপর ভিক্ষার্থে নগরে বহির্গত হইতেন। কোনদিন তিনি একাকী বাহির হইতেন, কোনদিন কোন ভিক্ষুদলের সঙ্গে যাইতেন। কিন্তু ভিক্ষা তাঁহাকে প্রায়ই করিতে হইত না। কোন না কোন গৃহপতি প্রায় প্রত্যহই পথ হইতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন।

কোন গৃহস্থের দান গ্রহণ করিলে প্রতিদান স্বরূপে তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দান তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভোজনান্তে তিনি একস্থানে উপবেশন করিতেন। সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিত। সুক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে তিনি উপস্থিত সকলের মানসিক ভাব পর্য্যালোচন করিয়া তদনুযায়ী উপদেশ প্রদান করিতেন। উপদেশশ্রবণের ফলে কেহ-বা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সংঘের আশ্রয় গ্রহণ করিত, কেহ-বা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিয়া উপাসক-শ্রেণীভুক্ত হইত। অবশিষ্ট সকলকেই বুদ্ধের প্রতি অন্ততঃ একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা লইয়া ফিরিতে হইত। উপদেশান্তে তিনি বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

বিহারে তাঁহার বিস্তৃত আসনে উপবেশন করিয়া তিনি ভিক্ষুগণের আহারাদি সমাপনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। সকলের আহারাদি সুসম্পন্ন হইলে তাঁহারা তথায় সমবেত হইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে নানা উপদেশচ্ছলে মুক্তিচেষ্টায় উৎসাহিত করিতেন। কেহবা তখন তাঁহাকে ধ্যান-সাধনাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন। যথোপযুক্ত উত্তরদানে তিনি প্রশ্নকারীকে সন্তুষ্ট করিতেন। অতঃপর সকলে তাঁহার পদবন্দনা করিয়া বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলে, তিনিও স্বপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতেন। কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে শয়ন অথবা উপবেশন করিয়া থাকিয়া তিনি বিশ্রাম লাভ করিতেন।

যে স্থানে তিনি বাস করিতেন, তথাকার যত অধিবাসী তাঁহার অমৃতবাণী শ্রবণের অভিলাষে দিবসের শেষভাগে আসিয়া সমবেত হইত, সন্ধ্যাগমন পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবগাহন করিয়া শুদ্ধ বস্ত্রে ধ্যান-প্রকোষ্ঠে গমন করিতেন এবং কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন। এই সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষুগণ আসিয়া তাঁহাকে দর্শনাভিলাষে অপেক্ষা করিতেন। ধ্যানান্তে তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাঁহার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকিত সকলকে উপযুক্ত উত্তর দিয়া সাহায্য করিতেন। এই ভাবে রাত্রির প্রথম ভাগ কাটিয়া যাইত।

ভিক্ষুগণ যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া প্রস্থান করিলে পর রাত্রির মধ্যভাগ তিনি দেবগণের সহিত অতিবাহিত করিতেন।

রাত্রির শেষভাগে তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতেন। বহুক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকার শ্রান্তি-নিবারণার্থে কিয়ৎক্ষণ পদচারণা করিয়া, অল্পসময়ের জন্য শয্যাগ্রহণ করিতেন। অল্পক্ষণ পরেই শয্যা ত্যাগ করিয়া

পুনরায় আসনে উপবেশন করিতেন এবং রজনীর শেষ অংশ এই ভাবে অতিবাহিত হইত। *

বুদ্ধের এই নিয়মিত কার্য্যপ্রণালী সংঘের প্রসার ও সংঘের ভিত্তি দৃঢ় করিবার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হইল। কেবল এক ত্যাগী কর্ম্মীদল লইয়া কোন সংঘ চলিতে পারে না। যাহাদের জন্য এই কর্ম্মীসংঘের প্রচেষ্টা, এবং যাহাদের অর্থানুকূল্যে এই সংঘের প্রতিষ্ঠা, তাহারা যদি ইহাকে না চায়, তাহারা যদি ইহার বাস্তব প্রয়োজন অনুভব না করে, তবে ইহার জীবন নিশ্চয়ই শঙ্কাজনক। জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক বুদ্ধের দৈনন্দিন কর্ম্মপ্রণালী এই সমস্যাপূরণে খুবই কার্য্যকরী হইল।

রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ শ্রাবস্তী হইয়া নবমবর্ষায় কৌশাম্বীতে † উপস্থিত হইলেন। নিকটস্থ ঘোষিতারামে তিনি বর্ষাবাস করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু একটি অপ্রিয় ঘটনা তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিল। বিনয় সম্পর্কে কোন জটিল প্রশ্ন লইয়া ঘোষিতারামের ভিক্ষুগণের মধ্যে একটি বিসংবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদভঞ্জনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া বুদ্ধ একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মূর্খগণের মধ্যে অনর্থক শক্তির অপচয় অনুচিত বিবেচনা করিয়া, তিনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিবেন, স্থির করিলেন। কৌশাম্বী ত্যাগ করিয়া তিনি বালকলোনকার গ্রামে গমন করিলেন।

এস্থানে স্থবির ভৃগু এবং দিন কয়েক পরে অনিরুদ্ধ, নন্দীয় ও কিম্বিল আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সকলে পারিলেয্যক নামক স্থানে গমন করিয়া তত্রত্য রক্ষিতবনে শান্তিময় জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

একটী হস্তী স্বীয় দলকর্ত্তৃক বিশেষভাবে বিড়ম্বিত হইয়া এই বনে আসিয়া নিঃসঙ্গ ভাবে বাস করিতেছিল। বুদ্ধ তাহার অবস্থা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাহাকে বড় আদর করিতেন।

কিন্তু বুদ্ধ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ভিক্ষুগণ অধিককাল সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরেই সকলের মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। তদুপরি উপাসকগণও তাঁহাদিগকে হীনচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রতীকারের জন্য ব্যগ্র হইয়া বুদ্ধের সন্ধান লইতে আরম্ভ করিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, বুদ্ধ সম্প্রতি শ্রাবস্তীতে গমন করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে সকলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বুদ্ধের নির্দ্দেশ মত উভয় দল বিবাদের মীমাংসা করিয়া লইলেন।

* সুমঙ্গল বিলাসিনী—বুদ্ধ ঘোষ।

† বর্ত্তমান কোসাম, এলাহাবাদের নিকটে।

একাদশ বর্ষায় তথাগত পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একদিন সমীপবর্ত্তী একনালাগ্রামের এক ধান্যক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে ক্ষেত্রাধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ কাশীভরদ্বাজ তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন। ভিক্ষুবেশ দেখিয়া ব্রাহ্মণ অবজ্ঞাভরে বলিলেন,—"আমি ভূমি কর্ষণ করি, বীজ বপন করি এবং উৎপন্ন শস্যে জীবন ধারণ করি; তুমিও তদ্রূপ কর না কেন?" বুদ্ধ শান্তভাবে উত্তর করিলেন—"ব্রাহ্মণ, আমিও কর্ষণ করি, বপন করি এবং ক্ষেত্রজ ফল লাভ করি"। তাঁহার কথায় ব্রাহ্মণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া বুদ্ধ কহিলেন—"ধর্ম্ম আমার ক্ষেত্র; সংসাররূপ আগাছা আমি উন্মূলন করি; বিজ্ঞান আমার লাঙ্গল, পবিত্রতা-বীজ আমি বপন করি; ধর্ম্মানুশরণই আমার কর্ষণক্রিয়া এবং নির্ব্বাণ আমার কৃষিফল"। এই অভিনব ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে কৃষক-ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল—সংসারস্রোত অতিক্রম করিয়া তিনি সংঘভুক্ত হইলেন।

বর্ষান্তে বুদ্ধ পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। সঙ্কাশ্য পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষায় শ্রাবস্তীনগরে ফিরিয়া আসিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষায় রাহুল বিংশবর্ষ বয়সে উপসম্পদা দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রমণপদবীতে উন্নীত হইলেন। * সপ্তদশ বর্ষায় বুদ্ধ রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বর্ষাশেষে তিনি পুনরায় প্রচারকার্য্যে বহির্গত হইলেন এবং উপর্য্যুপরি কয়েক বর্ষ শ্রাবস্তীতে ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অতিবাহিত করিলেন। বিংশ বর্ষায় জেতবনে অবস্থানকালে তীর্থকগণ এক নারীহত্যায় লিপ্ত করিয়া তাঁহাকে লোকচক্ষে খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায় নিজেরাই বিশেষরূপে অপদস্থ হয়েন।

এই বর্ষার প্রধান ঘটনা দস্যু অঙ্গুলিমালের পরিশোধন। কোশলের রাজপুরোহিত ভার্গবের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। যে রাত্রে শিশু জন্মগ্রহণ করে সে রাত্রে রাজ্যের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এক অদ্ভুত দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠে। ভার্গব সন্ত্রস্ত হইয়া স্বপ্নফল-বেত্তাকে আহ্বান করিলেন। গণনার ফলে জানিতে পারা গেল, জাতক রাজ্যসম্পাসী দস্যু হইবে। ভীত ভার্গব রাজার নিকট অশুভকারী পুত্রের প্রাণনাশের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। প্রবল-প্রতাপ কোশলরাজ স্মিতহাস্যে পুরোহিতকে অভয় দিয়া পুত্রকে যথোচিত ভাবে লালন-পালন করিতে আদেশ করিলেন। পুত্রের মনে অহিংসা ভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্য, ভার্গব তাহার নাম রাখিলেন 'অহিংসক'।

বাল্য অতিক্রম করিয়া অহিংসক বিদ্যাশিক্ষার্থে

* বিংশবর্ষের পূর্ব্বে উপসম্পদা দীক্ষা দেওয়া বিনয়বিরুদ্ধ।

তক্ষশিলায় প্রেরিত হইলেন। তাহার তীক্ষ্ণ মেধা অচিরেই সকল শিক্ষার্থিগণের ধীশক্তিকে মলিন করিয়া দিল। শারীরিক বলেও তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। সহপাঠিগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। নানা কুটিল উপায়ে তাহারা তাহার অনিষ্টাচরণ করিবার প্রয়াস পাইল। অনেক ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের পর তাহারা তাহার বিরুদ্ধে গুরু-পত্নীর সহিত ব্যাভিচারের অভিযোগ উপস্থিত করিল। ইতিপূর্ব্বে বহু চেষ্টায়ও তাহারা অহিংসকের প্রতি আচার্য্যকে বিরূপ করিতে পারে নাই। কিন্তু এইবার তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। আচার্য্যদেবের সমস্ত জ্ঞান-গরিমা তাঁহাকে অভ্রান্তপথে রাখিতে অসমর্থ হইল। অহিংসক ইহার কিছুই জানিতে পারিল না, কারণ কাহারও এমন সাহস ছিল না যে, তাহার সম্মুখে ইহা আলোচনা করে। অধ্যাপক অহিংসককে বিতাড়িত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"বৎস, সাধারণ বিদ্যা সমস্তই তোমার অধিগত হইয়াছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিদ্যা লাভ করিবার পূর্ব্বে তোমায় সহস্র মানবের প্রাণবধ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের এক-একটি অঙ্গুলি আনিয়া আমায় উপহার দিতে হইবে"। বিদ্যা-লাভের দুরন্ত আকাঙ্ক্ষায় অহিংসক এই আদেশ সানন্দে শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

এক বনের ভিতর রাজ্যের প্রধান প্রধান অটটি রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। অহিংসক সেই বনে অবস্থান করিয়া নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েকটি অঙ্গুলি যখন সঞ্চিত হইল, তিনি সেইগুলিকে একত্র গ্রথিত করিয়া মালারূপে গলায় ধারণ করিলেন। লোকে দস্যুর নাম রাখিল 'অঙ্গুলিমাল'। দিন দিনই মাল্যের অঙ্গুলি-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ক্রমে সমগ্র কোশলব্যাপী প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। নৃপতি আর নিশ্চিন্ত রহিতে পারিলেন না। সৈন্যসহ দস্যুগণকে দমন করিবেন স্থির করিলেন। এই দস্যু যে কে ব্রাহ্মণ ভার্গব ও তাঁহার পত্নীর তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। মাতৃহৃদয় পুত্রের প্রাণনাশের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মাতা উপায় চিন্তা করিতে করিতে অরণ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অহিংসকের উল্লাসে তখন একটু বিষাদ-ছায়া পড়িয়াছে। আর একটিমাত্র অঙ্গুলি হইলেই তাঁহার সহস্রা-ঙ্গুলি পূর্ণ হয়, কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও আজ কোন মানুষের সন্ধান মিলিতেছে না। লোক এপথে চলাচল বন্ধ করিয়াছিল।

করুণার অবতার বুদ্ধ আজ ধ্যানযোগে অদ্ভুত দস্যুর সমস্ত কথাই অবগত হইলেন। তিনি দেখিলেন অহিংসক আজ পিপাসাপ্ত্যা বিচার করিবে না, মাতৃ-অঙ্গুলিতেই—সে তাহার মালা পূর্ণ করিবে। অবিলম্বে তিনি বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বহু লোকের সহিত দেখা হইল, সকলেই তাঁহাকে ঐ পথে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল। কিন্তু কাহারও বাধা না মানিয়া তিনি শান্তমনে অগ্রসর হইলেন।

ভিক্ষুকে দেখিয়া অঙ্গুলিমালের অন্তর উল্লসিত হইয়া উঠিল। শাণিত ছুরিকা হস্তে সে ভিক্ষুর পশ্চাতে ধাবিত হইল। কিন্তু ভিক্ষুকে ধরিতে সমর্থ হইল না। পরি-শ্রান্ত হইয়া অঙ্গুলিমাল তাঁহাকে থামিতে অনুরোধ করিল। ভিক্ষু প্রত্যুত্তরে তাহাকেও থামিতে বলিলেন।

বুদ্ধ তাঁহার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। হত্যার কথা ভুলিয়া গিয়া সে একবার ভিক্ষুর সৌম্য শান্ত মুখের প্রতি চাহিল। অন্তরে দেবতা জাগিয়া উঠিল। দস্যু শাস্তার আশ্রয় ভিক্ষা করিল। বুদ্ধ তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন।

দস্যুকে আক্রমণের পূর্ব্বে কোশলরাজ একবার বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কথায় কথায় অঙ্গুলি-মালের প্রসঙ্গ উঠিল। বুদ্ধ কহিলেন, "আচ্ছা সে যদি এই সঙ্ঘভুক্ত হয়, তবে কি করিবেন?"

"তৎপ্রতি শ্রমণোচিৎ সম্মান দেখাইব।"

কথাগুলি প্রসেনজিতের কণ্ঠ হইতেই নিঃসৃত হইল, কারণ সমগ্র রাজ্য-সন্ত্রাসী দস্যুর এরূপ পরিবর্ত্তন তিনি কল্পনাও করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুবেশী দস্যুকে যখন যথার্থই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তিনি তাহার দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া ভয়চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অভয় পাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"ধন্য বুদ্ধ!"

কিন্তু ভিক্ষুবৃত্তি গ্রহণ করিয়াও অহিংসকের দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না। ভিক্ষায় বহির্গত হইলেই কোশলবাসিগণ তাঁহার উপর নানা অত্যাচার করিতে লাগিল। অহিংসক নীরবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, এইভাবে তাঁহার কৃত পাপ ক্ষালিত হইবে। কিন্তু পূর্ব্বকৃত রোমাঞ্চকর হিংসাব্যাপার স্মরণ করিয়া তিনি স্বতঃই মধ্যে মধ্যে বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িতেন। তথাগত তাঁহাকে সস্নেহে বুঝাইতেন—"সে সকল তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত। তুমি নবজীবন লাভ করিয়াছ। এজন্য তুমি শুদ্ধ।"

চা-পান, না বিষপান?

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩৩ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে যদি ১৬॥০ কোটী ভারতবাসী, অর্থাৎ অর্দ্ধেক লোক প্রত্যহ ১ পয়সার চা পান করে বলিয়া ধরা যায়, তবে প্রতিদিন ২৫ লক্ষ টাকা, মাসে ৭॥০ কোটী টাকা অর্থাৎ বৎসরে ৯০ কোটী টাকা আমরা চা-পানে নষ্ট করি। এদিকে ভারতবাসীর গড়ে দৈনিক আয় ৬ পয়সা মাত্র। চা-বিষ প্রাতঃকালে খালি পেটে সেবন করিয়া অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ভুগি। চা-পানের ফলে ভাত প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর দ্রব্য বেশী খাওয়া যায় না। ১ পয়সা চায়ের লোভে আয়ুহ্রাসের ব্যবস্থা করি। (সঞ্জীবনী ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬)। আমাদের বেশ মনে পড়ে, দেশে, অন্তত এই কলিকাতায় চা কি প্রকারে ছুঁচের আকারে ঢুকিয়া এখন ফালের আকারে বাহির হইতেছে। এক সময়ে দেখা গেল, চায়ের কাটতি বড়ই কমিয়া গিয়াছে। ইংরাজী বণিকমহলে এবং সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন পড়িল, কিসে চায়ের কাটতি বাড়ানো যায়। সেই সময়ে Tea-cess আরম্ভ হইল কিনা মনে পড়ে না, অন্তত Tea-cess হইতে কাটতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করাই স্থির হইল। তখন এক মস্ত বিলাতী কোম্পানি, এই আন্দোলনের নেতৃস্বরূপে ভার লইলেন। প্রথম প্রথম এক মহা রব উঠিল যে, যে কেহ চায়ের দোকান খুলিবে সাহেবরা সেই দোকানের ভাড়া দিবে, যদি লোকসান হয় তাহা পুরাইয়া দিবে এবং সমস্ত সরঞ্জাম যোগাইয়া দিবে। এত প্রলোভন এই দুর্ভাগ্য দরিদ্র দেশের কয়জন অতিক্রম করিতে পারে? সহরের চারিদিকে হু-হু করিয়া চায়ের দোকান খুলিল। যখন এই সমস্ত দোকানের পসার বেশ জমিয়া গেল, তখন শুনি ১ পয়সায় দুই প্যাকেট চা, এবং কিছুদিন পরে ১ পয়সায় ১ প্যাকেট খুব ভাল চা বিক্রয় হইতেছে। এই pice-packet চায়ের কি কাটতি! যে চায়ের জন্য ধনীরা লালায়িত, সেই চা যখন সকলেই এত সস্তা পাইতে লাগিল, তখন কি আর রক্ষা আছে?

চায়ের দোকানে চা তো দিনরাত চড়ানোই থাকে— মধ্যবিত্ত লোকেরা দোকানে বসিলেন, পাঁচজনের সঙ্গে খোস গল্প অশ্লীল তামাসা জুড়িয়া দিলেন; ইতিমধ্যে দোকানদার সেই সিদ্ধ চায়ের জল ঢালিয়া তাহাতে টিনের অসার দুধ ও চিনি মিশাইয়া চা প্রস্তুত করিয়া হাজির করিল। চা-পায়ী ভাবিয়া দেখিলেন না যে, তিনি চা খাইতেছেন, না তীব্র বিষ গলাধঃকরণ করিতেছেন। ইহার উপর আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনেক চা-বিক্রেতা একজনের খাওয়া চায়ের অবশিষ্ট অংশ সেই চা-কুচো ফেলিয়া "হিন্দু" চা প্রস্তুত করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। ইহার ফলে চা-সেবী ত্রিবিধ স্বর্গসুখ লাভ করেন—[১] ঘরের কড়ি স্বেচ্ছায় উড়াইয়া দেওয়া, [২] বিষ পান করা এবং [৩] মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হওয়া। চা-পানের একটু মজা আছে। চা-পানের ফলে অজীর্ণ রোগ চোরের মত দেহে প্রবেশ করে এবং দুর্ব্বলতা আনয়ন করে; দুর্ব্বলতা আসিলেই চায়ের ন্যায় mild stimulant বা নরম উত্তেজক কিছু দরকার হয়—এইরূপে রোগেরও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। চা-পান না ছাড়িলে দাঁড়াইবে এই যে, যে দিক দিয়া হোক, চায়ের দাম হিসাবে অথবা রোগের ঔষধ হিসাবে, বিলাতকে পয়সা দাও, দেশে দারিদ্র্য আন এবং জীবন্মৃত হইয়া দিন যাপন কর।

আজকালকার কয়জন জানেন, বোধ হয় কেহই জানেন না যে, চা-বাগানের কুলিদের প্রতি চা-কর ইংরাজগণ কি ভীষণ অত্যাচার করিত। আজকাল যেমন নারীধর্ষণের ব্যাপার সংবাদপত্র খুলিলেই দেখা যায়, সেকালেও চা-কর ইংরাজদের সবুট পদাঘাতে কুলিদিগের প্লীহাফাটা, কথায় কথায় বিচারে বে-কসুর খালাস পাওয়া এবং কুলিরমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার-কাহিনী সংবাদপত্র খুলিলেই দেখা যাইত। ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত নির্ভীকহৃদয় ও শক্তিমান দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি স্বয়ং কুলি হইয়া চা-বাগানে কাজ করিয়া স্বচক্ষে কুলিদের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে সঞ্জীবনী আজ নারীনিগ্রহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইছে, গাঙ্গুলি মহাশয়ের ঐ সকল "কুলি-কাহিনী" সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঐ সঞ্জীবনীর অঙ্গ ভূষিত করিতে লাগিল। সঞ্জীবনীর আন্দোলনের ফলে চা খাওয়া খুব কমিয়া গিয়াছিল। তখন সে দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল। তখন আড়কাঠির বে-আইনী কুলি-চালানোর বিরুদ্ধে আইন হইল; পূর্ব্বের অপেক্ষা বিচার-বিভ্রাট অনেক কমিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কুলি ও কুলিরমণীদের প্রতি অত্যাচারও অনেক কমিয়া গেল। অনেক পুষ্প সুগন্ধবিস্তারে সুখ দান করিয়া লোকদৃষ্টির অন্তরালে ঝরিয়া যায়। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সাধারণ্যে দ্বারিক গাঙ্গুলি নামে সুপরিচিত— মহাশয়ের আগ্রহে ও চেষ্টায় কুলিদের প্রতি অত্যাচার প্রশমিত হইল, কিন্তু কয়জন লোক তাহা অবগত আছে? আমার মনে হয়, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা উচিত। প্রত্যেক কুলির নিকট ১ পয়সা করিয়া লইলে সহজেই এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা যাইতে পারে।

চা-পানের কুফল ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস গত অগ্রহায়ণের 'বঙ্গলক্ষ্মীতে' সুন্দর বিবৃত করিয়াছেন। আমর

তাহার সারমর্ম নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—উহা আমাদের উপরোক্ত কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে।

"চা-পানের সর্ব্বদেশে অভ্যাস হইলে ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়—দশ-বারো বার চা নইলে চলে না। অন্তঃসত্বা অবস্থায় স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা ভয়ানক অনিষ্টকর। ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন দেখলেন বিলাতে চায়ের জন্য স্বাধীন চীনের উপর নির্ভর করতে হয়, তাঁরা অধীন ভারতে চা উৎপন্ন করবার মতলব আঁটলেন। ১৮৩৩ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারতে চায়ের চাষ করবার জন্য চীন থেকে চা এবং চীনা শ্রমজীবী আনালেন। তিনি সতীদাহ নিবারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু চায়ের অপব্যবহারের দরুন কত পরিবারের যে কত মর্ম্মদাহ ভবিষ্যতে হতে পারে, তা তিনি অনুভব করেন নাই। * * * ১৮৫২ সালে আসামোৎপন্ন চা চীনের চায়ের সমকক্ষ হয়েছিল। প্রথমে দেশীয় লোকেরা চা খেতেন না; এখন চা একটা নেশায় পরিণত হয়েছে। ১৮৬৪ সালে এদেশ থেকে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়। এখন প্রতি বৎসর ৩৫ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়। দেশে চা ধরাবার জন্য এগুযুল কোম্পানী কেরাণীদের টিফিনের ছুটির সময় পাঁচ সিকে খরচ করে চা খাওয়াত; তারপর খরচ করত দশ আনা, তারপর চারি আনা। তারপর যখন দেখলে নেশা ধরেছে, আর কিছুই খরচ করতে হল না। এখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সকলে চা খায়। মুটে মজুর সকলেরই এখন চা না খেলে চলে না"।

আপাতত বোধ হয়, এত বড় ব্যবসায়ে ভারত লাভবান হয়; কিন্তু লাভ কত এদেশে থাকে, আর বিদেশে কত যায়, তার খতিয়ান দেখিলে দেখা যায় যে, যদি বা ভারতের কিছু লাভ থাকে, সে লাভ অতি সামান্য। "সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, ভারতবর্ষে চায়ের ব্যবসায়ে ৪৮ কোটী টাকা মূলধন খাটছে। এর মধ্যে ৩৭ কোটী টাকা বিলাতী। অবশিষ্ট মূলধনের মালিক অধিকাংশ বিলাতের লোক। এদেশের মালিক অতি অল্প। লাভ প্রায় শতকরা একশত কি দুইশত। আমাকে একজন চা-বাগানের মালিক বলেছিলেন—একবৎসর দুর্ব্বৎসর, লাভ শতকরা পঞ্চাশ মাত্র। যদি শতকরা পঁচিশও ধরা যায়, ৩৭ কোটী বিলাতী মূলধনের দরুণ প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ৯।০ কোটী টাকা যায়। তা ছাড়া বিলাতী ম্যানেজারদিগকে প্রায় ৫ কোটী টাকা দিতে হয়। অর্থাৎ এই ব্যবসার দরুণ ভারতবর্ষে বিলাতী বণিকদিগকে প্রতি বৎসর ১৪।০ কোটী টাকা দিয়ে থাকে। সরকারী বিবরণী বলে—৩৪০ চা বাগানে ৬১৫ জন বিদেশী ম্যানেজার।

"প্রায় ৮।০ লক্ষ শ্রমজীবী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিদেশী বণিকদের অর্থকোষ পূর্ণ করছে। তার প্রতিদানে পায় মাথা পিছু ৭৷৷০ টাকা। দৈনিক চারি আনাতে কি একটা মানুষের জীবন ধারণ চলে? অত্যাচার—অনাচারের কথা ছেড়ে দাও, ইতিহাস তার সাক্ষী। স্থানে স্থানে সরকারী বে-সরকারী রেলওয়ে ষ্টেশনে 'টী-সেস্ এসোসিয়েশনের' অনুরোধ পত্র ঝুলছে। এক পেয়ালা চা খাও, কোন কষ্ট থাকবে না। মাতাল হবে না অথচ মদ্যানন্দ পাবে, শরীর সুস্থ, সবল ও কার্য্যক্ষম হবে, ইত্যাদি। সহসা আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিদেশী বণিকদের এত উদ্বেগ কেন? সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

"চায়ের দরুণ বছরে ১৪।০ কোটী তো তাঁদের উদরে যায়, তা ছাড়া এই ভারতেই ৪ কোটী টাকার চা বিক্রী হয়। তা ছাড়া ঐ চায়ের মোহিনী শক্তি বৃদ্ধি করতে হলে বিদেশী-দেশী জীবননাশী দুটী পদার্থ আবশ্যক—বিলাতী টিন-বন্ধ দুগ্ধ এবং জাভার চিনি। যার যত নেশা তার তত বেশী কড়া চা এবং দুধ ও চিনি চাই। টিনভরা দুধের দরুণ ১৯২২-২৩ সালে ভারতবর্ষ থেকে বিলাতে ৪০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা গিয়েছিল; ১৯২৬-২৭ সালে সেই অঙ্ক উঠেছিল ৭৫ লক্ষের কোঠায়। এক পাউণ্ড চা প্রস্তুত করতে হলে ৩½ ৪ সের চিনি চাই। বিদেশী চিনি নইলে অনেকের মুখে চায়ে তার লাগে না। ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশী চিনির দরুণ বিদেশে প্রতিবৎসর এদেশের ৪ কোটী টাকা বেরিয়ে যায়, দেশী চিনি ময়লা বলিয়া আমরা ঘৃণা করি। তা ছাড়া, এই দেশী চিনি প্রকৃষ্ট প্রণালীতেও প্রস্তুত হয় না। জাহাজে বিদেশী চিনির যে সব বস্তা বিক্রী হয়, সেই বস্তায় চিনির যে সব ময়লা লেগে থাকে, তাহাই জাল দিয়ে চিনি বের করে যে অপরূপ পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম দেশী চিনি। এই তো গেল দুধ-চিনির কথা। চায়ের জন্য বিলাতী পাত্র চাই। প্রতি বৎসর ভারতে ১ কোটী টাকার বিলাতী পেয়ালা আসে। এর এক-তৃতীয় কি এক-চতুর্থ অংশও যদি চায়ের জন্য ব্যবহার হয়, তাহলেও অন্তত ২৫৷৩০ লক্ষ টাকা এই বাবদে বিলাতে যায়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বশুদ্ধ চায়ের দরুণ দেশ থেকে ১৯ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা লুণ্ঠিত হচ্ছে।

"চা স্বাস্থ্যেরও কিরূপ হানিকর তাহাও বলি। চা চলতি হবার পূর্ব্বে ইংরাজ-জাতি বেশী বলবান ও সুস্থ ছিল। বোয়ার যুদ্ধের সময় দশলক্ষ ইংরাজ সৈন্য হবার অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। অবশ্য তার কারণ শুধু চা নয়। চা খেতে-খেতে যখন নেশা হয়ে যখন

খুব কড়া চা নইলে চলে না। এই প্রকার কড়া চায়ে যে বিষ থাকে, তা থেকে জন্মায় পাকাশয়ের প্রদাহ, অম্বল, অজীর্ণতা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ প্রভৃতি। কেহ কেহ ১৪।১৫ পেয়ালা চা খেয়ে সমস্ত দিন কাটিয়ে দেয়। কেহ কেহ এত গরম চা খায় যে জিভ পুড়ে যায়, এই অত্যুষ্ণ চায়ের দরুণ পেটের ভিতর ঘা হয়। আজকাল অনেকের মধ্যে এই রোগটা প্রবল হয়েছে। তার দরুণ পেট কেটে চিকিৎসা করতে হয়।

"আর এক বিপদ, সংক্রামক রোগ। পাত্রগুলি তো আর গরম জলে সিদ্ধ করে বিষমুক্ত করবার অবকাশ বা অভিপ্রায় থাকে না। গরমি বা যক্ষ্মারোগী চুমুক দিয়ে চা খেয়ে যাচ্ছে, তার পরেই আর একজন এসে সেই পাত্রে চা পান করে রোগটা সঞ্চয় করল।

"আর একটা দিক আছে সঙ্গদোষ। ঐ চায়ের দোকানে যত বকাটে ছেলের আড্ডা হয়। ঐ খানেই যত অসৎ প্রবৃত্তির উৎপত্তি"।

এই সেদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, কোন সুপ্রসিদ্ধ বিলাতী কোম্পানীর কমবেশী প্রায় ৫০টী সিন্দুক চা নষ্ট করা হইল। ইহার কারণ কি? কারণ—ঐ সিন্দুকগুলির চায়ে—আ—র্সে—নিক বিষ পাওয়া গিয়াছিল!! ইহা কি প্রকার ভয়াবহ কথা, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আমাদের প্রশ্ন এই যে, খুব অল্প পরিমাণে ঐ বিষ চায়ের সঙ্গে মিশাইলে কি উহার স্বাদ বা গন্ধ ভাল হয়, অথবা চায়ে সহজে পোকা ধরে না, অথবা নেশা ভাল জমে? এতগুলি সিন্দুকে আর্সেনিক পাওয়ায় আমাদের সন্দেহ হয় যে, ইহা দৈবাতের কথা নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশ্রিত। তবে, হইতে পারে যে, এই কয়টা সিন্দুকে উহা কিছু বেশী পরিমাণে মিশানো হইয়াছিল—এই বেশীটুকু হয়তো দৈবাতের কাজ হইতে পারে। আমাদের অনুরোধ এই যে, কর্পোরেশন এই আর্সেনিক মিশ্রিত হইবার মূল অনুসন্ধান করুন। করিলে শোনা যায়, চায়ের কারখানায় নাকি অনেক রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা শুনিয়াছিলাম যে, আর একটা চায়ের মস্ত বড় কোম্পানি তাঁহাদের চায়ে আফিমের জল ছিটাইয়া দিতেন—তাহা হইলে একবার যাঁহারা তাঁহাদের চা খাইবেন, তাঁহারা সহজে আর তাঁহাদের চা ছাড়িয়া অন্য চা ধরিতে চাহিবেন না। আমার এক বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি যে তিনি যখন পাঠ্যাবস্থায় এক হোষ্টেলে থাকিতেন, তখন একজন সেই হোষ্টেলের সম্মুখে এক চায়ের দোকান খুলিল। দোকানে লোকে লোকারণ্য—এমন চা নাকি অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তখন বন্ধু—ইনি চা খাইতেন না—কৌতূহলবশতঃ সন্ধান লইতে উদ্যত হইলেন—এত প্রশংসার কারণ কি? শেষে কোন প্রকারে চা যেখানে প্রস্তুত হয়, সেই কোটরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, চায়ের জল ফোটাইবার সময়ে উহাতে "পোস্তর ঢেঁড়ি" (আফিমের ফলের বীচি) ফেলিয়া দেওয়ার কারণেই ঐ চায়ের প্রতি ছেলেদের এত ঝুঁকিবার কারণ। উহা জানিয়া ছেলেরা ঐ চায়ের দোকান পরিত্যাগ করিল।

আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, রেলওয়ে ষ্টেশনে একজনের খাওয়া চায়ের অবশিষ্ট অংশ মূল চা-কুণ্ডে ঢালিয়া "হিন্দু" চা প্রস্তুত হইল এবং তাহাই চা-পায়ীদের পয়সার বিনিময়ে উপাদেয় পেয়রূপে বিতরিত হইতে লাগিল। শুধু চা কেন? আমি এক চায়ের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম—সেখানে লেখা আছে—চা, ঘোলের সরবত প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকাল—একজন এসে ঘোলের সরবৎ চহিল। দোকানদার ঘোলের নামধারী সাদা বিষ ঢালাঢালি করিয়া তাহাকে খাইতে দিল। লোকটীকে দেখিয়া বোধ হইল, মেথরশ্রেণীর—তাহা না হইলেও ঐ প্রকার কোনও নিতান্ত নীচশ্রেণীর নিঃসন্দেহ। সে খানিকটা খাইয়া অল্প কিছু অংশ গেলাসে রাখিয়া চলিয়া গেল। দোকানদার সেই পরিত্যক্ত অংশটুকু নিঃসঙ্কোচে ঘোলের কুণ্ডের মধ্যে ঢালিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে কেরাণীশ্রেণীর এক দুর্ভাগ্য জীব আসিয়া সেই ঘোলের সরবৎ চাহিল, দোকানদার অমনি তাহার সেই অমৃতভাণ্ড বা ঘোলকুণ্ড হইতে অমৃত ঢালিয়া তাহাতে পচা গোলাপী আতর ও একটু গোলাপী রংয়ের বিষ ঢালিয়া এক গেলাস বিষ প্রস্তুত করিয়া দিল। কেরাণী বাবুটীও উহা পান করিয়া স্বর্গের সুখ অনুভব করিয়া চলিয়া গেলেন। এইভাবে সংক্রামক রোগের বীজ যে কি প্রকার দ্রুতবেগে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা কয়জন অভিভাবক লক্ষ্য করিয়া রাখিতেছেন?

প্রবীণ ডাক্তার সুন্দরীমোহন বাবু বলেন যে চায়ের বদলে গম কড়া করিয়া ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া রাখিয়া দাও; তাহাই ফুটন্ত জলে দিয়া দুধ ও গুড়ের সঙ্গে খাও। চিনির ভিতর সার কিছুই নাই। তদপেক্ষা গুড় শতগুণে পুষ্টিকর। আমরাও শুনি যে, আজকাল অল্প খরচে চিনির মিষ্টতা বাড়াইবার জন্য স্যাকারীণ [saccharine] ব্যবহার হয়। পড়িয়াছিলাম যে, এই পদার্থ বেশী ব্যবহার করিলে কর্কট [cancer] রোগ হয়।

গম গুঁড়ার ব্যবস্থা করিলে চর্ব্বি-মিশানো বিস্কুটও ব্যবহার করিতে হয় না। সুন্দরীমোহন বাবু যে ভাবে গম গুঁড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বিলাতী grapenut নামক পদার্থের ব্যবহারেরই অনুরূপ। তাঁহার মতে

প্রাতদির টাটকা মুড়ি নারিকেল দিয়া এবং কল-বেরোন [অঙ্কুরিত] ছোলা আদা ও গুড় দিয়া খাওয়া উচিত।

আমাদের মনে হয় আরামের একটা কল্পনাই চা-পান বৃদ্ধির অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। আমি, আমার কয়েকজন বন্ধু চা খাইব না বলায় দুধে চিনি ও গরম জল দিয়া তাঁহাদিগকে যেই বলিলাম যে জলপি হইতে আগত একপ্রকার সাদা চা আনিয়াছি, তখনই তাঁহারা তাহাতে চায়ের সুগন্ধ ও সুস্বাদ অনুভব করিলেন, এবং বলিলেন সদ্যসদ্যই তাঁহাদের অম্বল অজীর্ণতা প্রভৃতি ভাল হইয়া গেল। সমস্ত নেশার প্রধান মূল হইল কল্পনা। আমরা আশা করি তরুণসমাজ চা, সিগারেট প্রভৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন।

জড়জগতে ও মানবাত্মায় ভগবানের প্রকাশ।

(প্রথম প্রস্তাব)

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

ধর্ম্মের মূল সত্যগুলি ভগবান স্বহস্তে মানবাত্মায় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি নিজে গুরু হইয়া আমাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতেছেন এবং আমাদিগকে পূর্ণতার পথে লইয়া যাইতেছেন। আমাদের শিক্ষার জন্য তিনি অসংখ্য উপায় বিধান করিয়াছেন। উপদেশের অভাবে ভাল হইতে পারিলাম না, আমাদের কাহারও একথা বলিবার পথ নাই। যদি আমাদের জীবন ভাল না হয়, যদি আমাদের জীবন ধর্ম্মে ও জ্ঞানে আনন্দে ও শান্তিতে ক্রমশ সমুন্নত না হয়, সে দোষ আমাদেরই—সেজন্য আমরাই দায়ী।

আকাশ পৃথিবী জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল। প্রকৃতির ভাষা কি দুর্ব্বোধ, না অর্থহীন? সত্য বটে ভগবান অতীন্দ্রিয়, কিন্তু জগৎ কি তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান ও তাঁহার প্রেমের পরিচয় দেয় না? তিনি জড় নহেন সত্য, কিন্তু জড়ের ভিতর দিয়া তিনি নিরন্তর আমাদের নিকটে কি তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন না? মানবাত্মায় কি তাঁহার প্রতিরূপ আমরা দেখি না? বিবেক যে আদেশ প্রদান করে, সে আদেশ কাহার? যে অনন্ত জ্ঞানকে মানবের বুদ্ধি ধারণা করিতে অক্ষম, বুদ্ধি নিজে কি সেই জ্ঞানের একটী ক্ষীণ রশ্মি বলিয়া অনুভব করে না? মানুষের হৃদয় কি সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে এমন একজন মানুষ সাক্ষাৎ পায় না, যাঁহার উপরে একান্ত নির্ভর স্থাপন করিতে পারে এবং যাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করিতে পারে? যদি আমরা তাঁহার মহিমা ও গৌরব না দেখি তাহার কারণ এই যে আমাদের অধ্যাত্মদৃষ্টি অন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মের সত্য মানবাত্মায় নিহিত ও বহির্জ্জগতে পরিব্যাপ্ত বলিয়া যে পৃথিবীতে সাধুভক্তগণের আবির্ভাব অনাবশ্যক, একথা বলা হইতেছে না। তাঁহারা কোন নূতন সত্য সৃষ্টি করেন না বটে, কিন্তু যে সকল সত্য মানবাত্মায় ও বহিঃপ্রকৃতিতে ভগবান স্থাপন করিয়াছেন সাধুভক্তগণের জীবনে ঐ সকল সত্য উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করে। যে সকল আসক্তি ও মোহ আমাদের চক্ষু হইতে ভগবানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, মহাজনগণের দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষু হইতে সেই আবরণ উন্মোচন করে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্র এই মহাপুরুষদিগের আপ্তবাক্য। সেই জন্য শাস্ত্রের সমাদর করি। কিন্তু কোন শাস্ত্রই অভ্রান্ত নহে। শাস্ত্র আছে বলিয়া আমরা মানবাত্মা ও বহিঃপ্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারি না। উভয়ই ঈশ্বরের নিত্যলীলার রঙ্গভূমি। যিনি কেবল মনুষ্যলিখিত শাস্ত্রের উপরে নির্ভর করিবেন, তিনি ভ্রম কল্পনা ও কুসংস্কার হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না।

উপরে এই কথাই বলা হইয়াছে যে ভগবানের প্রকাশ দুই স্থানে, প্রথমতঃ বহির্জ্জগতে এবং দ্বিতীয়তঃ মানবাত্মায়। মানবাত্মায় যে তাঁহার প্রকাশ তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্য; কিন্তু বহির্জ্জগতে তাঁহার প্রকাশ সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু কিছু বলা যাইতে পারে।

ভগবান যে অনন্তস্বরূপ, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক ঘটনা সেই কথাই ইঙ্গিত করিতেছে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল ব্যাপার প্রতিনিয়ত আমাদের চক্ষুর সমক্ষে ঘটিতেছে, অতি তুচ্ছ অতি অকিঞ্চিৎকর যে সকল সামগ্রী আমাদের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে তাহাদের মধ্যেও অনন্তের বার্ত্তা নিহিত রহিয়াছে। একখণ্ড প্রস্তরকে শূন্যে নিক্ষেপ করিলে পরমুহূর্ত্তেই যে উহা ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, এই ক্ষুদ্র ঘটনার পশ্চাতে সেই শক্তি বিদ্যমান, যাহা গ্রহ-উপগ্রহকে নিজ নিজ কক্ষে পরিচালিত করিতেছে এবং নক্ষত্রকে নক্ষত্রের সঙ্গে অলঙ্ঘ্য বন্ধনে গ্রথিত করিয়াছে। লোকচক্ষুর অগোচরে গহন অরণ্য মধ্যে যে একটী সামান্য বনফুল ফুটিতেছে তাহার জন্য সূর্য্য এবং পৃথিবী, বায়ুমণ্ডল ও জলরাশির কি সমবেত প্রয়াস! এই যে একটী বালুকাকণা, উহা কোথা হইতে কোন্ জলস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, কোন্ বায়ুর হিল্লোলে উড়িতে উড়িতে কোন্ পথ ধরিয়া কত যুগে যে আজ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে

এ সুদীর্ঘ ইতিহাস কে জানে? সমুদ্র ও পর্ব্বত, উপত্যকা ও অধিত্যকা, নদনদী নির্ঝর, কান্তার ও মরুভূমি—আজ যেখানে যে আকার ধারণ করিয়াছে সৃষ্টির আরম্ভ হইতে অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং ভবিষ্যতে তাহাদের যখন যেরূপ পরিণতি হইবে তাহাও অব্যর্থরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। ভূকম্পের ভীমরব, অশনির রুদ্রনাদ, প্রত্যেক বৃক্ষপত্রের স্পন্দন এবং প্রত্যেক অণুরেণুর উত্থান ও পতন—জড়জগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল ঘটনা অলঙ্ঘ্য কার্য্য-কারণশৃঙ্খলের অধীন ও অতি গূঢ়যোগে সমগ্র বিশ্বের সহিত সম্বদ্ধ। জড়জগতের সকল বস্তুই আমাদিকে বর্ত্তমানের বাহিরে লইয়া যাইতেছে এবং অনাদি অতীত ও সীমাহীন ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা যে অনন্তস্বরূপ প্রকৃতি কোটীকণ্ঠে এই মহাসত্যই ঘোষণা করিতেছে। ইহার অপেক্ষা মহত্তর সত্য পৃথিবীর সাধুভক্তগণ ও স্বর্গের দেবতাগণও ঘোষণা করিতে অক্ষম।

এ জগৎ যে অন্ধ জড় পরমাণুর রঙ্গমঞ্চ বা উদাসীন নিয়তির কর্ম্মক্ষেত্র—মানবের বুদ্ধি এ কথায় সায় দেয় না। বস্তুতঃ প্রকৃতির সকল শক্তিই ঈশ্বরের শক্তি, প্রকৃতির সকল নিয়মই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত কার্য্য-প্রণালী, প্রকৃতির সকল কৌশলের পশ্চাতেই ঈশ্বরের জ্ঞানলীলা। প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য, কারণ ভগবান ধীর স্থির অচঞ্চল ও নির্ব্বিকার। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, যদি প্রাকৃতিক নিয়মে দৃঢ়তা না থাকিত তবে মানবের জীবনযাত্রা নিতান্তই অসম্ভব হইত। আমরা কি এই দৃঢ়তার মধ্যে তাঁহার মহিমা দর্শন না করিয়া বলিব যে ব্রহ্মাণ্ড খাম-খেয়ালীর দ্বারা পরিচালিত হইলে অতি উত্তম হইত?

আবার, বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে সেই বৃক্ষে বীজ জন্মিতেছে উহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। বীজের পশ্চাতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষের পশ্চাতে বীজ—কি এক অন্তহীন পর্য্যায়! কিন্তু প্রথম বীজই বা কোথা হইতে আসিল এবং প্রথম বৃক্ষই বা কিরূপে উৎপন্ন হইল—এ কি গভীর সমস্যা! বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, যুগ-যুগান্তের পূর্ব্বে অতি সূক্ষ্ম জীবাণু বা Germ এর আকারে প্রথমে পৃথিবীতে জীবনের সঞ্চার হইয়াছিল এবং সেই Germ হইতে কোটী কোটী বৎসরে ক্রমবিকাশের দ্বারা বর্ত্তমানের এই অগণ্য বৃক্ষ-লতা কীট-পতঙ্গ জীব-জন্তু ও মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু বহু পরীক্ষার পরে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জড় হইতে জীবনের উদ্ভব হয় না। জীবনের পশ্চাতে জীবন—এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। [illegible] কীট ও জীবজন্ম [illegible] সেই সেই জাতীয় কীট ও শৈবাল হইতে জন্ম। তবে পৃথিবীতে কিরূপে জীবনের সঞ্চার হইল অর্থাৎ কোথা হইতে প্রথমে জীবাণুর উদ্ভব হইল—এই সুগভীর রহস্যের উত্তর বিজ্ঞানের অতীত।

যদি আমরা স্বীকার করি যে সেই আদি জীবাণু হইতে ক্রমবিকাশের দ্বারা বহু কল্পে এই বর্ত্তমান যুগের বৃক্ষলতা জীবজন্তু ও মানবের উৎপত্তি হইয়াছে, তবে যে আর সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানিবার প্রয়োজন হয় না—একথা একেবারেই সত্য নহে। কোন একটী কার্য্য যদি অল্প দিনে হয় তাহারই কর্ত্তা থাকে, আর যাহা বহুকাল-সাপেক্ষ তাহার কোন কর্ত্তা থাকে না, তাহা আপনি হয়—এ মত কখনই গ্রাহ্য নহে। বিশ্বাসীর নিকটে ক্রমবিকাশ ঈশ্বরেরই সৃষ্টিপ্রণালী। বিশ্বাসীর নিকটে ক্রমবিকাশের অন্য কোন অর্থই নাই।

মানুষও সেই জীবাণুর পরিণতি বলিয়া যদি মানা যায়, তবে বলিতে হয় যে মানুষের যাহা কিছু—তাহার মস্তিষ্ক পাকযন্ত্র হৃদ্‌যন্ত্র এবং নিশ্বাসের যন্ত্র, তাহার হস্তপদ চক্ষুকর্ণ, তাহার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক, তাহার আশা ভয় ও আকাঙ্ক্ষা, তাহার বাণিজ্য-ব্যবসায় যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাহার সাহিত্য-সঙ্গীত দর্শন-বিজ্ঞান ধর্ম্ম—এ সমুদয়ও সেই অদ্ভুত বীজাণুর মধ্যে গূঢ়রূপে প্রচ্ছন্ন ছিল। আরও বলিতে হয় যে বাল্মীকি ও বেদব্যাস, গেটে ও সেক্সপীয়ার, সীজার ও আলেকজাণ্ডার, প্লেটো ও শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ যীশু ও চৈতন্য—ইহাঁরাও সেই জীবাণুর গর্ভে ভবিতব্যরূপে নিহিত ছিলেন। এই যে জীবাণু, যাহার ক্রমবিকাশ বা পরিণতির কথা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়—যদি ঈশ্বরকে না মান, তবে কি করিয়া এই জীবাণুর উৎপত্তি হইল ও কেনই বা উহা এই পরমাশ্চর্য্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইল এই সুগভীর রহস্যের কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই পরিচয়দান করিতেছে ও তাঁহারই নাম গান করিতেছে, কিন্তু আমাদের চক্ষুকর্ণ থাকিয়াও নাই। অধিকাংশ লোক এই বিচিত্র বিশ্বে সারা জীবন যেন ঘুমাইয়া কাটায়। আমাদের চারিদিকে যে সকল মহাব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমাদের শরীর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয় না, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয় না। এই যে স্বচ্ছ নির্ম্মল বায়ুরাশি যাহা ভেদ করিয়া আমাদের চক্ষু দিগন্তের পানে ছুটিতেছে, এই যে মাথার উপরে সুনীল উন্মুক্ত আকাশ, দিবা-ভাগের এই যে আলোক-সমুদ্র, নিশীথ অন্ধকারে এই যে অসংখ্য গ্রহতারকার দিব্যজ্যোতি, এই যে জীবধাত্রী সুদৃঢ়পৃষ্ঠ পৃথিবী, ঐ যে তুষারকিরীট অভ্রভেদী পর্ব্বত, এই যে চির-চঞ্চল সমুদ্রের তরঙ্গমালা, এই যে নদনদী

ঈশ্বরের আনন্দধারা, সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের এই যে অন্তহীন রহস্য— ইহা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে না। ঐ যে কোটী যোজন দূরবর্ত্তী সূর্য্য, যাহার উপরে পৃথিবীর সমুদয় বৃক্ষলতা ও প্রাণীপুঞ্জের জীবন নির্ভর করিতেছে —যদি আমাদের বিস্ময়ের চক্ষু থাকিত তবে কি প্রতিদিন সেই সূর্য্যের সুগম্ভীর উদয়মুহূর্ত্তে আমরা ভূমিষ্ঠ প্রণত হইয়া ভগবানের স্তব করিতাম না?

রামায়ণ সম্বন্ধে দুই-একটী কথা।*

(শ্রীবীরেশ্বর সেন)

বাল্যকালে যখন পল্লীগ্রামে থাকিতাম তখন দেখিতাম, কাহারও জ্বর-বিকার হইয়া মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে অথবা শিরঃপীড়া হইলে কবিরাজ তপ্ত বালুকার পুঁটুলী করিয়া সেক দিবার ব্যবস্থা করিতেন। পরে যখন কিছু বড় হইয়া নগরে গিয়া দেখিলাম যে সেই অবস্থায় ডাক্তার শীতল জলের পটি অথবা বরফ প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন, তখন ডাক্তারী চিকিৎসাটা বড়ই বর্ব্বরোচিত বলিয়া বোধ হইত। মন হইতে এই সংস্কার দূর হইতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। আবার বাল্যকালে যখন হিন্দুসমাজের ছুঁৎমার্গ দেখিতাম, তখন অন্ন-ব্যঞ্জন প্রভৃতিকে ("সকড়ি") বড়ই অপবিত্র বস্তু বলিয়া মনে করিতাম। মুসলমানেরা বিছানায় বসিয়া ভাত খায়—তাহাদের কথা দূরে থাকুক; হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা যখন ডালভাত রাঁধিতে রাঁধিতে হাত না ধুইয়া তেল বা ঘৃতের ভাঁড়ে অথবা বস্ত্রাদিতে হাত দিত, তখন তাহাদিগকেও নিতান্ত বর্ব্বর মনে করিতাম। পরে অধিক বয়স হইলে যখন একজন বুঝাইয়া দিলেন যে, যে অন্ন খাইয়া আমাদের জীবন রক্ষা হয় তাহা ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রধান দান, সুতরাং তাহা অপবিত্র ইহা ভাবিলেও পাপ হয়। তখন মনে যেন আলোক প্রবেশ করিল এবং স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে বাল্যকালের সংস্কারটা কিরূপ যুক্তিহীন ছিল। এইরূপে সকল বিষয়েই পূর্ব্ব সংস্কারবিরোধী নূতন কোন কথা শুনিলেই আমাদের মনে প্রথমে আঘাত লাগে এবং পরে সেই আঘাতের ফলে আমরা উত্তেজিত হই এবং অনেক সময়ে সেই নূতন কথায় কোন সত্য আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেও পরাঙ্মুখ হই; কিন্তু এরূপ মনোবৃত্তি যে সমীচীন নহে তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। অনুসন্ধান করিলে হয় ত আমরা কখনও কখনও দেখিতে পাইব যে আমাদের পূর্ব্বসংস্কার ভ্রান্ত।

আমি এখানে একই বিষয়ে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়া পাঠকদিগকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

রামায়ণে দেখিতে পাই সুতরাং হিন্দু-মাত্রেরই বিশ্বাস যে, রাম বিবাহ করিয়াছিলেন জনক রাজার কন্যা সীতাকে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্র মতে সীতা ছিলেন রামের ভগিনী এবং পত্নী। অর্থাৎ বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে রাম স্বীয় ভগিনী সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কথাটা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয় বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া একবার স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

জগতে সকল বিষয়েই ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে। বিবাহ-অনুষ্ঠানেও এই ক্রমোন্নতি হইয়াছে। আদি যুগে বিবাহপ্রথা মোটেই ছিল না, ইহা মহাভারতে উদ্দালক-শ্বেতকেতুর উপাখ্যান হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। পূর্ব্বে নিকট ভ্রাতাভগিনী অর্থাৎ অতি জ্ঞাতির কন্যা-পুত্রে বিবাহ হইত। এই প্রথা যে যদুবংশে প্রচলিত ছিল, তাহা হরিবংশ হইতে স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। বুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত অতি সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়বংশে এই প্রথা ছিল। বুদ্ধ স্বয়ং তাঁহার ভগিনী অথবা মাতুল-কন্যা গোপাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাম অবশ্যই বুদ্ধের বহু পূর্ব্বকার লোক ছিলেন; সুতরাং রামের সময়ে নিকটতর সম্পর্কের নরনারীর বিবাহের সম্ভাবনা ছিল। তাহার পর আমাদিগের ইহা স্মরণ করিতে হইবে, রামায়ণে যখন 'বুদ্ধ' 'শ্রমণ' প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তখন রামায়ণের রচনাকাল বুদ্ধের পরবর্ত্তী। সুতরাং রামের ঐতিহাসিক বিবরণ রামায়ণকার অপেক্ষা বৌদ্ধশাস্ত্র-প্রণেতারই অধিক জানিবার সম্ভাবনা। কিন্তু রামায়ণরচনার সময়ে হিন্দুদিগের পূর্ব্বকালের বিবাহের উপরোক্ত রীতির পরিবর্ত্তে উন্নততর বিধি নিবদ্ধ হইয়াছিল। রামায়ণকার রামের ইতিহাসসংকলনের সময়ে রামের এই বর্ত্তমান যুগের অননুমোদিত বিবাহের স্পষ্ট উল্লেখ করিতে অবশ্যই

---

* প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখক দায়ী।

কুণ্ঠিত হইয়া, অথচ এত বড় একটা সত্য সংবাদ একেবারে অপলাপ না করিয়া লিখিলেন যে, রাম বিবাহ করিয়াছিলেন জনকের কন্যাকে। 'জনক' শব্দের অর্থ যে পিতা ইহা সকলেই জানেন। এবিষয়ে আরও একটা কথা বিবেচ্য। রামায়ণে সীতার মাতার উল্লেখ নাই। সীতার জন্মবৃত্তান্ত যাহা রামায়ণে বর্ণিত আছে, তাহা একটা অতি-প্রাকৃত ঘটনা; তাহাতে এই বৈজ্ঞানিক যুগে কেহই আস্থাবান হইতে পারে না। অন্য পক্ষে কৌশল্যা প্রভৃতি তিন জন প্রধান মহিষী ভিন্ন দশরথের আরও ৭৫০ জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও গর্ভে সীতার জন্ম হওয়া অসম্ভব নহে। নতুবা সীতার মাতা যে কে ছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই কেন?

কেহ কেহ নিশ্চয়ই বলিবেন যে, রামায়ণই পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা এবং বৌদ্ধশাস্ত্র পরে রচিত হইয়াছিল; এবং বৌদ্ধরাই তাহার অপকর্ষ সাধন করিয়া রামায়ণ হইতে রামের কথা অপহরণ করিয়া স্বীয় শাস্ত্র মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মত কিন্তু ক্রমোন্নতিবাদীরা মানিয়া লইবেন না। তাঁহারা বলিবেন যে বৌদ্ধশাস্ত্রে এবং রামায়ণ-মহাভারতে যখন একই আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাতে এই পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে বৌদ্ধশাস্ত্রের গল্পে কোন সৌন্দর্য্য, অলঙ্কার, কবিত্ব, চমৎকারিত্ব প্রভৃতি নাই, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতে সেই সেই গল্প কবিত্বময় ও সৌন্দর্য্য-পূর্ণ। এক কথায় বৌদ্ধ গল্প অপেক্ষা হিন্দুগল্প সর্ব্বাংশে ভাল। যাহা ভাল তাহাই পরে হইয়া থাকে। রামায়ণের গল্প শুনিবার পর যদি বৌদ্ধেরা রাম-পণ্ডিতের উপাখ্যান লিখিতেন, তাহা হইলে রামসীতার বিবাহবর্ণনায় তাঁহারা কখনই তাহার অপকর্ষ সাধন করিতেন না।

এ বিষয়ে আমি নির্ব্বন্ধ সহকারে কোন মত প্রকাশ না করিয়া সুধীবর্গকে ইহার আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করি।

জাতকের অনুবাদক সুপণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন "দশরথ-জাতকটী ত একখানি ছোটখাটো রামায়ণ। কিন্তু এ সম্বন্ধে কে কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী—কে উত্তমর্ণ কে অধমর্ণ, ইহা বিচার করিতে গেলে সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদের সম্ভাবনা। অনেকে বলিবেন মহাভারত প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব বুঝিতে হইবে যে বৌদ্ধেরাই এই সকল গ্রন্থ হইতে কথা অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে নূতন বেশে সাজাইয়াছেন এবং তাঁহাদের নিজস্ব বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদীরা উত্তর দিবেন, কে বলিল রামায়ণ-মহাভারত গৌতমের পূর্ব্বেই তাহাদের বর্ত্তমান আকার পাইয়াছিল? ... ... অতএব ইহাই বা না বলিব কেন যে তদন্তর্গত জাতক-সাদৃশ্যযুক্ত আখ্যায়িকাগুলি প্রক্ষিপ্ত? যে সমস্ত আখ্যায়িকা হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের সাধারণ সম্পত্তি, সেগুলি সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলেও বৌদ্ধ আখ্যায়িকাগুলির পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রতিভাত হয়। সে সমস্ত বৌদ্ধের হস্তে অমার্জ্জিত অসংস্কৃত ও কার্য্যোৎকর্ষ-বর্জ্জিত; পক্ষান্তরে রামায়ণ-মহাভারতই বল বা পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশই বল, রচনাচাতুর্য্যে ভাবমাধুর্য্যে ও চরিত্রবিশ্লেষণে উৎকৃষ্টতর। ... ... মানবসমাজে সর্ব্বত্রই যখন ক্রমোন্নতি দেখা যায়, তখন সাহিত্যেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? ... ... বৌদ্ধ জাতকগুলির রচনাকালে রামায়ণ ও মহাভারত যদি বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জনসমাজে সুবিদিত থাকিত, তাহা হইলে বৌদ্ধ উপাখ্যানকারেরা বোধ হয় মূল ঘটনার কোন বিকৃতি ঘটাইতে সাহসী হইতেন না। সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোন আখ্যানের অপকর্ষ ঘটাইলে শ্রোতার ও পাঠকের মনে যদি বিরক্তিরই উদ্রেক হয়, তাহাতে ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা ঘটে না। যদি বলা যায় যে, বৌদ্ধেরা রামায়ণ-মহাভারত জানিতেন না, তাহাও অসম্ভব; কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। ... ... বর্ত্তমান রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় গ্রন্থ তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত থাকিলে তাঁহারা যে সেগুলি অধ্যয়ন করিতেন না, ইহা একেবারেই অসম্ভব।" জাতকের ভূমিকা। ॥৶০ এবং ৸০ পৃষ্ঠা।

জাতক-আখ্যানই যদি সংস্কৃত হইয়া রামায়ণে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে রামায়ণের ঐতিহাসিকত্বে সন্দেহ হয়। এই বিষয়ে এবং রামায়ণের আরও কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

রামসীতার বিবাহ ও বৌদ্ধশাস্ত্র

("রামায়ণ সম্বন্ধে দুই-একটী কথা"র প্রতিবাদ)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধের সহিত আমরা সর্ব্বাংশে একমত হইতে পারিলাম না। ভারতের পুরাণাদি শাস্ত্র বা শাস্ত্রোক্ত বিষয়-সকল ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়া যতই আলোচিত হইবে, ততই প্রকৃত সত্যনির্ণয়ের পথ আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই প্রকার আলোচনার স্থান দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি না, যদিও হয়তো সময়ে সময়ে কোন কোন বিষয়ে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নহে। আমরা লক্ষ্য রাখিব যে, প্রবন্ধাদিতে কোন প্রকার নিন্দাবাদসূচক কোন কিছু বাহির না হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধও আমরা ঐতিহাসিক গবেষণার সহায়তার উদ্দেশ্যেই প্রকাশ করিলাম; কিন্তু বলা বাহুল্য, লেখকের মতের সঙ্গে—যদিও তিনি তাঁহার মত সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেন নাই—আমরা একমত হইতে পারি নাই; তাই আমাদের মন্তব্য সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

লেখক লিখিয়াছেন, বৌদ্ধশাস্ত্রে সীতা রামের ভগিনী ও স্ত্রী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বৌদ্ধ-শাস্ত্রের এই বিষয়ক পূর্ব্বাপর বা context উদ্ধৃত করিলে এবিষয়ে বিশেষভাবে বিচার করিবার সুবিধা হইত। যাই হোক, সীতা রামচন্দ্রের ভগ্নী ও পত্নী হইবার পক্ষে বিশেষ কোনই বাধা দেখি না। এখানে ভগ্নী বলা হইয়াছে বলিয়া যে সহোদরা ভগ্নী বুঝিতে হইবে, এমন কোন কারণ দেখিতেছি না। দশরথও একজন বড় রাজা ছিলেন, জনকও তদপেক্ষা বিশেষ কমদরের রাজা ছিলেন বলিয়া রামায়ণ বা মহাভারত পাঠে বুঝা যায় না। উভয় রাজার মধ্যে কুটুম্বিতাসূত্রে আত্মীয়তা থাকা অসম্ভব ছিল না, বরঞ্চ সম্ভবই ছিল মনে হয়। সেই আত্মীয়তাসূত্রে সীতার রামচন্দ্রের দূর-সম্পর্কিত ভগ্নী-পদবাচ্য হওয়া আশ্চর্য্য কি? এক সময়ে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সহিত ভারতের সাধারণ হিন্দুদিগের প্রণয় যে বড় প্রভুভাব ধারণ করিয়াছিল এবং not much love was lost between them একথা একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। সেই সময়ে বৌদ্ধশাস্ত্রে যে, সীতা রামচন্দ্রের যে সহোদরা ভগ্নী নয়, সে কথা উল্লেখ না করিয়া তদানীন্তন হিন্দুদিগের বিশেষভাবে পূজ্য রামসীতাকে হেয়-রূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামচন্দ্রের সহিত সীতার মাত্র ভগ্নী সম্পর্কটুকু উল্লেখ করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়।

লেখক লিখিতেছেন যে, উদ্দালক-শ্বেতকেতুর উপাখ্যান হইতে দেখা যায় যে আদিযুগে বিবাহ-প্রথা ছিল না। কিন্তু এই যুগ যে কত পূর্ব্বের তাহা স্থির করাই দুঃসাধ্য। মহাভারত বা রামায়ণের সময়ে এবং উহার পরে এত উচ্চ সভ্যতায় জনসমাজ আরোহণ করিয়াছিল যে, ঐ উপাখ্যানের উল্লেখ করিলে অনেকের বিচারশক্তি রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। তারপর লেখক লিখিয়াছেন "পূর্ব্বে নিকট ভ্রাতাভগিনী অর্থাৎ আত্ম জ্ঞাতির কন্যাপুত্রে বিবাহ হইত"। এখানে মনে হয় লেখক সহোদরার বিবাহ স্বীকার করেন নাই। তাহা যদি না করেন, তবে আমাদের আপত্তির কোনই কারণ দেখি না। বর্ত্তমানে ইউরোপের রাজন্যবর্গের মধ্যেও আভিজাত্য রক্ষার জন্য নিকট সম্পর্কিত ভ্রাতা-ভগ্নীর (cousins) মধ্যে বিবাহ দেখা যায়। সেইরূপ রামায়ণের সময়েও আভিজাত্য-রক্ষা এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি অন্যান্য নানা কারণে নিকট সম্পর্কিত cousinsদিগের মধ্যে, কিন্তু সহোদর-সহোদরার মধ্যে নয়, বিবাহ সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল; এবং প্রচলিত থাকিলেও দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না। লেখক লিখিতেছেন যে, বুদ্ধের সময়েও অতি সম্ভ্রান্ত বংশে এই প্রথা ছিল। এই প্রথা থাকাই তো সম্ভব। বুদ্ধ তাঁহার মাতুল-কন্যা গোপাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মাতুল বুদ্ধের মাতার সহোদর ভাই ছিলেন বা অ-সহোদর মাতুল সম্পর্কিত মাত্র ছিলেন, তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যতদূর মনে পড়ে, আমাদের মনে হয় যে, তিনি বুদ্ধ মাতার সহোদর ভাই ছিলেন না। এ অবস্থায় বুদ্ধের সম্পর্কিত মাত্র মাতুলের কন্যাকে বিবাহ করায় কোনই দোষ [illegible] পাবে না।

আমরা উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা সঙ্গত হইলে, রাম বুদ্ধের বহু পূর্ববর্ত্তী লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহার সময়ে নিকটতর সম্পর্কের নরনারীর (সহোদর ভ্রাতা-ভগীর ইঙ্গিতসূচক) বিবাহের সম্ভাবনা ছিল, লেখকের এই উক্তি যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না।

রামায়ণে যে 'বুদ্ধ' 'শ্রমণ' প্রভৃতির উল্লেখ আছে তাহাই যে প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার প্রমাণ কি? রামায়ণে বুদ্ধ প্রভৃতির উল্লেখ থাকায় যদি রামায়ণকে বৌদ্ধশাস্ত্রের পরবর্ত্তী ধরিতে হয়, তবে বৌদ্ধ শাস্ত্রে রামসীতার বিবাহাদি উল্লেখ থাকায় বৌদ্ধ-শাস্ত্রকেই বা রামায়ণের পরবর্ত্তী বলিয়া না ধরিব কেন?

লেখক "জনক" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইয়া অর্থাৎ "পিতা" এই অর্থ ধরিয়া সীতাকে দশরথেরই ঔরসজাত কন্যা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। এরূপ সন্দেহ কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। জনক-রাজের নাম কি কারণে জনক হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু এটুকু তো জানি যে, জনক-রাজার রাজ্য দশরথের রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তখন জনক ও দশরথ একই ব্যক্তি, এরূপ মনে করা অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। উভয়ে যদি এক ও অভিন্ন ব্যক্তিই হইলেন, তবে উভয়ের মধ্যে সংবাদ প্রভৃতি আদানপ্রদানের কথা উল্লিখিত হইল কিরূপে? এক ব্যক্তির সহিত এই বিষয় লইয়া আমাদের কথালাপ হইতেছিল। তিনি বলিলেন যে, যদি প্রত্যেক ব্যক্তির নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিয়াই তাঁহার ব্যক্তিত্ব ধরিতে হয়, তবে ধরিতে হয় যে, দশরথের ঠিক দশটাই রথ ছিল এবং শত্রুঘ্ন শৈশব অবধিই শত্রু হনন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর তাহা হইলে লক্ষ্মণ ও ভরত সম্বন্ধে নামের কি ব্যাখ্যা দিতে পারা যায়?

সীতার মাতার নাম রামায়ণে উল্লিখিত হয় নাই সত্য; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই নাম উল্লিখিত হয় নাই। সীতা হলাগ্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তো তাঁহার নাম "সীতা" হইয়াছিল। এরূপ প্রসঙ্গ আছে যে, কোন সময়ে রাক্ষসরাজ রাবণ আপন সাম্রাজ্য-গৌরবে ভ্রান্তবুদ্ধি হইয়া মুনিঋষিগণের নিকট রাজপ্রাপ্য করের জন্য উৎপীড়ন করেন। উৎপীড়িত ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব জানু বিদারণ পূর্ব্বক করস্বরূপ শোণিত প্রদান করিয়া রাবণকে এই অভিশাপ দেন যে, ইহাই তোমার সবংশে ধ্বংস হইবার কারণ হইবে। সভয়ে ও সযত্নে রক্ষিত এই শোণিত রাবণের দিগ্বিজয়কালে মন্দোদরী ভক্ষণ করায়, যথাকালে তাহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন স্বামীভয়ে ভীতা মন্দোদরী আপন জানু চিরিয়া সেই ভ্রূণরূপী রক্তপিণ্ড একটী পাত্রে গ্রহণপূর্ব্বক নদীর জলে ভাসাইয়া দেন। ইহাই ভগবদ্‌বিধানে কালক্রমে মনুষ্যমূর্ত্তি গ্রহণ করে এবং ভূমিকর্ষণ-কালে জনকের হলাগ্রে উত্থিত হয়। ইহাতেই তো স্পষ্ট দেখা যায় যে, সীতা আসলে কুড়ানো মেয়ে, জনকরাজা তাঁহাকে সুলক্ষণাক্রান্তা দেখিয়া পোষ্য কন্যা করিয়া লইলেন। রামচন্দ্র জনকরাজার পোষ্য কন্যা জানিয়াই সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন অনুমান হয়। দশরথের যে তিনজন মহিষীর নাম উল্লেখ করা ঘটনাপ্রসঙ্গে আবশ্যক বোধ হইয়াছিল, সেই তিন জনেরই নাম রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। যখন উক্ত তিনজন স্ত্রীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন দশরথ সীতার পিতা হইলে দশরথের যে স্ত্রী সীতার মাতা ছিলেন, তাঁহারও নামের উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত—তাহা না থাকিবার তো কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যে রামায়ণ কথা বিকৃত আকারে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, লেখক মহাশয় পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখিতেছেন যে, ক্রমোন্নতিবাদীরা উহা স্বীকার করিবেন না। এই মত ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত, সে কথার বিচার এখানে না করিলেও আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারি না; কারণ প্রক্ষিপ্ত হইবার মতবাদ স্বীকারে কোন বাধা দেখা যায় না। বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত গল্পের যে সৌন্দর্য্য নাই অলঙ্কার নাই, তাহাই তো আরও পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রামায়ণ-কথা হইতে সমস্ত বাদসাদ দিয়া নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির উপযুক্ত অংশটুকু গৃহীত হইয়া বিকৃত আকারে প্রকাশ করিবার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। যাহা ভাল, তাহা যে পূর্ব্বে হইতে পারেই না, এমন কথা বলা বড়ই দুঃসাহসের কথা। রামায়ণের পর বৌদ্ধেরা রামসীতার উপাখ্যান লিখিলে তাঁহাদের

বিবাহবর্ণনার অপকর্ষ সাধন করিতেন না, হিন্দু-বৌদ্ধের কঠোর বিরোধবিবাদ স্মরণ করিলে, যাহার ফলে অনেক হিন্দুজাতি আজ পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য পরিগণিত হইয়াছে, লেখকের এই উক্তি স্বীকার করিতে পারি না।

ঈশান বাবুর মত উদ্ধৃত করিয়া লেখক পাঠকগণের সম্মুখে বিচারের জন্য ধরিয়াছেন। কিন্তু উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে তাহার ভিতর হইতে লেখকেরও মত কতকটা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। ঈশানবাবু ক্রমোন্নতির উপর দাঁড়াইয়া বলিতে চান যে, যাহা কিছু ভাল তাহাই পরবর্ত্তী। এ কথা আমাদের দেশের বিষয় আলোচনা করিলে বলা যায় বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণের সময় বল, অথবা বৌদ্ধরাজা অশোক বা পালবংশের সময় বল, সে সময় অপেক্ষা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ পরবর্ত্তী বলিয়াই কি এখনকার সমাজকে ভাল বলিতে হইবে? ঈশানবাবু এস্থলে বৌদ্ধশাস্ত্রের হইয়া একটু ওকালতি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ জাতকগুলি যে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহা জাতকগুলি পাঠ করিলেই উপলব্ধ হইবে। সেগুলি অনুমান হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগেরই অভিরুচিমত রচিত হইয়া তাহাদিগেরই নিকটে পঠনপাঠন হইত। দেশের মতিগতি অনুযায়ী অর্থাৎ মজ্জাগত apathy'র কারণে হিন্দুরা বৌদ্ধদিগের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করা বা বিবাদ উপস্থিত করা সমীচীন বোধ করে নাই। বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের লিখিত হিন্দুবিরোধী অনেক কথা বিকৃত আকারে আবির্ভূত হইলেও বুদ্ধপন্থীদিগের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত হইবার পথ লাভ করিয়াছিল।

মূল প্রবন্ধের প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় যে রামায়ণের ঐতিহাসিক বিষয়ের ঐতিহাসিকভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি এ বিষয়ে আলোচনা আহ্বান করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের দুই চারিটী বক্তব্য তাঁহার সমক্ষে এবং পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। অনেক বিষয়েই তাঁহার সঙ্গে একমত হইতে না পারিয়া আমরা দুঃখের সহিত তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আশা করি, ইহার জন্য তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলাম যে স্বল্পায়তন পাদটীকায় মতের অনৈক্য প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইব; কিন্তু লিখিবার পথে অগ্রসর হইতে গিয়া দেখি যে, বিষয়ের গুরুত্বের কারণে এ বিষয়ে আমাদের মন্তব্য বিশদরূপে ব্যক্ত করাই শ্রেয় এবং সেই কারণেই এই প্রবন্ধটী আমরা লিখিলাম এবং পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কাসত্ত্বেও এই সংখ্যাতেই মূল প্রবন্ধের পরেই উহা প্রকাশ করিলাম।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স দ্বারকানাথ

(শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, কবিভূষণ, কাব্যরত্ন বি-এ)

(১) দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রথমবার বিলাত যাত্রা

দ্বারকানাথ ঠাকুর দুইবার ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। প্রথমবার, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, ৯ই জানুয়ারী, রবিবার তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যান এবং যাইবার সময় ইটালীর রাজধানী রোম-নগরে গিয়া পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১০ই জুলাই শুক্রবার তিনি লণ্ডন নগরে উপস্থিত হন। ১৬ই জুন তারিখে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স এলবার্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভারতবাসীর পক্ষে এরূপ গৌরব-লাভ এই প্রথম দেখা যায়। মহারাণী ও প্রিন্স এলবার্টের অনুরোধে ইনি তাঁহাদিগের সহিত একত্র ভোজন এবং ইংলণ্ডের সৈন্য সম্মেলন (Review) ও রাজ-প্রাসাদের শিশুগৃহ পরিদর্শন করেন। তিনি প্রায় ৪ মাস ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সংকল্প করেন যে, ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্স দেখিয়া দেশে যাইবেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করেন। ইহার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে তিনি পুনরায় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্টের নিকটে বিদায় লইবার জন্য "উইণ্ডসর ক্যাসেলে" তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহারা দ্বারকানাথকে এবারেও যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের অনুরোধে তাঁহারা

তাঁহাদের দুইখানি তৈলচিত্র (১) কলিকাতাবাসীগণকে উপহার দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। শুধু তাহাই নহে। তাঁহারা লর্ড ফিটজ্‌জেরাল্ড দ্বারা দ্বারকানাথকে একখানি স্বর্ণপদক উপহার পাঠাইয়া তাঁহার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২১ অক্টোবর তারিখে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বদেশ-হিতৈষীতার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র সহ একটি সুবর্ণ-পদক উপহার প্রদান করেন। দ্বারকানাথও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

(২) দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির-নির্ম্মাণ

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন প্রথমবার বিলাত যান, তখন তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার দিবসে টাউনহলে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। (১) এই সভায় গণ্যমান্য য়ুরোপীয় ও বাঙ্গালীগণ উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণও দলে দলে আসিয়া এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রত্যেক রবিবার দ্বারকানাথের টিফিনের অংশভাগী হইয়া সেরি-স্যাম্পেন চালাইতেন, এবং অভাব জানাইলেই দ্বারকানাথ যাঁহাদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশ লোকই এই সভায় উপস্থিত হন নাই, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। এই সময় সভায় একটি প্রস্তাব উঠিল যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমাধি-স্থানের অত্যন্ত দুর্গতি হওয়ায় তাহার সংস্কার করা উচিত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে John Mack, ৩রা জানুয়ারী তারিখের Friend of India পত্রে লিখিয়াছেন, "প্রসিদ্ধ রচনা-লেখক John Fosterএর সহিত আমি যখন তখন দেখা করিতে যাইতাম। তিনি Stapleton Groveএ বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর ঠিক পার্শ্বেই রামমোহন রায়ের কবর ছিল। তিনি রামমোহন রায়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, এবং তাঁহার অশেষ গুণকীর্ত্তন করিতেন। তিনি বলিতেন, যেখানে রামমোহনের কবর ছিল, তাহা অন্য একজন আসিয়া কিনিয়া লইয়াছে। কবরের চিহ্নমাত্র নাই।" (২) যাহা হউক, মুক্তহস্ত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাতে গমন করিয়া উক্ত স্থান হইতে রামমোহন রায় মহাশয়ের মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া যান এবং "আর্ণোস-ভেল" (Arno's Vale) নামক স্থানে তাহার উপরি একটি মনোহর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। (৩)

(৩) ফ্রান্সে লুই ফিলিপ ও দ্বারকানাথ ঠাকুর

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর তারিখে দ্বারকানাথ ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া যান, এবং কয়েক দিন ফ্রান্স-দেশে থাকিয়া কলিকাতায় আসিবার সংকল্প করেন। তৎকালে লুই ফিলিপ ফ্রান্সের রাজা ছিলেন। ফ্রান্সেও দ্বারকা-নাথের আদর ও অভ্যর্থনার সীমা ছিল না। ২৮শে অক্টোবর তারিখে তিনি রাজা ও রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ফরাসী-দেশীয় রাজগণের প্রথানুসারে আগন্তুক ব্যক্তি কখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু লুই ফিলিপ সে প্রথা উলঙ্ঘন করিয়া দ্বারকানাথকে নিজ অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্বীয় মহিষীর সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় করিয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বেলজিয়মের রাজা ও রাণী, নিমুর্শের ডিউক ও ডাচেস্ এবং রাজকুমারী ক্লেমেণ্টাইনের সহিত দ্বারকানাথের পরিচয়-দান ও গুণ-কীর্ত্তন করিতে ত্রুটি করেন নাই। দ্বারকানাথের সম্মানের জন্য সমগ্র রাজভবন আলোকিত করা হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং তাঁহাকে বাটীর ভিতরে লইয়া গিয়া তাঁহার যাবতীয় ঘর ও আসবাব সামগ্রী দেখাইয়াছিলেন। (১)

---

(১) এই দুইখানি তৈলচিত্র বহু বিলম্বে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, যতক্ষণ না ইহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়াছিল, ততক্ষণ মহারাণী ইহা গ্রহণ করেন নাই। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে মাননীয় মিঃ মারে কলিকাতায় দ্বারকানাথকে এই বিলম্বের কারণ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। উইন্টার বোথাম্ নামক একজন ইংলণ্ডদেশীয় প্রসিদ্ধ চিত্রকর এই দুইখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে টাউনহলে ইহা-দিগকে স্থাপিত করা হয়। মনোমতভাবে চিত্র স্থাপিত না হওয়ায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখের Calcutta Star নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক চিত্রস্থাপন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ তারিখের Eastern Star নামক সংবাদপত্রে জানিতে পারা যায়, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এল-বার্টকে ধন্যবাদ দিবার জন্য ১লা মার্চ্চ তারিখে টাউনহলে বাঙ্গালী ও য়ুরোপীয়গণ এক বিরাট সভা আহ্বান করেন। ইহাতে স্থির হয় যে, যখন দ্বারকানাথ শীঘ্রই দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা করিতেছেন, তখন আমাদের এই ধন্যবাদ পত্রখানি তিনিই মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্টকে স্বহস্তে প্রদান করিবেন। Friend of India, 5 January 1843, p 10; 4 April, 1844, p, 215; Eastern Star, 2 March, 1845.

(১) Hurkaru 10 January 1842.

(২) Friend of India, 13 January 1842.

(৩) "রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত"। ৩৮৪ পৃঃ

(১) Friend of India, 5 January 1843.

এইখানে বহুদিনের একটি গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। খাঁ-পোস্তায় একটি সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন। তাঁহার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইঁহার পিতা শিবচরণ ঠাকুরই হিন্দু কলেজের প্রথম দিনের প্রথম ছাত্র। দেবেন্দ্রনাথ রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ ও আদিব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার নামের ও বয়সের ঐক্য এবং মনের মিল থাকায় উভয়ের মধ্যে পরম সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল, এবং উভয়েই পরস্পর "সখা" বলিয়া ডাকিতেন। আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি, তখন পোস্তার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে থাকিতাম ও তাঁহার পুত্রকে পড়াইতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। উভয়ে একত্র বসিয়া "অমরকোষ অভিধান" পড়িতাম। একদিন তিনি বলিলেন, "আমার সখা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত একদিন তোমার আলাপ করিয়া দিব"। আমি ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। একদিন তাঁহার সঙ্গে মহর্ষির সহিত দেখা করিতে গেলাম। পোস্তার দেবেন্দ্রনাথ, মহর্ষির সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। দেখিলাম, মহর্ষি বাস্তবিকই মহর্ষি। তাঁহার যেমন গুণ তেমনি রূপ। কথাগুলি মধুমাখা। তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি এখনও আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। কথায় কথায় মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা তুলিলেন। তিনি বিলাতে গিয়া কিরূপ ভাবে থাকিতেন ও কি কি করিয়াছিলেন, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। এই কথা বলিবামাত্র তিনি স্বয়ং উঠিয়া গিয়া একখানি বই আনিয়া তাহাতে আমার নাম লিখিয়া আমাকে উপহার দিলেন। যতদূর মনে হয়, বইখানির নাম Stockler's Life of Prince Dwarkanath Tagore. এই বইখানি ছোট নহে, বেশ মোটাসোটা। এই বইখানি সুদীর্ঘকাল পরে আর খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইহা এখন অতি দুর্লভ। মহর্ষি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবা যখন ফ্রান্সে গিয়া লুই ফিলিপের সহিত দেখা করেন, তখন ফিলিপ বাটীর ভিতরে একটি মনোহর ফোয়ারা দেখাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ইহা কেমন সুন্দর দেখুন। ফোয়ারা হইতে সুন্দরভাবে জল পড়িতেছে দেখিয়া বাবা আহ্লাদে ও মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন, It is exactly like that of my Belgachia villa" দ্বারকানাথের কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। আমি বাল্যকালে বেলগাছিয়া বাগানের যে অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়াছি, তাহা আর এখন নাই। আমি এখানে যাহা যাহা লিখিলাম, তাহা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের কথা। অগ্রজ-প্রতিম বহুদর্শী এটর্নী শ্রীযুক্ত কালিদাস ভদ্র মহাশয়ের মুখেও সম্প্রতি ফোয়ারায় গল্পটি শুনিয়াছি।

(৪) দ্বারকানাথ ঠাকুরের মল্লযুদ্ধার্থে আহ্বান

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ফ্রান্সে গিয়াছিলেন, তখন একটি হাস্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন একটি ভোজে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সেখানে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন দ্বারকানাথের এইরূপ আদর ও অভ্যর্থনা দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। দ্বারকানাথ পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি অন্য এক প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া ভারতীয় পালোয়ানের বেশে সুসজ্জিত হইয়া মল্লযুদ্ধস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে এই প্রকারে সজ্জিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, "আমাদের দেশের পালোয়ানরা এইরূপ মালকোচা মারিয়া কুস্তি করে"। তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লযুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইল। (১)

(৫) দ্বারকানাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়বার য়ুরোপ যাত্রা

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ শনিবার দ্বারকানাথ ঠাকুর "বেণ্টিক" নামক জাহাজে চড়িয়া য়ুরোপ যাত্রা করেন। তাঁহার এই কয়েকজন সঙ্গী এক জাহাজেই তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন:—দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ, তাঁহার ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার র‍্যালে, দিল্লী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বৌট্রস, ডাক্তার গুডিভ্ ও তাঁহার চারিজন ছাত্র—ভোলানাথ বসু, গোপাললাল শীল, দ্বারকানাথ বসু ও সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী। যাইবার সময় কেইরোনগরে ইজিপ্টের রাজ-প্রতিনিধি ও নেপল্‌স্ নগরে ইটলীর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ বৎসরের ২৪শে জুন তারিখে লণ্ডনে উপস্থিত হন। এবারেও তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্টের নিকটে নানা সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। প্রাসাদে তাঁহার অভ্যর্থনা-উপলক্ষে দ্বারকানাথ মহারাণীর সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইবার দুর্লভ সম্মান প্রাপ্ত হন। যখন তিনি বকিংহাম প্রাসাদে গমন করেন, তখন মহারাণী ও প্রিন্স এলবার্ট আপনাদের একখানি ছবি তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। ছবিখানির নিম্নভাগে মহারাণী স্বহস্তে এই কথাগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন,—To Dwarkanath Tagore with best regards from Victoria R. Albert, Buckingham Palace, July 8, 1845. এই বৎসর স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে গিয়াও

(১) "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-চরিত"। ১২ পৃঃ

তিনি বিশেষ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ৩০ জুন তারিখে Duchess of Inverness তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। আহার করিবার সময়ে তিনি কম্প অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন।

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মার্টিনের পরামর্শে দ্বারকানাথ Sussex সায়ারের অন্তর্গত সমুদ্রকূলে Worthing নামক বন্দরে গিয়া বাস করেন। তখন কিভাবে তিনি দিনযাপন করিতেন, তৎসম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন—"রোগের যন্ত্রণায় বড়ই অশান্তি ও ছটফটানি হয়েছিল! ৬টার সময় উঠে গাড়ী ক'রে বেড়িয়ে ফিরে এসে অল্প নিদ্রা যেতেন। তার পর আহার। তাঁহার ভৃত্য হুলির তৈয়ারি কারি ও ভাত, আর একটু কমলা লেবুর জেলি, এইমাত্র আহার। পরিচ্ছদের মধ্যে একখানি সুন্দর কাশ্মীরি শাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্য মহিলারা দলে দলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। Duchess of Cleveland প্রত্যহ তাঁকে দেখতে আসতেন। Duchess of Inverness রোজ পত্র দ্বারা তাঁর সংবাদ নিতেন। তিনি তাঁর সাময়িক ব্যবহারের জন্য সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এত পীড়ার প্রকোপেও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি। কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি জানিয়ে কারও প্রতি দোষারোপ করতেন না। সর্ব্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে হাসিমুখে থাকতেন। অতি অকর্ম্মা ভৃত্যও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা হ'তে বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার-ব্যবহারে তিনি অনুরক্ত ছিলেন। দেশীয় পরিচ্ছদ তিনি পরিধান কত্তেন। আলবোলার নল সর্ব্বদাই তাঁর হাতে থাকত; ভৃত্য হুলি তামাক সেজে দিত। তাঁর একটি কাঁচকড়ার তৈয়ারী মসলার ডিপে ছিল। গরম তাঁর আদপে সহ্য হ'ত না। জানালা খুলে শুতেন। প্রত্যহ সকালে স্নান করতেন, আর বরফ-জল ভালবাসতেন। তাঁর শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন, কেহ জিজ্ঞাসা করলে মধুর গম্ভীরস্বরে বলতেন, I am content অর্থাৎ আমি শান্তিতে আছি। ক্রমে তাঁর শরীর আরও অবসন্ন হতে লাগল। তাঁকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান হ'তে জুলাই মাসের ২৭শে তারিখে Dr. Martin তাঁকে সঙ্গে করে লণ্ডনে নিয়ে যান। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট তারিখে তিনি পরলোক-গমন করেন।" (১) এই দিনই তিনি Kensal Green নামক স্থানে মহাসমারোহে সমাহিত হন। গোরস্থানের উপরিভাগে একখানি রৌপ্যফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বঙ্গানুবাদ সহ লিখিত হইয়াছিল। Babu Dwarkanath Tagore, Zemindar, died 1st August 1846, aged 52 years.

(৬) য়ুরোপে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্মান

ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে অবস্থান-কালে দ্বারকানাথ ঠাকুর অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, একদিন ফ্রান্সে একটি ভোজে যত সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে তিনি এক একখানি উৎকৃষ্ট কাশ্মীরি শাল উপহার দিয়াছিলেন। যে কেহ প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে আসিতেন, তিনি বিরুক্তি না করিয়া মুক্তহস্তে তাঁহাকে দান করিতেন। তিনি স্বভাবতঃ সুপুরুষ, সুরসিক ও সদালাপী ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন। *

(১) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* 'বসুমতী' ফাল্গুন, ১৩৩৬

বাঙ্গালী কবি ও বিদেশী সমালোচক।

(শ্রীপ্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল)

(৩)

তরু দত্তের নারী-হৃদয়ের সবটা সীতা-চরিত্র অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ১৮৭৭ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে তিনি কুমারী ক্লারিশা বেডারকে লিখিয়াছিলেন,— "সীতার প্রেম হৃদয়কে স্পর্শ করে, এমন নায়িকা কি আর কোথাও দেখা যায়? সন্ধ্যাকালে আমার মাতা যখন পুরাণ পাঠ করেন, তাহা শুনিয়া আমার চক্ষু বাষ্পাকুল হয়। সীতা দ্বিতীয়বার নির্ব্বাসিতা হইলে যখন তিনি একাকিনী নিবিড় বনে নৈরাশ্যময় ও ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে করুণকণ্ঠে বিলাপ করেন, তাহা শুনিয়া কেহ অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারেন না।" তরু দত্তের জীবনীপাঠে জানা যায় যে, তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিধ পুরাণাদিতে বর্ণিত বহু আখ্যান আজীবন বারংবার শুনিয়াছিলেন ও পাঠ করিয়াছিলেন। শৈশবাবধি ১৮৭৭ সাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত মাতার মুখে তরুদত্ত যে পৌরাণিক আখ্যান শুনিতেন, তৎসম্বন্ধে কবির লিখিত পত্রাদি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবার পর তরু ও তাঁহার পিতা পণ্ডিতের নিকট উক্ত গ্রন্থসকল যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ কবির পত্রাদি ও তাঁহার পিতার উক্তি হইতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণোক্ত "রাজর্ষি ও হরিণ-শিশু"র উপাখ্যান ও "ধ্রুবোপাখ্যান" নামে দুইখানি ইংরাজী খণ্ড-কাব্য, যাহা তরু দত্তের রচিত 'হিন্দুস্থানের প্রাচীন ব্যাখ্যা ও কাহিনী'তে স্থান পাইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কবির পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত কবির রচিত "ফ্রেঞ্চ কাব্য-ক্ষেত্রে সংগৃহীত কবিতা-গুচ্ছে"র (Sheaf gleaned In French Field) প্রস্তাবনাতে লিখিয়াছেন,—"আমরা উভয়ে যখন সংস্কৃত-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতাম, সেই সময়ে তরু কয়েকটি বিষয় ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিল"। ইহার মধ্যে উক্ত "রাজর্ষি ও হরিণ-শিশু"র উপাখ্যান 'কলিকাতা রিভিউ' নামক পত্রিকায়, "ধ্রুবোপাখ্যান" 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তরু দত্তের রচিত উপরোক্ত "কবিতা-গুচ্ছ" ১৮৭৬ সালে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই কাব্য-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ভিক্টর হুগোর কন্যার মৃত্যুতে রচিত স্মৃতি-কবিতার টীকায় তরু দত্ত হুগোর বিলাপোক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই কবিতাপাঠে তিন সহস্র

বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার বিলাপোক্তির স্মৃতি জাগিয়া উঠে। টীকায় রামায়ণের মূল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে:—

তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা।
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম্॥

তরু দত্তের উপর বাল্মীকি ও বেদব্যাসের প্রভাব যে কত বেশী, তৎসম্বন্ধে বিদেশী সমালোচকগণ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। মাতার মুখে গল্প কথা ও পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রামায়ণ ও মহাভারতের ব্যাখ্যা শুনিয়া আর্য্য-চরিত্র সম্বন্ধে তরুদত্ত যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাচীন ভারতের প্রতি তাঁহার ভক্তি গাঢ়তর হইলেও আর্য্য-নারীর চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশী সাহিত্যিক ও সমালোচকের মন্তব্য পাঠ করিয়া তাঁহার মনে প্রাচীন ভারতের আদর্শ নর-নারীর কীর্ত্তি-কাহিনী কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিবার অভিলাষ যে তাঁহার প্রতিভাকে উত্তেজিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ফরাসি বিদুষী ক্লারিশা বেডার-লিখিত "প্রাচীন ভারতের নারী" (La Femme dans L' Inde Antique) নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া তরু দত্ত উক্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার পিতা ১৮৭৬ সালে পুস্তকখানি ফ্রান্স হইতে তাঁহাকে আনাইয়া দেন। তরু দত্ত এই পুস্তক পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন ও পর বৎসরে গ্রন্থকর্ত্রীকে পত্র লিখিয়া পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তরু মৃত্যুর পূর্ব্বে এই পুস্তকের ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মিস্ মার্টিনকে তিনি প্রাচীন ভারতের কাহিনী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"How grand, how sublime, how pathetic, our legends are, the wifely devotion that an Indian wife pays to her husband, her submission to him even when he is capricious and exacting, her worship of him, 'as the god of her life' as old Spenser has it. The legend of Nala and Damayanti, that of Sabitri who followed 'Yama' (Pluto of the Heathen) even to the lower regions, and by her wisdom, her constancy, her love, made him give back to her, her dead husband alive; the legend of Sacontala and Daushmanta; that of Queen Gandhari, who because her husband was blind, put a band on her own eyes, thus renouncing to enjoy a privilege which nature had denied her husband; lest I come to reproach my husband, said she. And last but not least, the sad legend of Ram and Sita."

তরু দত্ত মিস্ মার্টিনকে ক্লারিশা বেডার-লিখিত উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অভাবে ফ্রেডারিক রিচার্ডসন লিখিত "প্রাচ্যের ইলিয়ড্" নামে পুস্তক পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তরু দত্ত বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ফরাসি ও ইংরাজী ভাষায় শ্রুত পঠিত লিখিত বা অনূদিত রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান হইতে আর্য্যনারীর আদর্শ-চরিত্র সম্বন্ধে উত্তমরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

"আমাদের দেশের নারিকাগণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যদি জানিতে চাও, তাহা হইলে অন্ততঃ 'প্রাচ্যের ইলিয়ড' পাঠ কর" একথা যে কবি বলিতে পারেন, তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ভারতবাসী তাঁহাকে হিন্দু কবির আসনে বসাইবে। কুমারী বেডারও আর্য্যনারীর প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৭৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি তরু দত্তকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভারতের নারীগণকে সর্ব্বাপেক্ষা সাধ্বী ও পূত-স্বভাবা বলিয়াছিলেন। তরু দত্ত যে কেবল প্রাচীন ভারতের নারী-চরিত্রেরই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে, পুরুষ-চরিত্রের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পৌরাণিক সাহিত্যের বীর ও করুণ রস তরু দত্তের কবি-হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে যে ফোয়ারার মুখ খুলিয়া দিয়াছিল, তাঁহার পদ্য ও গদ্যময় ইংরাজি রচনার ভিতর দিয়া তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় ভাব-প্রবাহ ইংরাজি-শিক্ষিত পাঠককে দূর অতীতের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। মিস্ মার্টিনকে কবি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"Don't you like Lakshmana? I like him immensely, such a bold and intrepid warrior he was. Is not the sad tale of Dasaratha's fault about the hermit youth, whom he killed by accident, beautiful? The description of the feelings of the king, when he discovered that he had killed a human being, instead of an animal, is vivid and thrilling, and the sorrow of the blind old father of the hermit youth is most pathatic. I also like very much the episode about the nuptials of Ganga, 'the fanciful dripping and bright'; and the charming description of the nymph Menaka. Are not Sita's conversations with the old hermitess Anousuya, beautiful? Her description of her own brith and of her marriage with Rama is exquisite."

তরু দত্ত ও তাঁহার পিতা গোবিন্দচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত সালের ২৩শে নবেম্বর তারিখে তরু মিস্ মার্টিনকে লিখিয়াছিলেন,—

"Pappa and I am going to begin Sanskrit in December; * * * I am very glad of this. I should like to read the glorious epics the Ramayana and the Mohabharata, in the original. I shall be quite a Sanskrit Pundit, when I revisit cambridge!"

১৮৭৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে তরু দত্ত মিস্ মার্টিনকে লিখিয়াছিলেন,—"আমরা সংস্কৃত আরম্ভ করিয়াছি। শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন"। বাল্মীকির রামায়ণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা অন্য কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ চন্দ্রের উক্তি হইতে জানা যায় যে, এই সকল পুস্তকের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ তাঁহারা পাঠ করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে তরু দত্ত মিস্ মার্টিনকে লিখিয়াছিলেন,—

"We are going on with our Sanskrit lessons. When we have finished the book we are reading now, we will take up Valmiki's Ramayana. My uncle has followed our example and has commenced reading Sanskrit also, with another pundit."

১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে সংস্কৃত ভাষার রীতিমত চর্চ্চা রামবাগানের দত্ত কবিদের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তরু দত্ত ও তাঁহার পিতার শিক্ষক সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক আলোকনাথ পণ্ডিতের নিকট রামবাগানের দত্ত-বংশের হিন্দুশাখার ঈশানচন্দ্র দত্ত ও তাঁহার পরে তাঁহার পুত্রদ্বয় যোগেশচন্দ্র ও তাঁহার স্বনামপ্রসিদ্ধ ভ্রাতা রমেশ চন্দ্র দত্ত আই-সি-এস, মহোদয়ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তবে তরু দত্ত ও তাঁহার পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দত্ত কবিদের মধ্যে যে ভারতের প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ হইয়াছিল, ইহা তরু দত্ত লিখিত উপরোক্ত পত্রাংশ পাঠে বুঝা যায়। ইংরাজী শিক্ষার যে প্রবল স্রোত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশে বহিতেছিল, তাহাকে বাধা দিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেকগুলি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের অমর কবি যেদিন সংস্কৃত ভাষা রীতিমত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতে বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনে প্রাচীন ভারতের লুপ্ত আর্য্য আদর্শের প্রভাব নূতন আকারে দেখা দিয়াছিল। অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের হৃদয়ে পূর্ণ সংস্কার সংস্কৃত ভাষার প্রসাদাৎ জাঁকিয়া বসিলে কবির অন্তর্দৃষ্টি বঙ্গভারতীর কবিত্বময়ী যে মূর্ত্তি পাশ্চাত্য মাল-মসলায় গঠিত কাব্য-মন্দিরে চিরকালের তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহাই এদেশের হিন্দুগণের পাশ্চাত্যের প্রভাব হইতে বাঙ্গালীর জাতীয়তাকে শুধু রক্ষা করে নাই, তাহাকে দেশাত্মবোধের দিক দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। কাব্য-সাহিত্যের ভিতর দিয়াই যে বাঙ্গালী আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে, তদ্বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। সেই কাব্যসাহিত্যের অবয়ব বিদেশী আহার্য্যে পরিপুষ্ট হইলেও তাহার প্রাণবস্তু যে হিন্দু আদর্শ তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। মধুসূদন আধুনিক বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খৃষ্টান মহিলা-কবি তরু দত্তও ইংরাজী ভাষায় রচিত কাব্যের ভিতর দিয়া পাশ্চাত্যের সাহিত্য-জগতে প্রাচীন ভারতের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া এদেশের ইংরাজী শিক্ষিত পাশ্চাত্য মোহীকে বিদেশী প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৭৫ সালে যেদিন তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, সেই দিনও বঙ্গদেশের কাব্যজগতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মধুসূদন ও তরু দত্তের কবি-জীবনে ভারতের দেবভাষা নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল। মৃত সংস্কৃত সাহিত্যের কঙ্কালগুলি পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যের বালখিল্য সভ্যতা ভারতের প্রাচীন অতিকায় আর্য্য সভ্যতার তুলনায় নগণ্য হইলেও জীবন্ত। সেইজন্য জীবন্ত পাশ্চাত্য-সাহিত্যকে নিঙড়াইয়া তাঁহারা যে মৃত-সঞ্জীবনী রস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যের উপর তাহা ছিটাইয়া দিয়া অতীতের বিস্মৃতি হইতে পুণ্যভূমি ভারতের উচ্চতম আদর্শকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার পটে পূর্ব্বপুরুষগণের ছায়া-চিত্র দেখিয়া মধুসূদন ও তরুদত্তের প্রতিভা বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষার পটে যে জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, তাহাতে চিত্রকরের অতুলনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তরু দত্তের রচিত চিত্রগুলির ভাষা পরিচ্ছদ দেখিয়া ভ্রান্ত সমালোচনা তাহাদিগকে বিদেশী আদর্শে রচিত মনে করিতে পারে; কিন্তু অত্যন্ত আমোদের বিষয় যে "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের ভাষা-পরিচ্ছদেও স্থূলদৃষ্টি কয়েকজন বাঙ্গালী সমালোচক কবির উপর বিদেশী প্রভাব দেখিয়াছেন। বিদেশী আর্ট কি তাহা হইলে মধুসূদন নিজস্ব করিতে পারেন নাই? এড্‌মন্ গস্ (Edmund Gosse) প্রমুখ বিদেশী সমালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে তরু দত্তের চিত্রগুলি সম্পূর্ণ হিন্দু আদর্শে রচিত। বিদেশী সমালোচক ইংরাজী ভাষার কবি তরু দত্তকে "হিন্দু কবির আসনে" বসাইতে চাহেন, কিন্তু বাঙ্গালী সমালোচক বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি মধুসূদনকে সে আসন দিতে প্রস্তুত নহেন। বিস্ময়ের কথা বটে!

বিভুগুণ গাও।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(বাউলের সুর)

বিভুগুণ গাওরে প্রাণপাখী
দারা-সুত যত কিছু সবাই দেবে ফাঁকি॥
তাঁরে ছেড়ে আর ডাকবি কাকে—
নিতুই প্রাণে যে দেব জাগে?
রোস নে সরে আপন ফাঁকে—
কি মধু সে দেখ্‌রে ডাকি।
মধুর সিন্ধু পায়, যে ডাকে—
কষ্ট পেতে হয় না তাকে;
আনন্দে সে বিভোর থাকে—
দেবতা রাখেন পক্ষে ঢাকি।
আকাশ-পথে রইবি জাগি—
গান গাবি রে থাকি থাকি;
তখন তোরে বেঁধে রাখে—
দেখতে কারেও পায় না আঁখি॥

সুখদাসুন্দরী অমৃতধামে।

আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পরলোকগত সহধর্ম্মিণী ৺সুখদাসুন্দরী দেবীর জীবনকথা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আমরা তাহা সংক্ষিপ্ত আকারে সাদরে প্রকাশ করিলাম। ভগবান তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করুন।

"পাতিব্রত্য ও সতীত্বের মূর্ত্তি সুখদাসুন্দরী ইহজগতে নাই। তিনি অমৃতধামে গিয়াছেন, আর তাঁহার স্বহস্তগঠিত সারস্বত কুটীর এখন গভীর শোকাভিভূত। সকল সম্প্রদায়ের পল্লীবাসী নরনারী তাঁহার বিয়োগে ম্রিয়মাণ। শিলচর সহর তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পিতা ৺নয়নচন্দ্র দত্ত পুরকায়স্থ।

সুখদাসুন্দরী শিলচর বঙ্গবিদ্যালয় হইতে আসামের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন এবং আসাম গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৩৲ টাকা বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে শ্রীহট্ট জেলায় বেজুড়া-গ্রামনিবাসী কাশ্যপগোত্র ৺যাদবেন্দ্র মজুমদারের পৌত্র ও ৺ব্রজনাথ মজুমদারের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদারের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করেন এবং সেই সঙ্গে তিনি বিবিধ কারুকার্য্য ও শিল্পকার্য্য শিক্ষা করেন।

তিনি চরকায় সুন্দররূপে সূতা কাটিতে পারিতেন। আসাম গবর্ণমেণ্টের বয়ন-পরিদর্শক তাঁহার কাটা সূতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মোজা প্রভৃতি এবং কোট সেমিজ প্রভৃতি কাটা কাপড় সুন্দররূপে প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি বাঁশের ঝুড়ি ফুলের সাজি নির্ম্মাণ, সুপারির খোল হইতে ডালা প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্পকার্য্যেও বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে যাহা শিখিতেন, পল্লীবাসী অপর সাধারণকেও তাহা শিখাইতে ভালবাসিতেন। তিনি চিত্রশিল্পেও সুনিপুণ ছিলেন।

কেবল যে চারুকলায় তিনি দক্ষ ছিলেন তাহা নহে, রন্ধনাদি কার্য্য, মিষ্টান্ন প্রস্তুত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য কর্ম্মেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রাচীন সুগৃহিণীদের অনুকরণে পরিবারের সকলের এবং অতিথি-অভ্যাগতদের আহারাদি শেষ হইলে নিজে আহারে বসিতেন।

সর্ব্বোপরি, তাঁহার ধর্ম্মভাব আশ্চর্য্য ছিল। তিনি "লেস" ডালা প্রভৃতি যাহা কিছু বুনন করিতেন, সকলেতেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ভাব সেই একে" প্রভৃতি ধর্ম্মভাবসূচক কোন একটী বাক্য না প্রকাশ করিলে তৃপ্তিলাভ করিতেন না।

তিনি অজাতশত্রু ছিলেন; কাহারও সহিত তিনি বিবাদ-কলহ করিতেন না। তিনি সকলেরই প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি সমদৃষ্টিতে দেখিতেন।

গৃহের কোন কর্ম্মই তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। দাসদাসীর উপর নির্ভর না করা সত্বেও সকল কর্ম্মই স্বয়ং যথাসাধ্য নির্ব্বাহ করিতেন। স্বাবলম্বনই তাঁহার গৃহস্থালীর মূলমন্ত্র ছিল।

তিনি ব্রহ্মমুহূর্ত্তে নিয়মিত উঠিয়া নিজের কাজকর্ম্ম সারিয়া গ্রামের ছেলেমেয়েদিগকে নানাবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। ভোগবিলাস বা ধনসম্পদের প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল না। নিয়মিত ও শৃঙ্খলার সহিত কর্ম্ম করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। নিয়মের উপর চলিতেন বলিয়াই তিনি ব্রহ্মমুহূর্ত্ত অবধি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে পারিতেন এবং নানাবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার অবসর পাইতেন।

দর্শন আলোচনার ফলে তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ স্থানীয় সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইত।

আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি" পড়িয়া তিনি আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আচার্যের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপে বেজুড়াগ্রামে "ক্ষিতীন্দ্র লাইব্রেরী" নামে একটী সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি ভক্তিমতী ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি অচল বিশ্বাসের বলে তিনি সংসারের অনেক ঘাতপ্রতিঘাত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া গিয়াছেন।

পরমেশ্বর তাঁহার আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দান করুন।"

ভূমিদান।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজে ৫২৮১৮।৫৯ নম্বর মহাল সানন্দরায় রায়মজুমদার হইতে ১৫ নম্বর খারিজ পৃথক হিসাব প্রসন্ন কুমার মজুমদার মহালের অন্তর্গত অর্দ্ধ বিঘা ধানীজমি রকম ভূমি দান করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর ঐ ভূমির আয় সমাজে প্রেরিত হইবে। ঐ ভূমির বার্ষিক খাজানা এক টাকা। সমাজের সহিত স্থায়ী সম্বন্ধ সংরক্ষণার্থ এককালীন কিছু অর্থ দান না করিয়া ভূমিদান করা হইয়াছে।

দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

এককালীন দান

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	২৫৲

উৎসবের দান।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ	১৲
শ্রীসুধীরচন্দ্র বিশ্বাস	১৲
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু	১৲
শ্রীতুলসী দাস দত্ত	২৲